توضيح القرآن
آسان ترجمۂ قرآن
আল কুরআনুল কারীম
সহজ তরজমা ও তাফসীর
তাফসীরে
তাওযীহুল কুরআন
প্রথম খণ্ড
সূরা ফাতেহা - সূরা তাওবা
শাইখুল ইসলাম
মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দামাত বারাকাতুহুম

আল কুরআনুল কারীম

সহজ তরজমা ও তাফসীর

তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন

প্রথম খণ্ড

সূরা ফাতেহা, সূরা বাকারা, সূরা আলে 'ইমরান
সূরা নিসা, সূরা মায়েদা, সূরা আন'আম
সূরা আ'রাফ, সূরা আনফাল ও সূরা তাওবা

উর্দূ তরজমা ও তাফসীর
শাইখুল ইসলাম মুফতী মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী 'উসমানী
দামাত বারাকাতুহুম

অনুবাদ
মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
ইমাম ও খতীব: পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট জামে মসজিদ, তেজগাঁও, ঢাকা
শাইখুল হাদীস: জামিয়াতুল 'উলূমিল ইসলামিয়া, তেজগাঁও, ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫ ৭৮৫
ই-মেইল: info@maktabatulashraf.com
ওয়েব সাইট: www.maktabatulashraf.com

তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন

প্রথম খণ্ড (সূরা ফাতেহা - সূরা তাওবা)

উর্দু তরজমা ও তাফসীর ঃ শাইখুল ইসলাম মুফতী মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী 'উসমানী
অনুবাদ ঃ মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২ ৮৯৫৭৮৫

প্রকাশকাল
রবিউস সানী ১৪৩১ হিজরী
এপ্রিল ২০১০ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
[মাকতাবাতুল আশরাফ-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান]
৩/খ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-70250-0019-3

মূল্য ঃ পাঁচশত নব্বই টাকা মাত্র

TAFSIRE TAWZIHUL QURAN
1st Part [Sura Fatiha - Sura Tawba]
By: Shaikhul Islam Maulana Mufti Muhammad Taqi Usmany
Transleted by: Maulana Abul Bashar Muhammad *Saiful* Islam
Price: Tk. 590.00 - US$ 20.00 only

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

ভূমিকা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

আমাদের উপর কুরআন মাজীদের বহু হক রয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হকসমূহ নিম্নরূপ–

১. কুরআন মাজীদের প্রতি পরিপূর্ণ উপলব্ধির সাথে ঈমান আনা।

এ ঈমানের কয়েকটি দিক আছে, যথা–

(ক) বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার কালাম যা তিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল করেছেন। এ কিতাব যে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ এবং এর যাবতীয় বিষয়বস্তু সত্য এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এতেও কোনও সন্দেহ নেই যে, নাযিলের সময় থেকে আজ অবধি এ কিতাব যথাযথভাবে সংরক্ষিত আছে এবং কিয়ামতকাল পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। সুতরাং আমরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, বর্তমানে গ্রন্থাকারে যে কুরআন আমাদের হাতে আছে, য়া সূরা ফাতিহা দ্বারা শুরু হয়ে সূরা নাস এ সমাপ্ত হয়েছে, এটাই আল্লাহ্ তা'আলার সেই কিতাব যা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল হয়েছিল।

(খ) বিশ্বাস রাখতে হবে যে, মানুষের হিদায়াত ও সফলতা কুরআনের প্রতি ঈমান আনার মধ্যেই নিহিত। এ ঈমানের মাধ্যমেই মানুষ তার স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করতে ও আখেরাতের মুক্তি পেতে পারে। যে ব্যক্তি এ কুরআনকে নিজের দিশারী ও আদর্শ রূপে গ্রহণ করবে দোজাহানের সফলতা কেবল তারই নসীব হবে।

(গ) কুরআনের প্রতি ঈমান কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন সম্পূর্ণ কুরআনের প্রতি ঈমান আনা হবে। কুরআন মাজীদের কিছু বিধান মানা ও কিছু না মানা এবং কুরআন মাজীদকে জীবনের ক্ষেত্র বিশেষে সিদ্ধান্তদাতা বলে স্বীকার করা ক্ষেত্র বিশেষে স্বীকার না করা, সম্পূর্ণ কুফ্রী আচরণ। গোটা কুরআনকে অস্বীকার করা যে পর্যায়ের কুফ্র এটাও ঠিক সে রকমেরই কুফ্র।

(ঘ) কুরআন মাজীদের প্রতি ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এটাও শর্ত যে, তা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা মোতাবেক হতে হবে, যে শিক্ষা মহান সাহাবীগণ হতে প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসছে। সুতরাং কোন আয়াতকে তার প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসা সর্ববাদীসম্মত ব্যাখ্যার পরিবর্তে নতুন কোনও ব্যাখ্যায় গ্রহণ করলে সেটা কুরআন মাজীদকে সরাসরি অস্বীকার করার নামান্তর ও সেই রকমেরই কুফ্র বলে গণ্য হবে।

২. কুরআন মাজীদের আদব ও সম্মান রক্ষা করা

কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা, তেলাওয়াত করা, লেখা, দেখা ও রেখে দেওয়া ইত্যাদি কাজসমূহ আদব ও প্রযত্ন সহকারে করা, কুরআন সম্পর্কে কথাবার্তা বলার সময় এবং এর অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে আলোচনাকালে আদব রক্ষায় যত্নবান থাকা,সামান্যতম বেআদবী হয় কিংবা কিছুমাত্র অমর্যাদা প্রকাশ পায় এ জাতীয় আচরণ ও কথাবার্তা হতে বিরত থাকা, মোদ্দাকথা অন্তরকে কুরআনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভক্তি-ভালোবাসায় পরিপ্লুত রাখা, এবং সর্বতোভাবে আদব-ইহ্তিরাম বজায় রাখা কুরআন মাজীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হক।

৩. কুরআন মাজীদের তেলাওয়াত

এটা পবিত্র কুরআনের একটি স্বতন্ত্র হক এবং আল্লাহ্ তা'আলার অতি বড় এক 'ইবাদত। এর বহু আদব রয়েছে। প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হল, সে যথাযথ আদব রক্ষা করে প্রতিদিন কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করবে।

তাজবীদের সাথে পড়া, মাখরাজ ও সিফাতের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং পাঠরীতির অনুসরণ করা তিলাওয়াতের অবিচ্ছেদ্য অংগ। আজকাল এ ব্যাপারে চরম উদাসিনতা লক্ষ্য করা যায়। কুরআন মাজীদের অর্থ ও তাফসীর বোঝার জন্য তো সময় বের করা হয়, কিন্তু তেলাওয়াত সহীহ্ করার জন্য মশ্‌ক করা কিংবা মশ্‌কের জন্য সময় বের করার প্রয়োজন মনে করা হয় না। যেন মানুষের কাছে কুরআনের তেলাওয়াত সহীহ্ করা অপেক্ষা অর্থ বোঝাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ অথচ এ ধারণা সম্পূর্ণ গলত, কুরআনের প্রতি ঈমান আনার পর সর্বপ্রথম কাজই হল অবিলম্বে কুরআনের নিত্যকার ফরযসমূহের উপর আমল শুরু করে দেওয়া এবং সহী-শুদ্ধভাবে কুরআন-তেলাওয়াত শেখার জন্য মেহনতে লেগে পড়া।

এমনিভাবে লক্ষ্য করা যায় অনেকে কুরআনের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার জন্য তো সময় বরাদ্দ করে, কিন্তু কুরআন শেখার ও তাজবীদের সাথে তিলাওয়াতের যোগ্যতা অর্জন করার জন্য সময় দিতে চায় না। এটাও এক মারাত্মক অবহেলা।

আরও লক্ষ্য করা যায় যে, সহী-শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত জানা সত্ত্বেও অনেকে নিয়মিতভাবে কুরআন তেলাওয়াত করে না কিংবা তিলাওয়াতের প্রতি লক্ষ্যই দেয় না। আর এক্ষেত্রে তাদের বাহানা হল দ্বীনী বা দুনিয়াবী কাজের ব্যস্ততা। বলা বাহুল্য এটাও গুরুতর অবহেলা। আল্লাহ তা'আলা কুরআন-তেলাওয়াত-সংক্রান্ত যাবতীয় অবহেলা ও উদাসীনতা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন– আমীন।

সম্প্রতি এক শ্রেণীর নব্যপন্থী এমন এক ফিৎনার উদ্ভব ঘটিয়েছে যা কুরআন-তিলাওয়াতের মত মহান ইবাদতের গুরুত্ব হ্রাস করার কিংবা তার গুরুত্ব অস্বীকার করার নিকৃষ্টতম উদাহরণ। তাদের মতে অর্থ না বুঝে তেলাওয়াত করার কোনও ফায়দা নেই; বরং এরূপ তেলাওয়াত একটি গুনাহের কাজ (নাঊযুবিল্লাহ)। কে তাদেরকে বোঝাবে যে, তেলাওয়াত ধর্তব্য হওয়ার জন্য যদি অর্থ বোঝা শর্ত হত, তবে যে ব্যক্তি অর্থ বোঝে না তার নামায শুদ্ধ হত না এবং এরূপ তেলাওয়াত পৃথক কোনও 'ইবাদতও হত না। কেননা অর্থ বোঝাই যখন একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন এর জন্য তো শুদ্ধ পাঠের কোনও প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় তেলাওয়াতকে 'ইবাদত গণ্য করা হবে কেন?

মনে রাখতে হবে তাদের এ চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বেদ্বীনী চিন্তাধারা। আসলে তারা কুরআন মাজীদকে যা কিনা আল্লাহ তা'আলার কালাম, মানব-রচিত বই-পুস্তকের সাথে তুলনা করে। আর সেখান থেকেই এ বিভ্রান্তির উৎপত্তি। তারা দেখছে বই-পুস্তকে অর্থটাই আসল। অর্থ না বুঝলে পড়া নিরর্থক হয়ে যায়। কাজেই কুরআন পাঠের বিষয়টাও তেমনই হবে। তারা চিন্তা করছে না যে, কুরআন কারও রচনা নয়। এটা আল্লাহ তা'আলার কালাম, কোনও মাখ্‌লূকের বাণী নয়। এটা ওহী। এর শব্দ ও অর্থ উভয়টাই উদ্দেশ্য। এর শব্দমালার ভেতরও রয়েছে নূর ও হিদায়াত, বরকত ও প্রশান্তি এবং হৃদয়ের উদ্ভাস ও উদ্দীপণ। এর শব্দমালার সাথে শরী'আতের বহু বিধান জড়িত আছে। আছে বহু সৎ কর্মের সম্পৃক্ততা। সুতরাং কুরআন মাজীদের কেবল শব্দমালার তেলাওয়াতকে নিরর্থক কাজ মনে করা একটি গুরুত্বর অপরাধ ও চরম বেআদবী। আর একে গুনাহ বলাটা তো এক রকম মস্তিষ্ক-বিকৃতিরই বহিঃপ্রকাশ।

হ্যাঁ একথা সত্য যে, তিলাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব হল কুরআন মাজীদকে বুঝে-শুনে, গভীর অনুধ্যানের সাথে পড়া এবং তার দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করা। অর্থ বোঝা যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা কে অস্বীকার করতে পারে? কিন্তু অর্থ না বুঝলে তেলাওয়াতটাই যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে যাবে এ কথার কী ভিত্তি আছে? এটা যে একটা মারাত্মক ভুল ধারনা কেবল তাই নয়; বরং কুরআন মাজীদের প্রতি এক কঠিন বেআদবীও বটে।

কুরআন তিলাওয়াতের আদব সম্পর্কে ইমাম মুহ্‌য়ুদ্দীন নাবাবী (রহ.) রচিত 'আত-তিব্‌য়ান ফী আদাবি হামালাতিল-কুরআন' একখানি তথ্যবহুল পূর্ণাঙ্গ পুস্তিকা। আগ্রহী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন।

৪. কুরআন মাজীদের হিদায়াত ও বিধানাবলীর অনুসরণ

এটাও কুরআন মাজীদের একটি পৃথক হক। কুরআনের প্রতি ঈমান আনার পর পরই এর পর্যায় চলে আসে। ঈমান ও ইসলামের আরকান (মৌলিক বিষয়সমূহ) ও অবশ্য পালনীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে নির্দেশনা তো কুরআন মাজীদে আছে, কিন্তু তার জ্ঞান ইসলামী সমাজে এমনিতেই চালু রয়েছে, যেমন প্রত্যেক

মুসলিম জানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয, জুমু'আর দিন জুহরের পরিবর্তে জুমু'আর নামায পড়া ফরয, নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত আদায় করা ফরয, রমযান মাসে রোযা রাখা ফরয, সামর্থ্যবানের উপর বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ ফরয, পর্দা করা ফরয, সূদ-ঘুষ হারাম, জুলম করা হারাম ইত্যাদি।

এসব বিধান মানার নিয়ম এই নয় যে, আগে জানতে হবে এসবের কোন্‌টি কুরআন মাজীদের কোন্‌ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং তারপর সেই জ্ঞান অনুসারে তা পালন করা ফরয হবে। বরং ঈমানের পরই আমল শুরু করে দিতে হবে। কুরআনী বিধানাবলীর জ্ঞান কুরআনের তাফসীর শিখে অর্জন করা জরুরী না এবং এরূপ জ্ঞানার্জনের উপর হুকুম পালনকে মওকুফ রাখাও জায়েয নয়। সাহাবায়ে কিরাম যে বলেছেন–

تَعَلَّمْنَا الْاِيْمَانَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْاٰنَ فَازْدَدْنَا اِيْمَانًا

'আমরা আগে ঈমান শিখেছি, তারপর কুরআন শিখেছি, ফলে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে'। এর অর্থ এটাই যে, তারা ঈমান, ঈমানের আরকান ও বিধানাবলী সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেছিলেন আমল ও পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। তারা এটাকে কুরআনের তাফসীর শেখার উপর মওকুফ রাখেননি। বস্তুত তাদের সে পন্থাই দ্বীন শেখার স্বভাবসিদ্ধ পন্থা।

৫. কুরআনের তাদাব্বুর (চিন্তা-ভাবনা) ও তা থেকে উপদেশ গ্রহণ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ

হে নবী! এটা এক বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি এই জন্য নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে। (সাদ ঃ ২৯)

কুরআনের মাঝে তাদাব্বুর বা চিন্তা-ভাবনা করার অনেক বড়-বড় ফায়দা রয়েছে। সবচে' বড় ফায়দা তো এই যে, এর দ্বারা ঈমান নসীব হয়, ও ঈমান সজীব হয়। দ্বিতীয় ফায়দা হল, এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণের নি'আমত লাভ হয়। এ জন্যই কুরআন মাজীদের তেলাওয়াত চিন্তা ও ধ্যানমগ্নতার সাথে করা বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনে কোন কোন আয়াত বা আয়াতের অংশ বিশেষ বারবার পড়তে থাকা চাই। নামাযেও ধ্যানের সাথে তেলাওয়াত করা ও লক্ষ্য করে শোনা একান্ত কাম্য।

তবে তাদাব্বুর ও চিন্তা-ভাবনা করার ভেতরও স্তরভেদ রয়েছে। প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেক স্তরের চিন্তা-ভাবনা সমীচীন নয় এবং উপকারীও নয়। (মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), মা'আরিফুল কুরআন, ২য় খণ্ড, ৪৮৮-৪৮৯ পৃ.)

ইদানীং লক্ষ্য করা যায়, এমন কিছু লোকও কুরআনের গবেষণায় নেমে পড়েছে যারা কুরআনের ভাষাও বোঝে না এবং কুরআন বোঝার বুনিয়াদী বিষয়সমূহ সম্পর্কেও খবর রাখে না। তাদের এ গবেষণা বিলকুল নীতিবিরুদ্ধ। সুতরাং এটা কুরআনের মাঝে চিন্তা-ভাবনা করার অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণেই এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণের ফায়দা আদৌ হাসিল হয় না; উল্টো কুরআনের তাহরীফ তথা কুরআনকে বিকৃত করার পথ খুলে যায়।

প্রকাশ থাকে যে, কুরআনের তাদাব্বুর কেবল অর্থ বোঝার নাম নয়। অর্থ তো আরবের কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকরাও বুঝত, কিন্তু তারা তাদাব্বুর আদৌ করত না। তাদাব্বুর না করার কারণে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের নিন্দা করেছেন। তাদাব্বুরের সত্তাসার হল– উপদেশ গ্রহণের লক্ষে, ভক্তি ও ভালোবাসা সহকারে, চিন্তা ও ধ্যানমগ্নতার সাথে আয়াতসমূহ পাঠ করা, সেই সঙ্গে সর্তক থাকা, যাতে আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দিষ্ট মর্ম বোঝার ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত মেজাজ-মর্জি, ভাবাবেগ ও চিন্তা-চেতনার কিছুমাত্র প্রভাব না পড়ে।

তাদাব্বুর ফলপ্রসূ ও ঝুঁকিমুক্ত হওয়ার জন্য একটি বুনিয়াদী শর্ত এই যে, লক্ষ্য রাখতে হবে তাদাব্বুরের ফল যেন প্রজন্ম পরম্পরায় প্রাপ্ত 'আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, চূড়ান্ত শর'ঈ বিধান ও সালাফে সালিহীন বা মহান পূর্বসূরীদের ঐকমত্যভিত্তিক তাফসীরের পরিপন্থী না হয়, সে রকম হলে নিশ্চিত ধরে নিতে হবে তাদাব্বুর সঠিক পন্থায় হয়নি, যদ্দরুণ তা থেকে সঠিক ফল উৎপন্ন হয়নি।

'আশরাফুত-তাফাসীর'-এর ভূমিকায় হযরতুল-উস্তায লিখেছেন, কুরআন মাজীদ সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়েছে, لاتنقضى عجائبه অর্থাৎ এর শব্দমালা ও বর্ণনা শৈলীর ভেতর যে নিগূঢ় রহস্য ও অথৈ তাৎপর্য নিহিত আছে, তা কখনও শেষ হওয়ার নয়। এটা আল্লাহ তা'আলার কালামের এক অলৌকিকত্ব যে, যখন অতি সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির কেউ সাদামাঠাভাবে এ কিতাব পড়ে, তখন সাধারণ স্তরের হিদায়াত লাভের জন্য যতটুকু বোঝা দরকার, নিজ জ্ঞান মাফিক সে অতি সহজেই তা বুঝে ফেলে। আবার একজন পণ্ডিতমনস্ক ব্যক্তি যখন এ কালাম থেকেই বিধি-বিধান আহরণ এবং হিকমত ও রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করে, তখন একই কালাম তাকে অতি সূক্ষ্ম ও গভীর তত্ত্ব-ভাণ্ডারের সন্ধান দেয়। প্রত্যেকের প্রতিভা ও জ্ঞানবত্তা অনুযায়ী এ তত্ত্ব-ভাণ্ডারের ব্যাপ্তি ও গভীরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ কারণেই কুরআন মাজীদ বিভিন্ন স্থানে তাদাব্বুরের আদেশ করেছে। কেননা এ তাদাব্বুরের ফলশ্রুতিতে অনেক সময় একেকজন 'আলেমের কাছে এমন কোন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়, পূর্বে যে দিকে আর কারও নজর যায়নি।

তবে মনে রাখতে হবে নিত্য-নতুন তাৎপর্য খুঁজে বের করার বিষয়টি ওয়াজ-নসীহতের সাথে সম্পৃক্ত কিংবা সৃষ্টি-রহস্য, তত্ত্বজ্ঞান ও শর'ঈ বিধানাবলীর হিকমতের সাথে। কেবল এ ময়দানেই এমন নতুন-নতুন রহস্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, যে দিকে প্রাচীনদের কারও দৃষ্টি যায়নি। এটাকেই হযরত 'আলী (রাযি.) এভাবে ব্যক্ত করেছেন– أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ 'অথবা এমন উপলব্ধি, যা কোনও মুসলিম ব্যক্তিকে দান করা হয়।' মোটকথা বিষয়টা উপরিউক্ত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। 'আকাইদ ও আহকামের ময়দান এর থেকে ভিন্ন। এখানেও যে চাইলেই কেউ গোটা উম্মতের ইজমার বিপরীতে এমন কোনও তাফসীর করতে পারবে, যা স্বীকৃত বিশ্বাস ও বিধানের পরিপন্থী, আদৌ সে সুযোগ নেই। কেননা তার অর্থ দাঁড়াবে কুরআন যে 'আকাইদ ও আহকামের প্রচারার্থে এসেছিল, তা অদ্যাবধি অজ্ঞাত ও দুর্বোধ্য রয়ে গেছে। বলা বাহুল্য তাতে 'ইসলাম'-ই বিলকুল অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়– না'উযুবিল্লাহ। (আশরাফুত তাফাসীর, ১ম খ, ১০ পৃ.)

৬. কুরআন মাজীদের তা'লীম ও তাবলীগ

এটাও কুরআন মাজীদের এক গুরুত্বপূর্ণ হক। এরও বিভিন্ন পর্যায় ও নানা রকম পদ্ধতি আছে এবং তার জন্য সুনির্দিষ্ট শর্ত-শারায়েত ও আদব-কায়দা আছে। যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে এ হক আদায়ের কাজে অংশগ্রহণে সক্ষম নয়, সে আদব ও বিনয়ের সাথে যে কোনও ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে। এ পন্থায় তার জন্য ছওয়াবের হকদার হওয়ার ও নিজের জন্য সৌভাগ্যের দুয়ার খোলার সুযোগ রয়েছে।

৭. নিজেকে নিজের আওলাদকে এবং অধীনস্থদেরকে কুরআনের শিক্ষা ও হিদায়াত থেকে বঞ্চিত না রাখা।

কুরআনের হুকূক সম্পর্কিত আলোচনা অনেক দীর্ঘ। এ প্রসঙ্গে এ স্থলে সর্বশেষ যে কথা আরয করতে চাচ্ছি তা এই যে, কোনও মু'মিন কুরআন ও কুরআনের হিদায়াত থেকে নিজে বঞ্চিত থাকবে কিংবা নিজের আওলাদ ও অধীনস্থদেরকে বঞ্চিত রাখবে– এটা কিছুতেই শোভনীয় ও গ্রহণীয় হতে পারে না। মাদ্‌রাসা ও উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে যে সব প্রোপ্রাগাণ্ডা চালানো হয়, তাতে প্রভাবিত হয়ে অথবা বিশেষ কোনও ছাত্র বা 'আলেমের ভ্রান্ত কর্মপন্থাকে অজুহাত বানিয়ে অথবা মাদ্‌রাসাগুলোর দুরবস্থার কারণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কিংবা যে রিযকের যিম্মাদারী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের কাছে রেখেছেন, নিজেকে তার যিম্মাদার মনে করে নিজ সন্তানকে কুরআন ও কুরআনের হিদায়াত শেখানো থেকে বঞ্চিত রাখাটা কিছুমাত্র বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়; বরং এটা মারাত্মক রকমের লোকসান। আপনি পদ্ধতি যেটাই অবলম্বন করুন, নিজের আওলাদ ও অধীনস্থদেরকে সহীহ তেলাওয়াত অবশ্যই শিক্ষা দিন এবং 'সালাফে সালিহীন' (মহান পূর্বসুরীগণ) থেকে প্রজন্ম পরম্পরায় প্রাপ্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও কুরআনী হিদায়াত দ্বারা তাদেরকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলুন।

পরিতাপের বিষয় হল, বহু লোক কুরআনী তা'লীমের কার্যক্রমে আর্থিক সাহায্য করছে, কুরআনী মকতব, হিফজখানা ও মাদরাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করছে, কিন্তু নিজের সন্তানকে ঈমান ও কুরআন শেখানোর ব্যাপারে তাদের কোনও আগ্রহ নেই। এটা নিজেদের লোকসান তো বটেই, সেই সঙ্গে কুরআন মাজীদের প্রতি ভক্তি-ভালোবাসার সীমাহীন ঘাটতিরও দলীল।

কুরআন মাজীদের তা'লীম ও তাদাব্বুরকে ব্যাপক ও সহজ করার ক্ষেত্রে 'উলামায়ে কিরামের ভূমিকা

কুরআন মাজীদের অর্থ ও মর্মের শিক্ষাদান এবং আয়াতের ভেতর তাদাব্বুর তথা চিন্তা-ভাবনার পথ সুগম করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় উলামায়ে কিরাম বিপুল খেদমত আনজাম দিয়েছেন। তাদের বহুমুখী সেবার মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের তরজমা ও ব্যাখ্যামূলক টীকা লেখার বিষয়টা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত এক্ষেত্রে উর্দু ভাষার পাল্লা অন্যসব ভাষা অপেক্ষা ভারী হবে। কেননা এ জাতীয় কাজ উর্দু ভাষায় অনেক বেশি হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা সাম্প্রতিককালে আমাদের মুহতারাম উস্তায হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উছমানী, (তাঁর বরকত দীর্ঘস্থায়ী হোক) -এর দ্বারা এ ধারার অতি মূল্যবান কাজ নিয়েছেন। সম্প্রতি 'আসান তরজমায়ে কুরআন' নামে তাঁর তরজমা ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক টীকা প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশনার এক বছর পূর্ণ না হতেই তার একাধিক সংস্করণ বের হয়ে গেছে। নাম দ্বারাই এ তরজমার মূল বৈশিষ্ট্য অনুমান করা যায়। ব্যাখ্যামূলক টীকার উপকারিতা সম্পর্কে হযরাতুল-উস্তায নিজেই বলেছেন, 'ব্যাখ্যামূলক টীকায় কেবল এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, যেখানে মর্ম অনুধাবনে কোন জটিলতা দেখা দেয়, সেখানে যেন পাঠক টীকার সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। দীর্ঘ তাফসীরী আলোচনা ও তাত্ত্বিক পর্যালোচনার পেছনে পড়া হয়নি। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানীতে সেজন্য বড়-বড় তাফসীরগ্রন্থ রয়েছে। হ্যাঁ সংক্ষিপ্ত টীকায় ছাঁকা-ছাঁকা কথা পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে, যেসব কথা বিপুল পড়াশোনার পর অর্জিত হয়েছে।'

তরজমা ও টীকার উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য করে গ্রন্থখানিকে বাংলা ভাষার পাঠকদের জন্য বাংলায় অনুবাদ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। কিন্তু অনুবাদের ভেতর কুরআন মাজীদের অর্থ ও মর্মের প্রতিস্থাপন খুব সহজ ব্যাপার নয়। বরং এটা অতি স্পর্শকাতর কাজ। এ জন্য এমন অনুবাদক দরকার, যিনি হবেন পরিপক্ক যোগ্যতাসম্পন্ন আলেম এবং যিনি কুরআনের ভাষা, বর্ণনাশৈলী ও কুরআনী 'উলূমে ভালো দখল রাখেন। সেই সঙ্গে যে ভাষায় অনুবাদ করা হবে, তাতে অন্ততপক্ষে এতটুকু দক্ষতা থাকতে হবে, যাতে কুরআনের অর্থ ও মর্মকে যতদূর সম্ভব কোন রকম হ্রাস-বৃদ্ধি ছাড়া সাবলীল-স্বচ্ছন্দ ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন। আবার এস্থলে যেহেতু মাঝখানে উর্দূ ভাষার মধ্যস্থতা রয়েছে, তাই উর্দূ ভাষার সাথে পরিচয় থাকাও জরুরী। মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান ছাহেব এ খেদমত সম্পর্কে আমার সাথে মাশওয়ারা করলে আমি উপরে বর্ণিত ব্যাপারগুলোকে বিবেচনায় রেখে বললাম, জনাব মাওলানা আবুল বাশার সাহেব (আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম) যদি এ কাজটি করে দেন, তবে ইনশাআল্লাহ্ খুবই পছন্দসই কাজ হবে। কেননা তিনি যেমন সমঝদার, তেমনি দায়িত্বশীলও বটে। আবার এ রকম কাজে তাঁর অভিজ্ঞতাও ভালো। সুতরাং তিনি এ প্রস্তাব পছন্দ করলেন এবং আমাকেই তাঁর সাথে কথা বলার দায়িত্ব দিলেন। সে মতে আমি জনাব মাওলানার খেদমতে এ দরখাস্ত পেশ করলাম। তিনি সদয় সম্মতি জানালেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করে কাজ শুরু করে দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ্! প্রথম খণ্ডের কাজ শেষ হয়ে এখন তা সর্বসমক্ষে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন, মাওলানার কলব ও কলমে অধিকতর বরকত দান করুন এবং তাঁর দ্বারা উম্মতের বেশি বেশি খেদমত নিন।

প্রথম খণ্ডের কাজ শেষ করার পর তিনি কোন এক প্রসঙ্গে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করছিলেন। তাতে বলছিলেন, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উছমানী সাহেবের এ কিতাব আমাকে খুবই প্রভাবিত করেছে। এতে আমি তাঁর আদব ও ইহতিরামের যে পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য করেছি তা আমাদের আকাবির ও আসলাফ তথা মহান পূর্বসূরীদের আখলাকী বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি আল্লাহ্ রাব্বুল- 'আলামীনের কেবল নাম লিখেই ক্ষান্ত হন না, অবশ্যই 'আল্লাহ্ তা'আলা' লেখেন, নবী কারীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্যান্য আম্বিয়া 'আলাইহিমুস-সালামের নামের সাথে দরূদ শরীফ লিখতে ভোলেন না। আকাবির ও আসলাফের নামের সাথে রহমতের দু'আ লিখতে যত্নবান থাকেন। মোদ্দাকথা সমগ্র কিতাব জুড়ে রয়েছে আদব ও বিনয়ের উৎকৃষ্টতম নমূনা। সবচেয়ে বড় কথা হল, অনুবাদকালে এতে আমার বড়ই নূরানিয়াতের স্পর্শ অনুভূত হতে থেকেছে।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম সম্পর্কে মাওলানা যে অনুভূতি প্রকাশ করেছেন, অন্যান্য সচেতন পাঠকের অনুভূতিও একই রকম। মুসলিম শরীফের উপর লেখা হযরতের ভাষ্যগ্রন্থ 'তাকমিলাতু ফাতহিল-মুলহিম' সম্পর্কে অনেক বড়-বড় 'আলেম অভিমত লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে আমাদের শায়খ 'আব্দুল-ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাঃ রহমাতুল্লাহি 'আলায়হি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজ অভিমতে উপরে বর্ণিত বৈশিষ্টসমূহের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হযরতের এই বৈশিষ্ট্যাবলীসহ অন্যান্য গুণাবলীতে আমাদেরকে তাঁর অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন।

কুরআন মাজীদের যে-কোনও খেদমত সম্পর্কে কিছু লেখা আমার মত নিঃসম্বলের পক্ষে নিঃসন্দেহে অতি বড় ধৃষ্টতা। এই উপলব্ধি থাকা সত্ত্বেও জনাব মাওলানা আবুল বাশার সাহেবের নির্দেশ ও মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খানের পীড়াপীড়িতে নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে এই লাইন ক'টি লিখতে হয়েছে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার সাথে সাত্তার (দোষ আড়ালকারী) সুলভ আচরণ জারি রাখুন। আমাকে, আমার সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়স্বজন ও সমস্ত মুসলিমকে কুরআনের আস্বাদ ও আগ্রহ দান করুন। হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা, আপনার বান্দার ও আপনার বাঁদীর পুত্র। আমি আপদমস্তক আপনার কবজার ভেতর। আমার সম্পর্কে আপনার হুকুম সতত কার্যকর। আমার সম্পর্কে আপনার ফয়সালা সম্পূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক। আপনি যে সকল নামে নিজেকে অভিহিত করেছেন, যা আপনি নিজ কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন, বা আপনার কোন সৃষ্টিকে অবহিত করেছেন কিংবা নিজের কাছেই গায়ব রেখে দিয়েছেন, সেই সকল নামের উসীলায় আমি আপনার কাছে দরখাস্ত করছি যে, কুরআন মাজীদকে আমার হৃদয়ের সজীবতা, আমার চোখের আলো, আমার দুঃখ-নিবারক ও আমার পেরেশানী বিদূরক বানিয়ে দিন– আল্লাহুম্মা আমীন! ছুম্মা আমীন।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى وَسَلَّم عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বিনীত
মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া
মিরপুর, ঢাকা

তারিখ ঃ শুক্রবার
৩০/০৪/১৪৩১ হিজরী

পেশ লফ্য

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَعَلٰى مَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

আল্লাহ্ তা'আলার শুকর কোন্ ভাষায় আদায় করব! তিনি কেবলই নিজ ফয্‌ল ও করমে এই অক্ষম বান্দাকে কুরআন মাজীদের তরজমা ও ব্যাখ্যা করার তাওফীক দিয়েছেন - যা এখন আপনার সামনে রয়েছে।

আজ থেকে বছর কয়েক আগ পর্যন্ত আমার ধারনা ছিল, যেহেতু উর্দু ভাষায় নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কিরামের হাতে কৃত বহু তরজমা-গ্রন্থ রয়েছে তাই এখন আর নতুন কোন তরজমার প্রয়োজন নেই। সুতরাং কুরআন মাজীদের খেদমতকে অতি বড় সৌভাগ্যের বিষয় মনে করা সত্ত্বেও কেউ যখন আমার কাছে আরেকটি তরজমার জন্য ফরমায়েশ করত, তখন প্রথমত নিজ অযোগ্যতার উপলব্ধিই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াত, দ্বিতীয়ত নতুন কোন তরজমার প্রয়োজনও অনুভূত হত না।

কিন্তু আরও পরে এসে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমার বন্ধুগণ তাদের অভিমত জানাল যে, উর্দু ভাষায় কুরআন মাজীদের যে সকল তরজমা এখন মানুষের হাতে আছে, তা আজকালকার মুসলিম সাধারণের পক্ষে বোঝা কঠিন হয়ে গেছে। কাজেই অতি সাধারণ পর্যায়ের শিক্ষিত লোকও বুঝতে পারবে - এ রকম সহজ-সরল তরজমা বাস্তবিকই প্রয়োজন। তাদের এ ফরমায়েশ উত্তরোত্তর এতটাই বৃদ্ধি পেল যে, শেষ পর্যন্ত বিষয়টা নিয়ে আমাকেও নতুন করে ভাবতে হল। সুতরাং আমি বর্তমানে প্রচলিত তরজমাসমূহ যথারীতি নিরীক্ষণ করতে থাকলাম। শেষে আমারও যেন মনে হল, তাদের ফরমায়েশের গুরুত্ব আছে। তারপর যখন আমার ইংরেজি তরজমার কাজ শেষ হল এবং তা যথারীতি প্রকাশও পেল, তখন তাদের দাবী আরও জোরদার হয়ে ওঠল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার নামে তরজমার কাজ শুরু করলাম।

আমি চিন্তা করছিলাম 'আম মুসলিমদের পক্ষে কুরআন মাজীদের মর্ম অনুধাবনের জন্য তরজমার সাথে সাথে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যারও দরকার হবে। সে মতে আমি তরজমার সাথে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক টীকাও লিখতে যত্নবান থেকেছি।

কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা'আলার এমন এক কিতাব, যা নিজেই এক মহা মু'জিযা (অলৌকিক বিষয়), যে কারণে এর এমন তরজমা অসম্ভব, যা কুরআনী অলংকার, এর অনন্যসাধারণ শৈলী এবং এর তাছীর ও আকর্ষণীশক্তিকে অন্য কোনও ভাষায় প্রতিস্থাপন করবে। তবে এ বান্দা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে যাতে এ তরজমা উর্দু বাকরীতিসম্মত হয় এবং এর দ্বারা কুরআন মাজীদের মর্মবানী সহজ ও সাবলীলভাবে স্পষ্ট হয়ে যায়। এ তরজমা সম্পূর্ণ আক্ষরিকও নয়, আবার এমন স্বাধীনও নয় যে, কুরআন মাজীদের শব্দমালা থেকে দূরে সরে গেছে। সহজ ও সুস্পষ্টকরণের প্রতি লক্ষ্য রাখার সাথে সাথে পূর্ণ চেষ্টা করা হয়েছে যাতে তরজমা কুরআনী শব্দশৈলীর কাছাকাছি থাকে। শব্দের ভেতর যেখানে একাধিক তাফসীরের অবকাশ আছে, সেখানে সেই অবকাশ যাতে তরজমার ভেতরও থাকে সে দিকেও লক্ষ রাখা হয়েছে। আর যেখানে তা সম্ভব হয়নি, সেখানে সালাফ তথা মহান পূর্বসূরীদের ব্যাখ্যার আলোকে যে তাফসীর সর্বাপেক্ষা সঠিক মনে হয়েছে। সেই অনুযায়ী তরজমা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যামূলক টীকায় কেবল এই দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে যে, তরজমা পড়ার সময় আয়াতের মর্ম অনুধাবনে পাঠক কোথাও সমস্যার সম্মুখীন হলে যাতে টীকার সাহায্যে তার নিরসন করতে পারে। দীর্ঘ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও তাত্ত্বিক আলোচনা-পর্যালোচনার পেছনে পড়া হয়নি। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার

মেহেরবানীতে সেজন্য অনেক বড় বড় তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। হাঁ এই সংক্ষিপ্ত টীকাসমূহে ছাঁকা ছাঁকা কথা পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছে, যা বিপুল পড়াশোনার পর অর্জিত হয়েছে।

এই খেদমতের অনেকখানি; বরং বলা উচিত এর বেশির ভাগই সম্পন্ন হয়েছে আমার বিভিন্ন সফরে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার ফয্ল ও করমে সমস্ত প্রয়োজনীয় কিতাব কম্পিউটারে আমার সাথেই থাকত। ফলে কোনও জরুরী গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে আমার কোনও রকম বেগ পেতে হয়নি।

কুরআন মাজীদের এই ক্ষুদ্র সেবাটুকু আমি এই অনুভূতির সাথেই পেশ করছি যে, এই মহাগ্রন্থের খেদমতের জন্য যে পরিমাণ 'ইলম ও তাকওয়ার পুঁজি থাকা দরকার, তার কিছুই আমার নেই। কিন্তু এ কালাম যে দয়াময় মালিকের, তিনি চাইলে তুচ্ছ বালুকণার দ্বারাও কাজ নিতে পারেন। সুতরাং এ কাজের ভেতর যতটুকু ভালো ও বিশুদ্ধ, তা কেবল তাঁরই তাওফীক। আর যা কিছু ত্রুটি, তার জন্য আমার অযোগ্যতাই দায়ী। মহান মালিকের দরবারে মিনতি, তিনি নিজ ফয্ল ও করমে এই খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং একে মুসলিম সাধারণের পক্ষে ফায়দাজনক ও এই অকর্মণ্যের জন্য আখেরাতের সঞ্চয় বানিয়ে দিন। আর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে এটা কঠিন কিছু নয়।

বান্দা
মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
জামে'আ দারুল উলূম
করাচী-১৪

২০ রমযানুল মুবারক
১৪২৯ হিজরী

অনুরোধ

আলহামদু লিল্লাহ! মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃপক্ষ তাদের সাধ্যমতো আল কুরআনুল কারীম-এর মূল আরবী বিশেষভাবে এবং পূর্ণ কিতাব সাধারণভাবে ভুল-ত্রুটিমুক্ত মুদ্রণের জন্য সার্বিক প্রয়াস চালিয়েছে। কিন্তু সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও অনেক সময় ছাপা কিংবা বাইন্ডিং-এর সময় মারাত্মক ধরণের প্রমাদের শিকার হয়। আমাদের অনুরোধ হলো, এ ধরনের কোন ত্রুটি যদি কারো দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন যাতে সংশোধন করা যায়।

বিনীত
প্রকাশক

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ! আলহামদু লিল্লাহ!! আলহামদু লিল্লাহ!!!

আমরা আল্লাহপাকের দরবারে অসংখ্য শোকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি একান্তই নিজ অপার অনুগ্রহে মাকতাবাতুল আশরাফকে তাঁর পবিত্র কিতাবের তরজমা ও তাফসীর প্রকাশ করার সৌভাগ্য নসীব করেছেন।

গত বছর (ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ঈসায়ী) শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম যখন বাংলাদেশ সফরে আসলেন তখন তাসাওউফ সংক্রান্ত হযরতের বয়ান সংকলন 'ইসলাহী মাজালিস' এর বাংলা তরজমা তাঁর খেদমতে পেশ করলে তিনি খুবই সন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং দু'আ দিলেন। হয়তো সে সময়েই অথবা অন্য কোন দিন হযরত কৃত আল কুরআনুল কারীমের ইংরেজি তরজমা সম্পর্কে কয়েকজন উচ্চপর্যায়ের ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনী ব্যক্তিত্বের অভিমত হযরতকে শোনানো হলে হযরত বললেন, আলহামদু লিল্লাহ! উর্দূ তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর ছেপে এসেছে,বাইন্ডিং শেষ না হওয়ায় আনতে পারিনি।

সফর শেষে হযরত চলে যাওয়ার পর অতি অল্প দিনেই আমি তা সংগ্রহ করি এবং আমার মুরুব্বী হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের অনুরোধে মাওলানা আবুল বাশার (আ, ব, ম, সাইফুল ইসলাম) ছাহেব তার বঙ্গানুবাদের কাজ আরম্ভ করেন। আলহামদু লিল্লাহ! তিনি তাঁর খোদাপ্রদত্ব সালাহিয়াতকে কাজে লাগিয়ে অপূর্ব এক তাফসীর এদেশের মানুষের জন্য উপহার দেন।

এ কাজের সকল পর্যায়ে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের সযত্ন তত্ত্বাবধান অব্যাহত ছিল। সর্বপরি তিনি আলকুরআনুল কারীমের হুকূক সম্পর্কে অপূর্ব এক ভূমিকা লিখেছেন, যা পাঠকদের জন্য ইনশাআল্লাহ খুবই উপকারী হবে। আল্লাহ পাক তার রূহানী ও জিসমানী শক্তি বাড়িয়ে দিন এবং তাঁর ছায়াকে আমাদের উপর দির্ঘায়িত করুন। আমীন।

আল কুরআনুল কারীমের আরবীপাঠ আমরা অন্য আরেকটি মুদ্রিত কপি থেকে আমাদের তাফসীরে সংযুক্ত করেছি। বিধায় সব জায়গায় আরবীপাঠ ও বাংলা তরজমাকে পাশাপাশি রাখা সম্ভব হয়নি। কোন জায়গায় আরবী আগে ও বাংলা পরে, আবার কোন জায়গায় বাংলা আগে আরবী পরে এসে গেছে। আমরা এজন্য দুঃখিত।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো এ খেদমতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছি। তা সত্ত্বেও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। কারো চোখে এ ধরনের কিছু ধরা পড়লে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ করছি, যাতে সংশোধন করা যায়।

এ কাজে আমাদেরকে অনেকেই সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহপাক তাদের সবাইকে উত্তম বদলা দিন। আমীন।

পরবর্তি খণ্ড দু'টির কাজও দ্রুত চলছে। আপনাদের দু'আ কামনা করছি যাতে আল্লাহপাকের রহমতে তা তাড়াতাড়ি প্রকাশ করতে পারি।

আল্লাহপাক আমাদের এ কাজকে কবুল করুন এবং কুরআন বুঝা ও কুরআনী হুকুম বাস্তবায়নের জন্য এটাকে উসীলা বানান। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
১৩৬ আজীমপুর, ঢাকা-১২০৫

পহেলা জুমাদাল উলা, ১৪৩১ হিজরী
১৬ এপ্রিল, ২০১০ ঈসায়ী
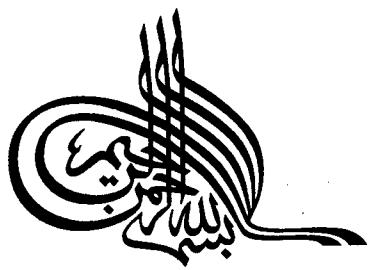
সূচীপত্র

বিষয় / পৃষ্ঠা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

ওহী কী ও কেন?

সৃষ্টির মধ্যমণি হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি পবিত্র কুরআন নাযিল করা হয় ওহীর মাধ্যমে। তাই সর্বপ্রথম ওহী সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী বিষয় জেনে নেওয়া দরকার।

ওহীর প্রয়োজনীয়তা

প্রতিটি মুসলিম জানে আল্লাহ তাআলা মানুষকে এ পৃথিবীতে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছেন। সে লক্ষ্যে তিনি তার প্রতি কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য ন্যস্ত করেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টিকে তার সেবায় নিয়োজিত করেছেন। অতএব পৃথিবীতে আসার পর মানুষের জন্য দুটি কাজ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক তো এই যে, সে এই জগত এবং এতে সৃষ্ট বস্তুরাজি দ্বারা যথাযথ কাজ নেবে আর দ্বিতীয় এই যে, সৃষ্টিজগতের বস্তুনিচয়কে ব্যবহার করার সময় আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকামকে সামনে রাখবে এবং এমন সব কাজ পরিহার করে চলবে, যা আল্লাহ তাআলার পসন্দ নয়।

মানুষের জন্য অপরিহার্য এই যে দু'টি কাজের কথা বলা হল, এর জন্য তার 'ইলম' প্রয়োজন। কেননা সে যতক্ষণ পর্যন্ত না জানবে এই সৃষ্টি জগতের হাকীকত কী, এর কোন্ বস্তুর কী বৈশিষ্ট্য এবং এর দ্বারা কিভাবে উপকার গ্রহণ সম্ভব, ততক্ষণ পর্যন্ত জগতের কোনও একটি জিনিসকেও সে নিজ কাজে ব্যবহার করতে পারবে না। এমনিভাবে সে যতক্ষণ পর্যন্ত জানতে না পারবে, আল্লাহ তাআলার মর্জি কী এবং তিনি কোন্ কাজ পসন্দ ও কোন্ কাজ অপসন্দ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে আল্লাহ তাআলার মর্জি মোতাবেক জীবন যাপন করা সম্ভব নয়।

সুতরাং মানুষকে সৃষ্টি করার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা এমন তিনটি জিনিস সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যার মাধ্যমে সে উপরিউক্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

এক. মানুষের ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চোখ, কান, মুখ ও হাত-পা।

দুই. আকল বা বুদ্ধি।

তিন. ওহী।

মানুষ অনেক বিষয়ে তার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে থাকে এবং অনেক বিষয়ে বুদ্ধির মাধ্যমে। আর যে সকল বিষয়ে এ দুটোর মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না, তাকে তার জ্ঞান ওহীর মাধ্যমে দান করা হয়।

'ইলম ও জ্ঞানের এই তিনটি মাধ্যমের ভেতর আবার ক্রমবিন্যাস রয়েছে এবং প্রত্যেকটির এক বিশেষ সীমানা ও স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র আছে, যার বাইরে তা কোন কাজে আসে না। সুতরাং মানুষ যে সব বিষয় স্বীয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অবগত হয়, তার জ্ঞান কেবল বুদ্ধি দ্বারা অর্জন করা যায় না। উদাহরণত একটি দেয়াল চোখ দ্বারা দেখে আপনি জানতে পারেন সেটির রং সাদা। কিন্তু আপনি যদি চোখ বন্ধ করে কেবল বুদ্ধির সাহায্যে দেয়ালটির রং জানতে চেষ্টা করেন, তবে

সে চেষ্টায় আপনি কখনও সফল হবেন না। এমনিভাবে যেসব বিষয়ের জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা অর্জিত হয়, কখনও নিছক ইন্দ্রিয় দ্বারা তার জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। উদাহরণত আপনি যদি চোখ দ্বারা দেখে বা হাত দ্বারা ছুঁয়ে জানতে চান দেয়ালটি কে নির্মাণ করেছে, তবে আপনি কখনও তাতে সমর্থ হবেন না। এটা জানার জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন হবে।

মোটকথা পঞ্চ ইন্দ্রিয় যে পরিমণ্ডলে কাজ করে, তার ভেতর বুদ্ধি কোন পথ নির্দেশ করে না। অত:পর পঞ্চেন্দ্রিয় যেখানে অক্ষম হয়ে যায়, সেখান থেকে বুদ্ধির কাজ শুরু হয়। আবার বুদ্ধির দৌড়ও অন্তহীন নয়। একটা সীমায় গিয়ে সেও থেমে যেতে বাধ্য হয়। বহু জিনিস এমন রয়েছে, যে সম্পর্কে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারাও জ্ঞান লাভ করা যায় না এবং বুদ্ধি দ্বারাও নয়। ওই প্রাচীরের কথাই ধরুন। সেটিকে কিভাবে ব্যবহার করলে আল্লাহ তাআলা খুশী হবেন এবং কিভাবে ব্যবহার করলে তিনি নাখোশ হবেন, এটা কি পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা জানা সম্ভব কিংবা বুদ্ধি কি এ সম্পর্কে কোন জ্ঞান যোগাতে পারে? কখনই নয়। এ জাতীয় প্রশ্নের সমাধানের জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যে মাধ্যম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তারই নাম 'ওহী'। এর পদ্ধতি এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে কাউকে বাছাই করে তাঁকে নবী বানিয়ে দেন এবং তার প্রতি স্বীয় বাণী নাযিল করেন। তার সেই বাণীকেই ওহী বলা হয়।

এ বিষয়টি আরেকটি উদাহরণ দ্বারা সম্ভবত আরও বেশি স্পষ্ট হবে। মনে করুন, আমার হাতে একটি পিস্তল আছে। আমি চোখে দেখে সেটির সাইজ ও আকৃতি জানতে পারব। হাত দ্বারা স্পর্শ করে বুঝতে পারব সেটি কোনও কঠিন উপাদান দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। ট্রিগার চেপে জানতে পারব সেটি থেকে একটি গুলি কতটা তীব্র বেগে বের হয়ে কতদূর গিয়ে পৌঁছেছে। তার শব্দ শুনে জানতে পারি তা দ্বারা কেমন ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তার নল শুঁকে অবগত হই যে, তা থেকে বারুদের গন্ধ আসছে। আমার বাহ্য ইন্দ্রিয় তথা চোখ, কান, নাক ও হাত-পা-ই আমাকে এ সকল তথ্য সরবরাহ করে। কিন্তু কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করে পিস্তলটি কে তৈরি করেছে, তবে এই বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহ এর কোন উত্তর দিতে পারবে না। এ স্থলে আমি আমার বুদ্ধিকে কাজে লাগাই। বুদ্ধি আমাকে জানায় এ পিস্তলের ধরণ দেখে বোঝা যায় এটি আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। নিশ্চয়ই এটাকে কোন কারিগর তৈরি করেছে। যদিও আমার চোখ সে কারিগরকে দেখছে না এবং আমার কান তার আওয়াজ শুনছে না, কিন্তু স্বীয় বুদ্ধির মাধ্যমে আমি এ জ্ঞান লাভ করেছি যে, পিস্তলটিকে কোন মানব কারিগর তৈরি করেছে।

এবার আরেকটি প্রশ্ন আসে যে, এই অস্ত্রটির কোন্ ব্যবহার বৈধ এবং কোন ব্যবহার বৈধ নয়? এ প্রশ্নের উত্তরেও আমার বুদ্ধি একটা পর্যায় পর্যন্ত আমাকে দিক-নির্দেশ করতে পারে। আমি বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করে এই সমাধানে আসতে পারি যে, এ অস্ত্র দ্বারা কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা অতি মন্দ কাজ, যা কিছুতেই অনুমোদনযোগ্য নয়। কিন্তু এর পরই প্রশ্ন আসবে যে, কে অপরাধী আর কে নিরপরাধ? কোন্ অপরাধ এ পর্যায়ের যে, তার শাস্তিতে এই পিস্তল ব্যবহার করে কাউকে হত্যা করা যেতে পারে? এসব এমনই প্রশ্ন, কেবল বুদ্ধি খাটিয়ে এর সমাধান পেতে চাইলে বুদ্ধি আমাকে মহা ঘোর-পেঁচের মধ্যে ফেলে দেবে। উদাহরণত আমার সামনে যদি এমন কোন ঘাতককে উপস্থিত করা হয়, যে একজন নিরপরাধ লোককে হত্যা করেছে, আর আমি তাকে নিয়ে চিন্তা করতে থাকি, তবে বুদ্ধি একবার বলবে, এই ব্যক্তি একজন জ্যান্ত-জাগ্রত লোকের জীবন সাঙ্গ করেছে, তার স্ত্রীকে বৈধব্যের শরে বিদ্ধ করেছে, সন্তানদেরকে অকারণে ইয়াতীম বানিয়েছে এবং তাদের চিরতরে পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছে, সুতরাং সে ঘোর অপরাধী। তার উপযুক্ত শাস্তি হল তাকেও হত্যা করে অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত বানিয়ে দেওয়া হবে, যাতে তাকে

দিয়ে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। অপরদিকে এই একই বুদ্ধি ভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করে। সে বলে, যেই নিহত ব্যক্তির মরার ছিল সে তো মারা গেছে। হত্যাকারীকে হত্যা করার দ্বারা সে তো আর প্রাণ ফিরে পাবে না! তার স্ত্রী-সন্তানদেরও তাদের প্রিয়জনকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না! বরং তাকে হত্যা করা হলে একই মসিবত তার স্ত্রী-সন্তানদের ভোগ করতে হবে, অথচ তাদের কোন অপরাধ নেই।

এই পরস্পর বিরোধী উভয় যুক্তি বুদ্ধি থেকেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। এর দ্বারা বোঝা গেল নিছক বুদ্ধি দ্বারা সকলের পক্ষে সন্তোষজনক কোন সমাধানে আসা কঠিন ব্যাপার।

বস্তুত এটা এমন এক ক্ষেত্র, যেখানে আমার ইন্দ্রিয় কোন মীমাংসা দেওয়ার যোগ্যতা রাখে না এবং আমার বুদ্ধিও কোন সর্বগ্রাহ্য সমাধান নিয়ে হাজির হতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সেই হিদায়াত ও পথনির্দেশ ছাড়া কোন গতি থাকে না, যা তিনি স্বীয় নবীগণের প্রতি ওহী নাযিলের মাধ্যমে মানবতাকে সরবরাহ করে থাকেন।

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ওহী মানুষের জন্য জ্ঞানার্জনের সেই সর্বোচ্চ মাধ্যম, যা তাকে তার জীবন সংক্রান্ত প্রশ্নাবলীর এমন সন্তোষজনক উত্তর শিক্ষা দেয়, যা তার ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি মারফত পাওয়া সম্ভব ছিল না, অথচ তা অর্জন করা তার জন্য অপরিহার্য ছিল। এর দ্বারা এটাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য কেবল বুদ্ধি ও চাক্ষুষ জ্ঞান যথেষ্ট নয়। বরং এর জন্য ওহী এক অনিবার্য প্রয়োজন। আর বুদ্ধি যেখানে কাজে আসে না মৌলিকভাবে ওহীর প্রয়োজন সেখানেই দেখা দেয়, তাই ওহীর প্রতিটি কথা যে বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা যাবে এটাও অবশ্যম্ভাবী নয়; বরং যেমনিভাবে কোন বস্তুর রং উপলব্ধি করা বুদ্ধির কাজ নয়, ইন্দ্রিয়ের কাজ, তেমনি বহু দীনী 'আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞান সরবরাহ করাও বুদ্ধির নয়; বরং ওহীরই কাজ আর তা উপলব্ধি করার জন্য কেবল বুদ্ধির উপর ভরসা করা কিছুতেই সঙ্গত নয়।

যে ব্যক্তি (আল্লাহ পানাহ) আল্লাহর অস্তিত্বকেই স্বীকার করে না, তার সাথে ওহী নিয়ে কথা বলা বিলকুল অর্থহীন। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও তার অপার শক্তির উপর বিশ্বাস রাখে, তার জন্য ওহীর বৌদ্ধিক প্রয়োজন, তার সম্ভাব্যতা ও তার বাস্তব অস্তিত্ব উপলব্ধি করা কিছু কঠিন বিষয় নয়।

আপনি যদি এ কথায় বিশ্বাস রাখেন যে, এই জগতকে এক সর্বশক্তিমান সত্ত্বা সৃষ্টি করেছেন, তিনিই এর সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় রীতি-নীতিকে স্বীয় প্রজ্ঞাবলে পরিচালনা করছেন এবং তিনিই বিশেষ কোন লক্ষ্যে মানুষকে এখানে পাঠিয়েছেন, তবে এটা কি করে সম্ভব যে, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করার পর সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে ছেড়ে দেবেন এবং তাকে এতটুকু পর্যন্ত জানাবেন না যে, সে কেন এই দুনিয়ায় এসেছে? এখানে তার কাজ কী? তার শেষ গন্তব্য কোথায়? এবং সে কিভাবে স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্যে সফল হতে পারে?

যে ব্যক্তি সুস্থ বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন তার পক্ষে কি এটা সম্ভব যে, সে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে তার কোন চাকরকে কোথাও সফরে পাঠাবে আর পাঠানোর সময়ও তাকে সফরের উদ্দেশ্য জানাবে না এবং পাঠানোর পরও কোন বার্তাবাহকের মাধ্যমে তাকে অবহিত করবে না তাকে কী কাজে পাঠানো হয়েছে আর সফরকালে তার ডিউটি কী হবে? যখন একজন মামুলী বুদ্ধির লোকও এরূপ করতে পারে না, তখন সেই মহান আল্লাহ সম্পর্কে এরূপ ধারণা কি করে করা যায়, যার অপার প্রজ্ঞায় মহাবিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে? যেই মহান সত্ত্বা চন্দ্র, সূর্য, আসমান, যমীন ও গ্রহ-নক্ষত্রের জন্য এমন বিস্ময়কর নিয়ম তৈরি করেছেন, তিনি স্বীয় বান্দাদের কাছে বার্তা পৌছানোর জন্য এমন কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন না, যার দ্বারা মানুষকে তাদের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে

দিক-নির্দেশ করা যাবে? আল্লাহ তাআলার অসীম প্রজ্ঞার উপর বিশ্বাস থাকলে স্বীকার করতে হবে যে, তিনি নিজ বান্দাদেরকে অন্ধকারের ভেতরে ছেড়ে দেননি; বরং তাদের পথনির্দেশের জন্য নিয়মতান্ত্রিক কোন ব্যবস্থা অবশ্যই দিয়েছেন। পথনির্দেশের সেই নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থারই নাম ওহী ও রিসালাত।

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ওহী এক দীনী বিশ্বাস মাত্র নয়; বরং একটি বৌদ্ধিক প্রয়োজনও বটে, যার অস্বীকৃতি মূলত আল্লাহ তাআলার অসীম প্রজ্ঞাকে অস্বীকার করারই নামান্তর। আল্লাহ তাআলা এই ওহী তাঁর হাজার-হাজার নবীর প্রতি নাযিল করেছেন, যার মাধ্যমে তারা নিজ-নিজ আমলে মানুষের হিদায়াতের ব্যবস্থা করেছেন। পরিশেষে কিয়ামতকাল পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের আগমন ঘটবে তাদের সকলের হিদায়াতের জন্য মহানবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কুরআন মাজীদ নাযিল করা হয়েছে এবং তাঁর মাধ্যমে এই পবিত্র সিলসিলার পূর্ণতা বিধান করা হয়েছে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ওহী নাযিলের পদ্ধতি

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিভিন্ন পদ্ধতিতে ওহী নাযিল হত। সহীহ বুখারীর এক হাদীসে আছে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, একবার হারিছ ইবনে হিশাম (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কাছে ওহী কিভাবে আসে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কখনও আমি ঘণ্টাধ্বনির মত শুনতে পাই আর ওহীর এ পদ্ধতিই আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা কঠিন। অত:পর এ অবস্থা আমার থেকে কেটে যায়, আর ইতোমধ্যে যা-কিছু সে ধ্বনিতে আমাকে বলা হয়, তা আমার মুখস্থ হয়ে যায়। কখনও ফিরিশতা আমার সামনে একজন পুরুষের আকৃতিতে উপস্থিত হয়।

(বুখারী, ১ম খণ্ড, ২ পৃষ্ঠা)

এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর আওয়াজকে ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে তুলনা করেছেন। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহ.) এর ব্যাখ্যা করেন যে, এক তো ওহীর আওয়াজ ঘণ্টাধ্বনির মত অবিরাম হত, মাঝখানে ছেদ ঘটত না, দ্বিতীয়ত ঘণ্টা যখন একাধারে বাজতে থাকে, তখন শ্রোতার পক্ষে সে ধ্বনি কোন্ দিক থেকে আসছে তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। তার কাছে মনে হয় সে ধ্বনি সকল দিক থেকেই আসছে। আল্লাহ তাআলার কালামেরও এটা এক বৈশিষ্ট্য যে, তার বিশেষ কোন দিক থাকে না; বরং সকল দিক থেকেই তার ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। এর স্বরূপ তো চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ছাড়া উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, তবে বিষয়টিকে সাধারণের উপলব্ধির অনেকটা কাছাকাছি নিয়ে আসার জন্য ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। (ফায়যুল বারী, ১ম খণ্ড, ১৯–২০ পৃষ্ঠা)

এ পদ্ধতিতে ওহী নাযিল হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তার চাপ বড় বেশি পড়ত। হযরত আয়েশা (রাযি.) এ হাদীসেরই শেষাংশে বলেন, আমি তীব্র শীতের দিনে তার প্রতি ওহী নাযিল হতে দেখেছি। যখন নাযিল শেষ হত, তখন সেই কঠিন শীতের সময়ও তাঁর পবিত্র ললাট স্বেদাপ্লুত হয়ে যেত।

অপর এক বর্ণনায় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, যখন ওহী নাযিল হত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্বাস-প্রশ্বাস আটকে আসত, পবিত্র চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে খেজুর ডালার মত হলদে হয়ে যেত, সামনের দাঁত শীতে কাঁপতে থাকত এবং তিনি এতটা ঘর্মাক্ত হয়ে পড়তেন যে, তার ফোটাসমূহ মুক্তার মত চকচক করত। (আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা)

ওহী নাযিলের এ অবস্থায় কখনও কখনও চাপ এতটা বেশি হত যে, তিনি তখন যে পশুর পিঠে সওয়ার থাকতেন, সেটি তাঁর গুরুভারের কারণে বসে পড়ত। একবারের কথা– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত (রাযি.)-এর উরুতে মাথা রেখে শোওয়া ছিলেন। এ অবস্থায় ওহী নাযিল হল। তাতে হযরত যায়দ (রাযি.)-এর উরুতে এতটা চাপ পড়ল যে, তা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হল। (যাদুল মাআদ, ১ম খণ্ড, ১৮–১৯ পৃষ্ঠা)

কখনও কখনও ওহীর মৃদু আওয়াজ অন্যরাও উপলব্ধি করতে পারত। হযরত উমর (রাযি.) বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ওহী নাযিল হত, তখন তাঁর পবিত্র চেহারার কাছে মৌমাছির গুণগুণ আওয়াজের মত শব্দ শোনা যেত।

(মুসনাদে আহমদ, কিতাবুস সীরাতিন নাবাবিয়্যা, ২০ খণ্ড, ২১২ পৃষ্ঠা)

ওহীর দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ ফিরিশতা কোন মানুষের আকৃতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আল্লাহ তাআলার বাণী পৌঁছে দিত। এরূপ ক্ষেত্রে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সাধারণত প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত দিহ্য়া কালবী (রাযি.)-এর আকৃতিতে আগমন করতেন। কখনও অন্য কারও বেশেও আসতেন। সে যাই হোক, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যখন কোন মানবাকৃতিতে ওহী নিয়ে আসতেন, তখনকার ওহী নাযিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সহজ হত। (আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা)

ওহী নাযিলের তৃতীয় পদ্ধতি ঃ হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম কোন মানবাকৃতি ধারণ না করে বরং তাঁর আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করতেন। তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সারাটা জীবনে এরূপ মাত্র তিনবারই হয়েছে। একবার সেই সময়, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে তাঁর আসল চেহারায় দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। দ্বিতীয়বার মিরাজে আর তৃতীয়বার নবুওয়াতের শুরুভাগে মক্কা মুকাররমার আওয়াদ নামক স্থানে। প্রথম দু'বারের কথা তো সহীহ্ সনদেই বর্ণিত আছে, তবে তৃতীয়বারের ঘটনা সনদের দিক থেকে দুর্বল হওয়ায় কিছুটা সন্দেহযুক্ত।

(ফাতহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮–১৯)

চতুর্থ পদ্ধতি হল কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথোপকথন। জাগ্রত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সৌভাগ্য একবার অর্থাৎ মিরাজে লাভ করেছিলেন। তাছাড়া স্বপ্নযোগেও আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তাঁর একবার কথোপকথন হয়েছিল।

(আল-ইতকান, ১ খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা)

ওহী নাযিলের পঞ্চম পদ্ধতি ছিল এই যে, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম কোনও আকৃতিতে সামনে আসা ছাড়াই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে কোন কথা ঢেলে দিতেন। পরিভাষায় এটাকে نفث فى الروع (অন্তরে নিক্ষেপণ) বলা হয়। (প্রাগুক্ত)

কুরআন নাযিলের তারিখ

এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কুরআন মাজীদের ধারাবাহিক অবতরণের সূচনা ঘটে তাঁর চল্লিশ বছর বয়সকালে। সহীহ্ বর্ণনামতে এটা হয়েছিল 'লায়লাতুল কাদর'-এ। কিন্তু এটা রমাযানের কোন্ তারিখ ছিল সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। কোন বর্ণনা দ্বারা রমাযানের সতের তারিখ, কোন বর্ণনা দ্বারা উনিশ তারিখ এবং কোন বর্ণনা দ্বারা সাতাশ তারিখ ছিল বলে জানা যায়।

সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত

সহীহ মত অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কুরআন মাজীদের যে আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছিল, তা হচ্ছে সূরা 'আলাক'-এর শুরুর আয়াতসমূহ। বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর সূত্রে সে ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ওহী নাযিলের সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্ন দ্বারা। অত:পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে একাকী নিভৃতে ইবাদতের আগ্রহ জাগে। সুতরাং তিনি হেরা পাহাড়ে চলে যান এবং তার এক গুহায় একত্রে কয়েক রাত করে অবস্থান করতে থাকেন। এভাবে তাঁর ইবাদত-বন্দেগী চলতে থাকে। পরিশেষে এক দিন সেই গুহায় তাঁর কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ফিরিশতা আসলেন। ফিরিশতা তাঁকে লক্ষ্য করে সর্বপ্রথম যে কথা বললেন, তা হল اِقْرَأْ (পড়)। তিনি বললেন, আমি তো পড়ুয়া নই। অত:পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আমার উত্তর শুনে ফিরিশতা আমাকে ধরলেন এবং এমন জোরে বুকে চেপে ধরলেন যে, আমার কষ্টের একশেষ হয়ে গেল। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং পুনরায় বললেন, اِقْرَأْ আমি উত্তর দিলাম, আমি তো পড়ুয়া নই। ফিরিশতা আমাকে পুনরায় ধরলেন এবং এমন জোরে বুকে চেপে ধরলেন যে, আমার কষ্টের একশেষ হয়ে গেল। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং পুনরায় বললেন, اِقْرَأْ আমি উত্তর দিলাম, 'আমি তো পড়ুয়া নই'। তিনি তৃতীয়বার আমাকে ধরলেন এবং বুকে চেপে ছেড়ে দিলেন। তারপর বললেন,

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ...

'পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত হতে। পড় এবং তোমার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা মহানুতব...।

এগুলো ছিল তাঁর প্রতি অবতীর্ণ সর্বপ্রথম আয়াত, এরপর তিন বছর ওহী নাযিলের ধারা বন্ধ থাকে, যাকে 'ফাতরাতুল-ওয়াহী' বা ওহীর 'বিরতিকাল' বলে। তিন বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আবার সেই ফিরিশতা আবির্ভূত হলেন, যিনি হেরা গুহায় এসেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আসমান ও যমীনের মাঝখানে দেখতে পেলেন। ফিরিশতা তাকে সূরা মুদ্দাছ্ছিরের শুরুর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনালেন। অত:পর ওহীর ধারাবাহিকতা চলতে থাকল।

মক্কী ও মাদানী আয়াত

আপনি কুরআন মাজীদের সূরাসমূহের শিরোনামায় লক্ষ্য করে থাকবেন যে, কোনও সূরার সাথে 'মক্কী' ও কোন সূরার সাথে 'মাদানী' লেখা আছে। এর সঠিক মর্ম বুঝে নেওয়া দরকার।

মুফাস্সিরদের পরিভাষায় 'মক্কী' আয়াত বলতে সেই সব আয়াতকে বলে, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরতের আগে নাযিল হয়েছে আর 'মাদানী' বলে সেই সকল আয়াতকে, যা মদীনায় পৌঁছার পর নাযিল হয়েছে। কতক লোক মনে করে মক্কী হল সেই আয়াত যা মক্কা নগরে নাযিল হয়েছে আর 'মাদানী' যা মদীনা শহরে নাযিল হয়েছে। কিন্তু এ অর্থ সঠিক নয়। কেননা এমন কিছু আয়াতও রয়েছে যা মক্কা নগরে নাযিল হয়নি, অথচ

হিজরতের আগে নাযিল হওয়ার কারণে তাকে 'মক্কী' বলে। সুতরাং যে সকল আয়াত মিনা, আরাফা বা মিরাজের সফরকালে নাযিল হয়েছে, তাকেও 'মক্কী' বলে। এমনকি যে সকল আয়াত হিজরতের সফরকালে মদীনার পথে নাযিল হয়েছে, তাকেও মক্কীই বলে। অনুরূপ বহু আয়াত এমন রয়েছে, যা মদীনা নগরে নাযিল হয়নি, অথচ তাকে 'মাদানী' বলে। সুতরাং হিজরতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বহু সফর করতে হয়েছে, যার কোনওটিতে তিনি শত-শত মাইল দূরে চলে গিয়েছিলেন। সেসব সফরে যত আয়াত নাযিল হয়েছে সবগুলোকে 'মাদানী'-ই বলে। এমনকি সেই সকল আয়াতকেও 'মাদানী' বলা হয়, য়া হুদায়বিয়ার অভিযান বা মক্কা বিজয় কালে মক্কা নগর বা তার আশেপাশে নাযিল হয়েছে। সুতরাং আয়াত إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন আমানতসমূহকে তার অধিকারীর নিকট পৌঁছে দিতে (নিসা : ৫৮) মক্কা নগরীতে নাযিল হওয়া সত্ত্বেও এটিকে 'মাদানী' বলা হয়। (আল-বুরহান, ১ম খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা; মানাহিলুল ইরফান, ১ম খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

কতক সূরা এমন আছে, যার সম্পূর্ণটাই মক্কী বা মাদানী। যেমন সূরা 'মুদ্দাছছির' সম্পূর্ণটাই 'মক্কী' এবং সূরা 'আলে-ইমরান' সম্পূর্ণটাই 'মাদানী'। আবার কোনও কোনও সূরা এমনও আছে, যার প্রায় সমস্ত আয়াতই মক্কী, কিন্তু তার মধ্যে কয়েকটি 'মাদানী' আয়াতও এসে গেছে এবং কোনও কোনও সূরা এর বিপরীতও আছে। যেমন সূরা 'আরাফ' মক্কী, কিন্তু তার মধ্যে আয়াত وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ থেকে وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ পর্যন্ত আয়াতসমূহ মাদানী। এমনিভাবে সূরা হজ্জ মাদানী, কিন্তু তার মধ্যে চারটি আয়াত অর্থাৎ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى থেকে عَذَابُ يَوْمٍ مُقِيمٍ পর্যন্ত (হজ্জ : ৫২-৫৫) মক্কী।

এর দ্বারা এটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোনও সূরার মক্কী বা মাদানী হওয়ার বিষয়টি তার অধিকাংশ আয়াতের উপর নির্ভর করে। প্রায় ক্ষেত্রেই এমন হত যে, যে সূরার শুরুর আয়াতসমূহ হিজরতের আগে নাযিল হয়েছে তাকে মক্কী সাব্যস্ত করা হয়েছে, যদিও পরবর্তীকালে তার কিছু আয়াত হিজরতের পর নাযিল হয়েছে।

কুরআন মাজীদের পর্যায়ক্রমিক অবতরণ

কুরআন মাজীদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি পূর্ণাঙ্গরূপে একবারেই নাযিল করা হয়নি; বরং অল্প অল্প করে প্রায় তেইশ বছরকালে তা নাযিল করা হয়েছে। কখনও হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম একটি ছোট আয়াত, বরং আয়াতের অংশবিশেষ নিয়েও হাজির হতেন। আবার কখনও কয়েকটি আয়াত একত্রে একবারে নাযিল হত। কুরআন মাজীদের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র যে অংশ পৃথকভাবে নাযিল করা হয়েছে তা হল غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ (নিসা : ৯৫)। এটি একটি দীর্ঘ আয়াতের অংশ। অপর দিকে গোটা সূরা 'আনআম' একবারেই নাযিল হয়েছে।

(ইবনে কাছীর, ২য় খণ্ড, ১২২ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন হচ্ছে সম্পূর্ণ কুরআনকে একবারেই নাযিল না করে অল্প অল্প করে নাযিল করা হল কেন? এ প্রশ্ন খোদ আরব মুশরিকগণই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করেছিল। আল্লাহ তাআলা নিজেই তাদের সে প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا - وَلَا يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا

কাফিরগণ বলে, সম্পূর্ণ কুরআন তার প্রতি একবারেই অবতীর্ণ করা হল না কেন? (হে নবী!) আমি এরূপ করেছি এর মাধ্যমে তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় রাখার উদ্দেশ্যে। আর আমি একে থেমে থেমে পাঠ করিয়েছি। তারা যখন তোমার নিকট কোন অভিনব বিষয় নিয়ে আসে, আমি তোমাকে তার যথাযথ উত্তর এবং উত্তম ব্যাখ্যা প্রদান করি। (ফুরকান)

ইমাম রাযী (রহ.) এ আয়াতের তাফসীরে কুরআন মাজীদের পর্যায়ক্রমিক অবতরণের যে রহস্য ও তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, এ স্থলে তার সার-সংক্ষেপ বুঝে নেওয়াই যথেষ্ট। তিনি বলেন,

এক. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মী ছিলেন; লেখাপড়া জানতেন না। যদি সম্পূর্ণ কুরআন একবারেই নাযিল করে দেওয়া হত, তবে তা স্মরণ রাখা ও আয়ত্ত করা কঠিন হত। পক্ষান্তরে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম লেখাপড়া জানতেন। তাই তাওরাত গ্রন্থ তার প্রতি একবারেই নাযিল করা হয়।

দুই. সম্পূর্ণ কুরআন একবারে নাযিল হলে সমস্ত বিধি-বিধান তৎক্ষণাৎ পালন করা অপরিহার্য হত আর তা সেই প্রাজ্ঞজনোচিত ক্রমিকতার পরিপন্থী হত, যার প্রতি মুহাম্মাদী শরীআতে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

তিন. স্বীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রতিদিন নতুন-নতুন উৎপীড়ন বরদাশত করতে হত। কুরআনী আয়াত নিয়ে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের পুনঃ-পুনঃ আগমন তাদের সেই উৎপীড়নের মুকাবিলা করাকে সহজ করে দিত এবং তা তার হৃদয়-শক্তি বৃদ্ধির কারণ হত।

চার. কুরআন মাজীদের বড় এক অংশ মানুষের বিভিন্ন রকম প্রশ্নের জবাব ও বিভিন্ন রকম ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই সে সকল আয়াত ওই সময়ে নাযিল করাই সমীচীন ছিল, যখন সে সকল প্রশ্ন করা হয়েছিল বা সেসব ঘটনা ঘটেছিল। এর ফলে একদিকে মুসলিমদের জ্ঞান ও উপলব্ধি বৃদ্ধি পেত, অন্যদিকে কুরআন কর্তৃক অদৃশ্য সংবাদ বর্ণনার কারণে তার সত্যতা আরও বেশি পরিস্ফুট হয়ে উঠত। (তাফসীরে কাবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা)

শানে নুযুল

কুরআন মাজীদের আয়াত দু'প্রকার।

এক. সেই সকল আয়াত, যা আল্লাহ তাআলা আপনা থেকেই নাযিল করেছেন; বিশেষ কোন ঘটনা বা কারও কোন প্রশ্ন কিংবা অন্য কিছুই তা নাযিলের 'কারণ' হয়নি।

দুই. সেই সকল আয়াত, যা বিশেষ কোন ঘটনা বা কোন প্রশ্নের কারণে নাযিল হয়েছে, যাকে সেই আয়াতের প্রেক্ষাপট বলা যায়। মুফাসসিরদের পরিভাষায় এই প্রেক্ষাপটকে 'শানে নুযুল' বা 'নাযিলের কারণ' বলা হয়। যেমন সূরা বাকারায় ইরশাদ হয়েছে,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ

'তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করো না, যাবৎ না তারা ঈমান আনে। নিশ্চয়ই মুমিন দাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা শ্রেয়, যদিও সেই মুশরিক নারী তোমাদের ভাল লাগে।'

(বাকারা : ২২১)

এ আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার কারণে নাযিল হয়েছিল। জাহিলী যুগে ‘আনাক নাম্নী এক নারীর সাথে হযরত মারছাদ ইবনে আবু মারছাদ গানামী (রাযি.)-এর সম্পর্ক ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মদীনায় চলে আসেন, কিন্তু সেই নারী মক্কাতেই থেকে যায়। একবার হযরত মারছাদ (রাযি.) বিশেষ কোন কাজে মক্কায় আগমন করেন। তখন ‘আনাক তাকে দুষ্কর্মের আহ্বান জানায়। হযরত মারছাদ (রাযি.) সে আহ্বান সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাকে জানিয়ে দেন যে, ইসলাম আমার ও তোমার মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে, হাঁ তুমি চাইলে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি নিয়ে তোমাকে বিবাহ করতে পারি। মারছাদ (রাযি.) মদীনায় ফিরে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিবাহের অনুমতি চাইলেন এবং নিজ আগ্রহের কথাও তাঁকে জানালেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত নাযিল হয় এবং এতে মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়।

(আসবাবুন নুযুল, পৃষ্ঠা ৩৮)

উল্লিখিত ঘটনাটি আয়াতের শানে নুযুল। কুরআন মাজীদের তাফসীরের ক্ষেত্রে শানে নুযুল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বহু আয়াত এমন রয়েছে, যার সঠিক মর্ম শানে নুযুল না জানা পর্যন্ত উপলব্ধি করা যায় না।

কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস

রিসালাত-যুগে কুরআন সংরক্ষণ ঃ সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ যেহেতু একবারে নাযিল হয়নি, বরং প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী এর বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন সময়ে নাযিল হতে থাকে, তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কুরআন মাজীদকে শুরু থেকেই গ্রন্থাকারে লিখে সংরক্ষণ করা সম্ভব ছিলনা। যদ্দরুণ ইসলামের প্রথম যুগে কুরআন সংরক্ষণের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি জোর দেওয়া হত স্মরণশক্তির উপর। প্রথম দিকে যখন ওহী নাযিল হত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার শব্দাবলী সঙ্গে সঙ্গে পুনরাবৃত্তি করতে থাকতেন, যাতে তা ভালোভাবে মুখস্থ হয়ে যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কিয়ামার কয়েকটি আয়াত নাযিল করা হয় এবং তাতে আল্লাহ তাআলা তাকে নির্দেশ দেন যে, কুরআন মাজীদকে মুখস্থ রাখার জন্য ঠিক ওহী নাযিলের মুহূর্তে তাড়াহুড়া করে ওহীর শব্দাবলী পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং আপনাকে এমন স্মরণশক্তি দান করবেন যে, ওহী নাযিলের পর আপনি তা ভুলতেই পারবেন না। সুতরাং এমনই হল। একদিকে তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হত, অন্যদিকে তাঁর তা মুখস্থ হয়ে যেত। এভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্ষদেশ ছিল কুরআন সংরক্ষণের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ আধার, যেখানে কোনও রকমের ভুল-ভ্রান্তি বা রদ-বদলের সম্ভাবনা ছিল না। অত:পর বাড়তি সতর্কতা স্বরূপ প্রতি বছর রমযান মাসে তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.)কে পূর্ণ কুরআন শোনাতেন। যে বছর তাঁর ওফাত হয়, সে বছর তিনি হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের সঙ্গে পূর্ণ কুরআন দু'বার শোনাশুনি (দাওর) করেন। (বুখারী, ফাতহুল বারীসহ ৯বম খণ্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে কুরআনের কেবল অর্থই শিক্ষা দিতেন না; বরং তাদেরকে শব্দাবলীও মুখস্থ করাতেন। সাহাবায়ে কেরামের অন্তরেও কুরআন মাজীদ শেখা ও মুখস্থ করার এতটা আগ্রহ ছিল যে, এ ব্যাপারে প্রত্যেকের চেষ্টা থাকত যাতে অন্যদের থেকে অগ্রগামী থাকতে পারেন। কোনও কোনও নারী তাদের স্বামীদের কাছে মোহরানা হিসেবে কেবল এটাই দাবী করতেন যে, তারা তাদেরকে কুরআন মাজীদ শেখাবেন। বহু সাহাবী এমন ছিলেন, যারা নিজেদেরকে দুনিয়ার সকল চিন্তা ও ঝামেলা থেকে মুক্ত করে কুরআনের জন্য

নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তারা যে কুরআন মাজীদ কেবল মুখস্থ করতেন তাই নয়, বরং রাতভর তারা সালাতে কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন।

হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রাযি.) বলেন, কোনও ব্যক্তি যখন হিজরত করে মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় আসতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আমাদের কোন আনসার ব্যক্তির কাছে সমর্পণ করতেন, যাতে তিনি তাকে কুরআন শিক্ষা দেন। মসজিদে নববীতে কুরআনের পঠন-পাঠনে এমন শোরগোল হত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আওয়াজ ছোট করার নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়, যাতে কোন ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়। (মানাহিলুল ইরফান, ১ম খণ্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা)

অল্প কালের মধ্যেই সাহাবায়ে কেরামের এমন একটি বড় দল গড়ে ওঠে, যাদের সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ ছিল। এ দলের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীন ছাড়া আরও যারা ছিলেন তাদের মধ্যে হযরত তালহা (রাযি.), হযরত সাদ (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.), হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাযি.), হযরত সালিম মাওলা আবী হুযায়ফা (রাযি.) হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.), হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.), হযরত মুআবিয়া (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব (রাযি.), হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.), হযরত হাফসা (রাযি.), হযরত উম্মু সালামা (রাযি.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মোটকথা ইসলামের শুরুভাগে বেশি জোর দেওয়া হয় কুরআন মুখস্থ করার প্রতি। সে সময়ের অবস্থা অনুযায়ী এ পদ্ধতিই অধিকতর নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ছিল। কেননা সেকালে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রেস ইত্যাদি মাধ্যম ও উপকরণের আবিষ্কারই হয়নি। তখন যদি কেবল লেখার উপর নির্ভর করা হত, তবে বৃহত্তর পরিসরে কুরআন মাজীদের প্রচারও হত না এবং নির্ভরযোগ্য উপায়ে তার সংরক্ষণও করা যেত না। তার পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা আরববাসীকে এমন অসাধারণ স্মরণ-শক্তি দিয়েছিলেন যে, তাদের একেক ব্যক্তি হাজার-হাজার শ্লোক মুখস্থ জানত। অতি সাধারণ গ্রাম্য লোকও তার নিজ খান্দানের তো বটেই, ঘোড়াদের পর্যন্ত বংশ তালিকা মুখস্থ বলতে পারত। কুরআন মাজীদ সংরক্ষণের জন্য তাদের এই বিস্ময়কর স্মরণশক্তিকেই কাজে লাগানো হয় এবং এরই মাধ্যমে কুরআন মাজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ আরবের কোণে-কোণে পৌঁছে যায়।

ওহী লিপিবদ্ধকরণ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন মাজীদ মুখস্থ করানো ছাড়াও তা লিপিবদ্ধ করণেরও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত (রাযি.) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে ওহী লিপিবদ্ধকরণের কাজ করতাম। যখন ওহী নাযিল হত, তাঁর প্রচণ্ড উত্তাপ বোধ হত। তখন তাঁর পবিত্র দেহে স্বেদবিন্দুসমূহ মুক্তা দানার মত চকমক করত। তাঁর সে অবস্থা কেটে গেলে আমি (উটের) কাঁধের হাড় বা অন্য কোন টুকরা নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হতাম। তিনি বলে যেতেন আর আমি লিখতে থাকতাম। লেখা শেষ হলে কুরআন লিপিবদ্ধকরণের গুরুভারে আমার মনে হত যেন আমার পায়ের গোছা ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং আমি আর কোনও দিন চলাফেরা করতে পারব না। সে যাই হোক, যখন লেখা শেষ করতাম, নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, পড়। আমি পড়ে শোনাতাম। তাতে কোন ভুল-চুক হয়ে গেলে তিনি তা সংশোধন করে দিতেন। তারপর তা মানুষের সামনে নিয়ে আসতেন।

(মাজমাউয যাওয়াইদ, ১ম খণ্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা; তাবারানীর বরাতে)

হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত (রাযি.) ছাড়া আরও অনেক সাহাবী ওহী লেখার দায়িত্ব পালন করতেন, যাদের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীন, হযরত উবাই ইবনে কাব (রাযি.), হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রাযি.), হযরত মুআবিয়া (রাযি.), হযরত মুগীরা ইবনে শুবা (রাযি.), হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রাযি.), হযরত ছাবিত ইবনে কায়স (রাযি.), হযরত আবান ইবন সাঈদ (রাযি.) প্রমূখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(ফাতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, ১৮ পৃষ্ঠা; যাদুল মাআদ, ১ম খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা)

হযরত উসমান (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল যখন কুরআন মাজীদের কোন অংশ নাযিল হত তখন ওহী লেখককে বলতেন, এটুকু অমুক সূরার অমুক-অমুক আয়াতের পর লিখে দাও। (ফাতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, ১৮ পৃষ্ঠা)

সেকালে আরবে কাগজ খুব কমই পাওয়া যেত। তাই কুরআনী আয়াতসমূহ সাধারণত পাথরের ফলক, চামড়া, খেজুরের ডালা, বাঁশের টুকরা, গাছের পাতা ও পশুর হাড়ে লিখে রাখা হত, তবে কখনও কখনও কাগজের টুকরাও ব্যবহার করা হয়েছে। (প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা)

এভাবে রিসালাতের যুগে স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তত্ত্বাবধানে কুরআন মাজীদের একটি লিপিবদ্ধ কপি তৈরি হয়ে যায়, যদিও তা গ্রন্থাকারে বিন্যস্ত ছিল না; পৃথক-পৃথক পত্রখণ্ড রূপে ছিল। তাছাড়া কোনও কোনও সাহাবী নিজস্ব স্মারক হিসেবে কুরআনী আয়াত নিজের কাছে লিখে রাখতেন। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই এ রীতি চালু ছিল। সুতরাং হযরত উমর (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের আগেই তাঁর বোন ও ভগ্নিপতির কাছে কুরআনী আয়াতের একটি সংকলন ছিল। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর যুগে কুরআন সংকলন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কুরআন মাজীদের যত কপি তৈরি করা হয়েছিল (তার মধ্যে যেটি পূর্ণাঙ্গ ছিল) তা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন বস্তুতে লিপিবদ্ধ ছিল। কোন আয়াত চামড়ায়, কোনও আয়াত গাছের পাতায়, হাড়ে কিংবা অন্য কিছুতে। অথবা তা পূর্ণাঙ্গ কপি ছিল না; বরং কোনও সাহাবীর কাছে একটি সূরা লেখা ছিল, কোনও সাহাবীর কাছে দশ-পাঁচটি সূরা এবং কোনও সাহাবীর কাছে কয়েকটি আয়াত লিপিবদ্ধ ছিল। আবার কোনও কোনও সাহাবীর কাছে আয়াতের সাথে ব্যাখ্যামূলক বাক্যও লেখা ছিল।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) স্বীয় খিলাফতকালে কুরআন মাজীদের বিক্ষিপ্ত অংশসমূহকে একত্র করে সংরক্ষন করার প্রয়োজন বোধ করলেন। তিনি যে প্রেক্ষাপটে ও যেভাবে এ কাজ আঞ্জাম দিয়েছিলেন, হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত (রাযি.) তার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের অব্যবহিত পরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) আমাকে একদিন ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। গিয়ে দেখি সেখানে হযরত উমর (রাযি.)ও উপস্থিত রয়েছেন। আবু বকর (রাযি.) আমাকে বললেন, এইমাত্র উমর এসে আমাকে বললেন, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক হাফেজ সাহাবী শহীদ হয়ে গেছেন। এভাবেই যদি বিভিন্ন স্থানে হাফেজ সাহাবীগণ শাহাদত বরণ করতে থাকেন তবে আমার আশঙ্কা হয়,

কুরআন মাজীদের একটা বড় অংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই আমার রায় হল আপনি কুরআন মাজীদ সংকলনের কাজ শুরু করার আদেশ দিন। আমি উমরকে বললাম, যে কাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি, আমরা তা কিভাবে করি?

উমর উত্তর দিলেন, আল্লাহর কসম! এটা একটা ভাল কাজই হবে। অত:পর উমর আমাকে বারবার একথা বলতে থাকলেন। পরিশেষে আমারও বিষয়টি পুরোপুরি বুঝে এসেছে। এখন আমারও রায় সেটাই, যা **উমর** বলেছেন।

অত:পর হযরত আবু বকর আমাকে বললেন, তুমি একজন যুবা পুরুষ এবং বুদ্ধিমান লোক। তোমার সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখেও ওহী লেখার কাজ করেছ। সুতরাং তুমি কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ খুঁজে খুঁজে সংকলন করে ফেল।

হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত (রাযি.) বলেন, আল্লাহর কসম! তারা যদি আমাকে একটা পাহাড় স্থানান্তরিত করার হুকুম দিতেন, তবে আমার কাছে তা এতটা কঠিন মনে হত না, যতটা মনে হয়েছে কুরআন সংকলনের কাজকে। আমি তাদেরকে বললাম, যে কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি, আপনারা তা কিভাবে করতে যাচ্ছেন? হযরত আবু বকর (রাযি.) বললেন, আল্লাহর কসম! এটি একটি ভাল কাজই হবে। অত:পর হযরত আবু বকর (রাযি.) আমাকে বারবার একথা বলতে থাকলেন। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা আমার হৃদয়ও হযরত আবু বকর (রাযি.) ও উমর (রাযি.)-এর রায়ের অনুকূলে খুলে দিলেন। সুতরাং আমি কুরআনী আয়াতের সন্ধান কার্য শুরু করে দিলাম এবং খেজুরের ডালা, পাথরের ফলক এবং মানুষের স্মৃতিপট থেকে কুরআন মাজীদ একত্র করতে থাকলাম। (বুখারী, ফাযাইলুল কুরআন অধ্যায়)

কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত (রাযি.)-এর কর্মপন্থা

এ স্থলে কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত (রাযি.)-এর কর্মপন্থা ভালভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। পূর্বে বলা হয়েছে, তিনি নিজেও কুরআনের হাফেজ ছিলেন। সুতরাং পূর্ণ কুরআন তিনি নিজ স্মৃতিপট থেকেও লিখে নিতে পারতেন। তিনি ছাড়াও তখন আরও বহু হাফেজ উপস্থিত ছিলেন। একটি পরিষদ বানিয়ে তাদের মাধ্যমেও কুরআন সংকলনের কাজ করা যেত।

তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কুরআনের যে কপি তৈরি করা হয়েছিল, হযরত যায়দ (রাযি.) তা থেকেও কুরআনের অনুলিপি তৈরি করতে পারতেন। কিন্তু সতর্কতামূলকভাবে তিনি বিশেষ এক পন্থার উপর নির্ভর করেননি; বরং উপরিউক্ত সবগুলো মাধ্যমকেই তিনি সামনে রেখেছেন। অত:পর লিখিত ও মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত কোন আয়াতের মুতাওয়াতির হওয়ার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আয়াতকে নিজ সংকলনে লিপিবদ্ধ করেননি। তাছাড়া যে সকল আয়াত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন, যা বিভিন্ন সাহাবীর কাছে সংরক্ষিত ছিল, হযরত যায়দ (রাযি.) তা খুঁজে খুঁজে একত্র করেন, যাতে নতুন সংকলনটি তার অবলম্বনে তৈরি করা যায়। সুতরাং ঘোষণা করে দেওয়া হয়, যার কাছে কুরআন মাজীদের যে আয়াত লিপিবদ্ধ আছে, সে যেন তা হযরত যায়দ (রাযি.)-এর কাছে জমা দেয়। কেউ যখন তাঁর কাছে লিখিত কোন আয়াত নিয়ে আসত তিনি নিম্নলিখিত চার পন্থায় তা সত্যায়িত করে নিতেন।

এক. সর্বপ্রথম নিজ স্মৃতিপটের সাথে তা মিলিয়ে নিতেন।

দুই. হযরত উমর (রাযি.)ও কুরআনের হাফেজ ছিলেন। বিভিন্ন রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় হযরত আবু বকর (রাযি.) তাকেও হযরত যায়দ (রাযি.)-এর সহযোগী নিযুক্ত করেছিলেন। কেউ যখন কোন আয়াত নিয়ে আসত, হযরত যায়দ (রাযি.)ও হযরত উমর (রাযি.) সম্মিলিতভাবে তা গ্রহণ করতেন।

(ফাতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা ইবনে আবু দাউদের বরাতে)

তিন. যতক্ষণ পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিত যে, এ আয়াত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে লেখা হয়েছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত লিখিত কোন আয়াত গ্রহণ করা হত না। (আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, ৬০ পৃষ্ঠা)

চার. অত:পর সেসব লিপিবদ্ধ আয়াতকে সেই সকল সংগ্রহের সাথে মিলিয়ে দেখা হত, যা বিভিন্ন সাহাবী তৈরি করে রেখেছিলেন।

(আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন, কৃত যারকাশী, ১ম খণ্ড, ২৩৮)

হযরত উসমান (রাযি.)-এর আমলে কুরআন সংকলন

হযরত উসমান (রাযি.) হিজরী ২৪ সনে খলীফা মনোনীত হন। ইতোমধ্যে ইসলাম আরবের সীমানা অতিক্রম করে রোম ও ইরানের প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। প্রতিটি নতুন অঞ্চলের জনগণ যখন ইসলামে দাখিল হত, তারা মুসলিম মুজাহিদ যা সেই সকল ব্যবসায়ীদের নিকট কুরআন মাজীদের শিক্ষা লাভ করত, যাদের উসিলায় তারা ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বিভিন্ন সাহাবী বিভিন্ন কিরাআত (পাঠরীতি) অনুযায়ী কুরআন শিখেছিলেন। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সে সকল কিরাআত অনুযায়ী কুরআন পড়ার অনুমতিও তাদের ছিল। প্রত্যেক সাহাবী তাদের শিষ্যদেরকে সেই পাঠরীতি অনুসারেই কুরআন শিক্ষা দিতেন, যে রীতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তারা কুরআন শিখেছিলেন। এভাবে কিরাআতের এ বৈচিত্র মুসলিম জাহানের দূর-দূরান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন পাঠরীতি থাকা এবং সবগুলোই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি যত দিন মানুষ অবগত ছিল তত দিন পর্যন্ত পাঠরীতির বিভিন্নতায় কোনও রকম অনিষ্ট দেখা দেয়নি, কিন্তু এ বিভিন্নতা যখন দূর-দূরান্তে পৌঁছে গেল এবং কুরআনের বিভিন্ন পাঠরীতি থাকার বিষয়টি সে সকল এলাকায় প্রসিদ্ধি লাভও করেনি, তখন এ নিয়ে মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দিতে লাগল। কেউ নিজের কিরাআতকে সহীহ এবং অন্যদের কিরাআতকে গলত সাব্যস্ত করতে লাগল। এ দ্বন্দ্বের কারণে আশংকা ছিল যে, মানুষ কুরআনের মুতাওয়াতির কিরাআতসমূহকে অস্বীকার করার গুরুতর বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। অন্য দিকে মদীনায় সংরক্ষিত হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত (রাযি.)-এর সংকলিত কপি ছাড়া সমগ্র মুসলিম জাহানে এমন কোন নির্ভরযোগ্য কপি ছিল না, যা সমগ্র উম্মতের জন্য প্রামাণ্য গ্রন্থের মর্যাদা পেতে পারে। কেননা অন্য যে সকল কপি কারও কারও কাছে ছিল তা ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংকলিত ছিল এবং তাতে সমস্ত কিরাত একত্র করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কাজেই কিরাআতের বৈচিত্র ভিত্তিক এ দ্বন্দ্ব নিরসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা কেবল এটাই ছিল যে, যে সংকলনে সমস্ত নির্ভরযোগ্য কিরাআত একত্র করা হয়েছে এবং তা দেখে সহীহ ও গলত কিরাআত সম্পর্কে ফায়সালা নেওয়া সম্ভব, সেই সংকলনকে সমগ্র মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। হযরত উসমান (রাযি.) স্বীয় খিলাফতকালে এই সুমহান কার্যই আঞ্জাম দেন।

এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে হযরত উসমান (রাযি.) উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রাযি.)কে বলে পাঠান যে, আপনার কাছে (হযরত আবু বকর [রাযি.]-এর প্রস্তুতকৃত) যে সহীফা সংরক্ষিত আছে,

তা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আমরা তার কয়েকখানি অনুলিপি তৈরি করে মূল কপি আপনাকে ফেরত দেব। হযরত হাফসা (রাযি.) সহীফাখানি হযরত উসমান (রাযি.)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত উসমান (রাযি.) চারজন সাহাবীকে দিয়ে একটি পরিষদ গঠন করলেন। এর সদস্য ছিলেন হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাযি.), হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রাযি.) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে হারিছ ইবনে হিশাম (রাযি.)। তাদের প্রতি দায়িত্ব অর্পিত হল যে, হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর সংকলন দেখে তারা কয়েকটি অনুলিপি তৈরি করবেন এবং তাতে সূরাসমূহ বিন্যস্তরূপে লিপিবদ্ধ করবেন। উল্লিখিত চার সাহাবীর মধ্যে কেবল হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত (রাযি.)-ই আনসারী ছিলেন আর বাকি সকলে ছিলেন কুরাইশী। তাই হযরত উসমান (রাযি.) তাদেরকে বললেন, কুরআনের কোন অংশে যদি তোমাদের ও যায়দের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় (অর্থাৎ কোন শব্দ কিভাবে লেখা হবে তা নিয়ে মতভিন্নতা দেখা দেয়), তবে তা কুরাইশী রীতি অনুযায়ী লিখবে। কেননা কুরআন মাজীদ তাদের ভাষাতেই নাযিল হয়েছে।

মৌলিকভাবে তো এ কাজ উপরিউক্ত ব্যক্তি চতুষ্ঠয়ের উপরই ন্যস্ত করা হয়েছিল, কিন্তু পরে অন্যান্য সাহাবীদেরকেও তাদের সহযোগিতায় নিয়োগ করা হয়েছিল, তারা কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কার্য আঞ্জাম দিয়েছিলেন।[১]

এক. হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর আমলে যে সংকলন তৈরি করা হয়েছিল, তাতে সূরাসমূহ বিন্যস্ত ছিল না; বরং প্রতিটি সূরা আলাদাভাবে লেখা হয়েছিল, তারা সবগুলো সূরা বিন্যস্ত আকারে একই কপিতে লিপিবদ্ধ করেন। (মুস্তাদরাক, ২য় খণ্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা)

দুই. তাঁরা কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ এমনভাবে লেখেন, যাতে তার লিখনরীতিতে মুতাওয়াতির সবগুলো কিরাআত এসে যায়। এ কারণেই তারা তাতে নুক্তা ও হরকত লাগাননি, যাতে তা সমস্ত মুতাওয়াতির কিরাআত অনুযায়ী পড়া সম্ভব হয়, যেমন লেখা হয়েছিল سَـٰزُهـًا যাতে তাকে نُنْشِرُهَا ও نُنْشِزُهَا উভয় রকমে পড়া যায়, যেহেতু এ দুই কিরাআতই সঠিক। (মানাহিলুল ইরফান, ১ম খণ্ড, ২৫৩–২৫৪ পৃষ্ঠা)

তিন. এ পর্যন্ত সম্মিলিতভাবে সমগ্র উম্মতের দ্বারা সত্যায়িত। কুরআন মাজীদের পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য কপি ছিল একটিই। এই পরিষদ সুবিন্যস্ত নতুন সংকলনের কয়েকটি কপি তৈরি করলেন। সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ আছে যে, হযরত উসমান (রাযি.) পাঁচখানি কপি তৈরি করিয়েছিলেন। কিন্তু আবু হাতিম সিজিস্তানী (রহ.)-এর বক্তব্য হল, সর্বমোট সাতখানি কপি তৈরি করা হয়েছিল। তা থেকে একখানি মক্কা মুকাররমায়, একখানি শামে, একখানি ইয়ামানে, একখানি বাহরায়নে, একখানি বসরায় ও একখানি কুফায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অবশিষ্ট একখানি মদীনা তায়্যিবায় সংরক্ষণ করা হয়।

(ফাতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা)

হিয্‌ব বা মনযিল

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণের নিয়ম ছিল প্রতি সপ্তাহে একবার কুরআন মাজীদ খতম করা। এতদুদ্দেশ্যে তাঁরা প্রাত্যহিক তিলাওয়াতের একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। সেই

---

১. এসব বিবরণ এবং এ সংক্রান্ত রিওয়ায়াতসমূহ ফাতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, ১৩–১৫ পৃষ্ঠা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিমাণকেই হিয্‌ব মা মনযিল বলে। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআনকে সাত হিযব বা সাত মনযিলে বণ্টন করা হয়েছিল। (আল-বুরহান, ১ম খণ্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা)

জুয্‌' বা পারা

বর্তমানে কুরআন মাজীদ ত্রিশটি অংশে বিভক্ত, যাকে ত্রিশ পারা বলা হয়। এ বণ্টন অর্থের দিকে লক্ষ্য করে করা হয়নি; বরং শিশুদেরকে শেখানোর সুবিধার্থে কুরআন মাজীদকে সমান ত্রিশটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ কারণেই দেখা যায় কখনও বিলকুল অসম্পূর্ণ কথার উপর পারা শেষ হয়ে যায়। নিশ্চিত করে বলা কঠিন যে, ত্রিশ পারার এ ভাগ কে করেছে? কারও কারও ধারণা হযরত উসমান (রাযি.) অনুলিপি তৈরি করানোর সময় এ রকমই ত্রিশটি আলাদা-আলাদা খণ্ডে কুরআন মাজীদ লিখিয়েছিলেন। সুতরাং এ বণ্টন তাঁরই সময়কার। কিন্তু প্রাচীন উলামায়ে কিরামের কোন রচনায় এর সমর্থনে কোন দলীল অধমের চোখে পড়েনি। অবশ্য আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী (রহ.) লিখেছেন যে, কুরআন মাজীদের প্রসিদ্ধ ত্রিশ পারা এভাবে চলে আসছে এবং মাদরাসার কুরআনের কপিসমূহে এর প্রচলন রয়েছে (আল-বুরহান, ১ম খণ্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা; মানাহিলুল ইরফান, ১ম খণ্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা)। বাহ্যত অনুমান করা যায় যে, এ বণ্টন সাহাবা যুগের পর শিক্ষাদানের সুবিধার্থে করা হয়েছে।

রুকূ'

উপমহাদেশের কুরআনী কপিসমূহে অদ্যাবধি একটি চিহ্ন চলে আসছে, যার নাম রুকু'। এটা নির্দিষ্ট করা হয়েছে কুরআন মাজীদের বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করে। অর্থাৎ যেখানে আলোচনার একটি ধারা শেষ হয়েছে, সেখানে রুকূ'র চিহ্ন বসানো হয়েছে (টীকায় ع হরফ লিখে দেওয়া হয়েছে)। অনেক অনুসন্ধান সত্ত্বেও এ অধম নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পারেনি রুকূ' চিহ্নটি সর্বপ্রথম কে চালু করেছে এবং কোন আমলে। অবশ্য এ কথা প্রায় নিশ্চিত যে, এ চিহ্নের উদ্দেশ্য হল আয়াতের এমন একটা মাঝামাঝি পরিমাণ নির্দিষ্ট করা, যা এক রাকাআতে পড়া যেতে পারে। আর একে এজন্যই রুকু' বলা হয় যে, মুসল্লী এ স্থলে পৌছে রুকূ' করবে।

ওয়াক্‌ফ চিহ্নসমূহ

তিলাওয়াত ও তাজবীদের সুবিধার্থে আরও একটি ভালো কাজ এই করা হয়েছে যে, বিভিন্ন কুরআনী বাক্যে এমন সাংকেতিক চিহ্ন লিখে দেওয়া হয়েছে, যা দ্বারা সেখানে ওয়াকফ করা (বিরাম নেওয়া) কেমন তা বোঝা যায়। এসব চিহ্নকে 'রুমূযে আওকাফ' বলা হয়। এটা করা হয়েছে এই উদ্দেশ্য, যাতে একজন আরবী না-জানা লোকও কুরআন তিলাওয়াতকালে সঠিক স্থানে ওয়াকফ করতে পারে এবং বেঠিক জায়গায় বিরাম নেওয়ার ফলে অর্থগত কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হতে পারে। এসব চিহ্নের অধিকাংশই সর্বপ্রথম স্থির করেছেন আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে তায়ফূর সাজাওয়ান্দী (রহ.)।

(আন-নাশরু ফিল কিরাআতিল আশার, ১ম খণ্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা)

চিহ্নসমূহের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ

ط এটা وقف مطلق (সাধারণ বিরতি)-এর নির্দেশক। এর অর্থ এখানে কথা পূর্ণ হয়ে গেছে। কাজেই এখানে ওয়াকফ করা শ্রেয়।

ج এটা وقف جائز (বৈধ বিরতি)-এর নির্দেশক। এর অর্থ এখানে ওয়াকফ করা জায়েয।

ز এটা وقف مجوز (অনুমোদনযোগ্য বিরতি)-এর নির্দেশক। এর অর্থ এ স্থলে ওয়াকফ করা বৈধ বটে, কিন্তু ওয়াকফ না করাই উত্তম।

ص এটা وقف مرخص (অবকাশমূলক বিরতি)-এর নির্দেশক। এর অর্থ এ স্থলে যদিও কথা পূর্ণ হয়নি, কিন্তু বাক্য যেহেতু দীর্ঘ, তাই অন্যত্র বিরাম না নিয়ে বরং এ স্থলেই নেওয়া চাই।

م এটা وقف لازم (অত্যাবশ্যকীয় বিরতি)-এর নির্দেশক। এর অর্থ এখানে থামা না হলে আয়াতের অর্থে মারাত্মক বিভ্রান্তি ঘটার আশঙ্কা আছে। তাই এখানে ওয়াকফ করা বেশি ভাল। কেউ কেউ এটাকে ওয়াজিব ওয়াকফও বলেছেন। তবে এর দ্বারা ফিকহী ওয়াজিব বোঝানো উদ্দেশ্য নয়, যা তরক করলে গুনাহ হয়। বরং বোঝানো উদ্দেশ্য হচ্ছে যত রকম ওয়াকফ আছে, তার মধ্যে এ স্থলে ওয়াকফ করা বেশি ভাল। (আন-নাশর, ১ম খণ্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা)

لا এটা (لا تقف)-এর নির্দেশক। এর অর্থ 'এ স্থলে বিরতি দিও না।' তবে এর মানে এ নয় যে, এ স্থলে বিরতি দেওয়া জায়েয নয়। বরং এর মধ্যে বহু জায়গা এমনও রয়েছে, যেখানে ওয়াকফ করলে কোন দোষ নেই এবং এর পরের শব্দ থেকে নতুনভাবে পড়া শুরু করাও জায়েয। সুতরাং এর সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, এ স্থলে ওয়াকফ করলে আবার এর পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে পড়া শুরু করাই শ্রেয়। পরের শব্দ থেকে পড়া শুরু করা পসন্দনীয় নয়। (আন-নাশর, ১ম খণ্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা)

উপরিউক্ত চিহ্নসমূহ সম্পর্কে তো নিশ্চিতভাবেই জানা যায় যে, এগুলো আল্লামা সাজাওয়ানদী (রহ.)-এর তৈরি করা। কুরআন মাজীদে এ ছাড়া আরও কিছু চিহ্নের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা–

مع এটা معانقه -এর নির্দেশক। এ চিহ্ন এমন জায়গায় দেওয়া হয়, যেখানে এক আয়াতের দু' রকম তাফসীর করা সম্ভব। এক তাফসীর অনুযায়ী ওয়াকফ হবে এক জায়গায় এবং অন্য তাফসীর অনুযায়ী অন্য জায়গায়। কাজেই এর যে-কোনও স্থানে ওয়াকফ করা যেতে পারে। কিন্তু এক জায়গায় ওয়াকফ করার পর দ্বিতীয় স্থানে ওয়াকফ করা ঠিক হবে না। উদাহরণত ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰةِ ج وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ج كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ ... এতে যদি التَّوْرٰةِ। শব্দে ওয়াকফ করা হয়, তবে الْاِنْجِيْلِ। শব্দে ওয়াকফ করা সঠিক হবে না। আর যদি الْاِنْجِيْلِ। শব্দে ওয়াকফ করা হয়, তবে التَّوْرٰةِ। শব্দে ওয়াকফ করা সঠিক হবে না। তবে কোনও জায়গাতেই ওয়াকফ না করলে সেটাও ঠিক আছে। এর এক নাম مقابلة -ও। এটা সর্বপ্রথম স্থির করেছেন ইমাম আবুল ফযল রাযী (রহ.)। (আন-নাশর, ১ম খণ্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা; আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা)

سكته এটা 'সাক্তা'-এর চিহ্ন। এর অর্থ এ স্থলে থামা চাই, তবে দম না ছেড়ে। এ চিহ্ন সাধারণত এমন স্থানে দেওয়া হয়, যেখানে মিলিয়ে পড়া হলে অর্থগত বিভ্রান্তির অবকাশ আছে।

وقفة এ স্থলে سكته অপেক্ষা একটু বেশি থামা চাই। তবে এ স্থলেও দম বন্ধ রাখতে হয়।

ق এটা قيل عليه الوقف এর সংক্ষেপ। এর অর্থ কারও কারও মতে এ স্থলে ওয়াকফ আছে এবং কারও মতে নেই।

قف এর অর্থ থেমে যাও। এ চিহ্ন এমন স্থানে দেওয়া হয়, যেখানে থামা সঠিক নয় বলে পাঠকের ধারণা হতে পারে।

صلے এটা الوصل اولى এর সংক্ষেপ। এর অর্থ এ স্থলে মিলিয়ে পড়া উত্তম।

صل এটা قد يوصل এর সংক্ষেপ। অর্থ এ স্থলে কেউ কেউ বিরতি দেন এবং কেউ কেউ মিলিয়ে পড়াকে পসন্দ করেন।

وقف النبى صلى الله عليه وسلم এটা সেই সকল স্থানে লেখা হয়, যেখানে কোনও রিওয়ায়াত দ্বারা জানা গেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিলাওয়াতকালে এ স্থলে ওয়াকফ করেছিলেন।

তাফসীর শাস্ত্র

এবার তাফসীর শাস্ত্র সম্পর্কিত কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা করা যাচ্ছে।

আরবী ভাষায় 'তাফসীর'-এর শাব্দিক অর্থ 'উন্মোচন করা'। পরিভাষায় 'তাফসীর' বলে সেই শাস্ত্রকে যাতে কুরআন মাজীদের অর্থ ও মর্ম বর্ণনা করা হয় এবং তার বিধানাবলী ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়। (আল-বুরহান)

কুরআন মাজীদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে ইরশাদ হয়েছে–

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ

'আমি আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের সামনে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন।' (১৬ : ৪৪)

আরও ইরশাদ হয়েছে–

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন, যখন তাদের প্রতি তাদেরই মধ্য থেকে এক রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে আল্লাহর, কিতাব ও জ্ঞানের কথা শিক্ষা দেন।" (৩ : ১৬৪)

সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে কুরআন মাজীদের কেবল শব্দাবলীই শিক্ষা দিতেন না; বরং তার পূর্ণ তাফসীর ও ব্যাখাও বলে দিতেন। এ কারণেই অনেক সময় সাহাবায়ে কিরামের একেকটি সূরা শিখতে কয়েক বছর লেগে যেত। এটা বিস্তারিতভাবে সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ তাআলা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যত দিন দুনিয়ায় বর্তমান ছিলেন, তত দিন তো কোন আয়াতের তাফসীর জানা কিছু কঠিন বিষয় ছিল না। যেখানেই সাহাবায়ে কিরামের কোন জটিলতা দেখা দিত, তাঁর শরণাপন্ন হতেন এবং তিনি তাদেরকে সন্তোষজনক জবাব দিয়ে দিতেন। তাঁর ওফাতের পর কুরআনের তাফসীরকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন দেখা দিল, যাতে উম্মতের জন্য কুরআন মাজীদের শব্দাবলীর সাথে তার সহীহ অর্থও

সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং বদ দ্বীন ও পথভ্রষ্ট শ্রেণীর পক্ষে এর অর্থগত বিকৃতি সাধনের কোন সুযোগ না থাকে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার দয়া ও করুণা এবং তাঁর তাওফীকে উম্মত এ কার্যক্রম এমন সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিয়েছে যে, আজ আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ এই গ্রন্থের কেবল শব্দাবলীই নয়; বরং তাঁর সহীহ তাফসীর ও ব্যাখ্যাও সংরক্ষিত আছে, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর উৎসর্গিত-প্রাণ সাহাবীদের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে।

কুরআনের তাফসীর সম্বন্ধে একটি মারাত্মক বিভ্রান্তি

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কুরআন মাজীদের তাফসীর অত্যন্ত নাজুক ও কঠিন কাজ। এর জন্য কেবল আরবী ভাষা জানাই যথেষ্ট নয়; সংশ্লিষ্ট সকল শাস্ত্রে দখল থাকা জরুরী। উলামায়ে কিরাম লিখেছেন, কুরআন মাজীদের তাফসীরকারকের জন্য আরবী ভাষার নাহ্‌ব (বাক্য গঠন প্রণালী), সরফ (শব্দ প্রকরণ), সাহিত্য ও অলংকার শাস্ত্র ছাড়াও হাদীস, উসূলে ফিক্‌হ, তাফসীর, আকাঈদ ও কালাম (ধর্মতত্ত্ব) সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেননা এসব শাস্ত্রে দখল না থাকলে কুরআন মাজীদের তাফসীরে কেউ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে না।

বড় আফসোসের কথা– কিছুকাল পূর্ব থেকে মুসলিমদের মধ্যে এই বিপজ্জনক মহামারি বিস্তার লাভ করেছে যে, বহু লোক মনে করে কুরআন মাজীদের তাফসীরের জন্য কেবল আরবী ভাষা জেনে নেওয়াই যথেষ্ট। সুতরাং যে ব্যক্তিই কিছু আরবী ভাষা শিখে ফেলে সে-ই কুরআন মাজীদের তাফসীর সম্পর্কে নিজস্ব মত প্রকাশ শুরু করে দেয়। বরং অনেক লোককে এমনও দেখা গেছে, যারা আরবী ভাষা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখে না, অতি সামান্য কিছু ধারণা রাখে মাত্র, তারা কুরআন মাজীদের যে কেবল মনগড়া তাফসীর করে তাই নয়, বরং প্রাচীন মুফাসসিরগণের ভুল-ত্রুটি ধরার পেছনে লেগে যায়। এমনকি কোনও কোনও ক্রূরাত্মা তো কেবল অনুবাদ পড়েই নিজেকে কুরআনের মহাপণ্ডিত গণ্য করে এবং নির্দ্বিধায় বড় বড় মুফাসসিরদের সমালোচনা করতে থাকে।

খুব ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার যে, এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক কর্মপন্থা। দ্বীনী বিষয়ে এটা ধ্বংসাত্মক পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। পার্থিব জ্ঞান-বিদ্যার ক্ষেত্রে সকলেই বোঝে যে, কোন ব্যক্তি যদি কেবল ইংরেজি ভাষা শিখে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই-পুস্তক পড়ে নেয়, তবে দুনিয়ার কোনও লোক তাকে চিকিৎসকরূপে স্বীকার করে নেবে না এবং কেউ নিজ জীবন তার হাতে ছেড়ে দেবে না। কাউকে চিকিৎসক স্বীকার করা হয় কেবল তখনই যখন সে কোন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে যথারীতি শিক্ষা গ্রহণ করে। কেননা ডাক্তার হওয়ার জন্য ইংরেজি ভাষা শেখাই যথেষ্ট নয়; বরং নিয়মিতভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করা জরুরী। এমনিভাবে ইংরেজি জানা কোন লোক ইঞ্জিনিয়ারিং বই-পত্র পড়েই যদি ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়, তবে দুনিয়ার কোন সমঝদার লোক তাকে ইঞ্জিনিয়ার বলে স্বীকার করতে পারে না। কেননা এ জ্ঞান কেবল ইংরেজি ভাষা শেখার দ্বারা অর্জিত হতে পারে না; বরং এর জন্য দক্ষ-অভিজ্ঞ শিক্ষকের অধীনে থেকে এ শাস্ত্রের যথারীতি প্রশিক্ষণ গ্রহণ আবশ্যক। যখন ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য কড়াকড়িভাবে এ শর্ত পূরণ করা জরুরী, তখন কুরআন ও হাদীসের ব্যাপারে কেবল আরবী ভাষা শেখাই যথেষ্ট হয় কি করে? জীবন ও জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় প্রতিটি লোক এ নীতি জানে ও মানে যে, প্রতিটি বিদ্যা অর্জন করার এক বিশেষ পদ্ধতি ও তার জন্য বিশেষ শর্ত-শরায়েত আছে, যা পূর্ণ করা ছাড়া

সে বিষয়ে তার মতামত গ্রহণযোগ্য হয় না। অন্য সব ক্ষেত্রে যখন এই অবস্থা, তখন কুরআন ও সুন্নাহ কি করে এমন লাওয়ারিশ হতে পারে যে, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য কোন জ্ঞান-বিদ্যা অর্জনের প্রয়োজন থাকবে না এবং সে ব্যাপারে যে-কারও ইচ্ছা হয় স্বীয় মতামত ব্যক্ত করতে পারবে?

কেউ কেউ বলে, কুরআন মাজীদ নিজেই তো ঘোষণা করেছে,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ

'নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি।' (৫৪ : ১৭)

কুরআন মাজীদ যখন একটি সহজ গ্রন্থ, তখন তার ব্যাখ্যার জন্য লম্বা-চওড়া জ্ঞান-বিদ্যার দরকার হবে কেন? প্রকৃতপক্ষে তাদের এই প্রমাণ প্রদর্শন একটি চরম বিভ্রান্তি এবং এর ভিত্তি এক রকম নির্বুদ্ধিতা ও জড়ত্বের উপর। বস্তুত কুরআন মাজীদের আয়াত দু' প্রকার।

এক. সেই সকল আয়াত, যাতে সাধারণ উপদেশমূলক কথা, শিক্ষণীয় ঘটনাবলী এবং ওয়াজ ও নসীহতের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, যথা দুনিয়ার নশ্বরতা, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থাদি, আল্লাহভীতি ও আখিরাতের চিন্তা জাগ্রতকারী বিষয়াবলী এবং জীবনের অন্যান্য সাদামাঠা বাস্তবতা। এ জাতীয় আয়াত নিঃসন্দেহে সহজ। যে ব্যক্তি আরবী ভাষা জানে সে তা বুঝে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। উপরে বর্ণিত আয়াতে এ জাতীয় শিক্ষামালা সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, আমি এগুলো সহজ করে দিয়েছি। খোদ আয়াতটির ভেতরই لِلذِّكْرِ (উপদেশের জন্য) শব্দটি এর প্রতি নির্দেশ করছে।

দুই. দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে এমন সব আয়াত যাতে আইন-কানুন, বিধানাবলী, আকীদা-বিশ্বাস ও উচ্চাঙ্গের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এ জাতীয় আয়াত যথাযথভাবে বোঝা ও তা থেকে আহকাম ও মাসাইল উদ্ভাবন করা প্রত্যেকের কাজ নয়। এটা কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব যারা ইসলামী জ্ঞান-বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি ও পরিপক্কতা অর্জন করেছে। এ কারণেই তো সাহাবায়ে কিরাম, যাদের মাতৃভাষা ছিল আরবী এবং আরবী বোঝার জন্য যাদের কোথাও শিক্ষা লাভের প্রয়োজন ছিল না, তারা পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কুরআন মাজীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য সুদীর্ঘকাল ব্যয় করতেন। আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) ইমাম আবু আবদুর রহমান সুলামী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাযি.), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) সহ যে সকল সাহাবী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কুরআন মাজীদের যথারীতি তালীম গ্রহণ করেছেন, তারা আমাদের বলেছেন, তারা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কুরআন মাজীদের দশ আয়াত শিখতেন, তখন যতক্ষণ পর্যন্ত সেসব আয়াত সম্পর্কিত যাবতীয় ইলমী ও আমলী বিষয় আয়ত্তে না আসত ততক্ষণ সামনে চলতেন না। তারা বলতেন,

فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْاٰنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيْعًا

'আমরা কুরআন এবং ইলম ও আমল একই সঙ্গে শিখেছি।' (আল-ইতকান, ২য় খণ্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

মুআত্তা মালিকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) কেবল সূরা বাকারা শিখতে পূর্ণ আট বছর ব্যয় করেছেন। মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সূরা বাকারা ও আলে-ইমরান শিখে ফেলত তার মর্যাদা আমাদের দৃষ্টিতে অনেক উঁচু হয়ে যেত। (আল-ইতকান, ২য় খণ্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

চিন্তা করার বিষয় এই যে, এই সাহাবায়ে কিরামের মাতৃভাষা তো ছিল 'আরবী' তারা আরবী কাব্য ও সাহিত্যে পূর্ণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। সামান্য একটু মনোযোগ দিলেই লম্বা-লম্বা কাসীদা যাদের মুখস্থ হয়ে যেত, সেই তাদের মত ব্যক্তিবর্গের কুরআন মাজীদ মুখস্থ করতে ও তার অর্থ বুঝতে এত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হত কেন? মাত্র একটি সূরা শিখতে তাদের আট বছর লাগত কী কারণে?

এর কারণ কেবল এটাই ছিল যে, কুরআন মাজীদ ও তাঁর জ্ঞানরাশি শেখার জন্য কেবল আরবী ভাষার দক্ষতাই যথেষ্ট ছিল না। বরং সেজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য দ্বারা উপকৃত হওয়া ও তার থেকে যথারীতি শিক্ষা গ্রহণ করা অপরিহার্য ছিল। এবার ভেবে দেখুন, আরবী ভাষায় দক্ষতা থাকা ও ওহী নাযিলের প্রত্যক্ষদর্শী হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের আলেম হওয়ার জন্য সাহাবায়ে কিরামেরও যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন হয়েছিল, তখন কুরআন নাযিলের হাজারও বছর পর আরবী ভাষা সম্পর্কে সামান্য একটু ধারণা লাভ করেই কিংবা কেবল অনুবাদ পড়েই 'মুফাসসিরে কুরআন' হয়ে যাওয়ার দাবী কত বড় ধৃষ্টতা এবং ইলম ও দ্বীনের সাথে কেমন দুঃখজনক তামাশা? যারা এমনতর ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে, তাদের উচিত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ইরশাদ ভালোভাবে স্মরণ রাখা যে,

مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ فِى النَّارِ

'যে ব্যক্তি কুরআন সম্বন্ধে না জেনে কোন কথা বলে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।'

আরও ইরশাদ,

مَنْ تَكَلَّمَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهٖ فَاَصَابَ فَقَدْ اَخْطَأَ

'যে ব্যক্তি কুরআনের ক্ষেত্রে (কেবল) নিজ মতের ভিত্তিতে কথা বলে এবং তাতে কোন সঠিক কথাও বলে, তবুও সে ভুল করে।' (আবু দাউদ, নাসাঈ, আল-ইতকান, ২য় খণ্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠার বরাতে)

সূরা ফাতিহা

পরিচিতি

সূরা ফাতিহা কুরআন মাজীদের বর্তমান বিন্যাস অনুযায়ীই সর্বপ্রথম সূরা নয়; বরং সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গরূপে যে সূরা নাযিল হয়েছে তা এটিই। এর আগে একত্রে পূর্ণাঙ্গ কোন সূরা নাযিল হয়নি। কোন কোন সূরার অংশবিশেষ নাযিল হয়েছিল।

এ সূরাকে কুরআন মাজীদের শুরুতে স্থান দেওয়ার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদের মাধ্যমে হিদায়াত লাভ করতে চায়, তার কর্তব্য সর্বপ্রথম নিজ সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের গুণাবলীকে স্বীকার করত: তার শুকর আদায় করা এবং একজন প্রকৃত সত্য-সন্ধানীরূপে তাঁর কাছেই হিদায়াত প্রার্থনা করা। তাই আল্লাহ তাআলার কাছে একজন সত্য-সন্ধানীর যে দু'আ ও প্রার্থনা করা উচিত তা এই সূরায় শেখানো হয়েছে, আর তা হল সরল পথের দু'আ। এভাবে এ সূরায় যে সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল পথের প্রার্থনা করা হয়েছে, তা কোন্ পথ, সমগ্র কুরআন তারই ব্যাখ্যা।

১–সূরা ফাতিহা, মক্কী–৫

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ

আয়াত– ৭, রুকূ– ১

اٰيَاتُهَا ۷ رُكُوْعُهَا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।[১]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক।[২]

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢

২. যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু,

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣

৩. যিনি কর্মফল-দিবসের মালিক।[৩]

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤

৪. [হে আল্লাহ] আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।[৪]

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥

৫. আমাদের সরল পথে পরিচালিত কর।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ

৬. সেই সকল লোকের পথে, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ।

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

৭. ওই সকল লোকের পথে নয়, যাদের প্রতি গযব নাযিল হয়েছে এবং তাদের পথেও নয়, যারা পথহারা।

---

১. আরবী নিয়ম অনুসারে "رحمن" -এর অর্থ সেই সত্তা যার রহমত ও দয়া অত্যন্ত প্রশস্ত (Extensive), অর্থাৎ যার রহমত দ্বারা সকলেই উপকৃত হয়। আর رحيم অর্থ সেই সত্তা, যার রহমত খুব বেশি (Intensive), অর্থাৎ যার প্রতি তা হয়, পরিপূর্ণরূপে হয়। দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার রহমত সকলেই ভোগ করে। মুমিন ও কাফির নির্বিশেষে সকলেই তা দ্বারা উপকৃত হয়। সকলেই রিযক পায় এবং দুনিয়ায় নেয়ামতসমূহ দ্বারা সকলেই লাভবান হয়। আখিরাতে যদিও কাফিরদের প্রতি রহমত হবে না, কিন্তু যাদের প্রতি (অর্থাৎ মুমিনদের প্রতি) হবে, পরিপূর্ণরূপে হবে। ফলে সেখানে নেয়ামতের সাথে কোন রকমের দুঃখ-কষ্ট থাকবে না।

رحمن ও رحيم -এর অর্থের মধ্যে এই যে পার্থক্য, এটা প্রকাশ করার জন্যই رحمن -এর তরজমা করা হয়েছে 'সকলের প্রতি দয়াবান' আর رحيم -এর তরজমা করা হয়েছে 'পরম দয়ালু'।

২. আপনি যদি কোন ইমারতের প্রশংসা করেন, তবে প্রকৃতপক্ষে সে প্রশংসা হয় ইমারতটির নির্মাতার। সুতরাং এই সৃষ্টিজগতের যে-কোনও বস্তুর প্রশংসা করা হলে পরিণামে সে প্রশংসা হয় আল্লাহ তাআলার, যেহেতু সে বস্তু তাঁরই সৃষ্টি। জগতসমূহের প্রতিপালক বলে সে দিকেই ইশারা করা হয়েছে। মানব জগত, জীব জগত, জড় জগত ও উদ্ভিদ জগত থেকে শুরু করে নভোমণ্ডল, নক্ষত্রমণ্ডল ও ফিরিশতা জগত পর্যন্ত সব কিছুর সৃজন ও প্রতিপালন আল্লাহ তাআলারই কাজ। এসব জগতের মধ্যে যা কিছু প্রশংসাযোগ্য আছে, আল্লাহ তাআলার সৃজন ও রবূবিয়্যাতের মহিমার কারণেই তা প্রশংসার যোগ্যতা লাভ করেছে।

৩. কর্মফল দিবস বলতে সেই দিনকে বোঝানো হয়েছে যে দিন সমস্ত বান্দাকে পার্থিব জীবনের যাবতীয় কৃতকর্মের বদলা দেওয়া হবে। এমনিতে তো কর্মফল দিবসের আগেও সৃষ্টিজগতের সমস্ত কিছুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলাই। তবে তিনি দুনিয়ায় মানুষকেও বহু কিছুর মালিকানা দান করেছেন। যদিও তাদের সে মালিকানা অসম্পূর্ণ ও সাময়িক, তারপরও আপাতদৃষ্টিতে তাকে মালিকানাই বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কিয়ামত-দিবসে যখন শাস্তি ও পুরস্কার দানের সময় এসে যাবে, তখন এই অসম্পূর্ণ ও সাময়িক মালিকানাও খতম হয়ে যাবে। সে দিন বাহ্যিক মালিকানাও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও থাকবে না। এ কারণেই এ স্থলে আল্লাহ তাআলাকে বিশেষভাবে কর্মফল দিবসের মালিক বলা হয়েছে।

৪. এর দ্বারা বান্দাদেরকে আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করার নিয়ম শেখানো হয়েছে। সেই সঙ্গে এটাও পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ কোন রকমের ইবাদত- উপাসনার উপযুক্ত নয়। আরও জানানো হচ্ছে, প্রতিটি কাজে প্রকৃত সাহায্য আল্লাহ তাআলার কাছেই চাওয়া উচিত। কেননা যথার্থভাবে কার্য-নির্বাহকারী তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। দুনিয়ার বিভিন্ন কাজে যে অনেক সময় মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়, তা এই বিশ্বাসে চাওয়া হয় না যে, সে কর্মবিধায়ক। বরং এক বাহ্যিক 'কারণ' মনে করেই চাওয়া হয়।

সূরা বাকারা

পরিচিতি

এটি কুরআন মাজীদের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ সূরা। এর ৬৭ থেকে ৭৩ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে একটি গাভীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যে গাভীটি যবাহ করার জন্য বনী ইসরাঈলকে আদেশ করা হয়েছিল। সে হিসেবেই এ সূরার নাম সূরা বাকারা। আরবীতে 'বাকারা' অর্থ গাভী (গরু)।

সূরাটির সূচনা করা হয়েছে ইসলামের মৌলিক আকীদা– তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের বর্ণনা দ্বারা। এ প্রসঙ্গে মুমিন, কাফির ও মুনাফিক, মানুষের এই তিনটি শ্রেণীর কথাও বর্ণিত হয়েছে। অত:পর হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে মানুষ নিজ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

তারপর ইয়াহুদীদেরকে লক্ষ্য করে আয়াতের এক দীর্ঘ সিলসিলা এগিয়ে চলেছে। সেকালে মদীনার আশেপাশে বিপুল সংখ্যক ইয়াহুদী বসবাস করত। তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা যেসব নেয়ামত বর্ষণ করেছেন এবং তার বিপরীতে তারা যে অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

প্রথম পারার শেষ দিকে রয়েছে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আলোচনা। তাকে কেবল ইয়াহুদী ও নাসারাই নয়, বরং আরব পৌত্তলিকরাও নিজেদের নেতা ও আদর্শ মনে করত। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তিনি খালেস তাওহীদের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি কস্মিনকালেও কোনও রকমের শিরককে মেনে নেননি। এ প্রসঙ্গে বায়তুল্লাহর নির্মাণ ও তাকে কিবলা বানানোর বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। দ্বিতীয় পারার শুরুতে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধানাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর মুসলিমের ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক জীবন সম্পর্কিত বহু হুকুম-আহকাম তুলে ধরা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ইবাদত থেকে নিয়ে সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী সম্পর্কিত বহু মাসাইল।

২–সূরা বাকারা, মাদানী–৮৭

(এ সূরাটি মাদানী। এতে ২৮৬টি আয়াত ও ৪০টি রুকূ' আছে)

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٢٨٦ رُكُوْعَاتُهَا ٤٠

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-মীম[১]।

الٓمّٓ ۚ ﴿١﴾

২. এটি এমন কিতাব, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।[২] এটা হিদায়াত এমন ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্য[৩]–

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾

৩. যারা অদৃশ্য জিনিসসমূহে ঈমান রাখে[৪] এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা-কিছু দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহর সন্তোষজনক কাজে) ব্যয় করে।

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾

৪. এবং যারা ঈমান রাখে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে[৫] তাতেও এবং তারা আখিরাতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে।[৬]

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾

---

১. বিভিন্ন সূরার শুরুতে এ রকমের হরফ এভাবেই পৃথক-পৃথকরূপে নাযিল হয়েছিল। এগুলোকে আল-হুরূফুল মুকাত্তা'আত (বিচ্ছিন্ন হরফসমূহ) বলে। এগুলোর অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে সঠিক কথা এই যে, তা আল্লাহ তাআলা ছাড়া কারও জানা নেই। এটা আল্লাহ তাআলার কিতাবের এক নিগূঢ় রহস্য। এ নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা এর অর্থ বোঝার উপর আকীদা ও আমলের কোন মাসআলা নির্ভরশীল নয়।

২. অর্থাৎ এ কিতাবের প্রতিটি কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। মানব-রচিত কোন গ্রন্থকে শত ভাগ সন্দেহমুক্ত বলে বিশ্বাস করা যায় না। কেননা মানুষ যত বড় জ্ঞানীই হোক তার জ্ঞানের একটা সীমা আছে। তাছাড়া তার রচনার ভিত্তি হয় তার ব্যক্তিগত ধারণা-ভাবনার উপর। কিন্তু এ কুরআন যেহেতু আল্লাহ তাআলার কিতাব, যার জ্ঞান সীমাহীন এবং শত ভাগ সন্দেহাতীত, তাই এতে কোনও রকম সংশয়-সন্দেহের অবকাশ নেই। যদি কারও মনে সন্দেহ দেখা দেয়, তবে তা তার বুঝের কমতির কারণেই দেখা দেবে, না হয় এ কিতাবের কোন বিষয় সন্দেহপূর্ণ নয় আদৌ।

৩. যদিও কুরআন মাজীদ মুমিন-কাফির নির্বিশেষে সকলকেই সঠিক পথ দেখায় এবং এ হিসেবে কুরআনের হিদায়াত সকলের জন্যই অবারিত, কিন্তু ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় কুরআনী হিদায়াতের উপকার কেবল তারাই ভোগ করতে পারে, যারা এর প্রতি বিশ্বাস রেখে

এর সমস্ত বিধি-বিধান ও শিক্ষামালার অনুসরণ করে। এ কারণেই বলা হয়েছে, 'এটা হিদায়াত এমন ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্য, যারা অদৃষ্ট জিনিসসমূহে ঈমান আনে....'।

ভীতি অবলম্বনের অর্থ হল অন্তরে সর্বদা এই চেতনা জাগ্রত রাখা যে, একদিন আল্লাহ তাআলার দরবারে আমাকে আমার সমস্ত কর্মের জবাবদিহী করতে হবে। কাজেই আমার এমন কোন কাজ করা উচিত হবে না, যা তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ হবে। এই ভয় ও চেতনার নামই তাকওয়া।

অদৃশ্য ও নাদেখা জিনিসসমূহের জন্য কুরআন মাজীদ 'গায়ব' শব্দ ব্যবহার করেছে। এর দ্বারা এমন সব বিষয় বোঝানো উদ্দেশ্য, যা চোখে দেখা যায় না, হাতে ছোঁয়া যায় না এবং নাক দ্বারা শুঁকেও উপলব্ধি করা যায় না; বরং তা কেবলই আল্লাহ তাআলার ওহীর মাধ্যমে জানা সম্ভব। অর্থাৎ হয়ত কুরআন মাজীদের ভেতর তার উল্লেখ থাকবে অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহী মারফত জেনে আমাদেরকে তা অবহিত করবেন। যেমন আল্লাহ তাআলার গুণাবলী। জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থাদি, ফিরিশতা প্রভৃতি।

এ স্থলে আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীসমূহের প্রতি মনে-প্রাণে বিশ্বাস রেখে সেই সকল জিনিসকে সত্য বলে স্বীকার করে, যা তারা দেখেনি।

এ দুনিয়া মূলত পরীক্ষার স্থান। সেই অদৃশ্য বিষয়াবলী যদি চোখে দেখা যেত, তারপর কেউ তাতে বিশ্বাস করত, তবে তা কোন পরীক্ষা হত না। আল্লাহ তাআলা সেসব জিনিসকে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রেখেছেন, কিন্তু বাস্তবে যে তার অস্তিত্ব আছে, তার সম্পর্কে অসংখ্য দলীল-প্রমাণ সামনে রেখে দিয়েছেন। যে-কেউ ইনসাফের সাথে তাতে চিন্তা করবে, সে গায়বী বিষয়াবলীর প্রতি সহজেই ঈমান আনতে পারবে, ফলে পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হবে। কুরআন মাজীদও সেসব প্রমাণ পেশ করেছে, যা ইনশাআল্লাহ একের পর এক আসতে থাকবে। প্রয়োজন কেবল কুরআন মাজীদকে সত্য-সন্ধানের প্রেরণায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পড়া এবং অন্তরে এই চিন্তা রাখা যে, এটা হেলাফেলা করার মত কোন বিষয় নয়। এটা মানুষের স্থায়ী জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতার বিষয়। কাজেই অন্তরে এই ভয় জাগ্রত রাখা চাই যে, পাছে আমার কুপ্রবৃত্তি ও মনের খেয়াল-খুশী কুরআন মাজীদের দলীল-প্রমাণ যথাযথভাবে বোঝার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমাকে কুরআন প্রদত্ত হিদায়াত ও পথ-নির্দেশকে সত্য-সন্ধানের প্রেরণা নিয়ে পড়তে হবে এবং আগে থেকে অন্তরে যে-সব চিন্তা-চেতনা শিকড় গেড়ে আছে তা থেকে অন্তরকে মুক্ত করে পড়তে হবে, যাতে সত্যিকারের হিদায়াত আমি লাভ করতে পারি। 'কুরআন যে ভীতি-অবলম্বনকারীদের জন্য হিদায়াত' তার এক অর্থ এটাও।

৪. যে সকল লোক কুরআন মাজীদের হিদায়াত ও পথ-নির্দেশ দ্বারা উপকৃত হয়, এ স্থলে তাদের গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম গুণ তো এই যে, তারা গায়ব তথা অদৃশ্য বিষয়াবলীর উপর ঈমান রাখে, যার ব্যাখ্যা উপরে দেওয়া হয়েছে। ঈমান সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। এর সারমর্ম হল– আল্লাহ তাআলা যা-কিছু কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেছেন কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে ইরশাদ করেছেন সে সবের প্রতি তারা ঈমান ও বিশ্বাস রাখে। দ্বিতীয় জিনিস বলা হয়েছে তারা সালাত কায়েম করে। কায়িক ইবাদতের মধ্যে এটা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় বিষয় হল নিজের অর্থ-সম্পদ থেকে আল্লাহ তাআলার পথে ব্যয় করা। যাকাত-সদকা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এটা আর্থিক ইবাদত।

৫. এরাই এমন লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সঠিক পথের উপর আছে এবং এরাই এমন লোক, যারা সফলতা লাভকারী।

أُولَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑤

৬. নিশ্চয়ই যে সকল লোক কুফর অবলম্বন করেছে,[৭] তাদেরকে আপনি ভয় দেখান বা নাই দেখান[৮] উভয়টাই তাদের পক্ষে সমান। তারা ঈমান আনবে না।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑥

---

৫. অর্থাৎ তারা বিশ্বাস রাখে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে সত্য এবং তাঁর পূর্ববর্তী আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম- হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) প্রমূখের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তাও সত্য ছিল, যদিও পরবর্তীকালের লোকে তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেনি, বরং তাতে নানা রকম রদ-বদল ও বিকৃতি সাধন করেছে।

এ আয়াতে সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওহী নাযিলের ক্রমধারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে শেষ হয়ে গেছে। তাঁর পর এমন কোনও ব্যক্তির জন্ম হবে না, যার প্রতি ওহী নাযিল হবে কিংবা যাকে নবী বানানো হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা এ স্থলে কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিলকৃত ওহী এবং তাঁর পূর্ববর্তী আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের প্রতি অবতীর্ণ ওহীর কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর পরের কোনও ওহীর কথা উল্লেখ করেননি। যদি তাঁর পরেও কোনও নতুন নবী আসার সম্ভাবনা থাকত, যার ওহীর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যিক, তবে এ স্থলে তার কথাও উল্লেখ করা হত, যেমন পূর্ববর্তী নবীগণের থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল যে, আপনাদের পর যে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমন হবে, আপনাদের কিন্তু তাঁর প্রতিও ঈমান আনতে হবে। (আলে-ইমরান : ৮১ আয়াত)

৬. 'আখিরাত' বলতে সেই জীবনকে বোঝানো হয়েছে, যা মৃত্যুর পর আসবে, যা স্থায়ী হবে, যখন প্রত্যেক বান্দাকে তার দুনিয়ার জীবনে কৃত যাবতীয় কর্মের হিসাব দিতে হবে এবং তার ভিত্তিতেই সে জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে, তার ফায়সালা হবে।

প্রথমে যে সকল অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে, আখিরাত যদিও তার অন্তর্ভুক্ত, তথাপি পরিশেষে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পৃথকভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত এর কারণ এই যে, প্রত্কপক্ষে আখিরাতের বিশ্বাসই মানুষের চিন্তা-চেতনা ও কর্মজীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, একদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে প্রতিটি কর্মের হিসাব দিতে হবে, সে কখনও আগ্রহের সাথে কোন গুনাহের কাজে প্রস্তুত হতে পারে না।

৭. একদল কাফের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছিল যে, যত স্পষ্ট দলীল ও উজ্জ্বল নিদর্শনই তাদের সামনে উপস্থিত করা হোক, তারা কখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতে

৭. আল্লাহ তাদের অন্তরে ও তাদের কানে মোহর[৯] করে দিয়েছেন আর তাদের চোখের উপর পর্দা পড়ে আছে এবং তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি।

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ؕ وَعَلٰۤى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ٘ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ۟۷

[২]

৮. কিছু লোক এমন আছে, যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান এনেছি, অথচ (প্রকৃতপক্ষে) তারা মুমিন নয়।[১০]

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِیْنَ ۘ۸

৯. তারা আল্লাহকে এবং যারা (বাস্তবিক) ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দেয় এবং (সত্য কথা এই যে,) তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না। কিন্তু এ বিষয়ের কোন উপলব্ধি তাদের নেই।[১১]

یُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا یَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا یَشْعُرُوْنَ ؕ۹

ঈমান আনবে না। এখানে সেই কাফেরদের কথাই বলা হচ্ছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এরা হচ্ছে সেই সব লোক, যারা কুফরের উপর গোঁ ধরে বসে আছে। সেই ভাব ব্যক্ত করার লক্ষ্যেই তরজমায় 'কুফর অবলম্বন করেছে' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

৮. انذار -এর অর্থ করা হয়েছে 'ভয় দেখানো'। কুরআন মাজীদে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের দাওয়াতকে প্রায়শ 'ভীতি প্রদর্শন' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা নবীগণ মানুষকে কুফর ও দুষ্কর্মের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে ভয় দেখাতেন। সুতরাং আয়াতের মর্ম দাঁড়ায় এই যে, আপনি তাদেরকে দাওয়াত দেন বা নাই দেন, তাদের সামনে দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী পেশ করুন বা নাই করুন, তারা যেহেতু কোন কথাই মানবে না বলে স্থির করে নিয়েছে, তাই তারা ঈমান আনবে না।

৯. এ আয়াতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে জিদ ও হঠকারিতা অত্যন্ত বিপজ্জনক জিনিস। কোন ব্যক্তি যদি ভুলে, অসাবধানতায় বা এ রকম কোনও কারণে কোনও গলত কাজ করে, তবে তার সংশোধনের আশা থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি কোন ভুল কাজে জিদ ধরে এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যে, কোনও অবস্থাতেই সে তা ছাড়বে না ও সঠিকটা গ্রহণ করবে না, তবে তার সে জিদের পরিণতিতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার অন্তরে মোহর করে দেওয়া হয়। ফলে তার সত্য কবুলের যোগ্যতাই খতম হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ অবস্থা থেকে রক্ষা করুন। এই ধারণা করার কোন সুযোগ নেই যে, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং যখন তার অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন তখন তো সে মাযূর ও অপারগ। কেননা এ মোহর করাটা স্বয়ং তার জিদেরই পরিণতি এবং সত্য না মানার যে সিদ্ধান্ত সে করে নিয়েছে তারই ফল।

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ۬ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿١٠﴾

১০. তাদের অন্তরে আছে রোগ। আল্লাহ তাদের রোগ আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।[১২] আর তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে, যেহেতু তারা মিথ্যা বলত।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ ۙ قَالُوْۤا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴿١١﴾

১১. যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা বিস্তার করো না, তারা বলে, আমরা তো শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী।

اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٢﴾

১২. মনে রেখ এরাই বিশৃঙ্খলা বিস্তারকারী, কিন্তু এর উপলব্ধি তাদের নেই।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَاۤ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ كَمَاۤ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩. যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরাও সেই রকম ঈমান আন, যেমন অন্য লোকে ঈমান এনেছে, তখন তারা বলে, আমরাও কি সেই রকম ঈমান আনব, যে রকম ঈমান এনেছে নির্বোধ লোকেরা? ভালভাবে শুনে রাখ, এরাই নির্বোধ, কিন্তু তারা এটা জানে না।

---

১০. সূরার শুরুতে মুমিনদের গুণাবলী ও তাদের শুভ পরিণামের কথা বর্ণিত হয়েছে। তারপর যারা প্রকাশ্য কাফের তাদের সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এবার এখান থেকে তৃতীয় একটি শ্রেণীর অবস্থা তুলে ধরা হচ্ছে, যাদেরকে 'মুনাফিক' বলা হয়। এরা প্রকাশ্যে তো নিজেদেরকে 'মুসলিম' বলে দাবী করত, কিন্তু আন্তরিকভাবে তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি।

১১. অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তারা আল্লাহ ও মুসলিমদেরকে ধোঁকা দিতে চায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরা নিজেদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে। কেননা এ ধোঁকার পরিণাম তাদের নিজেদের পক্ষেই অশুভ হবে। তারা মনে করছে নিজেদেরকে মুসলিমরূপে পরিচয় দিয়ে তারা কুফরের পার্থিব পরিণতি থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে, অথচ আখিরাতে তাদের যে আযাব হবে তা দুনিয়ার আযাব অপেক্ষা কঠিনতর।

১২. পূর্বে ৭নং আয়াতে যা বলা হয়েছিল, এটাও সে রকমেরই কথা। অর্থাৎ প্রথম দিকে এ পথভ্রষ্টতাকে তারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নিয়েছিল এবং তাতে স্থিরসংকল্প হয়ে গিয়েছিল। এটা ছিল তাদের অন্তরের একটা ব্যাধি। অত:পর তাদের জেদের পরিণামে আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাধি আরও বৃদ্ধি করে দেন। এখন আর বাস্তবিকভাবে তাদের ঈমান আনার তাওফীক হবে না।

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ⑭

১৪. যারা ঈমান এনেছে, তাদের সাথে যখন এরা মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি আর যখন নিজেদের শয়তানদের[১৩] সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তোমাদেরই সঙ্গে আছি। আমরা তো কেবল তামাশা করছিলাম।

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑮

১৫. আল্লাহ তাদের সাথে তামাশা (-এর আচরণ) করেন এবং তাদেরকে ঢিল দেন, যাতে তারা তাদের অবাধ্যতায় ঘুরপাক খেতে থাকে।[১৪]

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ⑯

১৬. এরাই তারা যারা হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী ক্রয় করেছে। ফলে তাদের ব্যবসায়ে লাভ হয়নি এবং তারা সঠিক পথও পায়নি।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ⑰

১৭. তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে আগুন জ্বালালো,[১৫] তারপর যখন সেই আগুন তার আশপাশ আলোকিত করে তুলল, তখন আল্লাহ তাদের আলো কেড়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারের মধ্যে এ অবস্থায় ছেড়ে দিলেন যে, তারা কিছুই দেখতে পায় না।

---

১৩. 'নিজেদের শয়তান' দ্বারা সেই সকল নেতৃবর্গকে বোঝানো হয়েছে, যারা মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে তাদের প্রধান ও পথপ্রদর্শক হিসেবে ভূমিকা রাখত।

১৪. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদের রশি ঢিল করে দিয়েছেন, যদ্দরুণ দুনিয়ায় তারা তাদের ফেরেববাজীর কারণে তাৎক্ষণিক শাস্তির সম্মুখীন হচ্ছে না। কিন্তু তারা মনে করছে তাদের কৌশল সফল হয়েছে। ফলে নিজেদের গোমরাহীতে তারা দিন-দিন পাকাপোক্ত হচ্ছে। আসলে তাদেরকে এভাবে পাকাপোক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। ধরা হবে তাদেরকে একবারেই এবং সেটা আখিরাতে। আল্লাহ তাআলার এ কর্মনীতি যেহেতু তাদের তামাশারই পরিণাম, তাই বিষয়টিকে 'আল্লাহ তাদের সাথে তামাশা করেন' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

১৫. এখান থেকে মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছে। ইসলামের সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ সামনে আসা সত্ত্বেও মুনাফিকগণ নিফাক ও কপটতার গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল। আয়াতে ইসলামের সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণকে আগুনের আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আগুনের

১৮ তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না।

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یَرْجِعُوْنَ ﴿۱۸﴾

১৯. অথবা (ওই মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত এ রকম)[১৬] যেমন আকাশ থেকে বর্ষ্যমান বৃষ্টি, যার মধ্যে আছে অন্ধকার, বজ্র ও বিজলী। তারা বজ্রধ্বনির কারণে মৃত্যু-ভয়ে নিজেদের কানে আঙ্গুল দেয় এবং আল্লাহ তাআলা কাফিরদেরকে ঘেরাও করে রেখেছেন।[১৭]

اَوْ كَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِیْهِ ظُلُمٰتٌ وَّ رَعْدٌ وَّ بَرْقٌ ۚ یَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِیْۤ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ وَ اللّٰهُ مُحِیْطٌۢ بِالْكٰفِرِیْنَ ﴿۱۹﴾

২০. মনে হয় যেন বিজলী তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেবে। যখনই বিজলী তাদের সামনে আলো দান করে তারা তাতে (সেই আলোতে) চলতে শুরু করে

یَكَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَاۤ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِیْهِ ۙ وَ اِذَاۤ اَظْلَمَ عَلَیْهِمْ قَامُوْا ؕ

আলোতে যেমন আশপাশের সবকিছু পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, তেমনি ইসলামের দলীল-প্রমাণ দ্বারা তাদের সামনে সত্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তথাপি তারা জিদ ও একগুঁয়েমী করে যেতে থাকে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে সে আলো কেড়ে নেন, যদ্দরুণ তারা দেখার শক্তি হারিয়ে ফেলে।

১৬. প্রথম দৃষ্টান্তটি ছিল সেই সকল মুনাফিকের যারা ইসলামের সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ সামনে আসা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বুঝে শুনেই কুফর ও নিফাকের পথ অবলম্বন করেছিল। এবার মুনাফিকদের আরেক শ্রেণীর দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছে। এরা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে দোদুল্যমানতার শিকার ছিল। যখন ইসলামের সত্যতার দলীল-প্রমাণ সামনে আসত তখন তাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হত এবং তখন তারা ইসলামের দিকে অগ্রসর হত। কিন্তু যখন ইসলামী আহকামের দায়িত্ব-কর্তব্য ও হালাল-হারামের বিষয়সমূহ সামনে আসত, তখন নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থের কারণে তারা থেমে যেত। এখানে ইসলামকে এক বর্ষ্যমান বৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর কুফর ও শিরকের অনিষ্ট ও মন্দত্বের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাকে অন্ধকারের সাথে এবং কুফর ও শিরকের কারণে যে শাস্তির ধমক দেওয়া হয়েছে, তাকে বজ্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাছাড়া কুরআন মাজীদে সত্যের যে দলীল-প্রমাণ এবং সত্যের অনুসারীদের জন্য জান্নাতের নিয়ামতরাজির যে সুসংবাদ শোনানো হয়েছে তাকে বিজলীর আলোর সাথে উপমিত করা হয়েছে। যখন এ আলো তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তখন তারা হাঁটা শুরু করে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যখন কু-প্রবৃত্তির অন্ধকার তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

১৭. অর্থাৎ কুরআন মাজীদ যখন কুফর ও পাপাচারের কারণে যে শাস্তি দেওয়া হবে সে সম্পর্কে সতর্কবাণী শোনায়, তখন তারা কান বন্ধ করে ফেলে এবং মনে করে তারা শাস্তি থেকে বেঁচে গেল। অথচ আল্লাহ তাআলা সমস্ত কাফিরকে বেষ্টন করে আছেন। তারা তাঁর থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

আবার যখন তা তাদের উপর অন্ধকার বিস্তার করে, তারা দাঁড়িয়ে যায়। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তি রাখেন।

[৩]

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

২১. হে মানুষ! তোমরা নিজেদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে, যাতে তোমরা মুত্তাকী হয়ে যাও।

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۪ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

২২. (সেই প্রতিপালকের) যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা বানিয়েছেন এবং আকাশকে ছাদ। আর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। তারপর তার মাধ্যমে তোমাদের জীবিকারূপে ফল- ফলাদি উদ্‌গত করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন শরীক স্থির করো না- যখন তোমরা (এসব বিষয়) জান।[১৮]

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۪ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ

২৩. তোমরা যদি এই কুরআন সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহে থাক, যা আমি আমার বান্দা (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

১৮. ইসলামের সর্বাপেক্ষা বুনিয়াদী আকীদা হল তাওহীদ। এ আয়াতে তারই দাওয়াত দেয়া হয়েছে এবং সংক্ষিপ্তরূপে তার প্রমাণও উপস্থিত করা হয়েছে। আরবগণ স্বীকার করত নিখিল বিশ্বের অস্তিত্ব দান করা, আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করা, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করা এবং তা দ্বারা ফল ও ফসল উৎপন্ন করা- এসব আল্লাহ তাআলারই কাজ। এতদসত্ত্বেও তাদের বিশ্বাস ছিল আল্লাহ তাআলা বহু কাজের দায়-দায়িত্ব দেব-দেবীর উপর ন্যস্ত করেছেন। সেমতে দেব-দেবীগণ নিজ-নিজ কাজে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা রাখে। কাজেই দেব-দেবীগণ তাদের সাহায্য করবে এই আশায় তারা তাদের পূজা-অর্চনা করত। আল্লাহ তাআলা বলছেন, যখন সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আমিই এবং বিশ্ব জগতের পরিচালনায় যখন আমার কারও থেকে কোনও রকমের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন নেই, তখন অন্য কারও উপাসনা করা কত বড়ই না অবিচার!

مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾

সাল্লাম)-এর প্রতি নাযিল করেছি, তবে তোমরা এর মত কোনও একটা সূরা বানিয়ে আন। আর সত্যবাদী হলে তোমরা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের সাহায্যকারীদের ডেকে নাও।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. তারপরও যদি তোমরা এ কাজ করতে না পার আর এটা তো নিশ্চিত যে, তোমরা তা কখনও করতে পারবে না, তবে ভয় কর সেই আগুনকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।[১৯]

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ

২৫. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য এমন সব বাগান (প্রস্তুত) রয়েছে, যার নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে।[২০] যখনই তাদেরকে তা থেকে রিয্ক হিসেবে কোন ফল দেওয়া হবে, তারা বলবে,

---

১৯. পূর্বের আয়াতে তাওহীদের বর্ণনা ছিল। ইসলামের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আকীদা হল রিসালাত। এবার তার বর্ণনা। এ প্রসঙ্গে আরবের সেই সকল লোকের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে, যারা কুরআনের প্রতি ঈমান না এনে বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অপবাদ দিত যে, তিনি একজন কবি এবং তিনি নিজেই এ কুরআন রচনা করেছেন। তাদেরকে বলা হচ্ছে, এ কুরআনের মত কোন বাণী যদি মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব হয়, তবে তোমরা যারা অনেক বড় কবি-সাহিত্যিক, সকলে মিলে কুরআনের যে-কোনও একটা সূরার মত একটা সূরা তৈরি করে আন। সাথে সাথে কুরআন এই দাবীও করেছে যে, তোমরা সকলে মিলেও এরূপ করতে পারবে না। আর বাস্তবতা এটাই যে, নিজেদের ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে যে আরবদের গর্ব ছিল, এই চ্যালেঞ্জের পর তারা সকলেই পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তাদের একজনও এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অগ্রসর হয়নি। বড় বড় কবি-সাহিত্যিক এই ঐশী বাণীর সম্মুখে নতজানু হয়ে বসে পড়ে। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত ও কুরআন মাজীদের সত্যতা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

২০. এটা ইসলামের তৃতীয় আকীদা অর্থাৎ আখিরাতের প্রতি ঈমানের বর্ণনা। এতে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর আরেকটি জীবন অবশ্যম্ভাবী। তখন প্রত্যেককে নিজ কর্মের হিসাব দিতে হবে। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সৎকর্ম করবে সে জান্নাতের অধিকারী হবে। সেখানে কী নিয়ামত লাভ হবে, তার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র এ আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে।

رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۙ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

এটা তো সেটাই, যা আমাদেরকে আগেও দেওয়া হয়েছিল। তাদেরকে এমন রিয্কই দেওয়া হবে, যা দেখতে একই রকমের হবে।[২১] তাদের জন্য সেখানে থাকবে পুত:পবিত্র স্ত্রী এবং তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

২৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ (কোনও বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য) কোনও রকমের উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না, তা মশা (এর মত তুচ্ছ জিনিস) হোক বা তারও উপরে (অধিকতর তুচ্ছ) হোক।[২২] তবে যারা মুমিন তারা জানে এ উদাহরণ সত্য, যা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত। কিন্তু যারা কাফির তারা বলে, এই (তুচ্ছ) উদাহরণ দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য কী? (এভাবে) আল্লাহ এ উদাহরণ দ্বারা বহু মানুষকে গোমরাহীতে

---

২১. এর এক অর্থ হতে পারে যে, জান্নাতেই তাদেরকে একটু পর পর এমন ফল খেতে দেওয়া হবে, যা দেখতে হুবহু একই রকমের হবে, কিন্তু স্বাদে প্রতিটি ফল হবে নতুন ও আলাদা। দ্বিতীয় এই অর্থেরও অবকাশ আছে যে, জান্নাতের ফল দেখতে দুনিয়ার ফল-সদৃশই হবে। তাই জান্নাতবাসী তা দেখে বলবে, এটা তো সেই ফলই যা পূর্বে দুনিয়ার জীবনে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল,. কিন্তু জান্নাতে তার স্বাদ ও বৈশিষ্ট্য দুনিয়ার ফল থেকে অনেক বেশি হবে। যার মধ্যে তুলনা চলে না।

২২. কোনও কোনও কাফির কুরআন মাজীদের উপর প্রশ্ন তুলেছিল, এতে মশা, মাছি, মাকড়সা ইত্যাদি দ্বারা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে কেন? এটা যদি সত্যিই আল্লাহর কালাম হত, তবে এতে এমন তুচ্ছ জিনিসের উল্লেখ থাকত না। বলাবাহুল্য এটা এক অবান্তর প্রশ্ন। কেননা উদাহরণ সর্বদা বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রেখেই দেওয়া হয়। কোন ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ জিনিসের উদাহরণ দিতে হলে এমন কোন জিনিস দ্বারাই দিতে হবে যা ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হয়। এ রকম করা হলে তা কথা ও বক্তব্যের ত্রুটি নয়; বরং তার বৈদগ্ধ ও অলংকারপূর্ণতারই দলীল হয়। অবশ্য এটা তো কেবল তাদেরই বুঝে আসার কথা, যারা সত্যের সন্ধানী এবং সত্যের প্রতি বিশ্বাসী। যারা কুফরকেই ধরে রাখবে বলে কসম করে নিয়েছে, তাদের তো সর্বদা সব রকম কথাতেই আপত্তি দেখা দেবে। এ কারণেই তারা এ জাতীয় অবান্তর কথাবার্তা বলে থাকে।

লিপ্ত করেন এবং বহুজনকে হিদায়াত দান করেন। তিনি গোমরাহ করেন কেবল তাদেরকেই যারা নাফরমান।[২৩]

২৭. সেই সকল লোক, যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতিকে পরিপক্ক করার পরও ভেঙ্গে ফেলে[২৪] এবং আল্লাহ যেই সম্পর্ককে যুক্ত রাখতে আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে।[২৫] বস্তুত এমন সব লোকই অতি ক্ষতিগ্রস্ত।

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۪ وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۲۷﴾

---

২৩. অর্থাৎ কুরআন মাজীদের যে সকল আয়াত সত্যের সন্ধানীকে হিদায়াত দান করে, সেগুলোই এমন সব লোকের জন্য অতিরিক্ত গোমরাহীর 'কারণ' হয়ে যায়, যারা জিদ ও হঠকারিতাবশত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যে, কখনও সত্য কথা মানবে না। কেননা তারা প্রত্যেক নতুন আয়াতকে অস্বীকার করে এবং প্রত্যেক আয়াতের অস্বীকৃতিই একটি স্বতন্ত্র গোমরাহী।

২৪. অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এ প্রতিশ্রুতি দ্বারা 'আলাস্তু'-এর প্রতিশ্রুতি বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ 'আমি কি তোমাদের রব্ব নই'– প্রতিশ্রুতি, যা সূরা আরাফে বর্ণিত হয়েছে (৭ : ১৭২)। সেখানেই এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এখানে এতটুকু বুঝে নেওয়াই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করার বহু আগে সমস্ত রূহকে একত্র করেন। তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তখন সকলেই আল্লাহ তাআলার প্রতিপালকত্বের কথা স্বীকার করে নিয়ে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তারা তাঁর আনুগত্য করবে। এ আয়াতে যে প্রতিশ্রুতিকে পরিপক্ক করার কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ এই যে, প্রতি যুগে আল্লাহ তাআলার রাসূলগণ আসতে থাকেন এবং তারা মানুষকে সেই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাআলাই যে সকলের স্রষ্টা ও মালিক তার অনুকূলে দলীল-প্রমাণ প্রদর্শন করতে থাকেন।

এই প্রতিশ্রুতির আরও একটি ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তা এই যে, এর দ্বারা সেই কর্মগত ও নীরব প্রতিশ্রুতি (Iacit Covenant) বোঝানো হয়েছে, যা প্রতিটি মানুষ তার জন্ম মাত্রই নিজ প্রতিপালকের সঙ্গে করে থাকে। এর উদাহরণ হল– যে ব্যক্তি যেই দেশে জন্মগ্রহণ করে, সে সেই দেশের নাগরিক হওয়ার সুবাদে এই নীরব প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে যে, সে সে দেশের সকল আইন মেনে চলবে। সে মুখে কিছু না বললেও কোনও দেশে তার জন্মগ্রহণ করাটাই এ প্রতিশ্রুতির স্থলাভিষিক্ত। এভাবেই যে ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে সে আপনা আপনিই তার প্রতিপালকের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে যায় যে, সে তার হিদায়াত অনুসারে জীবন যাপন করবে। এ প্রতিশ্রুতির জন্য মুখে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। খুব সম্ভব এ কারণেই এর পর পরই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, তোমরা কি করেই যা আল্লাহ তাআলার সাথে কুফরী কর্মপন্থা অবলম্বন কর, অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ, তারপর

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. তোমরা আল্লাহর সাথে কুফরী কর্মপন্থা কিভাবে অবলম্বন কর, অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ অত:পর তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। অত:পর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, অত:পর তিনি (পুনরায়) তোমাদেরকে জীবিত করবেন, তারপর তোমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাবে।

তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন'? অর্থাৎ যদি সামান্য একটু চিন্তা কর, তবে 'কেউ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন', এই এতটুকু বিষয়ই তোমাদের পক্ষ হতে একটা প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রাখে এবং এর ফলে তাঁর নিয়ামতের স্বীকারোক্তি প্রদান এবং তাঁর প্রদত্ত পথ অবলম্বন তোমাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়। অন্যথায় এটা কেমন বুদ্ধিমত্তা ও কেমন বিচার-বিবেচনার কাজ যে, সৃষ্টি তো করলেন আল্লাহ তাআলা আর আনুগত্য করা হবে অন্য কারও?

এই নীরব অঙ্গীকারকে 'পাকাপোক্ত করা'র দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে তোমাদেরকে অবিরত এই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকেন। নবীগণ তোমাদের সামনে এমন মজবুত দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন, যা দ্বারা এ প্রতিশ্রুতি আরও পাকাপোক্ত হয়ে গেছে যে, সকল ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করাই মানুষের কর্তব্য।

২৫. এর দ্বারা আত্মীয়-স্বজনের অধিকার খর্ব করাকে বোঝানো হয়েছে। এখানে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের তিনটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। (এক) তারা আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। (দুই) তারা আত্মীয়বর্গের অধিকার পদপিষ্ট করে এবং (তিন) তারা পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে। এর মধ্যে প্রথমটির সম্পর্ক হক্কুল্লাহ (আল্লাহর হক)-এর সাথে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে 'আকীদা-বিশ্বাস যে রকম রাখা উচিত সে রকম রাখে না এবং তাঁর যে ইবাদত-বন্দেগী তাদের উপর ফরয ছিল তা সম্পাদন করে না। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির সম্পর্ক হক্কুল ইবাদ তথা মানুষের অধিকারের সাথে। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন রকমের সম্পর্ক ও আত্মীয়তার জন্য যে হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা যথাযথভাবে আদায় করার মাধ্যমেই একটি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে উঠতে পারে। যদি সে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই ও স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের অধিকার পদদলিত করতে শুরু করে তবে যেই পারিবারিক ব্যবস্থার উপর একটি সুষ্ঠু-সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হয়, তা ধ্বংস হতে বাধ্য। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল ভূ-পৃষ্ঠে ব্যাপক ফিতনা-ফাসাদের বিস্তার। এ কারণেই কুরআন মাজীদের অন্য এক আয়াতে আত্মীয়তা ছিন্ন করা ও পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করাকে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। (সূরা মুহাম্মাদ : ২২)

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۚ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۹﴾

২৯. তিনিই সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।[২৬] তারপর তিনি আকাশের প্রতি লক্ষ্য করেন এবং তাকে সাত আকাশরূপে সুষ্ঠুভাবে নির্মাণ করেন। আর তিনি প্রত্যেক জিনিসের পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

[৪]

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

৩০. এবং (সেই সময়ের আলোচনা শোন) যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতা-দেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে এক খলীফা[২৭] বানাতে চাই। তারা বলতে লাগলেন, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে সেখানে অশান্তি বিস্তার করবে ও খুন-খারাবী করবে, অথচ আমরা আপনার তাসবীহ, হামদ ও পবিত্রতা ঘোষণায় নিয়োজিত[২৮] আছি? আল্লাহ বললেন, আমি এমন সব বিষয় জানি, যা তোমরা জান না।

---

২৬. এখানে এ বিষয়ের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, সে জগতের যা-কিছু দ্বারা উপকার লাভ করে তা সবই আল্লাহ তাআলার দান। এর প্রত্যেকটি জিনিস আল্লাহ তাআলার তাওহীদ ও একত্বের সাক্ষ্য দেয়। এতদসত্ত্বেও তাঁর সাথে কুফরী কর্মপন্থা অবলম্বন করা কত বড়ই না অকৃতজ্ঞতা! এ আয়াত থেকে ফুকাহায়ে কিরাম মূলনীতি আহরণ করেছেন যে, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু মৌলিকভাবে হালাল। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বস্তুর হারাম হওয়ার পক্ষে কোন দলীল পাওয়া না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে হালাল মনে করা হবে।

২৭. বিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলার ইবাদত অবশ্য কর্তব্য হওয়ার পক্ষে দলীল দেওয়া হয়েছিল। সে দলীল ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সাদামাটা, অথচ বড় শক্তিশালী। বলা হয়েছিল, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত। আটাশ নং আয়াতে এরই ভিত্তিতে কাফিরদের কুফরের কারণে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছিল। এবার মানব সৃষ্টির পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করত সে দলীলকে অধিকতর পরিপক্ক করা হচ্ছে। আয়াতে খলীফা দ্বারা মানুষকে বোঝানো হয়েছে। তাকে খলীফা বলার অর্থ সে পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকাম নিজেও পালন করবে এবং নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী অন্যদের দ্বারাও তা পালন করানোর চেষ্টা করবে।

৩১. এবং (আল্লাহ্) আদমকে সমস্ত নাম[২৯] শিক্ষা দিলেন। তারপর তাদেরকে ফিরিশতাদের সামনে পেশ করলেন এবং (তাদেরকে) বললেন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাকে এসব জিনিসের নাম জানাও।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۳۱﴾

৩২. তারা বললেন, আপনার সত্তাই পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যতটুকু জ্ঞান দিয়েছেন, তার বাইরে আমরা কিছুই জানি না।[৩০] প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মালিক তো কেবল আপনিই।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ﴿۳۲﴾

---

২৮. ফিরিশতাদের এ প্রশ্ন মূলত আপত্তি জানানোর উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং তারা এ কারণে তাজ্জব প্রকাশ করেছিলেন যে, যে মাখলুক পুণ্যের সাথে পাপ করারও যোগ্যতাসম্পন্ন হবে, যার পরিণামে পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তারেরও সম্ভাবনা রয়েছে, তাকে সৃষ্টি করার রহস্য কী? মুফাসসিরগণ লিখেছেন, পৃথিবীতে মানুষের আগে জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তারা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করে একে অন্যকে খতম করে দিয়েছিল। ফিরিশতাগণ চিন্তা করলেন হয়ত মানুষের পরিণতিও সে রকমই হবে।

২৯. 'নামসমূহ' দ্বারা সৃষ্টি জগতের যাবতীয় বস্তুর নাম, তাদের বৈশিষ্ট্যাবলী এবং মানুষ যে ক্ষুধা, পিপাসা, সুস্থতা, অসুস্থতা ইত্যাদি অবস্থাসমূহের সম্মুখীন হয়, তার জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। হযরত আদম আলাইহিস সালামকে এসব বিষয় শিক্ষা দানের সময় ফিরিশতাগণ উপস্থিত থাকলেও তাদের স্বভাবের ভেতর যেহেতু এসব জিনিসের বুঝ-সমঝ ছিল না, তাই তাদের থেকে যখন এর পরীক্ষা নেওয়া হল, তারা উত্তর দিতে সক্ষম হলেন না। এভাবে আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদের দ্বারা কার্যত স্বীকার করিয়ে নিলেন যে, এই নতুন সৃষ্টির দ্বারা তিনি যে কাজ নিতে চান, তা তারা আঞ্জাম দিতে সক্ষম নন।

৩০. আয়াতের শব্দাবলী দ্বারা বাহ্যত বোঝা যায় এসব নাম কেবল হযরত আদম আলাইহিস সালামকেই শেখানো হয়েছিল, এ শিক্ষায় ফিরিশতাগণ শরীক ছিলেন না। এ অবস্থায় তাদেরকে নাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এ কথার জানান দেওয়ার জন্য যে, আদমকে সৃষ্টি করার দ্বারা যা উদ্দেশ্য তোমাদের মধ্যে তার যোগ্যতাই নেই। তবে এই অবকাশও আছে যে, হযরত আদম আলাইহিস সালামকে শিক্ষা দান করার সময় ফিরিশতাগণও উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু এসব বোঝার বা স্মরণ রাখার মত যোগ্যতা যেহেতু তাদের ছিল না তাই পরীক্ষাকালে তারা উত্তর দিতে পারেননি। এ অবস্থায় তারা যা বলেছেন তার সারমর্ম এই যে, আপনি আমাদেরকে যে জ্ঞান দান করতে চান এবং যার যোগ্যতা আপনি আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন আমাদের পক্ষে কেবল তার জ্ঞান অর্জন করাই সম্ভব।

قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ۝٣٣

৩৩. আল্লাহ বললেন, হে আদম! তুমি তাদেরকে এসব জিনিসের নাম বলে দাও। সুতরাং যখন তিনি তাদেরকে সে সবের নাম বলে দিলেন, তখন আল্লাহ (ফিরিশতাদেরকে) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, আমি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রহস্য জানি? এবং তোমরা যা-কিছু প্রকাশ কর এবং যা-কিছু গোপন কর সেসব সম্পর্কে আমার জ্ঞান আছে।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ۝٣٤

৩৪. এবং (সেই সময়ের আলোচনা শোন) যখন আমি ফিরিশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর,[৩১] ফলে তারা সকলে সিজদা করল, কিন্তু ইবলীস ছাড়া। সে অস্বীকার করল[৩২] ও দর্পিত আচরণ করল এবং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

---

৩১. ফিরিশতাদের সামনে হযরত আদম আলাইহিস সালামের উচ্চ মর্যাদাকে কাজের মাধ্যমে তুলে ধরা এবং সেই সঙ্গে তাদের পরীক্ষা নেওয়ার লক্ষ্যে তাদেরকে আদেশ করা হল, আদমকে সিজদা কর। এ সিজদা ইবাদতের নয়, বরং সম্মান প্রদর্শনের জন্য ছিল। সম্মান প্রদর্শনমূলক সিজদা পূর্ববর্তী কোন কোন শরীয়তে জায়েয ছিল। পরবর্তীতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সম্মানার্থে সিজদা করাকেও কঠোরভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয়, যাতে শিরকের আভাস-মাত্র সৃষ্টি হতে না পারে। এ সিজদা করানোর দ্বারা যেন ফিরিশতাদেরকে পরোক্ষ নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল যে, সৃষ্টিজগতের যে সকল বিষয় তাদের এখতিয়ারাধীন করা হয়েছে তা যেন মানুষের জন্য নিয়োজিত করে, যাতে তারা তার সঠিক ব্যবহার করে, না বেঠিক, তা পরীক্ষা করা যায়।

৩২. সিজদার হুকুম সরাসরি যদিও ফিরিশতাদেরকে করা হয়েছিল, কিন্তু প্রাণবিশিষ্ট সকল সৃষ্টিই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাজেই ইবলীসের জন্য এটা পালন করা অপরিহার্য ছিল, যদিও সে ছিল জিন্ জাতির এক সদস্য। কিন্তু সে অহমিকা বশে আল্লাহ তাআলাকে বলতে লাগল, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দ্বারা আর আদমকে মাটি দ্বারা। তাই আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ হয়েও আমি তাকে সিজদা করব কেন? (সূরা আরাফ ৭:২২)

এ ঘটনা দ্বারা দু'টি শিক্ষা লাভ হয়। একটি এই যে, নিজেকে অন্যদের থেকে বড় মনে করা ও বড়ত্ব ফলানো অতি বড় গুনাহ। দ্বিতীয় শিক্ষা এই যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে স্পষ্ট কোন নির্দেশ এসে গেলে বান্দার কাজ হল মন-প্রাণ দিয়ে সে হুকুম পালন করে যাওয়া, সে হুকুমের উপকার ও তাৎপর্য বুঝে আসুক বা নাই আসুক।

وَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۠ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۳۵﴾

৩৫. আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে থাক এবং যেখান থেকে ইচ্ছা প্রাণ ভরে খাও। কিন্তু ওই গাছের কাছেও যেও না।[৩৩] অন্যথায় তুমি জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে।

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۠ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿۳۶﴾

৩৬. অত:পর এই হল যে, শয়তান তাদেরকে সেখান থেকে টলিয়ে দিল এবং তারা যার (যে সুখের) ভেতর ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে ছাড়ল।[৩৪] আমি (আদম, তার স্ত্রী ও ইবলিসকে) বললাম, এখন তোমরা সকলে এখান থেকে বের হয়ে যাও। তোমরা একে অন্যের শত্রু হবে। আর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে একটা কাল পর্যন্ত অবস্থান ও কিঞ্চিৎ ফায়দা ভোগ (-এর সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত) রয়েছে।[৩৫]

---

৩৩. সেটি কোন্ গাছ ছিল? কুরআন মাজীদে এটা স্পষ্ট করা হয়নি। আর এটা জানারও বিশেষ কোনও প্রয়োজন নেই। কেবল এতটুকু জেনে নেওয়াই যথেষ্ট যে, জান্নাতের বৃক্ষরাজির মধ্যে এমন একটা গাছ ছিল, যার ফল খেতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও তার স্ত্রীকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। কোনও কোনও বর্ণনায় বলা হয়েছে, সেটি ছিল গম গাছ। আবার কোনও বর্ণনায় আঙ্গুর গাছও বলা হয়েছে। কিন্তু এসব বর্ণনার মধ্যে এমন একটিও নেই, যার উপর আস্থা রাখা যেতে পারে।

৩৪. অর্থাৎ শয়তান তাদেরকে প্ররোচনা দিয়ে সেই গাছের ফল খেতে প্রস্তুত করে ফেলল। সে বাহানা এই দেখাল যে, এমনিতে এই গাছটি বড়ই উপকারী। কেননা এর ফল খেলে অনন্ত জীবন লাভ হয়। কিন্তু প্রথম দিকে এটা বরদাশত করার মত শারীরিক শক্তি যেহেতু আপনাদের ছিল না তাই আপনাদেরকে খেতে নিষেধ করা হয়েছিল। এখন তো আপনারা জান্নাতী পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। আপনাদের শক্তিও পরিপক্ক হয়ে উঠেছে। কাজেই এখন আর সে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর নেই। বিষয়টা আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ১৯-২৩) ও সূরা তোয়াহা (২০ : ১২০)।

৩৫. অর্থাৎ এ ঘটনার পরিণামে হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও তাঁর স্ত্রীকে জান্নাত থেকে এবং শয়তানকে আসমান থেকে পৃথিবীতে নেমে আসার হুকুম দেওয়া হল এবং সেই সঙ্গে এটাও বলে দেওয়া হল যে, যত দিন পৃথিবী থাকবে, মানুষ ও শয়তানের মধ্যে শত্রুতা চলতে থাকবে। আর পৃথিবীতে তাদের এ অবস্থান নির্দিষ্ট একটা কাল পর্যন্ত থাকবে। পার্থিব কিছু ফায়দা ভোগ করার পর সকলকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার নিকট পুনরায় উপস্থিত হতে হবে।

فَتَلَقّٰۤی اٰدَمُ مِنۡ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَیۡهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیۡمُ ﴿۳۷﴾

৩৭. অত:পর আদম স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ হতে (তওবার) কিছু শব্দ শিখে নিল (যা দ্বারা সে তওবা করল) ফলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করলেন।[৩৬] নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

قُلۡنَا اهۡبِطُوۡا مِنۡهَا جَمِیۡعًا ۚ فَاِمَّا یَاۡتِیَنَّكُمۡ مِّنِّیۡ هُدًی فَمَنۡ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَیۡهِمۡ وَلَا هُمۡ یَحۡزَنُوۡنَ ﴿۳۸﴾

৩৮. আমি বললাম, এবার তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও। অত:পর আমার নিকট থেকে তোমাদের নিকট যদি কোন হিদায়াত পৌঁছে, তবে যারা আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা কোন দুঃখেও পতিত হবে না।

وَالَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا وَكَذَّبُوۡا بِاٰیٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِیۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۳۹﴾

৩৯. আর যারা কুফরীতে লিপ্ত হবে এবং আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করবে তারা জাহান্নামবাসী। তারা সেখানে সর্বদা থাকবে।

---

৩৬. হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন, তখন ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছিলেন না আল্লাহ তাআলার কাছে কি শব্দে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। তাই তাঁর মুখ দিয়ে কিছুই বের হচ্ছিল না। আল্লাহ তাআলা তো অন্তর্যামী এবং তিনি পরম দয়ালু ও দাতাও বটে। তিনি হযরত আদম আলাইহিস সালামের মনের এ অবস্থার কারণে নিজেই তাঁকে তওবার ভাষা শিখিয়ে দিলেন, যা সূরা আরাফে বর্ণিত আছে এবং তা এরূপ–

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمۡنَاۤ اَنۡفُسَنَا وَاِنۡ لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا لَنَكُوۡنَنَّ مِنَ الۡخٰسِرِیۡنَ

'তারা বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের সত্তার প্রতি জুলুম করে ফেলেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।' এভাবে পৃথিবীতে পাঠানোর আগেই মানুষকে আল্লাহ তাআলা শিখিয়ে দিলেন যে, সে যদি কখনও শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে কিংবা ইন্দ্রিয় পরবশতার কারণে কোন গুনাহ করে ফেলে তবে তার কর্তব্য তৎক্ষণাৎ তওবা করে ফেলা। তওবার জন্য যদিও বিশেষ কোন শব্দ ও ভাষা ব্যবহার অপরিহার্য নয়, বরং নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা ও পরবর্তীতে অনুরূপ না করার প্রতিশ্রুতি প্রকাশ পায়– এমন

যে-কোন বাক্য দ্বারাই তওবা হতে পারে, কিন্তু উপরে বর্ণিত বাক্য যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ তাআলার শেখানো, তাই এর দ্বারা তওবা করলে তা কবুল হওয়ার বেশি আশা করা যায়।

এ স্থলে একটা কথা বিশেষভাবে বুঝে নেওয়া চাই, যেমনটা পূর্বে ৩০ নং আয়াত দ্বারাও পরিস্ফুট হয়েছে, আল্লাহ তাআলা শুরুতেই হযরত আদম আলাইহিস সালামকে পৃথিবীতে নিজ খলীফা বানিয়ে পাঠানোর জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সৃষ্টি করার পর তাকে প্রথমেই পৃথিবীতে না পাঠিয়ে তার আগে জান্নাতে থাকতে দিলেন। তারপর এতকিছু ঘটনা ঘটল। এর উদ্দেশ্য দৃশ্যত এই যে, হযরত আদম আলাইহিস সালাম যাতে জান্নাতের নিআমতসমূহ চাক্ষুষ দেখে নিজের আসল ঠিকানা সম্পর্কে ভালভাবে জেনে নিতে পারেন এবং পৃথিবীতে পৌঁছার পর এ ঠিকানা অর্জনে কি রকমের প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে এবং কোন পন্থায় তা থেকে মুক্তি লাভ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেন। যেহেতু ফিরিশতাগণের বিপরীতে মানুষের স্বভাবের ভেতরই ভাল ও মন্দ উভয়ের যোগ্যতা রাখা হয়েছে, তাই এ বৈশিষ্ট্যের কারণে পৃথিবীতে আসার আগেই এ রকমের একটা অভিজ্ঞতা লাভ করা তার জন্য জরুরী ছিল।

নবী যেহেতু মা'সূম ও নিষ্পাপ হন, ফলে তাঁর দ্বারা কোন গুনাহের কাজ সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়, তাই হযরত আদম আলাইহিস সালামের এ ভুল মূলত ইজতিহাদী ভুল ছিল (Bonafide Mistake) অর্থাৎ চিন্তাগত ভুল। তিনি শয়তানের কুমন্ত্রণার ফলে আল্লাহ তাআলার নির্দেশকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর সীমাবদ্ধ মনে করেছিলেন। অন্যথায় তাঁর পক্ষ হতে সরাসরি আল্লাহ তাআলার নাফরমানী হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। তথাপি একজন নবীর পক্ষে এ জাতীয় ভুলও যেহেতু শোভনীয় ছিল না, তাই কোনও কোনও আয়াতে এটাকে গুনাহ বা সীমালংঘন শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং এজন্য তওবা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে আলোচ্য আয়াতে এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করে নিয়েছেন।

এর দ্বারা মানুষের পাপ সংক্রান্ত খ্রিস্টীয় বিশ্বাস খণ্ডন হয়ে গেছে। খ্রিস্টানদের কথা হল, হযরত আদম আলাইহিস সালামের এ গুনাহ স্থায়ীভাবে মানব প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যদ্দরুণ প্রতিটি মানব-শিশু মায়ের পেট থেকে পাপী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। মানুষের এই সংকট মোচনের লক্ষ্যেই আল্লাহ তাআলার নিজ পুত্রকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে কুরবানী করানোর দরকার পড়েছে, যাতে তাঁর দ্বারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। কুরআন মাজীদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালামের তওবা কবুল করে নিয়েছিলেন। ফলে তার সে গুনাহও বাকি থাকেনি এবং তার সন্তানদের মধ্যে সে গুনাহের স্থানান্তরিত হওয়ারও কোন অবকাশ থাকেনি। তাছাড়া আল্লাহ তাআলার ইনসাফ ভিত্তিক বিধান অনুযায়ী এক ব্যক্তির পাপের বোঝা কখনও অন্যের মাথায় চাপানো হয় না।

[৫]

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ۝٤٠

৪০. হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার সেই নি'আমত স্মরণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম এবং তোমরা আমার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তাহলে আমিও তোমাদের সাথে আমার কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণ করব। আর তোমরা (অন্য কাউকে নয়; বরং) কেবল আমাকেই ভয় করো।[৩৭]

وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ ۖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۡ وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ۝٤١

৪১. আর আমি যে বাণী নাযিল করেছি তাতে ঈমান আন। যখন তা তোমাদের কাছে যে কিতাব (তাওরাত) আছে, তার সমর্থকও বটে। আর তোমরাই এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না। আর আমার আয়াতসমূহকে তুচ্ছ মূল্যের

---

৩৭. হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আরেক নাম ইসরাঈল। তাঁর বংশধরদেরকে বনী ইসরাঈল বলা হয়, সমস্ত ইয়াহুদী এবং অধিকাংশ খ্রিস্টান এ বংশের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল। মদীনা মুনাওয়ারায় বিপুল সংখ্যক ইয়াহুদী বসবাস করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় পৌঁছে ইয়াহুদীদেরকে যে কেবল ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন তাই নয়; বরং তাদের সঙ্গে শান্তি চুক্তিও সম্পাদন করেছিলেন। এই মাদানী সূরায় আলোচ্য আয়াত থেকে আয়াত নং ১৪৩ পর্যন্ত একাধারে তাদেরই সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এতে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে বিভিন্ন রকম উপদেশ দেওয়ার সাথে সাথে তাদের উপর্যুপরি দুষ্কৃতি সম্পর্কেও সতর্ক করা হয়েছে। প্রথমে তাদেরকে স্মরণ করানো হয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কত রকম নিয়ামত দান করেছিলেন। তার দাবী ছিল তারা আল্লাহ তাআলার শুকর আদায় করবে এবং তাওরাত গ্রন্থে তাদের থেকে যে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল তা পূরণ করবে। তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল যে, তারা যথাযথভাবে তাওরাতের অনুসরণ করবে এবং আল্লাহ-প্রেরিত প্রত্যেক নবীর প্রতি ঈমান আনবে। কিন্তু তারা তাওরাতের অনুসরণ তো করলই না, উল্টো তার মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করল এবং তার বিধানাবলীতে নানা রকম রদবদল করল। তাদের এ কর্মপন্থার একটা কারণ এ-ও ছিল যে, তাদের আশঙ্কা ছিল সত্য কবুল করলে তাদের সধর্মীয়রা তাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়তে পারে। তাই এ দুই আয়াতের শেষে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মাখলুককে ভয় না করে তাদের উচিত কেবল আল্লাহ তাআলাকেই ভয় করা এবং অন্তরে তাঁর ছাড়া অন্য কারও ভয়কে স্থান না দেওয়া।

বিনিময়ে বিক্রি করো না। আর তোমাদের অন্তরে (অন্য কারও পরিবর্তে) কেবল আমারই ভয়কে স্থিত কর।[৩৮]

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

৪২. এবং সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং সত্যকে গোপনও করো না, যখন (প্রকৃত অবস্থা) তোমরা ভালোভাবে জান।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

৪৩. এবং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর ও রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' কর।[৩৯]

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪. তোমরা কি অন্য লোকদেরকে পুণ্যের আদেশ কর আর নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াতও কর। তোমরা কি এতটুকুও বোঝ না?

---

৩৮. বনী ইসরাঈলকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাওরাত ও ইনজীলের যে দাওয়াত ছিল কুরআন মাজীদ সেই দাওয়াত নিয়েই এসেছে এবং তারা যে আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখে কুরআন মাজীদ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন তো করেই না; বরং দু'ভাবে তার সমর্থন করে থাকে। এক তো এভাবে যে, কুরআন মাজীদ স্বীকার করে যে, এসব কিতাব আল্লাহ তাআলারই নাযিল করা (আর পরবর্তীকালের লোকে যে নানাভাবে তাতে রদবদল করেছে, সেটা আলাদা কথা। কুরআন মাজীদ সে রদবদলের প্রকৃতিও স্পষ্ট করে দিয়েছে)। দ্বিতীয়ত কুরআন মাজীদ এ দিক থেকেও সেসব কিতাবের সমর্থন করে যে, তাতে শেষ নবীর আগমন সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, কুরআন মাজীদ তার সত্যতা প্রমাণ করেছে। এর তো দাবী ছিল বনী ইসরাঈল আরব পৌত্তলিকদের আগেই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। কিন্তু হল তার বিপরীত। আরব পৌত্তলিকগণ যেমন দ্রুতগতিতে ইসলাম গ্রহণ করছে, ইয়াহুদীরা ইসলামের প্রতি তেমন গতিসম্পন্ন হচ্ছে না। আর এভাবে যেন তারা কুরআন মাজীদকে অস্বীকার করার ব্যাপারেই অগ্রগামী থাকছে। এ কারণেই বলা হয়েছে, তোমরাই এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না। কতক ইয়াহুদীর নীতি ছিল আম-সাধারণের থেকে উৎকোচ নিয়ে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাওরাতের ব্যাখ্যা করত, আবার কখনও তাওরাতের বিধান গোপন করত। তাদের এই দুর্নীতির প্রতি ইশারা করে বলা হয়েছে, 'আমার আয়াতসমূহকে তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করো না, সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং সত্য গোপন করো না।'

৩৯. বিশেষভাবে রুকূ'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, ইয়াহুদীদের সালাতে রুকূ' ছিল না।

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. এবং সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য লাভ কর। সালাতকে অবশ্যই কঠিন মনে হয়, কিন্তু তাদের পক্ষে নয়, যারা খুশূ' (অর্থাৎ ধ্যান ও বিনয়)-এর সাথে পড়ে।

الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. যারা এ বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখে যে, তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে এবং তাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।

[৬]

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই নিআমত স্মরণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছিলাম এবং এটাও (স্মরণ কর) যে, আমি তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. এবং সেই দিনকে ভয় কর, যে দিন কোনও ব্যক্তি কারও কোনও কাজে আসবে না, কারও পক্ষ হতে কোনও সুপারিশ গৃহীত হবে না, কারও থেকে কোনও রকম মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের কোনও রকম সাহায্যও করা হবে না।

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ط وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿٤٩﴾

৪৯. এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদেরকে ফিরাউনের লোকজন থেকে মুক্তি দেই, যারা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিচ্ছিল। তোমাদের পুত্রদেরকে যবাহ করে ফেলছিল এবং তোমাদের নারীদেরকে

জীবিত রাখছিল।[৪০] আর এই যাবতীয় পরিস্থিতিতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের জন্য ছিল মহা পরীক্ষা।

৫০. এবং (স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে বিদীর্ণ করেছিলাম এবং এভাবে তোমাদের সকলকে রক্ষা করেছিলাম এবং ফিরাউনের লোকজনকে (সাগরে) নিমজ্জিত করেছিলাম।[৪১] আর তোমরা এসব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিলে।

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٠﴾

৫১. এবং (সেই সময়টিও) স্মরণ কর, যখন আমি মূসাকে চল্লিশ রাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। অত:পর তোমরা তার পরে (নিজেদের সত্তার উপর) জুলুম করত: বাছুরকে মাবূদ বানালে।[৪২]

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾

---

৪০. ফিরাউন ছিল মিসরের রাজা। মিসরে বিপুল সংখ্যক ইয়াহুদী বাস করত এবং তারা ফিরাউনের দাস রূপে জীবিন যাপন করত। একবার এক জ্যোতিষী ফিরাউনের সামনে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করল যে, এ বছর বনী ইসরাঈলে একটি শিশুর জন্ম হবে, যার হাতে তার রাজত্ব ধ্বংস হবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী শুনে সে ফরমান জারি করল, বনী ইসরাঈলে যত শিশুর জন্ম হবে, সকলকে হত্যা করা হোক, তবে মেয়ে শিশুকে নয়। কেননা বড় হলে তাদের থেকে সেবা নেওয়া যাবে। এভাবে বহু নবজাতককে হত্যা করা হয়। হযরত মূসা আলাইহিস সালামও এ বছরই জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে রক্ষা করেন। বিস্তারিত ঘটনা সূরা তোয়াহা ও সূরা কাসাস-এ স্বয়ং কুরআন মাজীদই বর্ণনা করেছে।

৪১. এ ঘটনাও উপরিউক্ত সূরা দু'টিতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

৪২. আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি তূর পাহাড়ে গিয়ে চল্লিশ দিন ইতিকাফ করলে তাকে তাওরাত দান করা হবে। সেমতে তিনি তূর পাহাড়ে চলে গেলেন। তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে যাদুকর সামিরী একটি বাছুর তৈরি করল এবং সেটিকে উপাস্য সাব্যস্ত করে বনী ইসরাঈলকে তার পূজায় লিপ্ত হতে প্ররোচিত করল। এভাবে তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ল। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন এ খবর পেলেন, তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ফিরে আসলেন এবং বনী ইসরাঈলকে তওবা করতে উৎসাহিত করলেন। তওবার একটা অংশ ছিল এই যে, তাদের মধ্যে যারা এ শিরকের কদর্যতায় জড়িত হয়নি তারা তাতে জড়িতদেরকে হত্যা করবে। সুতরাং সেমতে তাদের বিপুল সংখ্যক লোককে হত্যা করা হল এবং এভাবে তাদের তওবা কবুল হল। ইনশাআল্লাহ সূরা আরাফ ও সূরা তোয়াহায় এসব ঘটনা বিস্তারিতভাবে আসবে।

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. অত:পর এসব কিছুর পরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. এবং (স্মরণ কর) যখন আমি মূসাকে দিলাম কিতাব এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকরণের মাপকাঠি, যাতে তোমরা সঠিক পথে চলে আস।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ؕ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٤﴾

৫৪. এবং যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেরা নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছ। সুতরাং এখন নিজ সৃষ্টিকর্তার কাছে তওবা কর এবং নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা কর। এটাই তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তোমাদের পক্ষে শ্রেয়। এভাবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের তওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনিই অতি বড় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. আর যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুতেই তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আল্লাহকে নিজেদের চোখে প্রকাশ্যে দেখতে পাব। এর পরিণাম দাঁড়াল এই যে, বজ্র এসে তোমাদেরকে এমনভাবে পাকড়াও করল যে, তোমরা কেবল তাকিয়েই থাকলে।

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. অত:পর আমি তোমাদেরকে তোমাদের মৃত্যুর পর নতুন জীবন দান করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।[৪৩]

---

৪৩. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন তূর পাহাড় হতে তাওরাত নিয়ে ফিরলেন, তখন বনী ইসরাঈল তাকে বলল, আল্লাহ তাআলা যে সত্যিই আমাদেরকে এ কিতাব অনুসরণ করতে

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

৫৭. এবং আমি তোমাদেরকে মেঘের ছায়া দিলাম এবং তোমাদের প্রতি মান্ন ও সালওয়া অবতীর্ণ করলাম ও বললাম, যে পবিত্র রিয্ক আমি তোমাদেরকে দান করলাম, তা (আগ্রহভরে) খাও।[৪৪] আর তারা (এসব নাফরমানী করে) আমার কিছু ক্ষতি করেনি; বরং তারা নিজেদের সত্তার উপরই জুলুম করতে থাকে।

বলেছেন তা আমরা কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি? প্রথমে তাদের উপর প্রমাণ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা সরাসরি তাদেরকে সম্ভাষণ করে তাওরাত অনুসরণ করার হুকুম দিলেন। কিন্তু তারা বলতে লাগল যতক্ষণ আল্লাহকে আমরা নিজ চোখে না দেখব, ততক্ষণ বিশ্বাস করব না। এই ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের কারণে তাদের উপর বজ্রপাত হল। ফলে এক বর্ণনা অনুযায়ী তারা মারা গেল এবং অন্য বর্ণনা অনুযায়ী তারা অচেতন হয়ে পড়ল। অত:পর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পুনরায় জীবিত করেন। বিস্তারিত সূরা আরাফে আসবে ইনশাআল্লাহ।

৪৪. সূরা আলে-ইমরানে আসবে যে, বনী ইসরাঈল জিহাদের একটি আদেশ অমান্য করেছিল, যার শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে সিনাই মরুভূমিতে আটকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের এই শাস্তিকালীন সময়েও আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি নানা রকম নিয়ামত বর্ষণ করেছিলেন। এ স্থলে তা বিবৃত হচ্ছে। মরুভূমিতে যেহেতু তাদের মাথার উপর কোন ছাদ ছিল না, প্রচণ্ড খরতাপে তাদের খুব কষ্ট হচ্ছিল, তা থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের উপর একখণ্ড মেঘ নিয়োজিত করে দেন, যা তাদেরকে নিরবচ্ছিন্ন ছায়া দিয়ে যাচ্ছিল। এ মরুভূমিতে কোন খাদ্যদ্রব্যও ছিল না। আল্লাহ তাআলা গায়ব থেকে তাদের জন্য মান্ন ও সালওয়ারূপে উৎকৃষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। কোনও বর্ণনা অনুযায়ী 'মান্ন' হল তুরান্জ (প্রাকৃতিক চিনি বিশেষ, যা শিশিরের মত পড়ে তৃণাদির উপর জমাট বেঁধে যায়)। সেই এলাকায় এটা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা হত। আর 'সালওয়া' হল বটের (তিতির জাতীয় পাখি)। বনী ইসরাঈল যেসব জায়গায় অবস্থান করত, তার আশেপাশে এ পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ত এবং কেউ ধরতে চাইলে তারা মোটেই আত্মরক্ষার চেষ্টা করত না। বনী ইসরাঈল এসব নিয়ামতের চরম অসম্মান করল এবং এভাবে তারা নিজ সত্তার উপরই জুলুম করল।

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮. এবং (সেই কথাও স্মরণ কর) যখন আমি বলেছিলাম, ওই জনপদে প্রবেশ কর এবং তার যেখান থেকে ইচ্ছা প্রাণ ভরে খাও। আর (জনপদের) প্রবেশদ্বার দিয়ে নতশিরে প্রবেশ করবে আর বলতে থাকবে, (হে আল্লাহ!) আমরা আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। (এভাবে) আমি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করব এবং পুণ্যবানদেরকে আরও বেশি (সওয়াব) দেব।

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. কিন্তু ঘটল এই যে, তাদেরকে যে কথা বলা হয়েছিল জালিমরা তা পরিবর্তন করে অন্য কথা বানিয়ে নিল।[৪৫] ফলে তারা যে নাফরমানী করে আসছিল তার শাস্তি স্বরূপ আমি এ জালিমদের উপর আসমান থেকে শাস্তি অবতীর্ণ করলাম।

---

৪৫. সিনাই মরুভূমিতে যখন দীর্ঘদিন কেটে গেল এবং মান্ন ও সালওয়া খেতে খেতে বিতৃষ্ণা ধরে গেল, তখন বনী ইসরাঈল দাবী জানাল, আমরা একই রকম খাবার খেয়ে থাকতে পারব না। আমরা ভূমিতে উৎপন্ন তরি-তরকারি খেতে চাই। সামনে ৬১নং আয়াতে তাদের এ দাবীর কথা বর্ণিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, তাদের এ চাহিদাও পূর্ণ করা হল। ঘোষণা করে দেওয়া হল, এবার তোমাদেরকে মরুভূমির ছন্নছাড়া অবস্থা হতে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। সামনে একটি জনপদ আছে, সেখানে চলে যাও। তবে জনপদটির প্রবেশদ্বার দিয়ে নিজেদের কৃত গুনাহের জন্য লজ্জা প্রকাশার্থে মাথা নত করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে প্রবেশ কর। সেখানে নিজেদের চাহিদা মত যে-কোনও হালাল খাদ্য খেতে পারবে। কিন্তু সে জালিমরা আবারও টেড়া মানসিকতার প্রমাণ দিল। শহরে প্রবেশকালে মাথা নত করবে কি, উল্টো বুক টান করে প্রবেশ করল এবং ক্ষমা প্রার্থনার জন্য যে ভাষা তাদেরকে শেখানো হয়েছিল তাকে তামাশায় পরিণত করে তার কাছাকাছি এমন শ্লোগান দিতে দিতে প্রবেশ করল যার উদ্দেশ্য মশকারা ছাড়া কিছুই ছিল না। ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তাদেরকে তো শেখানো হয়েছিল– حطة (হে আল্লাহ! আমাদের পাপ মোচন কর), কিন্তু তারা এর পরিবর্তে শ্লোগান দিচ্ছিল حنطة 'গম চাই, গম'।

[৭]

৬০. এবং (সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর) যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করল। তখন আমি বললাম, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর। সুতরাং তা থেকে বারটি প্রস্রবণ উৎসারিত হল।[৪৬] প্রত্যেক গোত্র নিজ পানি গ্রহণের স্থান জেনে নিল। (আমি বললাম) আল্লাহ প্রদত্ত রিযক খাও এবং পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করো না।

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ
الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ
عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن
رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

৬১. এবং (সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর) যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা একই খাবারে সবর করতে পারব না। সুতরাং স্বীয় প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য ভূমিজাত দ্রব্য হতে কিছু উৎপন্ন করেন অর্থাৎ জমির তরকারি, কাঁকড়, গম, ডাল ও পিঁয়াজ। মূসা বলল, যে খাবার উৎকৃষ্ট ছিল, তোমরা কি তাকে এমন জিনিস দ্বারা পরিবর্তন করতে চাচ্ছ, যা নিকৃষ্ট? (ঠিক আছে,) কোনও নগরে গিয়ে অবতরণ কর। সেখানে তোমরা যা চেয়েছ সেসব জিনিস পেয়ে যাবে।[৪৭] আর তাদের (ইয়াহুদীদের) উপর লাঞ্ছনা ও অসহায়ত্বের ছাপ মেরে দেওয়া হল এবং তারা আল্লাহর গযব নিয়ে ফিরল। এসব এ কারণে ঘটেছে যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করত

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ
فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن
بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ
أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ
اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ
عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ
اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا
وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

---

৪৬. এ ঘটনাও সেই সময়ের, যখন বনী ইসরাঈল 'তীহ' (সিনাই) মরুভূমিতে আটকে পড়েছিল। সেখানে পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না। আল্লাহ তাআলা একটি অলৌকিক ঘটনা হিসেবে পাথর থেকে বারটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দেন। হযরত ইয়াকুব (ইসরাঈল) আলাইহিস সালামের বার পুত্র ছিল। প্রত্যেক পুত্রের সন্তানগণ একটি স্বতন্ত্র গোত্রের রূপ নেয়। এভাবে বনী ইসরাঈল বার গোত্রে বিভক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক গোত্রের জন্য আলাদা প্রস্রবণ চালু করেছিলেন, যাতে কোন কলহ সৃষ্টি হতে না পারে।

৪৭. পূর্বে ৪৫নং টীকায় যা লেখা হয়েছে, এটাই সে ঘটনা।

এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। এসব এ কারণে ঘটেছে যে, তারা নাফরমানী করেছিল এবং তারা অত্যধিক সীমালংঘন করত।

[৮]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

৬২. সত্যি কথা তো এই যে, মুসলিম হোক বা ইয়াহুদী, খ্রিস্টান হোক বা সাবী, যে-কেউ আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, তারা আল্লাহর নিকট নিজ প্রতিদানের উপযুক্ত হবে এবং তাদের কোন ভয় থাকবে না আর কোন দুঃখেও পতিত হবে না।[৪৮]

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩. এবং (সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের থেকে (তাওরাতের অনুসরণ সম্পর্কে) প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তূর পাহাড়কে তোমাদের উপর উত্তোলন করে ধরেছিলাম (আরও বলেছিলাম যে,) আমি তোমাদেরকে যা (যে কিতাব) দিয়েছি, তা শক্ত করে

---

৪৮. বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহরাজি ও তাদের অবাধ্যতা সম্পর্কিত আলোচনার মাঝখানে এ আয়াতে তাদের একটা মিথ্যা ধারণা রদ করা হয়েছে। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, কেবল তাদের বংশই আল্লাহ তাআলার মনোনীত ও প্রিয় বান্দা। তাদের খান্দানের বাইরে অন্য কোন মানুষ আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত নয়। (আজও ইয়াহুদীরা এরূপ বিশ্বাসই পোষণ করে থাকে। এ কারণেই ইয়াহুদী ধর্ম মূলত একটি বংশভিত্তিক ধর্ম। এ বংশের বাইরে কোন লোক যদি এ ধর্ম গ্রহণ করতে চায়, তবে প্রথমত তার সে সুযোগই নেই, আর যদি গ্রহণ করেও নেয়, তবে ইয়াহুদী বংশীয় কোন ব্যক্তি যেসব অধিকার ভোগ করে থাকে, সে তা ভোগ করতে পারে না)। এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, 'সত্য' কোনও বংশের একচেটিয়া ব্যাপার নয়। মূল বিষয় হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম। যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান আনয়ন ও সৎকর্মের মৌলিক শর্তাবলী পূরণ করবে, সে-ই আল্লাহ তাআলার নিকট পুরস্কারের হকদার হবে, তাতে পূর্বে সে যে ধর্ম ও বংশের সাথেই সম্পৃক্ত থাকুক। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান ছাড়া কিছু সংখ্যক নক্ষত্র পূজক লোকও আরবে বাস করত। তাদেরকে 'সাবী' বলা হত। তাই এ আয়াতে তাদেরও নাম নেওয়া হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন বলতে তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়নকেও বোঝায়। সুতরাং মুক্তি লাভের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনাও জরুরী। পূর্বে ৪০-৪১ নং আয়াতে এ কারণেই সমস্ত বনী

ধর[৪৯] এবং তাতে যা কিছু (লেখা) আছে তা স্মরণ রাখ, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।

৬৪. এসব কিছুর পর তোমরা পুনরায় (সঠিক পথ থেকে) ফিরে গেলে। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হত, তবে তোমরা অবশ্যই মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٤﴾

ইসরাঈলকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আরও দ্র. কুরআন মাজীদ ৫ : ৬৫–৬৮; ৭ : ১৫৫–১৫৭)।

৪৯. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাওরাত নিয়ে আসলে বনী ইসরাঈল লক্ষ্য করে দেখল তার কোনও কোনও বিধান বেশ কঠিন। তাই তারা তা থেকে বাঁচার অজুহাত খুঁজতে শুরু করল। প্রথমে তারা বলল, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং আমাদের বলে দিন যে, তাওরাত মানা আমাদের জন্য অপরিহার্য। তাদের এ দাবী যদিও অযৌক্তিক ছিল, তথাপি প্রমাণ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে এটা মেনে নেওয়া হল। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে সত্তর জন লোককে বাছাই করে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে তূর পাহাড়ে পাঠানো হল (যেমন সূরা আরাফের ১৫৫ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে)। আল্লাহ তাআলা সরাসরি তাদেরকে তাওরাত মেনে চলার হুকুম দিলেন। অত:পর তারা যখন ফিরে আসল, তখন নিজ সম্প্রদায়ের সামনে আল্লাহ তাআলার সে হুকুমের কথা তো স্বীকার করল, কিন্তু নিজেদের পক্ষ থেকে একটা কথা যোগ করে দিল। তারা বলল, আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, তোমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব ততটুকু মেনে চলবে; যা পারবে না আমি তা ক্ষমা করে দেব। সুতরাং তাওরাতের যে নির্দেশই তাদের দৃষ্টিতে কিছুটা কঠিন মনে হত, তারা বাহানা তৈরি করে বলত, এটাও সেই ছাড় দেওয়া নির্দেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তূর পাহাড়কে তাদের মাথার উপর তুলে ধরে বললেন, তাওরাতের সমুদয় বিধান মেনে নাও। তাদের যখন আশংকা হল, পাহাড়টিকে তাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হতে পারে, তখন তারা তাওরাত মানার ও সে অনুযায়ী আমল করার প্রতিশ্রুতি দিল। এ আয়াতে সে ঘটনার প্রতিই ইশারা করা হয়েছে।

তূর পাহাড়কে তাদের মাথার উপর তুলে ধরাটা প্রকৃত ও বাচ্যার্থেও সম্ভব। অর্থাৎ পাহাড়টিকে তার স্থান থেকে উৎপাটিত করে তাদের মাথার উপরে ঝুলিয়ে ধরা হয়েছিল। হাফেজ ইবনে জারীর (রহ.) বহু তাবিঈ হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন। বলাবাহুল্য, আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতা হিসেবে এটা কিছু কঠিন কাজ নয়। আবার এমনও হতে পারে যে, এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল, যদ্দরুণ তাদের মনে হয়েছিল পাহাড়টি বুঝি তাদের উপর পতিত হবে, যেমন হয়ত তখন প্রচণ্ড ভূমিকম্প দেখা দিয়েছিল। ফলে তাদের ধারণা হয়েছিল পাহাড়টি উৎপাটিত হয়ে তাদের উপর পড়বে। সুতরাং এ ঘটনা সম্পর্কে সূরা আরাফে বর্ণিত হয়েছে, وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ (আরাফ : ১৭১)। এতে نتق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার এক অর্থ সজোরে নাড়ানো (দেখুন আল-কামূস ও মুফরাদাতুল কুরআন)। সুতরাং আয়াতটির এরূপ অর্থও করা যেতে পারে যে, 'যখন আমি পাহাড়কে তাদের উপর সজোরে এমনভাবে নাড়াতে থাকি যে, তাদের মনে হচ্ছিল সেটি তাদের উপর পতিত হবে।'

৬৫. এবং তোমরা নিজেদের সেই সকল লোককে ভাল করেই জান, যারা শনিবার বিষয়ে সীমালংঘন করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা ধিকৃত বানরে পরিণত হও।[৫০]

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾

৬৬. অত:পর আমি এ ঘটনাকে সেই কালের ও তাদের পরবর্তী কালের লোকদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং যারা ভয় করে তাদের জন্য উপদেশগ্রহণের মাধ্যম বানিয়ে দেই।

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭. এবং (সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর), যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহ করতে আদেশ করছেন। তারা বলল, আপনি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?[৫১] মূসা বলল, আমি আল্লাহর কাছে (এমন) অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে পানাহ চাই (যারা ঠাট্টাস্বরূপ মিথ্যা কথা বলে)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾

প্রকাশ থাকে যে, কাউকে চাপ সৃষ্টি করে ঈমান আনতে বাধ্য করা যায় না বটে, কিন্তু কেউ যদি ঈমান আনার পর নাফরমানী করে, তবে সেজন্য তাকে শাস্তি দেওয়া যায় এবং হুমকি-ধমকি দিয়ে হুকুম মানতে প্রস্তুত করা যায়। বনী ইসরাঈল যেহেতু আগেই ঈমান এনেছিল, তাই আল্লাহর আযাবের ভয় দেখিয়ে তাদেরকে আনুগত্য করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

৫০. আরবী ও হিব্রু ভাষায় শনিবারকে 'সাবত' বলে। ইয়াহুদীদের জন্য 'সাবত'কে পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ দিন সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এ দিন তাদের জন্য আয়-রোজগারমূলক তৎপরতা নিষিদ্ধ ছিল। এস্থলে যে ইয়াহুদীদের কথা বলা হচেছ তারা খুব সম্ভব (হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের আমলে) কোন সাগর উপকূলে বাস করত ও মৎস্য শিকার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। তাদের জন্য শনিবার দিন মাছ ধরা নিষেধ ছিল। কিন্তু প্রথম দিকে তারা কিছুটা ছল-চাতুরির আশ্রয় নিয়ে এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করতে চাইল এবং পরের দিকে তারা প্রকাশ্যেই মাছ ধরা শুরু করে দিল। কিছু সংখ্যক নেককার লোক তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করল, কিন্তু তাতে তারা নিবৃত্ত হল না। পরিশেষে তাদের উপর আযাব আসল এবং তাদের আকৃতি বিকৃত করে বানর বানিয়ে দেওয়া হল। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সূরা আরাফে আসছে। (৭ : ১৬৩-১৬৬)

৫১. সামনে ৭২নং আয়াতে আসছে যে, এ হুকুম দেওয়া হয়েছিল এক নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে। তাই বনী ইসরাঈল এটাকে ঠাট্টা মনে করেছিল। তাদের বুঝে আসছিল না গাভী যবাহের দ্বারা হত্যাকারীকে জানা যাবে কিভাবে।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ؕ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ ؕ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ﴿۶۸﴾

৬৮. তারা বলল, আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে আবেদন করুন, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্ট করে বলে দেন সে গাভীটি কেমন হবে। সে বলল, আল্লাহ বলছেন, সেটি অতি বয়স্ক হবে না এবং অতি বাচ্চাও নয়- (বরং) উভয়ের মাঝামাঝি হবে। সুতরাং তোমাদেরকে যে আদেশ করা হয়েছে তা এখন পালন কর।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ﴿۶۹﴾

৬৯. তারা বলল, আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে আবেদন করুন, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্ট করে বলে দেন, তার রং কী হবে? মূসা বলল, আল্লাহ বলছেন, তা এমন গাঢ় হলুদ বর্ণের হবে, যা দর্শকদের মুগ্ধ করে দেয়।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۙ اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ؕ وَاِنَّاۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ﴿۷۰﴾

৭০. তারা (আবার) বলল, আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে আবেদন করুন, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্ট করে দেন সে গাভীটি কেমন হবে? গাভীটি তো আমাদেরকে সন্দেহে ফেলে দিয়েছে। আল্লাহ চাইলে আমরা অবশ্যই সেটির দিশা পেয়ে যাব।

قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا ؕ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ؕ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿۷۱﴾

৭১. মূসা বলল, আল্লাহ বলছেন, সেটি এমন গাভী, যা জমি কর্ষণে ব্যবহৃত নয় এবং যা ক্ষেতে পানিও দেয় না। সম্পূর্ণ সুস্থ, যাতে কোন দাগ নেই। তারা বলল, হাঁ এবার আপনি যথাযথ দিশা নিয়ে এসেছেন। অত:পর তারা সেটি যবাহ করল, যদিও মনে হচ্ছিল না তারা তা করতে পারবে।[৫২]

---

৫২. অর্থাৎ প্রথমে যখন তাদেরকে গাভী যবাহ করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তখন বিশেষ কোন গাভীর কথা বলা হয়নি। কাজেই তখন যে-কোনও একটা গাভী যবাহ করলেই হুকুম পালন হয়ে যেত, কিন্তু তারা অহেতুক খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে দিল। পরিণামে আল্লাহ তাআলাও নিত্য-নতুন শর্ত আরোপ করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত সে সব শর্ত মোতাবেক গাভী খুঁজে

[৯]

৭২. এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, তারপর তোমরা তার ব্যাপারে একে অন্যের উপর দোষ চাপাচ্ছিলে। আর তোমরা যা গোপন করছিলে আল্লাহ সে রহস্য প্রকাশ করবার ছিলেন।

وَاِذۡ قَتَلۡتُمۡ نَفۡسًا فَادّٰرَءۡتُمۡ فِیۡهَا ؕ وَاللّٰهُ مُخۡرِجٌ مَّا كُنۡتُمۡ تَكۡتُمُوۡنَ ﴿۷۲﴾

৭৩. অত:পর আমি বললাম, তাকে (নিহতকে) তার (গাভীর) একটা অংশ দ্বারা আঘাত কর।[৫৩] এভাবেই আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে নিজ (কুদরতের) নিদর্শনাবলী দেখান, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

فَقُلۡنَا اضۡرِبُوۡهُ بِبَعۡضِهَا ؕ كَذٰلِكَ یُحۡیِ اللّٰهُ الۡمَوۡتٰی ۙ وَیُرِیۡكُمۡ اٰیٰتِهٖ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ ﴿۷۳﴾

৭৪. এসব কিছুর পর তোমাদের অন্তর আবার শক্ত হয়ে গেল, এমনকি তা হয়ে গেল পাথরের মত; বরং তার চেয়েও বেশি শক্ত। (কেননা) পাথরের মধ্যে কিছু তো এমনও আছে, যা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়, তার মধ্যে কিছু

ثُمَّ قَسَتۡ قُلُوۡبُكُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ ذٰلِكَ فَهِیَ كَالۡحِجَارَۃِ اَوۡ اَشَدُّ قَسۡوَۃً ؕ وَاِنَّ مِنَ الۡحِجَارَۃِ لَمَا یَتَفَجَّرُ مِنۡهُ الۡاَنۡهٰرُ ؕ وَاِنَّ مِنۡهَا لَمَا یَشَّقَّقُ

পাওয়াই কঠিন হয়ে গেল। এক পর্যায়ে উপলব্ধি করা যাচ্ছিল তারা বুঝি এমন গাভী তালাশ করে যবাহ করতে সক্ষমই হবে না। এ ঘটনার ভেতর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, অহেতুক অপ্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পেছনে পড়া ঠিক নয়। যে বিষয় যতটুকু সাদামাটা হয়, তাকে সেরূপ সাদামাটাভাবেই আমল করা উচিত।

৫৩. ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহে প্রকাশ যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি মীরাছের লোভে তার ভাইকে হত্যা করল এবং তার লাশ সড়কের উপর ফেলে রাখল। তারপর ঘাতক নিজেই হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে গিয়ে মোকদ্দমা দায়ের করল এবং ঘাতককে ধরে শাস্তি দেওয়ার দাবী জানাল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার নির্দেশে তাদেরকে একটি গাভী যবাহ করতে বললেন, যেমন আয়াতে বিবৃত হয়েছে। গাভীটি যবাহ করা হলে তিনি বললেন, এর একটা অঙ্গ দ্বারা লাশকে আঘাত কর। তাহলে সে জীবিত হয়ে তার খুনীর নাম বলে দেবে। সুতরাং তাই হল এবং এভাবে খুনীর মুখোশ খুলে গেল ও তাকে গ্রেফতার করা হল। তাকে খুঁজে বের করার এই যে পন্থা অবলম্বন করা হল, এর একটা ফায়দা তো এই যে, এর ফলে খুনীর ছল-চাতুরি করার পথ বন্ধ হয়ে গেল। দ্বিতীয়ত আল্লাহ তাআলা যে মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন, তার একটি বাস্তব নমুনা দেখিয়ে সেই সকল লোকের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হল, যারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে অসম্ভব মনে করছিল। সম্ভবত এ ঘটনার পর থেকেই বনী ইসরাঈলের মধ্যে

فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ؕ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۷۴﴾

এমন আছে যা ফেটে যায় এবং তা থেকে পানি নির্গত হয় আবার তার মধ্যে এমন (পাথর)-ও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে পড়ে।[৫৪] আর (এর বিপরীতে) তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে অনবহিত নন।

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۷۵﴾

৭৫. (হে মুসলিমগণ!) এখনও কি তোমরা এই আশা কর যে, তোমাদের কথায় তারা ঈমান আনবে? অথচ তাদের মধ্যে একটি দল এমন ছিল, যারা আল্লাহর কালাম শুনত। অত:পর তা ভালোভাবে বোঝার পরও জেনে-শুনে তাতে বিকৃতি ঘটাত।

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚۖ وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۷۶﴾

৭৬. যখন এরা তাদের (সেই মুসলিমদের) সাথে মিলিত হয়, যারা আগেই ঈমান এনেছে, তখন (মুখে) বলে দেয় আমরা (-ও) ঈমান এনেছি। আবার এরা যখন নিভৃতে একে অন্যের সাথে মিলিত হয়, তখন (পরস্পরে একে অন্যকে) বলে, তোমরা কি তাদেরকে (মুসলিমদেরকে) সেই সব কথা বলে দিচ্ছ, যা আল্লাহ তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন? তবে

এই রীতি চালু হয়েছে যে, যদি কেউ নিহত হয় এবং তার হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া না যায়, তবে একটি গাভী যবাহ করে তার রক্তে হাত ধোয়া হয় এবং কসম করা হয় যে, আমরা তাকে হত্যা করিনি। বাইবেলের 'ইস্তিছনা' অধ্যায়ে (১২ : ১-৮) এর উল্লেখ রয়েছে।

৫৪. অর্থাৎ কখনও পাথর থেকে ঝর্ণা ধারা বের হয়ে আসে, যেমন বনী ইসরাঈল নিজেদের চোখেই দেখতে পেয়েছিল কিভাবে পাথরের এক চাঁই থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়েছিল (দেখুন ২ : ৬০)। অনেক সময় অত বেশি পানি বের না হলেও পাথর বিদীর্ণ হয়ে অল্প-বিস্তর পানি নিঃসৃত হয়। আবার কিছু পাথর আল্লাহর ভয়ে কেঁপে গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের দিল্ এমনই শক্ত যে, একদম গলে না। একটা কাল তো এমন ছিল যখন নিষ্প্রাণ পাথর কিভাবে ভয় পেতে পারে তা কিছু লোকের বুঝে আসত না, কিন্তু কুরআন মাজীদ কয়েক জায়গায় এ বাস্তবতা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আমরা আপাতদৃষ্টিতে যেসব জিনিসকে নিষ্প্রাণ ও অনুভূতিহীন মনে করি, তার মধ্যেও কিছু না কিছু অনুভূতি আছে। দেখুন সূরা বনী ইসরাঈল (১৭ : ৪৪) ও সূরা আহযাব (৩৩ : ২৭)। সুতরাং আল্লাহ তাআলা যখন বলছেন, কিছু পাথর আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হয়, তখন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বর্তমানে তো বিজ্ঞান ক্রমশ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে যে, জড় পদার্থের ভেতরেও বর্ধন ও অনুভূতির কিছু না কিছু যোগ্যতা রয়েছে।

তো তারা (মুসলিমগণ) তোমাদের প্রতিপালকের কাছে গিয়ে সেগুলোকে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণরূপে পেশ করবে![৫৫] তোমাদের কি এতটুকু বুদ্ধিও নেই?

৭৭. এসব লোক (যারা এ রকম কথা বলে,) জানে না যে, তারা যে সব কথা গোপন করে ও যা প্রকাশ করে সবই আল্লাহ্ জানেন?

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾

৭৮. তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে নিরক্ষর, যারা কিতাব (তাওরাত)-এর কোন জ্ঞান তো রাখে না, তবে কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা পুষে রেখেছে। তাদের কাজ কেবল এই যে, তারা অমূলক ধারণা করতে থাকে।

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾

৭৯. সুতরাং ধ্বংস সেই সকল লোকের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে তারপর (মানুষকে) বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে, যাতে তার মাধ্যমে সামান্য কিছু আয়-রোজগার করতে পারে।[৫৬] সুতরাং তাদের হাত যা রচনা করেছে সে কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস এবং তারা যা উপার্জন করেছে, সে কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

---

৫৫. তাওরাতে শেষ নবী সম্পর্কে যে সব ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ ছিল তার প্রত্যেকটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হুবহু মিলে যেত। মুসলিমদের সামনে নিজেকে মুসলিম রূপে পরিচয় দিত– এমন কোনও কোনও মুনাফিক ইয়াহুদী সে সব ভবিষ্যদ্বাণী মুসলিমদেরকে শোনাত। এ কারণে অন্যান্য ইয়াহুদীরা তাদেরকে নিভৃতে তিরস্কার করত। বলত, মুসলিমগণ এসব ভবিষ্যদ্বাণী জেনে ফেললে কিয়ামতের দিন এগুলোকে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। আর তখন আমাদের কাছে কোন জবাব থাকবে না। বলাবাহুল্য এটা ছিল তাদের চরম নির্বুদ্ধিতা। কেননা মুসলিমদের থেকে এসব ভবিষ্যদ্বাণী গোপন করতে পারলেও আল্লাহ্ তাআলার থেকে তো তা গোপন করা সম্ভব ছিল না।

৫৬. কুরআন মাজীদ এ স্থলে আলোচনার ক্রমবিন্যাস করেছে এভাবে যে, প্রথমে ইয়াহুদীদের সেই সব উলামার অবস্থা তুলে ধরেছে, যারা জেনেশুনে তাওরাতের মধ্যে রদবদল করত।

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

৮০. ইয়াহুদীরা বলে, আগুন কখনই আমাদেরকে গণা-গুণতি কয়েক দিনের বেশি স্পর্শ করবে না। আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা আল্লাহর পক্ষ হতে কোন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছ, ফলে আল্লাহ তাঁর সে প্রতিশ্রুতির বিপরীত কাজ করবেন না, না কি তোমরা আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করছ, যে সম্পর্কে তোমাদের কোন খবর নেই?

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾

৮১. (আগুন তোমাদেরকে কেন স্পর্শ করবে না,) অবশ্যই (করবে), যেসব লোক পাপ কামায় এবং তার পাপ তাকে বেষ্টন করে ফেলে,[৫৭] তারাই জাহান্নামবাসী। তারা সর্বদা সেখানে থাকবে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

৮২. যেসব লোক ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারা জান্নাতবাসী। তারা সর্বদা সেখানে থাকবে।

[১০]

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

৮৩. এবং (সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন আমি বনী ইসরাঈলের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না, পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথেও। আর মানুষের সাথে ভালো কথা বলবে, সালাত কায়েম

তারপর সেইসব অজ্ঞ-নিরক্ষর ইয়াহুদী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যারা তাওরাতের কোন জ্ঞান রাখত না; বরং উপরিউক্ত আলেমগণ তাদেরকে মিথ্যা আশার মধ্যে ভুলিয়ে রেখেছিল। তারা তাদেরকে বলে রেখেছিল যে, সমস্ত ইয়াহুদী আল্লাহর প্রিয়পাত্র। সর্বাবস্থায়ই তারা জান্নাতে যাবে। এ শ্রেণীর লোকের জ্ঞান বলতে কেবল এসব মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষাই ছিল। তাদের এসব ধারণার ভিত্তি যেহেতু ছিল তাদের আলেমদের দ্বীনী অপব্যাখ্যা তাই ৯৬ নং আয়াতে বিশেষভাবে তাদের ধ্বংস ও সর্বনাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৭. পাপের দ্বারা তাদের বেষ্টিত হওয়ার অর্থ এই যে, তারা এমন কোনও গুনাহে লিপ্ত হবে, যার পর আখিরাতে কোনও সৎকর্ম কাজে আসবে না। এরূপ গুনাহ হল কুফর ও শিরক।

وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۸۳﴾

করবে ও যাকাত দেবে। (কিন্তু) পরে তোমাদের মধ্য হতে অল্প কিছু লোক ছাড়া বাকি সকলে (সেই প্রতিশ্রুতি থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলে।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿۸۴﴾

৮৪. এবং (স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা একে অন্যের রক্ত বহাবে না এবং নিজেদের লোককে নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার করবে না। অত:পর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা নিজেরা তার সাক্ষী।

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ؗ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ؕ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي

৮৫. অত:পর (আজ) তোমরাই সেই লোক, যারা নিজেদের লোকদেরকে হত্যা করছ এবং নিজেদেরই মধ্য হতে কিছু লোককে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছ এবং পাপ ও সীমালংঘনে লিপ্ত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে (তাদের শত্রুদের) সাহায্য করছ। তারা যদি (শত্রুদের হাতে) কয়েদী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে তোমরা মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে ছাড়িয়ে নাও। অথচ তাদেরকে ঘর-বাড়ি হতে বের করাই তোমাদের জন্য হারাম ছিল।[৫৮] তবে তোমরা কি কিতাবের (অর্থাৎ

৫৮. এর প্রেক্ষাপট এই যে, মদীনা মুনাওয়ারায় ইয়াহুদীদের দু'টি গোত্র বাস করত। একটি বনু কুরায়জা, অপরটি বনু নাযীর। অপর দিকে পৌত্তলিকদেরও দু'টি গোত্র ছিল। একটি বনু আউস, অপরটি বনু খাযরাজ। আউস গোত্র ছিল বনু কুরায়জার মিত্র এবং খাযরাজ গোত্র ছিল বনু নাযীরের মিত্র। যখন আউস ও খাযরাজের মধ্যে কলহ দেখা দিত, তখন বনু কুরায়জা আউসের এবং বনু নাযীর খাযরাজ গোত্রের সহযোগিতা করত। এর ফলে ইয়াহুদী গোত্রদু'টি একে অন্যের প্রতিপক্ষ হয়ে যেত এবং যুদ্ধে যেমন আউস ও খাযরাজের লোক মারা পড়ত তেমনি বনু কুরায়জা ও বনু নাযীরের লোকও কতল হত, এমনকি অনেক সময় তারা নিজেদের ঘর-বাড়ি ত্যাগ করতেও বাধ্য হত। এভাবে বনু কুরায়জা ও বনু নাযীর গোত্রদ্বয় যদিও ইয়াহুদী ছিল, কিন্তু তারা একে অন্যের শত্রুর সহযোগিতা করে মূলত একে অন্যের হত্যা ও বাস্তুচ্যুতির কাজেই অংশীদার হত। অবশ্য তারা এটা করত যে,

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۸۵﴾

তাওরাতের) কিছু অংশে ঈমান রাখ এবং কিছু অংশ অস্বীকার কর? তাহলে বল, যারা এরূপ করে তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, পার্থিব জীবনে তাদের জন্য থাকবে লাঞ্ছনা আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে কঠিনতর আযাবের দিকে? তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে উদাসীন নন।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۫ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿۸۶﴾

৮৬. এরাই তারা, যারা আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে ক্রয় করে নিয়েছে। সুতরাং তাদের শাস্তি কিছুমাত্র লাঘব করা হবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

[১১]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۫ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ۫ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ﴿۸۷﴾

৮৭. নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে পাঠিয়েছি আর মারয়ামের পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দিয়েছি এবং রূহুল কুদসের মাধ্যমে তাকে শক্তিশালী করেছি।[৫৯] অত:পর এটা কেমন আচরণ যে, যখনই কোনও রাসূল তোমাদের কাছে এমন কোন বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যা তোমাদের মনের চাহিদা

শত্রুর হাতে কোন ইয়াহুদী বন্দী হলে তারা সকলে মিলে তার মুক্তিপণ আদায় করত ও তাকে ছাড়িয়ে আনত। তারা এর কারণ বর্ণনা করত যে, তাওরাত আমাদেরকে হুকুম দিয়েছে, কোন ইয়াহুদী শত্রুর হাতে বন্দী হলে আমরা যেন তার মুক্তির ব্যবস্থা করি। কুরআন মাজীদ বলছে, যে তাওরাত এই হুকুম দিয়েছে, সেই তাওরাত তো এই হুকুমও দিয়েছিল যে, তোমরা একে অন্যকে হত্যা করবে না এবং একে অন্যকে ঘর-বাড়ি থেকে বের করবে না। এসব আদেশ তো তোমরা পরিত্যাগ করলে আর কেবল মুক্তিপণ দেওয়ার আদেশকে মান্য করলে!

৫৯. 'রূহুল কুদ্স'-এর শাব্দিক অর্থ 'পবিত্র আত্মা'। কুরআন মাজীদে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের জন্য এ উপাধি ব্যবহৃত হয়েছে (সূরা নাহল ১৬ : ১০২)। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে তিনি এভাবে সাহায্য করতেন যে, শত্রুদের থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি তাঁর সাথে সাথে থাকতেন।

সম্মত নয়, তখনই তোমরা দম্ভ দেখিয়েছ? অতএব কতক (নবী)-কে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছ এবং কতককে হত্যা করতে থেকেছ।

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۸۸﴾

৮৮. আর এসব লোক বলে, আমাদের অন্তর আচ্ছাদনের ভেতর।[৬০] কখনও নয়; বরং তাদের কুফ্‌রীর কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। এ কারণে তারা অল্পই ঈমান আনে।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۫ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿۸۹﴾

৮৯. যখন তাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে এমন কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) আসল, যা তাদের কাছে পূর্ব থেকে যা আছে, তার (অর্থাৎ তাওরাতের) সমর্থন করে (তখন তাদের আচরণ লক্ষ্য করে দেখ), যদিও পূর্বে এরা কাফিরদের (অর্থাৎ পৌত্তলিকদের) বিরুদ্ধে (এ কিতাবের মাধ্যমে) আল্লাহর কাছে বিজয় প্রার্থনা করত,[৬১] কিন্তু যখন সেই জিনিস আসল, যাকে তারা চিনতে পেরেছিল, তখন তাকে অস্বীকার করে বসল। সুতরাং এমন কাফিরদের প্রতি আল্লাহর লানত।

---

৬০. তাদের এ বাক্যের এক ব্যাখ্যা এমনও হতে পারে যে, এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল অহমিকা প্রকাশ। তারা বলতে চাইত, আমাদের অন্তরের উপর এক ধরনের নিরোধ-আবরণ আছে, যদ্দরুণ কোন গলত কথা আমাদের অন্তরে পৌঁছাতে পারে না। আবার এমন ব্যাখ্যাও হতে পারে যে, এর দ্বারা তারা মুসলিমদেরকে নিজেদের থেকে নিরাশ করতে চাইত। এ উদ্দেশ্যে তারা ঠাট্টা করে বলত, তোমরা মনে করে নাও আমাদের অন্তরে গেলাপ লাগানো আছে। কাজেই তোমরা আমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার ফিকির করো না।

৬১. পৌত্তলিকদের সাথে ইয়াহুদীদের যখন কোন যুদ্ধ হত বা বিতর্ক দেখা দিত, তখন তারা দু'আ করত, হে আল্লাহ! আপনি তাওরাতে যে শেষ নবীর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন, তাকে শীঘ্র পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা তার সাথে মিলে পৌত্তলিকদের উপর জয়ী হতে পারি। কিন্তু যখন সেই নবী (মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শুভাগমন হল, তখন তারা এই ঈর্ষার কবলে পড়ল যে, তাকে বনী ইসরাঈলের মধ্যে না পাঠিয়ে বনী ইসমাঈলে কেন পাঠানো হল? তারা জানত শেষ নবীর যে সকল আলামত তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে, সবই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। এতদসত্ত্বেও তারা তাকে মানতে অস্বীকার করল।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩٠﴾

৯০. কতই না নিকৃষ্ট সে মূল্য যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রি করেছে। তা এই যে, তারা আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবকে কেবল এই অন্তর্জ্বালার কারণে অস্বীকার করছে যে, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহের কোন অংশ (অর্থাৎ ওহী) নিজ বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা কেন নাযিল করবেন? সুতরাং তারা (তাদের এ অন্তর্দাহের কারণে) গযবের উপর গযব নিয়ে ফিরল।[৬২] বস্তুত কাফিরগণ লাঞ্ছনাকর শাস্তিরই উপযুক্ত।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ؕ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩١﴾

৯১. যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যে কালাম নাযিল করেছেন তার প্রতি ঈমান আন, তখন তারা বলে, আমরা তো (কেবল) সেই কালামের উপরই ঈমান রাখব, যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে (অর্থাৎ তাওরাত)। আর এছাড়া (অন্যান্য যত আসমানী কিতাব আছে, সে) সব কিছুকে তারা অস্বীকার করে। অথচ তাও সত্য এবং তা তাদের কাছে যে কিতাব আছে, তার সমর্থনও করে। (হে নবী) তুমি তাদের বলে দাও, তোমরা যদি বাস্তবিকই (তাওরাতের উপর) ঈমান রাখতে তবে পূর্বে আল্লাহর নবীগণকে হত্যা করছিলে কেন?

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯২. আর স্বয়ং মূসা উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীসহ তোমাদের কাছে এসেছিল। অত:পর তোমরা তার পশ্চাতে এই অবিচারে লিপ্ত হলে যে, তোমরা বাছুরকে মাবুদ বানিয়ে নিলে।

---

৬২. অর্থাৎ এক গযবের উপযুক্ত হয়েছিল তাদের কুফুরীর কারণে। আর তাদের উপর দ্বিতীয় গযব পতিত হল তাদের হিংসা-বিদ্বেষের কারণে।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۗ وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖۤ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۹۳﴾

৯৩. এবং (সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম এবং তোমাদের উপর তূর (পাহাড়)কে উত্তোলন করলাম (এবং বললাম) আমি তোমাদেরকে যা-কিছু দিয়েছি তা শক্ত করে ধর। এবং (যা-কিছু বলা হয়, তা) শোন।[৬৩] তারা বলল, আমরা (আগেও) শুনেছিলাম, কিন্তু আমল করিনি (এখনও সে রকমই করব) আর (প্রকৃতপক্ষে) তাদের কুফরের অশুভ পরিণামে তাদের অন্তরে বাছুর জেঁকে বসেছিল আপনি (তাদেরকে) বলে দিন, তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক, তবে তোমাদের ঈমান তোমাদেরকে যে বিষয়ের নির্দেশ দেয় তা কতই না মন্দ!

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۹۴﴾

৯৪. আপনি (তাদেরকে) বলে দিন, আল্লাহর নিকট আখিরাতের নিবাস যদি অপরাপর মানুষ ব্যতীত কেবল তোমাদেরই জন্য নির্দিষ্ট হয় (যেমন তোমরা বলছ), তবে তোমরা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করে দেখাও– যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًاۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿۹۵﴾

৯৫. কিন্তু (আমি বলে দিচ্ছি) তারা তাদের যে কৃতকর্ম সামনে পাঠিয়েছে, সে কারণে কখনও এরূপ আকাঙ্ক্ষা করবে না।[৬৪] আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

---

৬৩. এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে এ সূরারই ৬৩ নং আয়াতের টীকায় বর্ণিত হয়েছে। আর বাছুরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ৫৩ নং আয়াতের টীকায়।

৬৪. এটাও ছিল কুরআন মাজীদের পক্ষ হতে একটি চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নেওয়া তাদের জন্য কিছুমাত্র কঠিন ছিল না। তারা অবলীলায় অন্ততপক্ষে মুখে মুখে হলেও প্রকাশ্যে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করে দেখাতে পারত, কিন্তু তারা সে ধৃষ্টতা দেখায়নি। কেননা তারা জানত এ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। কাজেই এরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে তা তৎক্ষণাৎ তাদেরকে কবরে পৌঁছে দেবে।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬. (বরং) নিশ্চয়ই তুমি বেঁচে থাকার প্রতি তাদেরকে অন্যান্য মানুষ অপেক্ষা বেশি লোভাতুর পাবে- এমনকি মুশরিকদের চেয়েও বেশি। তাদের একেক জন কামনা করে যদি এক হাজার বছর আয়ু লাভ করত, অথচ দীর্ঘায়ু লাভ তাকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আর তারা যা-কিছুই করছে আল্লাহ তা ভালোভাবে দেখছেন।

[১২]

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٧﴾

৯৭. (হে নবী) বলে দিন, কোনও ব্যক্তি যদি জিবরাঈলের শত্রু হয়,[৬৫] তবে (হোক না!) সে তো আল্লাহর অনুমতিক্রমেই এ কালাম তোমার অন্তরে অবতীর্ণ করেছে, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থন করে এবং যা ঈমানদারদের জন্য সাক্ষাৎ হিদায়াত ও সুসংবাদ।

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰىلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٩٨﴾

৯৮. যদি কোনও ব্যক্তি আল্লাহর, তার ফিরিশতাদের, তাঁর রাসূলগণের এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু হয়, তবে (সে শুনে রাখুক) আল্লাহ কাফিরদের শত্রু।

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ﴿٩٩﴾

৯৯. নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি এমন সব আয়াত নাযিল করেছি, যা সত্যকে পরিস্ফুটকারী। সেগুলোকে অস্বীকার করে কেবল অবাধ্যরাই।

---

৬৫. কোনও কোনও ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল, আপনার কাছে যিনি ওহী নিয়ে আসেন সেই জিবরাঈলকে আমরা আমাদের শত্রু মনে করি। কেননা তিনি আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন কঠিন বিধান নিয়ে আসতেন। আপনার কাছে যদি অন্য কোন ফিরিশতা ওহী নিয়ে আসত তবে আমরা বিবেচনা করতে পারতাম। তাদের এ কথার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। জবাবের সারমর্ম এই যে, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তো কেবল বার্তাবাহক। তিনি যা কিছু আনেন তা আল্লাহ তাআলার হুকুমেই আনেন। সুতরাং তার প্রতি শত্রুতা পোষণের যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই এবং তার কারণে আল্লাহ তাআলার কালামকে প্রত্যাখ্যান করারও কোন অর্থ নেই।

أَوَكُلَّمَا عٰهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾

১০০. তো এটা কেমন আচরণ যে, যখনই তারা কোনও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সর্বদা তাদের একটি দল তা ভেঙ্গে ছুঁড়ে মেরেছে; বরং তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনে না।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

১০১. আর যখন তাদের নিকট আল্লাহর তরফ থেকে এক রাসূল আসল, যে তাদের নিকট যা আছে (অর্থাৎ তাওরাত), তার সমর্থন করছিল, তখন কিতাবীদের মধ্য হতে একটি দল আল্লাহর কিতাব (তাওরাত ও ইনজীল)কে এভাবে পেছনে নিক্ষেপ করল, যেন তারা কিছু জানতই না (অর্থাৎ তাতে শেষ নবীর যেসব নিদর্শন আছে তা যেন জানতই না)।

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِينُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هٰرُوتَ وَمٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ أَحَدٍ

১০২. আর তারা (বনী ইসরাঈল) সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর শাসনামলে শয়তানগণ যা-কিছু (মন্ত্র) পড়ত তার পেছনে পড়ে গেল। সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) কোন কুফর করেনি। অবশ্য শয়তানগণ মানুষকে যাদু শিক্ষা দিয়ে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছিল।[৬৬] তাছাড়া (বনী ইসরাঈল) বাবিল শহরে হারূত ও মারূত নামক ফিরিশতাদ্বয়ের প্রতি যা নাযিল

---

৬৬. এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদীদের আরেকটি দুষ্কর্মের প্রতি ইশারা করেছেন। তা এই যে, যাদু-টোনার পেছনে পড়া শরীআতে সম্পূর্ণ অবৈধ ছিল। বিশেষত যাদুর মন্ত্রসমূহে যদি শিরকী কথাবার্তা থাকে, তবে সে যাদু কুফরের নামান্তর। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের আমলে কিছু শয়তান, যাদের মধ্যে জিন্ন ও মানুষ উভয়ই থাকতে পারে, কতক ইয়াহুদীকে ফুসলানি দিল যে, হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের রাজত্বের সকল রহস্য যাদুর মধ্যে নিহিত। তোমরা যদি যাদু শিক্ষা কর, তবে তোমাদেরও বিস্ময়কর ক্ষমতা অর্জিত হবে। সুতরাং তারা যাদুর তালীম নিতে ও তা কাজে লাগাতে শুরু করে দিল। অথচ যাদু শেখা যে কেবল অবৈধ ছিল তাই নয়, বরং তার কোনও কোনও পদ্ধতি ছিল কুফরী পর্যায়ের। ইয়াহুদীরা দ্বিতীয় মহাপাপ করেছিল এই যে, তারা খোদ

حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ؕ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا

হয়েছিল[৬৭] তার পেছনে পড়ে গেল। এ ফিরিশতাদ্বয় কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন তালীম দিত না, যতক্ষণ না বলে দিত, আমরা কেবলই পরীক্ষাস্বরূপ (প্রেরিত হয়েছি)। সুতরাং তোমরা (যাদুর পেছনে পড়ে) কুফরী অবলম্বন করো না। তথাপি তারা তাদের থেকে এমন জিনিস শিক্ষা করত, যা দ্বারা

হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামকেই একজন যাদুকর সাব্যস্ত করেছিল এবং তাঁর সম্পর্কে প্রচার করেছিল তিনি শেষ জীবনে মূর্তিপূজা শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এসব অপবাদমূলক কাহিনী তারা তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহেও জুড়ে দিয়েছিল, যা বাইবেলে আজও পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। বাইবেলে এখনও পর্যন্ত তাঁর মুরতাদ হওয়ার বিবরণ বিদ্যমান (দ্র. অধ্যায় : ইয়াহুদী রাজাদের বৃত্তান্ত ১১ : ১-২১)। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। কুরআন মাজীদের এ আয়াতে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের প্রতি আরোপিত এ পঙ্কিল অপবাদকে খণ্ডন করা হয়েছে। এর দ্বারা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়, কুরআন মাজীদ সম্পর্কে যারা অপবাদ দিত যে, 'এটা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের কিতাব থেকে আহরিত', তাদের সে অপবাদ কতটা মিথ্যা! এ স্থলে কুরআন মাজীদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইয়াহুদী ও নাসারাদের কিতাবসমূহকে রদ করছে। সত্য কথা হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এমন কোনও মাধ্যম ছিল না, যা দ্বারা তিনি নিজে ইয়াহুদীদের কিতাবে কী লেখা আছে তা জেনে নেবেন। এটা জানার জন্য তাঁর কাছে কেবল ওহীরই সূত্র ছিল। সুতরাং এ আয়াত তাঁর ওহীপ্রাপ্ত নবী হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল। এর দ্বারা তিনি ইয়াহুদীদের কিতাবে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের প্রতি কি ধরনের অপবাদ আরোপ করা হয়েছে সে কথা জানিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং অতি দৃঢ়তার সাথে তা খণ্ডনও করেছেন।

৬৭. বাবিল ছিল ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ নগর। এক কালে সেখানে যাদু বিদ্যার খুব চর্চা হত। ইয়াহুদীরাও এ নাজায়েয কাজে অতি ন্যাক্কারজনকভাবে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। আম্বিয়া কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন তাদেরকে যাদু চর্চায় লিপ্ত হতে নিষেধ করলে তারা তাতে কর্ণপাত করত না। এর চেয়েও খতরনাক কথা হল তারা যাদুকরদের ভোজবাজিকে মুজিযা মনে করে তাদেরকে নিজেদের ধর্মগুরু বানিয়ে নিয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাআলা হারূত ও মারূত নামক দু'জন ফিরিশতাকে মানব আকৃতিতে পৃথিবীতে পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল তারা মানুষকে যাদু কী জিনিস তা বুঝিয়ে দেবেন এবং মুজিযার সাথে যে তার কোন সম্পর্ক নেই তা পরিষ্কার করে দেবেন। মুজিযা তো সরাসরি আল্লাহ তাআলার কাজ। বাহ্যিক কোনও কারণ দ্বারা তা সৃষ্টি হয় না। পক্ষান্তরে যাদু দ্বারা যেসব ভোজবাজি দেখানো হয়, তা ইহ-জাগতিক আসবাব-উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। এ বিষয়টা স্পষ্ট করার জন্য ফিরিশতাদ্বয়কে যাদুর বিভিন্ন পদ্ধতিও বর্ণনা করতে হত, যাতে দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় তা কিভাবে 'কার্য-কারণ' সূত্রের সাথে সম্পৃক্ত। তবে তারা যখন সেসব পদ্ধতির ব্যাখ্যা করতেন, তখন মানুষকে সাবধান করে দিতেন যে, স্মরণ রেখ তোমরা যাদুর এসব পদ্ধতিকে

بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ أَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত, (তবে প্রকাশ থাকে যে,) তারা তার মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কারও কোন ক্ষতি সাধন করতে পারত না।[৬৮] (কিন্তু) তারা এমন জিনিস শিখত, যা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল এবং উপকারী ছিল না। আর তারা এটাও ভালো করে জানত যে, যে ব্যক্তি তার খরিদ্দার হবে আখিরাতে তার কোন হিস্যা থাকবে না। বস্তুত তারা যার বিনিময়ে নিজেদেরকে বিক্রি করেছে তা অতি মন্দ। যদি তাদের (এ বিষয়ের প্রকৃত) জ্ঞান থাকত।[৬৯]

কাজে লাগাবে বলে কিন্তু এসব তোমাদের সামনে বর্ণনা করছি না; বরং এই উদ্দেশ্যে বর্ণনা করছি, যাতে যাদু ও মুজিযার পার্থক্য তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় এবং তোমরা যাদু থেকে বেঁচে থাকতে পার। দেখ এ হিসেবে তোমাদের কাছে আমাদের উপস্থিতি কিন্তু তোমাদের জন্য একটা পরীক্ষা। লক্ষ্য করা হবে, আমাদের কথা উপলব্ধি করার পর তোমরা যাদু থেকে দূরে থাক, না যাদুর পদ্ধতি শিখে নিয়ে তা কাজে লাগাতে শুরু কর।

যাদু ও মুজিযার মধ্যে পার্থক্যকরণের এ কাজ নবীদের পরিবর্তে ফিরিশতাদের দ্বারা যে নেওয়া হল, দৃশ্যত তা এ কারণে যে, যাদুর ফর্মূলা শিক্ষা দেওয়া নবীদের জন্য শোভন ছিল না, তাতে তার উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক। ফিরিশতাদের উপর যেহেতু শরয়ী কোন বিধি-বিধান বর্তায় না, তাই তাদের দ্বারা এ রকম তাকবীনী বা রহস্য-জগতীয় কাজ-কর্ম নেওয়ার অবকাশ আছে। যা হোক, অবাধ্য লোকেরা ফিরিশতাদের কথায় কোনও কর্ণপাত তো করলই না, উল্টো তাদের বাতলানো ফর্মূলাসমূহকে যাদু করার কাজে ব্যবহার করল এবং তাও এমন সব ঘৃণ্য কাজে যা এমনিতেও হারাম ছিল, যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তালাকের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া।

৬৮. এখান থেকে একটি অন্তবর্তী কথা হিসেবে একটি মূলনীতি বিষয়ক ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তা এই যে, যাদুতে বিশ্বাসীগণ মনে করত যাদু স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তির অধিকারী। আল্লাহর হুকুম ছাড়া আপনা-আপনিই তা থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল প্রকাশ পায়। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করুন বা না-ই করুন যাদু তার কাজ করবেই। এটা মূলত এক কুফরী আকীদা ছিল। তাই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, পৃথিবীর অন্যান্য কারণের মত যাদুও একটা কারণ মাত্র। পৃথিবীর কোনও কারণই তার 'কার্য' বা ফল ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকাশ করতে পারে না, যতক্ষণ না তার সাথে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা সংশ্লিষ্ট হয়। জগতের কোনও জিনিসের মধ্যেই সত্তাগতভাবে উপকার বা ক্ষতিসাধনের শক্তি নেই। সুতরাং কোনও জালিম যদি কারও প্রতি জুলুম করতে চায়, তবে সে আল্লাহ তাআলার শক্তি ও ইচ্ছা ছাড়া কিছুই করতে পারবে না। তবে এ জগত যেহেতু পরীক্ষার স্থান, তাই এখানে আল্লাহ

১০৩. এবং (এর বিপরীতে) তারা যদি ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্তব্য সওয়াব নিঃসন্দেহে অনেক উৎকৃষ্ট। যদি তাদের (এ সত্য সম্পর্কে প্রকৃত) জ্ঞান থাকত!

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

[১৩]

১০৪. হে ঈমানদারগণ! (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে) 'রা'ইনা' বলো না; বরং 'উন্‌জুরনা' বলো[৭০] এবং শ্রবণ করো। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

তাআলার রীতি হল কেউ যখন আল্লাহ তাআলার কোনও নাফরমানীর কাজ করতে চায় বা কারও প্রতি জুলুম করতে চায়, তখন আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি-রহস্যের অনুকূল মনে করলে নিজ ইচ্ছায় সে কাজ করিয়ে দেন। এ হিসেবেই জালিম গুনাহগার এবং মজলুম সওয়াবপ্রাপ্ত হয়। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা যদি তাকে সে কাজের ক্ষমতাই না দেন, তবে পরীক্ষা হবে কি করে? সুতরাং দুনিয়ায় যত গুনাহের কাজ হয়, তা আল্লাহ তাআলারই শক্তি ও ইচ্ছায় হয়, যদিও তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকে না। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও তাঁর সন্তুষ্টির মধ্যে পার্থক্য এটাই যে, ইচ্ছা তো ভাল-মন্দ সব কাজের সাথেই সম্পৃক্ত হয়, কিন্তু তাঁর সন্তুষ্টি সম্পৃক্ত হয় কেবল বৈধ ও সওয়াবের কাজের সাথে।

৬৯. এ আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছিল যে, তারা জানে যারা শিরকী যাদুর খরিদ্দার হবে আখিরাতে তাদের কোন হিস্যা থাকবে না। কিন্তু আয়াতের শেষে বলা হয়েছে 'তারা যদি জানত'। বোঝা যাচ্ছে বিষয়টা তারা জানত না। আপাতদৃষ্টিতে উভয় বক্তব্যের মধ্যে বিরোধ লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনও বিরোধ নেই। কেননা এ বর্ণনারীতি দ্বারা মূলত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যে ইলম ও জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করা হয় না, তা ইলম ও জ্ঞান নামে অভিহিত হওয়ারই যোগ্য নয়, বরং সে জ্ঞান অজ্ঞতার শামিল। সুতরাং তারা একথা জানে তো বটে, কিন্তু তাদের কাজ যখন এর বিপরীত, তখন এ জানাটা কী কাজের হল? যদি তারা প্রকৃত জ্ঞান রাখত, তবে সে অনুযায়ী কাজও করত।

৭০. মদীনায় বসবাসকারী ইয়াহুদীদের একটি দল ছিল অতিশয় দুষ্ট। তারা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করত, তখন তাকে লক্ষ্য করে বলত 'রাইনা' (راعنا)। আরবীতে এর অর্থ 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন'। এ হিসেবে শব্দটিতে কোন দোষ নেই এবং এর মধ্যে বেআদবীরও কিছু নেই। কিন্তু ইয়াহুদীদের ধর্মীয় ভাষা হিব্রুতে এরই কাছাকাছি একটি শব্দ অভিশাপ ও গালি অর্থে ব্যবহৃত হত। তাছাড়া এ শব্দটিকেই যদি "ع" এর দীর্ঘ উচ্চারণে পড়া হয়, তবে راعينا হয়ে যায়, যার অর্থ 'আমাদের রাখাল'। মোটকথা ইয়াহুদীদের আসল উদ্দেশ্য ছিল শব্দটিকে মন্দ অর্থে ব্যবহার করা। কিন্তু আরবীতে যেহেতু বাহ্যিকভাবে শব্দটিতে কোনও দোষ ছিল না, তাই কতিপয় সরলপ্রাণ

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۱۰۵﴾

১০৫. কাফির ব্যক্তিবর্গ, তা কিতাবীদের অন্তর্ভুক্ত হোক বা মুশরিকদের, পসন্দ করে না যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। অথচ আল্লাহ যাকে চান স্বীয় রহমতের দ্বারা বিশিষ্ট করে নেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহের মালিক।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۰۶﴾

১০৬. আমি যখনই কোন আয়াত মানসূখ (রহিত) করি বা তা ভুলিয়ে দেই, তখন তার চেয়ে উত্তম বা সে রকম (আয়াত) আনয়ন[৭১] করি। তোমরা কি জান না আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন?

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۱۰۷﴾

১০৭. তুমি কি জান না আল্লাহ তাআলা এমন সত্তা যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব কেবল তাঁরই এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই?

মুসলিমও শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করে দেয়। এতে ইয়াহুদীরা বড় খুশী হত এবং ভেতরে ভেতরে মুসলিমদের নিয়ে মজা করত। তাই এ আয়াতে মুসলিমদেরকে তাদের এ দুষ্কর্ম সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তাদেরকে এ শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এ শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে যে, যে শব্দের ভেতর কোনও মন্দ অর্থের অবকাশ থাকে বা যা দ্বারা ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকে, সে রকম শব্দ ব্যবহার করা সমীচীন নয়। পরবর্তী আয়াতে এ সকল হঠকারিতাপূর্ণ আচরণের আসল কারণও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর তা এই যে, নবুওয়াতের মহা নিয়ামত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেন দান করা হল সেজন্য তারা ঈর্ষান্বিত ছিল। সেই ঈর্ষার কারণেই তারা এসব করে থাকে।

৭১. এটা আল্লাহ তাআলার শাশ্বত রীতি যে, তিনি প্রত্যেক যুগে সেই যুগের পরিস্থিতি অনুসারে শাখাগত বিধানাবলীতে রদ-বদল করে থাকেন। যদিও তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি দ্বীনের মৌলিক আকীদাসমূহ সকল যুগে একই রকম থেকেছে, কিন্তু বাস্তব আমল ও কর্মগত যে সকল বিধান হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দেওয়া হয়েছিল, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সময়ে তার কতককে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে তার মধ্যে আরও বেশি রদ-বদল করা হয়েছে। এমনিভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রথমে যখন নবুওয়াত দান করা হয়, তখন তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রমের সামনে অনেকগুলো ধাপ ছিল, যা অতিক্রম করা ছাড়া সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। সেই সঙ্গে মুসলিমদের সম্মুখেও নানা রকমের সঙ্কট বিদ্যমান ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা বিধি-বিধান দানের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾

১০৮. তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেই রকমের প্রশ্ন করতে চাও, যেমন প্রশ্ন পূর্বে মূসাকে করা হয়েছিল?[৭২] যে ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফর অবলম্বন করে, নিশ্চয়ই সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾

১০৯. (হে মুসলিমগণ!) কিতাবীদের অনেকেই তাদের কাছে সত্য পরিস্ফুট হওয়ার পরও তাদের অন্তরের ঈর্ষাবশত কামনা করে, যদি তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় কাফির বানিয়ে দিতে পারত! সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, যাবৎ না আল্লাহ্ স্বয়ং নিজ ফায়সালা পাঠিয়ে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ

১১০. এবং সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং (স্মরণ রেখ) তোমরা যে-কোনও সৎকর্ম নিজেদের কল্যাণার্থে

পন্থা অবলম্বন করেন। কখনও কোনও ক্ষেত্রে একটি বিধান দিয়েছেন। পরে আবার সেখানে অন্য বিধান এসে গেছে, যেমন কিবলার বিধানের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সামনে ১১৫ নং আয়াতে এর কিছুটা বিবরণ আসবে। শাখাগত বিধানাবলীতে এ জাতীয় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনকে পরিভাষায় 'নাস্খ' বলা হয় (যে বিধানকে পরিবর্তন করা হয় তাকে 'মানসূখ' এবং পরিবর্তে যা দেওয়া হয় তাকে 'নাসিখ' বলা হয়)।

কাফিরগণ, বিশেষত ইয়াহুদীরা প্রশ্ন তুলেছিল যে, সকল বিধানই যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তখন তার মধ্যে এসব রদ-বদল কেন? এ আয়াত তাদের সে প্রশ্নের উত্তরে নাযিল হয়েছে। উত্তরের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তাআলা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্বীয় হিকমত ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী এসব রদ-বদল করে থাকেন। আর যে বিধানই মানসূখ বা রহিত করা হয় তদস্থলে এমন বিধান দেওয়া হয়, যা পরিবর্তিত পরিস্থিতির পক্ষে বেশি উপযোগী ও অধিকতর ভালো। অন্ততপক্ষে তা পূর্ববর্তী বিধানের সমান ভালো তো অবশ্যই হয়।

৭২. যে সকল ইয়াহুদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনার পরিবর্তে তাকে নানা রকম প্রশ্ন দ্বারা উত্যক্ত করতে সচেষ্ট ছিল; তাদের সাথে সাথে মুসলিমদেরকেও এ আয়াতে সবক দেওয়া হচ্ছে যে, ইয়াহুদীরা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও তাকে নানা রকম অবান্তর প্রশ্ন করত ও অযৌক্তিক দাবী-দাওয়া পেশ করত। সুতরাং তোমরা এরূপ করো না।

إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٠﴾

সম্মুখে প্রেরণ করবে, আল্লাহর কাছে তা পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যে-কোনও কাজ কর আল্লাহ তা দেখছেন।

وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١١١﴾

১১১. এবং তারা (ইয়াহুদী ও নাসারাগণ) বলে, জান্নাতে ইয়াহুদী ও নাসারাগণ ছাড়া অন্য কেউ কখনও প্রবেশ করবে না।[৭৩] এটা তাদের আকাঙ্ক্ষা মাত্র। আপনি তাদেরকে বলে দিন তোমরা যদি (তোমাদের এ দাবীতে) সত্যবাদী হও, তবে নিজেদের কোনও দলীল পেশ কর।

بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২. কেন নয়? (নিয়ম তো এই যে,) যে ব্যক্তিই নিজ চেহারা আল্লাহর সামনে নত করবে এবং সে সৎকর্মশীলও হবে, সে নিজ প্রতিপালকের কাছে তার প্রতিদান পাবে। আর এরূপ লোকদের কোনও ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

[১৪]

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۪ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩. ইয়াহুদীরা বলে, খ্রিস্টানদের (ধর্মের) কোন ভিত্তি নেই এবং খ্রিস্টানরা বলে, ইয়াহূদীদের (ধর্মের) কোন ভিত্তি নেই। অথচ এরা সকলে (আসমানী) কিতাব পড়ে। অনুরূপ (সেই মুশরিকগণ) যাদের কাছে আদৌ কোন (আসমানী) জ্ঞান নেই, তারাও এদের (কিতাবীদের) মত কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। সুতরাং তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে আল্লাহই কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সে বিষয়ে ফায়সালা করবেন।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ

১১৪. সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে আছে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে আল্লাহর নাম নিতে বাধা প্রদান করে

---

৭৩. অর্থাৎ ইয়াহুদীরা বলে, কেবল ইয়াহুদীরাই জান্নাতে যাবে আর খ্রিস্টানরা বলে, কেবল খ্রিস্টানরাই জান্নাতে যাবে।

لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ۬ؕ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۱۴﴾

এবং তাকে বিরাণ করার চেষ্টা করে? এরূপ লোকের তো এ অধিকারই নেই যে, তাতে ভীতি-বিহ্বল না হয়ে প্রবেশ করবে।[৭৪] এরূপ লোকদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহা শাস্তি।

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۗ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۱۵﴾

১১৫. পূর্ব ও পশ্চিম সব আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাবে সেটা আল্লাহরই দিক।[৭৫] নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ।

---

৭৪. পূর্বে ইয়াহূদী, নাসারা ও আরব মুশরিক– এ তিনও সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ তিনও সম্প্রদায় কোনও না কোনও কালে এবং কোনও বা কোনও রূপে আল্লাহ তাআলার ইবাদতখানাসমূহের মর্যাদা নষ্ট করেছে। উদাহরণত খ্রিস্টান সম্প্রদায় বাদশাহ তায়তূসের আমলে বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর আক্রমণ করে তাতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। বাদশাহ আবরাহা, যে কিনা নিজেকে একজন খ্রিস্টান বলে দাবী করত, বাইতুল্লাহর উপর হামলা চালিয়ে তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়েছে। মক্কার মুশরিকগণ মুসলিমদেরকে মসজিদুল হারামে সালাত আদায়ে বাধা প্রদান করত। আর ইয়াহূদীরা বাইতুল্লাহর পবিত্রতা অস্বীকার করে কার্যত মানুষকে তার অভিমুখী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করেছিল। কুরআন মাজীদ বলছে, এক দিকে তো এসব সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটির দাবী হচ্ছে, কেবল তারাই জান্নাতে প্রবেশের হকদার, অন্যদিকে তাদের অবস্থা এই যে, তারা আল্লাহর ইবাদতে বাধা প্রদান কিংবা ইবাদতখানাসমূহকে ধ্বংস করার তৎপরতায় লিপ্ত। এ আয়াতের পরবর্তী বাক্যটি তাৎপর্যপূর্ণ। তার বাহ্যিক অর্থ তো এই যে, তাদের তো উচিত ছিল আল্লাহর ঘরে অত্যন্ত বিনীত ও ভীত অবস্থায় প্রবেশ করা; দর্পিতভাবে তাকে বিরাণ করা বা মানুষকে তার ভেতর ইবাদত করতে বাধা দেওয়া কিছুতেই সমীচীন ছিল না। এতদসঙ্গে এর ভেতর এই সূক্ষ্ম ইশারাও থাকতে পারে যে, অচিরেই সে দিন আসবে, যখন এই অহংকারী লোকেরা, যারা মানুষকে আল্লাহর ঘরে প্রবেশে বাধা দিচ্ছে, সত্যপন্থীদের সামনে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হবে। এমনকি সত্যপন্থীদের যেসব স্থানে প্রবেশে বাধা দেয়, সে সকল স্থানে তাদের নিজেদেরই ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রবেশ করতে হবে। সুতরাং মক্কা বিজয়ের পর মক্কাবাসী কাফিরদের এ রকম পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

৭৫. উপরে যে তিনটি সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে কিবলা নিয়েও বিরোধ ছিল। কিতাবীগণ বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা মনে করত আর মুশরিকগণ বাইতুল্লাহকে। মুসলিমগণও বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে সালাত আদায় করত আর এটা ইয়াহূদীদের অপসন্দ ছিল। মুসলিমদেরকে একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা বানানোর হুকুম দেওয়া হলে ইয়াহূদীরা এই বলে সন্তোষ প্রকাশ করল যে, দেখ মুসলিমগণ আমাদের কথা মানতে বাধ্য হয়ে গেছে। তারপর আবার বাইতুল্লাহকে চূড়ান্তরূপে কিবলা বানিয়ে দেওয়া হল। দ্বিতীয় পারার শুরুতে ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿١١٦﴾

১১৬. তারা বলে, আল্লাহ পুত্র গ্রহণ করেছেন, (অথচ) তাঁর সত্তা (এ জাতীয় জিনিস থেকে পবিত্র; বরং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তাঁরই। সকলেই তাঁর অনুগত।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿١١٧﴾

১১৭. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের অস্তিত্বদাতা। তিনি যখন কোনও বিষয়ের ফায়সালা করেন তখন কেবল এতটুকু বলেন যে, 'হয়ে যাও', অমনি তা হয়ে যায়।[৭৬]

এ আয়াত দৃশ্যত সেই সময় নাযিল হয়েছিল যখন মুসলিমগণ বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করত। জানানো উদ্দেশ্য এই যে, কোনও দিকই সত্তাগতভাবে কোনও রকম মর্যাদা ও পবিত্রতার ধারক নয়। পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁরই হুকুম বরদার, আল্লাহ তাআলা কোনও এক দিকে সীমাবদ্ধ নন। তিনি সর্বত্র উপস্থিত। সুতরাং তিনি যে দিকেই মুখ করার হুকুম দেন, বান্দার কাজ সে হুকুম তামিল করা। এ কারণেই কোনও লোক যদি এমন স্থানে থাকে, যেখানে কিবলা ঠিক কোন দিকে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না, সে ব্যক্তি সেখানে নিজ অনুমানের ভিত্তিতে যে দিককে কিবলা মনে করে সালাত আদায় করবে তার সালাত সহীহ হয়ে যাবে। এমনকি পরে যদি জানা যায় সে যে দিকে ফিরে সালাত আদায় করেছে কিবলা সে দিকে ছিল না, তবু তার সালাত পুনরায় আদায় করার প্রয়োজন নেই। কেননা সে ব্যক্তি নিজ সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার হুকুম তামিল করেছে। বস্তুত কোন স্থান বা কোনও দিক যে মর্যাদাসম্পন্ন হয়, তা আল্লাহ তাআলার হুকুমের কারণেই হয়। সুতরাং কিবলা নির্দিষ্টকরণের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা যদি নিজ হুকুম পরিবর্তন করে থাকেন, তবে তাতে কোনও সম্প্রদায়ের হার-জিতের কোন প্রশ্ন নেই। এ রদ-বদল মূলত এ বিষয়টা স্পষ্ট করার জন্যই করা হচ্ছে যে, কোনও দিকই সত্তাগতভাবে পবিত্র ও কাঙ্ক্ষিত নয়। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন। ভবিষ্যতে আল্লাহ তাআলা যদি পুনরায় বাইতুল্লাহর দিকে ফেরার হুকুম দেন, তবে তা বিস্ময় বা আপত্তির কোন কারণ হওয়া উচিত নয়।

৭৬. খ্রিস্টান সম্প্রদায় হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলে। ইয়াহুদীদের একটি দলও হযরত উযায়ের আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলত। অন্য দিকে মক্কার মুশরিকগণ ফিরিশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলত। এ আয়াত তাদের সকলের ধারণা খণ্ডন করছে। বোঝানো হচ্ছে যে, সন্তানের প্রয়োজন তো কেবল তার, যে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তাআলার এমন কোন মুখাপেক্ষিতা নেই। কেননা তিনি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও মালিক। কোনও কাজে তাঁর কারও সাহায্য গ্রহণের দরকার হয় না। এ অবস্থায় তিনি সন্তানের মুখাপেক্ষী হবেন কেন? এ দলীলকেই যুক্তিবিদ্যার ঢঙে এভাবে পেশ করা যায় যে, প্রত্যেক সন্তান তার পিতার অংশ হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক 'সমগ্র' তার অংশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা যেহেতু সব রকমের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তাই তাঁর সত্তা অবিভাজ্য (বাসীত), যার কোন অংশের প্রয়োজন নেই। সুতরাং তাঁর প্রতি সন্তান আরোপ করা তাকে মুখাপেক্ষী সাব্যস্ত করারই নামান্তর।

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَاۤ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿۱۱۸﴾

১১৮. যেসব লোক জ্ঞান রাখে না, তারা বলে, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে (সরাসরি) কথা বলেন না কেন? কিংবা আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে না কেন? তাদের পূর্বে যেসব লোক গত হয়েছে, তারাও তাদের কথার মত কথা বলত। তাদের সকলের অন্তর পরস্পর সদৃশ। প্রকৃতপক্ষে যে সব লোক বিশ্বাস করতে চায়, তাদের জন্য পূর্বেই আমি নিদর্শনাবলী স্পষ্ট করে দিয়েছি।

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿۱۱۹﴾

১১৯. (হে নবী!) নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সত্যসহ এভাবে প্রেরণ করেছি যে, তুমি (জান্নাতের) সুসংবাদ দেবে এবং (জাহান্নাম সম্পর্কে) ভীতি প্রদর্শন করবে। যেসব লোক (স্বেচ্ছায়) জাহান্নাম (এর পথ) বেছে নিয়েছে, তাদের সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۱۲۰﴾

১২০. ইয়াহুদী ও নাসারা তোমার প্রতি কিছুতেই খুশী হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। বলে দাও, প্রকৃত হিদায়াত তো আল্লাহরই হিদায়াত। তোমার কাছে (ওহীর মাধ্যমে) যে জ্ঞান এসেছে, তার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তবে আল্লাহর থেকে রক্ষা করার জন্য তোমার কোনও অভিভাবক থাকবে না এবং সাহায্যকারীও না।[৭৭]

---

৭৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কাফিরদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী চলবেন– এটা যদিও সম্পূর্ণ অকল্পনীয় বিষয় ছিল, তথাপি এস্থলে সেই অসম্ভব বিষয়কেই সম্ভব ধরে নিয়ে কথা বলা হয়েছে। আর এর উদ্দেশ্য এই মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া যে, আল্লাহ তাআলার নিকট কোনও ব্যক্তির গুরুত্ব ও মর্যাদা তার ব্যক্তিসত্তার কারণে নয়। ব্যক্তির গুরুত্ব ও মর্যাদা হয় আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের কারণে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ কেবল এ কারণে যে, তিনি ছিলেন আল্লাহ তাআলার সর্বাপেক্ষা অনুগত বান্দা।

الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۲۱﴾

১২১. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা যখন তা সেভাবে তিলাওয়াত করে, যেভাবে তিলাওয়াত করা উচিত তখন তারাই তার প্রতি (প্রকৃত) ঈমান রাখে।[৭৮] আর যারা তা অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত লোক।

[১৫]

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۲۲﴾

১২২. হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার সেই নিয়ামত স্মরণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম এবং এ বিষয়টি (-ও স্মরণ কর) যে, আমি জগতসমূহের মধ্যে তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿۱۲۳﴾

১২৩. এবং সেই দিনকে ভয় কর, যে-দিন কেউ কারও কোনও কাজে আসবে না, কারও থেকে কোনওরূপ মুক্তিপণ গৃহীত হবে না, কোনও সুপারিশ কারও উপকার করবে না এবং তারা কোন সাহায্যও লাভ করবে না।[৭৯]

---

৭৮. বনী ইসরাঈলের মধ্যে যদিও বেশির ভাগ লোক অবাধ্য ও অহংকারী ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক মুখলিস ও নিষ্ঠাবান লোকও ছিল। তারা তাওরাত ও ইনজীল কেবল পড়েই শেষ করত না; বরং তার দাবী অনুযায়ী কাজ করত। তারা প্রতিটি সত্য কথা গ্রহণ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। সুতরাং যখন তাদের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত পৌঁছল, তখন তারা কোনরূপ হঠকারিতা ছাড়া অকুণ্ঠচিত্তে তা গ্রহণ করে নিল। এ আয়াতে সেই সকল লোকের প্রশংসা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সবক দেওয়া হয়েছে যে, কোনও আসমানী কিতাব তিলাওয়াতের দাবী হচ্ছে তার সমস্ত হুকুম মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়ে তা তামিল করা। প্রকৃতপক্ষে তাওরাতের প্রতি বিশ্বাসী লোক তারাই, যারা তার বিধানাবলী পালনে ব্রতী থাকে এবং সে অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনে।

৭৯. বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তাআলার নানা রকম নিয়ামত ও তার বিপরীতে বনী ইসরাঈলের নিরবচ্ছিন্ন অবাধ্যতার যে বিবরণ পূর্ব থেকে চলে আসছে, ৪৭ ও ৪৮ নং আয়াতে তার সূচনা করা হয়েছিল এ আয়াতে ব্যবহৃত শব্দাবলীর কাছাকাছি শব্দ দ্বারা। তারপর সবগুলো ঘটনা বিস্তারিতভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর হিতোপদেশমূলক ভাষায় আবার সে কথাই উল্লেখ করা হচ্ছে। বোঝানো হচ্ছে যে, এসব বিষয় স্মরণ করানোর প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদের কল্যাণ কামনা। সুতরাং এসব ঘটনা দ্বারা তোমাদের উচিত এ লক্ষ্যবস্তুতে উপনীত হওয়া। তথা এর থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হওয়া।

وَاِذِ ابْتَلٰۤی اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ ؕ قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِی الظّٰلِمِیْنَ ﴿۱۲۴﴾

১২৪. এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমকে তাঁর প্রতিপালক কয়েকটি বিষয় দ্বারা পরীক্ষা করলেন এবং সে তা সব পূরণ করল। আল্লাহ (তাকে) বললেন, আমি তোমাকে সমস্ত মানুষের নেতা বানাতে চাই। ইবরাহীম বলল, আমার সন্তানদের মধ্য হতে? আল্লাহ বললেন, আমার (এ) প্রতিশ্রুতি জালিমদের জন্য প্রযোজ্য নয়।[৮০]

---

৮০. এখান থেকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কিছু বৃত্তান্ত ও ঘটনা শুরু হচ্ছে। পেছনের আয়াতসমূহের সাথে দু'ভাবে এর গভীর সম্পর্ক আছে। একটি এভাবে যে, ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও আরব পৌত্তলিক- পূর্বোক্ত এ তিনও সম্প্রদায় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নিজেদের ইমাম ও নেতা মনে করত। তবে প্রত্যেক সম্প্রদায় দাবী করত তিনি তাদেরই ধর্মের সমর্থক ছিলেন। সুতরাং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রকৃত অবস্থা পরিষ্কার করে দেওয়া জরুরী ছিল। কুরআন মাজীদ এ স্থলে জানাচ্ছে, এ তিন সম্প্রদায়ের কোনওটির ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের সাথে তাঁর কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল না। তার সমগ্র জীবন ব্যয় হয়েছে তাওহীদের প্রচারকার্যে। এ পথে তাকে অনেক বড়-বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাতে তিনি শত ভাগ উত্তীর্ণ হন।

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দুই পুত্র ছিল- হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম। হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামেরই পুত্র ছিলেন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম, যার অপর নাম ইসরাঈল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগে নবুওয়াতের সিলসিলা তাঁরই আওলাদ তথা বনী ইসরাঈলের মধ্যে চলে আসছিল। এ কারণে তারা মনে করত দুনিয়ার নেতৃত্ব দানের অধিকার কেবল তাদের জন্যই সংরক্ষিত। অন্য কোনও বংশধারায় এমন কোন নবীর আগমন সম্ভবই নয়, যার অনুসরণ করা তাদের জন্য অপরিহার্য হবে। কুরআন মাজীদ এস্থলে তাদের সে ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করেছে। কুরআন মাজীদ স্পষ্ট করে দিয়েছে দ্বীনী নেতৃত্ব কোন বংশের মৌরুসী অধিকার নয়। খোদ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকেই একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাকে বিভিন্ন পন্থায় পরীক্ষা করেন এবং একথা প্রমাণ হয়ে যায় যে, তিনি সর্বোচ্চ পর্যায়ের ত্যাগ স্বীকার করে আল্লাহ তাআলার প্রতিটি হুকুম পালনের জন্য সদা প্রস্তুত; তাওহীদী আকীদায় বিশ্বাসের দরুণ তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তিনি দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। স্ত্রী ও নবজাতক পুত্রকে মক্কার মরু উপত্যকায় রেখে আসার হুকুম দেওয়া হলে সে হুকুমও পালন করেন। এভাবে তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে একের পর এক ত্যাগ স্বীকার করতে থাকেন। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সমগ্র পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে বসানোর ঘোষণা দেন। এ সময় তিনি নিজ সন্তানদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার জানিয়ে দেন তাদের মধ্যে যারা জালিম তথা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে নিজ সত্তার প্রতি অবিচারকারী হবে, তারা

وَاِذۡ جَعَلۡنَا الۡبَیۡتَ مَثَابَۃً لِّلنَّاسِ وَاَمۡنًا ؕ وَاتَّخِذُوۡا مِنۡ مَّقَامِ اِبۡرٰهٖمَ مُصَلًّی ؕ وَعَهِدۡنَاۤ اِلٰۤی اِبۡرٰهٖمَ وَاِسۡمٰعِیۡلَ اَنۡ طَهِّرَا بَیۡتِیَ لِلطَّآئِفِیۡنَ وَالۡعٰکِفِیۡنَ وَالرُّکَّعِ السُّجُوۡدِ ﴿۱۲۵﴾

১২৫. এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন আমি বাইতুল্লাহকে মানুষের জন্য এমন স্থানে পরিণত করি, যার দিকে তারা বারবার ফিরে আসবে এবং যা হবে পরিপূর্ণ নিরাপত্তার স্থান।[৮১] তোমরা 'মাকামে ইবরাহীম'কে সালাতের স্থান বানিয়ে নাও।[৮২] এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে গুরুত্ব দিয়ে বলি যে, তোমরা উভয়ে আমার ঘরকে সেই সকল লোকের জন্য পবিত্র কর, যারা (এখানে) তাওয়াফ করবে, ইতিকাফে বসবে এবং রুকূ' ও সিজদা আদায় করবে।

وَاِذۡ قَالَ اِبۡرٰهٖمُ رَبِّ اجۡعَلۡ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا

১২৬. এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম বলেছিল, হে আমার

এ মর্যাদার হকদার হবে না। বনী ইসরাঈলকে যুগের পর যুগ নানাভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তাতে প্রমাণিত হয়েছে তারা কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবতার দ্বীনী নেতৃত্ব দানের উপযুক্ত নয়। তাই শেষ নবীকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অপর পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশে পাঠানো হয়েছে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর জন্য দু'আ করেছিলেন যে, তাঁকে যেন মক্কাবাসীদের মধ্যে পাঠানো হয়। দ্বীনী নেতৃত্ব যেহেতু স্থানান্তরিত হয়েছে, তাই কিবলাকেও পরিবর্তন করে বাইতুল্লাহ শরীফকে স্থির করে দেওয়া হয়েছে, যা হযরত ইবরাহীম আলাইহিসসালাম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম নির্মাণ করেছিলেন। এই যোগসূত্রে সামনে কাবা ঘর নির্মাণের ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। এখান থেকে ১৫২ নং আয়াত পর্যন্ত যে আলোচনা ধারা আসছে তাকে এই প্রেক্ষাপটেই বুঝতে হবে।

৮১. আল্লাহ তাআলা বাইতুল্লাহর এমন মর্যাদা দিয়েছেন যে, কেবল মসজিদুল হারামই নয়; বরং তার চতুষ্পার্শস্থ হরমের বিস্তীর্ণ এলাকায় নরহত্যা, তীব্র প্রতিরক্ষামূলক প্রয়োজন ব্যতীত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কোনও পশু শিকার জায়েয নয়। এমনকি কোনও গাছ-বৃক্ষ উপড়ানো কিংবা কোনও প্রাণীকে আটকে রাখার অনুমতি নেই। এভাবে এটা কেবল মানুষেরই নয়, বরং জীব-জন্তু ও উদ্ভিদের জন্যও নিরাপত্তাস্থল।

৮২. মাকামে ইবরাহীম সেই পাথরের নাম যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বাইতুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করেছিলেন। সে পাথরটি আজও সংরক্ষিত আছে। যে-কোনও ব্যক্তি বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করবে তাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, সাত পাক সমাপ্ত হওয়ার পর সে মাকামে ইবরাহীমের সামনে দাঁড়িয়ে বাইতুল্লাহ শরীফের অভিমুখী হবে এবং দু' রাকাআত সালাত আদায় করবে। তাওয়াফের এ দু' রাকাআত সালাত এ জায়গায় আদায় করাই উত্তম।

وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٢٦﴾

প্রতিপালক! এটাকে এক নিরাপদ নগর বানিয়ে দাও এবং এর বাসিন্দাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনবে তাদেরকে বিভিন্ন রকম ফলের রিযক দান কর। আল্লাহ বললেন, এবং যে ব্যক্তি কুফর অবলম্বন করবে তাকেও আমি কিছু কালের জন্য জীবন ভোগের সুযোগ দেব, (কিন্তু) তারপর তাকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে টেনে নিয়ে যাব এবং তা নিকৃষ্টতম ঠিকানা।

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٢٧﴾

১২৭. এবং (সেই সময়ের কথা চিন্তা কর) যখন ইবরাহীম বাইতুল্লাহর ভিত উঁচু করছিল[৮৩] এবং ইসমাঈলও (তার সাথে শরীক ছিল এবং তারা উভয়ে বলছিল) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ হতে (এ সেবা) কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি এবং কেবল আপনিই সব কিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَاۤ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۪ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٨﴾

১২৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দু'জনকে আপনার একান্ত অনুগত বানিয়ে নিন এবং আমাদের বংশধরদের মধ্যেও এমন উম্মত সৃষ্টি করুন, যারা আপনার একান্ত অনুগত হবে এবং আমাদেরকে আমাদের ইবাদতের পদ্ধতি শিক্ষা দিন এবং আমাদের তওবা কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি এবং কেবল আপনিই ক্ষমাপ্রবণ (এবং) অতিশয় দয়ার মালিক।

---

৮৩. বাইতুল্লাহকে কাবা ঘরও বলা হয়। হযরত আদম আলাইহিস সালামের সময়ই এ ঘর নির্মিত হয় এবং তখন থেকেই মানুষ আল্লাহর ঘর হিসাবে এর মর্যাদা দিয়ে আসছে। এক সময় ঘরখানি কালের আবর্তনে বিলীন হয়ে যায়। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আমলে তার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। তাই তাঁকে নতুন করে প্রাচীন ভিতের উপর সেটি নির্মাণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ওহী মারফত সে ভিত জানিয়ে দিয়েছিলেন। এ কারণেই কুরআন মাজীদ বলছে, 'তিনি বাইতুল্লাহর ভিত উঁচু করছিলেন'; একথা বলছে না যে, বাইতুল্লাহ নির্মাণ করছিলেন।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۲۹﴾

১২৯. হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে এমন একজন রাসূলও প্রেরণ করুন, যে তাদেরই মধ্য হতে হবে এবং যে তাদের সামনে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে।[৮৪] নিশ্চয়ই আপনার এবং কেবল আপনারই সত্তা এমন, যাঁর ক্ষমতাও পরিপূর্ণ, প্রজ্ঞাও পরিপূর্ণ।

[১৬]

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهِمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۳۰﴾

১৩০. যে ব্যক্তি নিজেকে নির্বোধ সাব্যস্ত করেছে, সে ছাড়া আর কে ইবরাহীমের পথ পরিহার করে? বাস্তবতা তো এই যে, আমি দুনিয়ায় তাকে (নিজের জন্য) বেছে নিয়েছি আর আখিরাতে সে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৮৪. হৃদয় থেকে উৎসারিত এ দু'আর যে কি তাছির হতে পারে তা তরজমা দ্বারা অন্য কোনও ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তরজমা দ্বারা কেবল তার মর্মটুকুই আদায় করা যায়। এস্থলে তাঁর সে দু'আ বর্ণনা করার বহুবিধ উদ্দেশ্য রয়েছে। এক উদ্দেশ্য এ বিষয়টা দেখানো যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম তাদের মহত্তর কোন কাজের কারণেও অহমিকা দেখান না; বরং আল্লাহ তাআলার সামনে আরও বেশি বিনয় ও নমনীয়তা প্রকাশ করেন। তাঁরা নিজেদের কৃতিত্ব প্রচারে লিপ্ত হন না; বরং কার্য সম্পাদনে যে ভুল-ত্রুটি ঘটার অবকাশ থাকে তজ্জন্য তওবা ও ইস্তিগফারে লিপ্ত হন। দ্বিতীয়ত তাঁদের প্রতিটি কাজ হয় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। তাই তাঁরা তাঁদের কাজের জন্য মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর ফিকির না করে বরং আল্লাহ তাআলার কাছে কবুলিয়াতের দু'আ করেন। তৃতীয়ত এটা প্রকাশ করাও উদ্দেশ্য যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমনের বিষয়টা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দু'আর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এভাবে স্বয়ং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামই এ প্রস্তাবনা রেখেছিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেন হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশে পাঠানো হয়; হযরত ইসরাঈল আলাইহিস সালামের বংশে তথা বনী ইসরাঈলের মধ্যে নয়। এ দু'আয় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যবানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহও ব্যক্ত করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের কয়েকটি স্থানে সে সকল উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়েছে। তার ব্যাখ্যা ইনশাআল্লাহ এ সূরারই ১৫১ নং আয়াতে আসবে।

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَٰلَمِينَ ﴿١٣١﴾

১৩১. যখন তাঁর প্রতিপালক তাঁকে বললেন, 'আনুগত্যে নতশির হও',[৮৫] তখন সে (সঙ্গে সঙ্গে) বলল, আমি রাব্বুল আলামীনের (প্রতিটি হুকুমের) সামনে মাথা নত করলাম।

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَٰهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

১৩২. ইবরাহীম তাঁর সন্তানদেরকে এ কথারই অসিয়ত করল এবং ইয়াকুবও (তাঁর সন্তানদেরকে) যে, হে আমার পুত্রগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দ্বীন মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমাদের মৃত্যু যেন এ অবস্থায়ই আসে যখন তোমরা মুসলিম থাকবে।

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَٰهِمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩. তোমরা নিজেরা কি সেই সময় উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের মৃত্যুক্ষণ এসে গিয়েছিল,[৮৬] যখন সে তার পুত্রদের বলেছিল, আমার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা সকলে বলেছিল, আমরা সেই এক আল্লাহরই ইবাদত করব, যিনি আপনার মাবুদ এবং আপনার বাপ-দাদা ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকেরও মাবুদ। আমরা কেবল তাঁরই অনুগত।

---

৮৫. কুরআন মাজীদ এস্থলে 'আনুগত্যে নতশির হওয়া' -এর জন্য 'ইসলাম' শব্দ ব্যবহার করেছে। 'ইসলাম'-এর শাব্দিক অর্থ মাথা নত করা এবং কারও পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। আমাদের দ্বীনের নামও ইসলাম। এ নাম এজন্যই রাখা হয়েছে যে, এর দাবী হল– মানুষ তার প্রতিটি কথা ও কাজে আল্লাহ তাআলারই অনুগত হয়ে থাকবে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেহেতু শুরু থেকেই মুমিন ছিলেন, তাই এস্থলে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য তাঁকে ঈমান আনার আদেশ দেওয়া ছিল না। আর এ কারণেই 'ইসলাম গ্রহণ কর' তরজমা করা হয়নি। অবশ্য পরবর্তী আয়াতে সন্তানদের উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যে অসিয়ত উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে 'ইসলাম'-এর ভেতর উভয় মর্মই দাখিল; সত্য দ্বীনের প্রতি ঈমান আনাও এবং তারপর আল্লাহ তাআলার হুকুমের প্রতি আনুগত্যও। তাই সেখানে 'মুসলিম' শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে।

৮৬. কতক ইয়াহুদী বলত, হযরত ইয়াকুব (ইসরাঈল) আলাইহিস সালাম নিজ মৃত্যুকালে পুত্রদেরকে অসিয়ত করেছিলেন যে, তারা যেন ইয়াহুদী ধর্মে অবিচল থাকে। এ আয়াত তারই জবাব। এ আয়াতকে সূরা আলে ইমরানের ৬৫ নং আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে বিষয়টা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে যায়।

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. তারা ছিল একটি উম্মত, যা গত হয়েছে। তারা যা-কিছু অর্জন করেছে তা তাদেরই এবং তোমরা যা-কিছু অর্জন করেছ তা তোমাদেরই। তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না যে, তারা কি কাজ করত।

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرٰهِمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾

১৩৫. এবং তারা (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা মুসলিমদেরকে) বলে, তোমরা ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান হয়ে যাও, তবে সঠিক পথ পেয়ে যাবে। বলে দাও, বরং (আমরা তো) ইবরাহীমের দ্বীন মেনে চলব, যিনি যথাযথ সরল পথের উপর ছিলেন। তিনি সেই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে শরীক করত।

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرٰهِمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. (হে মুসলিমগণ!) বলে দাও যে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং সেই বাণীর প্রতিও, যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে এবং তার প্রতিও, যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁদের সন্তানদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং তার প্রতিও, যা মূসা ও ঈসাকে দেওয়া হয়েছিল এবং তার প্রতিও, যা অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে দেওয়া হয়েছিল। আমরা এই নবীগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই (এক আল্লাহরই) অনুগত।

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ

১৩৭. অত:পর তারাও যদি সে রকম ঈমান আনে যেমন তোমরা ঈমান এনেছ তবে তারা সঠিক পথ পেয়ে যাবে। আর তারা

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾

যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তারা মূলত শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং শীঘ্রই আল্লাহ তোমাদের সাহায্যার্থে তাদের দেখে নেবেন এবং তিনি সকল কথা শোনেন ও সবকিছু জানেন।

صِبْغَةَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ز وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮. (হে মুসলিমগণ! বলে দাও) আমাদের উপর তো আল্লাহ নিজ রং আরোপ করেছেন। কে আছে, যে আল্লাহ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রং আরোপ করতে পারে? আর আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি।[৮৭]

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯. বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের সাথে বিতর্ক করছ? অথচ তিনি আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক এবং (এটা অন্য কথা যে,) আমাদের কর্ম আমাদের জন্য এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য আর আমরা তো আমাদের ইবাদতকে তাঁরই জন্য খালেস করে নিয়েছি।

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ

১৪০. তোমরা কি বল, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁদের বংশধরগণ ইয়াহুদী বা নাসারা ছিল? (হে মুসলিমগণ! তাদেরকে) বলে দাও, তোমরাই কি বেশি জান, না আল্লাহ? আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম

---

৮৭. এতে খ্রিস্টানদের 'বাপটাইজ' প্রথার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। বাপটাইজ করানোকে 'ইসতিবাগ' (রং মাখানো)-ও বলা হয়। কোনও ব্যক্তিকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেওয়ার সময় রঙিন পানিতে গোসল করানো হয়। তাদের ধারণা এতে তার সত্তায় খ্রিস্ট ধর্মের রং লেগে যায়। এভাবে নবজাতক শিশুকেও বাপটাইজ করানো হয়। কেননা তাদের বিশ্বাস মতে প্রতিটি শিশু মায়ের পেট থেকে পাপী হয়েই জন্ম নেয়। বাপটাইজ না করানো পর্যন্ত সে গুনাহগারই থেকে যায় এবং সে ইয়াসূ মাসীহের কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত)-এর হকদার হয় না। কুরআন মাজীদ ইরশাদ করছে মাথামুন্ডহীন এই ধারণার কোন ভিত্তি নেই। কোনও রঙে যদি রঙিন হতেই হয়, তবে আল্লাহ তাআলার রং তথা খাঁটি তাওহীদকে অবলম্বন কর। এর চেয়ে উত্তম কোন রং নেই।

مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾

আর কে হতে পারে, যে তার নিকট আল্লাহ হতে যে সাক্ষ্য পৌঁছেছে তা গোপন করে?[৮৮] তোমরা যা-কিছু কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফেল নন।

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

১৪১. (যাই হোক) তারা ছিল একটি উম্মত, যা বিগত হয়েছে। তারা যা-কিছু অর্জন করেছে তা তাদের আর যা-কিছু তোমরা অর্জন করেছ তা তোমাদের। তারা কী কাজ করত তা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না।

[দ্বিতীয় পারা] [১৭]

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۗ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۗ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾

১৪২. অচিরেই এ সকল নির্বোধ লোক বলবে, সেটা কী জিনিস, যা এদেরকে (মুসলিমদেরকে) তাদের সেই কিবলা থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরাতে উদ্বুদ্ধ করল, যে দিকে তারা এ যাবৎ মুখ করছিল? আপনি বলে দিন, পূর্ব ও পশ্চিম সব আল্লাহরই। তিনি যাকে চান সরল পথের হিদায়াত দান করেন।[৮৯]

---

৮৮. অর্থাৎ এই বাস্তবতা মূলত তারাও জানে যে, এ সকল নবী খালেস তাওহীদের শিক্ষা দিতেন এবং তাদের ভিত্তিহীন আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে এ পুণ্যাত্মাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। খোদ তাদের কিতাবেই এ সত্য সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে। তাতে শেষনবী সম্পর্কিত সুসংবাদও লেখা রয়েছে, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাদের নিকট আগত সাক্ষ্যের মর্যাদা রাখে, কিন্তু এ জালিমগণ তা গোপন করে রেখেছে।

৮৯. এখান থেকে কিবলা পরিবর্তন ও তা থেকে সৃষ্ট মাসাইল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শুরু হচ্ছে। ঘটনার প্রেক্ষাপট এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুকাররমায় থাকাকালে বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন। মদীনা মুনাওয়ারায় আসার পর তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করতে আদেশ দেওয়া হয়। তিনি প্রায় সতের মাস সে আদেশ পালন করতে থাকেন। অত:পর পুনরায় বাইতুল্লাহকেই কিবলা বানিয়ে দেওয়া হয়। সামনে ১৫৯ নং আয়াতে কিবলা পরিবর্তনের এ আদেশ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত ভবিষ্যদ্বাণী করছে যে, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ এ পরিবর্তনের কারণে হইচই শুরু করে দেবে। অথচ যারা আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান রাখে এ সত্যের জন্য তাদের কোন দলীল-প্রমাণের দরকার পড়ে না যে, বিশেষ কোনও দিককে কিবলা স্থির করার অর্থ আল্লাহ সেই দিকে অবস্থান করছেন– এমন নয়। তিনি তো সকল দিকে ও সর্বত্রই আছেন। পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ সকল দিক তাঁরই সৃষ্টি। তবে সামগ্রিক কল্যাণ বিবেচনায় বিশেষ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴۳﴾

১৪৩. (হে মুসলিমগণ!) এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা অন্যান্য লোক সম্পর্কে সাক্ষী হও এবং রাসূল হন তোমাদের পক্ষে সাক্ষী।[৯০] পূর্বে তোমরা যে কিবলার অনুসারী ছিলে, আমি তা অন্য কোনও কারণে নয়; বরং কেবল এ কারণেই স্থির করেছিলাম যে, আমি দেখতে চাই কে রাসূলের আদেশ মানে আর কে তার পিছন দিকে ঘুরে যায়,[৯১] সন্দেহ নেই এ বিষয়টা বড় কঠিন ছিল, তবে আল্লাহ যাদেরকে হিদায়াত দিয়েছিলেন, সেই সকল লোকের পক্ষে (মোটেই কঠিন) ছিল না। আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমান নিস্ফল করে দেবেন।[৯২] বস্তুত আল্লাহ মানুষের প্রতি অতি মমতাবান, পরম দয়ালু।

একটা দিক স্থির করে দেওয়া সমীচীন ছিল, যে দিকে ফিরে সমস্ত মুমিন আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে। তাই আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নিজ হিকমত অনুযায়ী একটা দিক ঠিক করে দেন। আর তার অর্থ এ নয় যে, সেই বিশেষ দিকটি সত্তাগতভাবে পবিত্র ও কাঙ্ক্ষিত। কোনও কিবলা বা দিকের যদি কোনও মর্যাদা লাভ হয়ে থাকে, তবে কেবল আল্লাহ তাআলার হুকুমের কারণেই তা লাভ হয়েছে। সুতরাং তিনি স্বীয় প্রজ্ঞা অনুযায়ী যখন চান ও যে দিককে চান কিবলা স্থির করতে পারেন। একজন মুমিনের জন্য সরল পথ এটাই যে, সে এই সত্য উপলব্ধি করত আল্লাহর প্রতিটি আদেশ শিরোধার্য করে নেবে। আয়াতের শেষে যে সরল পথের কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা এই সত্যের উপলব্ধিকেই বোঝানো হয়েছে।

৯০. অর্থাৎ এই আখেরী যামানায় যেমন অন্যান্য সকল দিকের পরিবর্তে কেবল কাবার দিককে কিবলা হওয়ার মর্যাদা দান করেছি এবং তোমাদেরকে তা মনে-প্রাণে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছি, তদ্রূপ আমি অন্যান্য উম্মতের বিপরীতে তোমাদেরকে সর্বাপেক্ষা মধ্যপন্থী ও ভারসাম্যপূর্ণ উম্মত বানিয়েছি (তাফসীরে কাবীর)। সুতরাং এ উম্মতকে এমন বাস্তবসম্মত বিধানাবলী দেওয়া হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানবতার সঠিক দিক-নির্দেশ করতে সক্ষম। এ আয়াতে মধ্যপন্থী উম্মতের এ বিশেষত্বও বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন এ উম্মতকে অন্যান্য নবী-রাসূলের সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হবে। বুখারী শরীফের এক হাদীসে এর ব্যাখ্যা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের মধ্যে যারা

কাফির ছিল, তারা তাদের কাছে নবী-রাসূল পৌঁছার বিষয়টিকে সরাসরি অস্বীকার করবে, তখন উম্মতে মুহাম্মাদী নবীগণের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে যে, তাঁরা নিজ-নিজ উম্মতের কাছে আল্লাহ তাআলার বার্তা পৌঁছে দিয়ে রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করেছেন। যদিও আমরা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম না, কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহী দ্বারা অবগত হয়ে এ বিষয়টা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন আর তাঁর কথার উপর আমাদের বিশ্বাস আমাদের চাক্ষুষ দেখা অপেক্ষাও দৃঢ়। অপর দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের এ সাক্ষ্যকে তসদীক করবেন। কোনও কোনও মুফাসসির উম্মতে মুহাম্মাদীর সাক্ষী হওয়ার বিষয়টাকে এভাবেও ব্যাখ্যা করেছেন যে, এ স্থলে সাক্ষ্য (শাহাদাত) দ্বারা সত্যের প্রচার বোঝানো উদ্দেশ্য। এ উম্মত সমগ্র মানবতার কাছে সত্যের বার্তা সেভাবেই পৌঁছে দেবে, যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে পৌঁছিয়েছিলেন। আপন-আপন স্থানে উভয় ব্যাখ্যাই সঠিক এবং উভয়ের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্বও নেই।

৯১. অর্থাৎ আগে কিছু কালের জন্য যে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার উদ্দেশ্য- কে কিবলার প্রকৃত রহস্য অনুধাবন করত আল্লাহ তাআলার হুকুম তামিল করে আর কে বিশেষ কোনও কিবলাকে চির দিনের জন্য পবিত্র গণ্য করে ও আল্লাহর পরিবর্তে তারই পূজা শুরু করে দেয়, এটা পরীক্ষা করা। বস্তুত ইবাদত বায়তুল্লাহর নয়; বরং আল্লাহ তাআলারই করতে হবে। অন্যথায় মূর্তি পূজার সাথে এর পার্থক্য কী থাকে? মূলত কিবলা পরিবর্তন দ্বারা এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ তাআলা এটাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, যারা শত-শত বছর ধরে বাইতুল্লাহকে কিবলা মেনে আসছিল হঠাৎ করে তাদের পক্ষে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ ফেরানো সহজ বিষয় ছিল না। কেননা যেসব আকীদা-বিশ্বাস শত-শত বছর মনের উপর কর্তৃত্ব করেছে হঠাৎ করে তা পাল্টে ফেলা কঠিন বৈকি! কিন্তু যাকে আল্লাহ তাআলা এই বুঝ দিয়েছেন যে, সত্তাগতভাবে কোন জিনিসেরই কোন মর্যাদা ও পবিত্রতা নেই, প্রকৃত মর্যাদা আল্লাহ তাআলার হুকুমের, তাদের পক্ষে কিবলার দিকে মুখ ফেরানোতে এতটুকু কষ্ট হয়নি। কেননা তারা চিন্তা করছিল আমরা আগেও আল্লাহর বান্দা ও তাঁর হুকুমবরদার ছিলাম আর আজও তার হুকুমই পালন করছি।

৯২. হাসান বসরী (রহ.) বাক্যটির ব্যাখ্যা করেন যে, নতুন কিবলাকে গ্রহণ করে নেওয়া যদিও কঠিন কাজ ছিল, কিন্তু যেসব লোক নিজেদের ঈমানী শক্তি প্রদর্শন করত: বিনা বাক্যে তা মেনে নিয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাদের সে ঈমানী উদ্দীপনাকে বৃথা যেতে দেবেন না; বরং তারা তার মহা প্রতিদান লাভ করবে। (তাফসীরে কাবীর) তাছাড়া এ বাক্যটি একটি প্রশ্নের উত্তরও বটে। কোনও কোনও সাহাবীর মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, বাইতুল মুকাদ্দাস কিবলা থাকাকালে যে সকল মুসলিমের ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিল, তারা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে যে সব সালাত আদায় করেছিল, কিবলা পরিবর্তনের কারণে তাদের সে সালাতসমূহ নিষ্ফল ও পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়ে যায়নি তো? এ আয়াত তার জবাব দিয়েছে যে, না, তারা যেহেতু নিজেদের ঈমানী জযবায় আল্লাহ তাআলার নির্দেশ তামিল করতে গিয়েই তা করেছিল, তাই সে সব সালাত বৃথা যাবে না।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۴﴾

১৪৪. (হে নবী!) আমি তোমার চেহারাকে বারবার আকাশের দিকে উঠতে দেখছি। সুতরাং যে কিবলা তোমার পসন্দ আমি শীঘ্রই সে দিকে তোমাকে ফিরিয়ে দেব।[৯৩] সুতরাং এবার মসজিদুল হারামের দিকে নিজের চেহারা ফেরাও। এবং (ভবিষ্যতে) তোমরা যেখানেই থাক (সালাত আদায়কালে) নিজ চেহারা সে দিকেই ফিরিয়ে রাখবে। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তারা জানে এটাই সত্য, যা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে।[৯৪] আর তারা যা-কিছু করছে আল্লাহ সে সম্বন্ধে উদাসীন নন।

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَاۤ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ

১৪৫. যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তুমি যদি তাদের কাছে সব রকমের নিদর্শনও নিয়ে আস, তবুও তারা তোমার

---

৯৩. বাইতুল মুকাদ্দাসকে যখন কিবলা বানানো হয়, তখন সেটা যে একটা সাময়িক হুকুম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ রকম অনুমান করতে পেরেছিলেন। তাছাড়া বাইতুল্লাহ যেহেতু বাইতুল মুকাদ্দাস অপেক্ষা বেশি প্রাচীন এবং তার সাথে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্মৃতি জড়িত তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনেরও আকাঙ্ক্ষা ছিল যেন বাইতুল্লাহকেই কিবলা বানানো হয়। তাই কিবলা পরিবর্তনের প্রতীক্ষায় তিনি কখনও কখনও আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকতেন। এ আয়াতে তাঁর মনের সেই অবস্থাই বর্ণনা করা হয়েছে।

৯৪. অর্থাৎ কিতাবীগণ ভালো করেই জানে কিবলা পরিবর্তনের যে হুকুম দেওয়া হয়েছে তা বিলকুল সত্য। তার এক কারণ তো এই যে, তারা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে মানত এবং তিনিই যে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে মক্কা মুকাররমায় পবিত্র কাবা নির্মাণ করেছিলেন এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত ছিল; বরং কোনও কোনও ঐতিহাসিক লিখেছেন (হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামসহ) হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সকল সন্তানের কিবলাই ছিল পবিত্র কাবা (এ বিষয়ে আরও জানার জন্য দেখুন মাওলানা হামীদুদ দীন ফারাহী রচিত 'যাবীহ কৌওন হ্যায়', পৃষ্ঠা ৩৫–৩৮)।

وَمَا بَعۡضُهُمۡ بِتَابِعٍ قِبۡلَةَ بَعۡضٍ ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعۡتَ اَهۡوَآءَهُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الۡعِلۡمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيۡنَ ﴿۱۴۵﴾

কিবলা অনুসরণ করবে না। তুমিও তাদের কিবলা অনুসরণ করার নও আর তাদের পরস্পরেও একে অন্যের কিবলা অনুসরণ করার নয়।[৯৫] তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তবে তখন অবশ্যই জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে।

اَلَّذِيۡنَ اٰتَيۡنٰهُمُ الۡكِتٰبَ يَعۡرِفُوۡنَهٗ كَمَا يَعۡرِفُوۡنَ اَبۡنَآءَهُمۡ ؕ وَاِنَّ فَرِيۡقًا مِّنۡهُمۡ لَيَكۡتُمُوۡنَ الۡحَقَّ وَهُمۡ يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۴۶﴾

১৪৬. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে এতটা ভালোভাবে চেনে যেমন চেনে নিজেদের সন্তানদেরকে।[৯৬] নিশ্চিত জেনে রেখ, তাদের মধ্যে কিছু লোক জেনে-শুনে সত্য গোপন করে।

اَلۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوۡنَنَّ مِنَ الۡمُمۡتَرِيۡنَ ﴿۱۴۷﴾

১৪৭. আর সত্য সেটাই, যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে। সুতরাং কিছুতেই সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

[১৮]

وَلِكُلٍّ وِّجۡهَةٌ هُوَ مُوَلِّيۡهَا فَاسۡتَبِقُوا الۡخَيۡرٰتِ ؕ اَيۡنَ مَا تَكُوۡنُوۡا يَاۡتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيۡعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ﴿۱۴۸﴾

১৪৮. প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই একটি কিবলা আছে, যে দিকে তারা মুখ করে। সুতরাং তোমরা সৎকর্মে একে অন্যের অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা কর। তোমরা যেখানেই থাক, আল্লাহ তোমাদের সকলকে (নিজের নিকট) নিয়ে

---

৯৫. ইয়াহুদীরা বাইতুল মুকাদ্দাসকে নিজেদের কিবলা মানত আর খ্রিস্টানগণ বাইতুল লাহ্‌ম (বেথেলহেম)কে, যেখানে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

৯৬. এর এক অর্থ হতে পারে– তারা কাবার কিবলা হওয়ার বিষয়টাকে ভালোভাবেই জানত, যেমন উপরে বলা হয়েছে। আবার এই অর্থও হতে পারে যে, পূর্বের নবীগণের কিতাবসমূহে যে রাসূলের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই যে সেই রাসূল এটা তারা ভালো করেই জানত, কিন্তু জিদ ও হঠকারিতার কারণে তা স্বীকার করে না।

আসবেন।[৯৭] নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

১৪৯. আর তোমরা যেখান থেকেই (সফরের জন্য) বের হও (সালাতের সময়) নিজেদের মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফেরাও। নিশ্চয়ই এটাই সত্য, যা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে।[৯৮] আর তোমরা যা-কিছু কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ অনবহিত নন।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٩﴾

১৫০. এবং তুমি যেখান থেকেই বের হও, মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফেরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তোমাদের

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ

---

৯৭. যারা কিবলা পরিবর্তনের কারণে আপত্তি করছিল, তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ চূড়ান্ত করার পর মুসলিমদেরকে হিদায়াত দেওয়া হচ্ছে যে, প্রতিটি ধর্মের লোক নিজেদের জন্য আলাদা কিবলা স্থির করে রেখেছে। কাজেই ইহকালে তাদের সকলকে বিশেষ একটি কিবলার অনুসারী বানানো তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। সুতরাং তাদের সাথে কিবলা সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে বরং তোমাদের উচিত নিজেদের কাজে লেগে পড়া। নিজেদের সে কাজ হল আমলনামায় যত বেশি সম্ভব পুণ্য সঞ্চয় করা। তোমরা এ কাজে একে অন্যের উপরে থাকার চেষ্টা কর। শেষ পরিণাম তো হবে এই যে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত ধর্মাবলম্বীদেরকে নিজের কাছে ডেকে নেবেন এবং তখন তাদের সকলের হুজ্জত খতম হয়ে যাবে। সেখানে সকলেরই কিবলা একটিই হয়ে যাবে। কেননা তখন সকলে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ানো থাকবে।

৯৮. আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতসমূহে মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফেরানোর নির্দেশকে তিনবার পুনরুক্ত করেছেন। এর দ্বারা এক তো নির্দেশের গুরুত্ব ও তাকীদ বোঝানো উদ্দেশ্য; দ্বিতীয়ত এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া উদ্দেশ্য যে, কিবলামুখো হওয়ার হুকুম কেবল বাইতুল্লাহ শরীফের সামনে থাকাকালীন অবস্থায়ই প্রযোজ্য নয়; বরং যখন মক্কা মুকাররমার বাইরে থাকবে তখনও একই হুকুম এবং কখনও দূরে কোথাও চলে গেলে তখনও এটা সমান পালনীয়। এ স্থলে আল্লাহ তাআলা شطر (দিক) শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, কাবামুখী হওয়ার জন্য কাবার একদম শতভাগ সোজাসুজি হওয়া জরুরী নয়, বরং দিকটা কাবার হলেই যথেষ্ট; তাতেই হুকুম পালন হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে মানুষের দায়িত্ব এতটুকুই যে, সে তার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাধ্যম ব্যবহার করে দিক নির্ণয় করবে। এতটুকু করলেই তার সালাত জায়েয হয়ে যাবে।

شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۚ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۚ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۙ ﴿١٥٠﴾

মুখ সে দিকেই রেখ, যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে মানুষের কোন প্রমাণ পেশের সুযোগ না থাকে।[৯৯] অবশ্য তাদের মধ্যে যারা জুলুম করতে অভ্যস্ত (তারা কখনও ক্ষান্ত হবে না) তাদের কোনও ভয় কর না; বরং আমাকে ভয় কর। আর যাতে তোমাদের প্রতি আমি নিজ অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করে দেই এবং যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ কর।

كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۛ ﴿١٥١﴾

১৫১. (এ অনুগ্রহ ঠিক সেই রকমই) যেমন আমি তোমাদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমতের তালীম[১০০] দেয় এবং তোমাদেরকে এমন সব বিষয় শিক্ষা দেয় যা তোমরা জানতে না।

---

৯৯. এর অর্থ হল– যতদিন বায়তুল মুকাদ্দাস কিবলা ছিল ইয়াহুদীরা হুজ্জত করত যে, আমাদের দ্বীন সত্য বলেই তো ওরা আমাদের কিবলা অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছে। অন্য দিকে মক্কার মুশরিকরা বলত, মুসলিমগণ নিজেদেরকে তো হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অনুসারী বলে দাবী করে, অথচ তারা ইবরাহীমী কিবলা পরিত্যাগ করতঃ তাঁর থেকে গুরুতরভাবে বিমুখ হয়ে গিয়েছে। এখন কিবলা পরিবর্তনের যে উদ্দেশ্য ছিল তা যখন অর্জিত হয়ে গেছে এবং এর পর মুসলিমগণ স্থায়ীভাবে কাবাকে কিবলা গণ্য করে তারই অনুসরণ করতে থাকবে, তখন আর প্রতিপক্ষের কোনও রকম হুজ্জতের সুযোগ থাকল না। অবশ্য তর্কপ্রবণ যে সকল লোক সব কিছুতেই আপত্তি তুলবে বলে কসম করে নিয়েছে তাদের মুখ তো কেউ বন্ধ করতে পারবে না। তা তারা আপত্তি করতে থাকুক। তাদেরকে মুসলিমদের কোন ভয় করার প্রয়োজন নেই। মুসলিমগণ তো ভয় করবে কেবল আল্লাহ তাআলাকে, অন্য কাউকে নয়।

১০০. কাবা নির্মাণকালে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দু'টি দু'আ করেছিলেন। এক. আমার বংশধরদের মধ্যে এমন একটি উম্মত সৃষ্টি করুন, যারা আপনার পরিপূর্ণ আনুগত্য করবে। দুই. তাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করুন (দেখুন আয়াত ১২৮–১২৯)। আল্লাহ তাআলা প্রথম দু'আটি এভাবে কবুল করেন যে, উম্মতে মুহাম্মাদীকে একটি মধ্যপন্থী ও ভারসাম্যপূর্ণ উম্মতরূপে সৃষ্টি করেছেন (দেখুন আয়াত ১৪৩)। এবার আল্লাহ

তাআলা বলছেন, আমি যেমন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দু'আ কবুল করে তোমাদের প্রতি এই অনুগ্রহ করেছি যে, তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি এবং স্থায়ীভাবে তোমাদেরকে মানবতার পথ-প্রদর্শনের দায়িত্ব দিয়েছি, যার একটি উল্লেখযোগ্য আলামত হল কাবাকে স্থায়ীভাবে তোমাদের কিবলা বানিয়ে দেওয়া, তেমনিভাবে আমি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় দু'আও কবুল করেছি, সেমতে নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করেছি, যিনি সেই সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার জন্য চেয়েছিলেন। তার মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য হল আয়াত তিলাওয়াতের দায়িত্ব পালন। এর দ্বারা জানা গেল কুরআন মাজীদের আয়াত তেলাওয়াত করাও একটি স্বতন্ত্র পুণ্যের কাজ ও কাম্য বস্তু, তা অর্থ না বুঝেই তিলাওয়াত করা হোক না কেন! কেননা কুরআন মাজীদের অর্থ শিক্ষা দানের বিষয়টি সামনে একটি পৃথক দায়িত্বরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল কুরআন মাজীদের শিক্ষা দান করার দায়িত্ব পালন। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক শিক্ষাদান ব্যতিরেকে কুরআন মাজীদ যথাযথভাবে বোঝা সম্ভব নয়। কেবল তরজমা পড়ার দ্বারা কুরআনের সঠিক মর্ম অনুধাবন করা যেতে পারে না। আরববাসী তো আরবী ভাষা ভালোভাবেই জানত। তাদেরকে তরজমা শেখানোর জন্য কোন শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল না। তথাপি যখন তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে কুরআনের তালীম নিতে হয়েছে, তখন অন্যদের জন্য তো কুরআন বোঝার জন্য নববী ধারার তালীম গ্রহণ আরও বেশি প্রয়োজন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তৃতীয় দায়িত্ব বলা হয়েছে 'হিকমত'-এর শিক্ষা দান। এর দ্বারা জানা গেল যে, প্রকৃত হিকমত ও জ্ঞান সেটাই, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন। এর দ্বারা কেবল তাঁর হাদীসসমূহের 'হুজ্জত' (প্রামাণিক মর্যাদাসম্পন্ন) হওয়াই বুঝে আসছে না; বরং আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁর কোন নির্দেশ যদি কারও নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী যুক্তিসম্মত মনে না হয়, তবে সেক্ষেত্রে তার বুদ্ধি-বিবেচনাকে মাপকাঠি মনে করা হবে না; বরং মাপকাঠি ধরা হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশকেই।

তাঁর চতুর্থ দায়িত্ব বলা হয়েছে এই যে, তিনি মানুষকে পরিশুদ্ধ করবেন। এর দ্বারা তাঁর বাস্তব প্রশিক্ষণদানকে বোঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে তিনি সাহাবায়ে কিরামের আখলাক-চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলীকে পঙ্কিল ভাবাবেগ ও অনুচিত চাহিদা থেকে মুক্ত করত: তাদেরকে উন্নত বৈশিষ্ট্যাবলীতে বিমণ্ডিত করে তোলেন।

এর দ্বারা জানা গেল মানুষের আত্মিক সংশোধনের জন্য কুরআন-সুন্নাহর কেবল পুঁথিগত বিদ্যাই যথেষ্ট নয়; বরং সে বিদ্যাকে নিজ জীবনে প্রতিফলিত করার বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণও জরুরী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে নিজ সাহচর্যে রেখে তাঁদেরকে বাস্তব প্রশিক্ষণ দান করেছেন, তারপর সাহাবীগণ তাবিঈদেরকে এবং তাবিঈগণ তাবে তাবিঈনকে এভাবেই প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এভাবে প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যার এ ধারা শত-শত বছর ধরে চলে আসছে। অভ্যন্তরীণ আখলাক চরিত্রের এ প্রশিক্ষণ যে জ্ঞানের আলোকে দেওয়া হয় তাকে 'ইলমুল ইহসান বা তাযকিয়া বলা হয়।

১৫২. সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব আর আমার শুকর আদায় কর, আমার অকৃতজ্ঞতা করো না।

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾

[১৯]

১৫৩. হে মুমিনগণ! সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য লাভ কর।[১০১] নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾

'তাসাওউফ'-ও মূলত এ জ্ঞানেরই নাম ছিল, যদিও এক শ্রেণীর অযোগ্যের হাতে পড়ে এ মহান বিদ্যায় অনেক সময় ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার সংমিশ্রণ ঘটেছে, কিন্তু তার মূল এই তাযকিয়া (পরিশুদ্ধকরণ)-ই, যার কথা কুরআন মাজীদের এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত তাসাওউফের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করার মত লোক সব যুগেই বর্তমান ছিল, যারা সে অনুযায়ী আমল করে নিজেদের জীবনকে উৎকর্ষমণ্ডিত করেছেন এবং যথারীতি তা করে যাচ্ছেন।

১০১. এ সূরার ৪০ নং আয়াত থেকে বনী ইসরাঈল সম্পর্কে যে আলোচনা শুরু হয়েছিল তা খতম হয়ে গেছে। শেষে মুসলিমদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন সে নিরর্থক বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত না হয়; বরং তার পরিবর্তে নিজেদের দ্বীন অনুযায়ী যত সম্ভব বেশি আমল করতে যত্নবান থাকে। সে হিসেবেই এখন ইসলামের বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস ও বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা শুরু হচ্ছে। আলোচনার সূচনা করা হয়েছে সবরের প্রতি গুরুত্বারোপ দ্বারা। কেননা এটা সেই সময়ের কথা যখন মুসলিমগণকে নিজেদের দ্বীনের অনুসরণ ও তার প্রচার কার্যে শত্রুদের পক্ষ হতে নানা রকম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছিল। তাতে বহুবিধ কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করতে হচ্ছিল। অনেক সময় আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে শাহাদতও বরণ করতে হয়েছে কিংবা আগামীতে তা বরণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই মুসলিমগণকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, সত্য দ্বীনের পথে এ জাতীয় পরীক্ষা তো আসবেই। একজন মুমিনের কাজ হল আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্ট থেকে সবর ও ধৈর্য প্রদর্শন করে যাওয়া।

প্রকাশ থাকে যে, দুঃখ-কষ্টে কাঁদা সবরের পরিপন্থী নয়। কেননা ব্যথা পেলে চোখের পানি ফেলা মানব প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। তাই শরীয়ত এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। যে কান্না অনিচ্ছাকৃত আসে তাও সবরহীনতা নয়। সবরের অর্থ হল দুঃখ-বেদনা সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি কোন অভিযোগ না তোলা; বরং আল্লাহ তাআলার ফায়সালার প্রতি বুদ্ধিগতভাবে সন্তুষ্ট থাকা। এর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় অপারেশন দ্বারা। ডাক্তার অপারেশন করলে মানুষের কষ্ট হয়। অনেক সময় সে কষ্টে অনিচ্ছাকৃতভাবে চিৎকারও করে ওঠে, কিন্তু ডাক্তার কেন অপারেশন করছে এজন্য তার প্রতি তার কোন অভিযোগ থাকে না। কেননা তার বিশ্বাস আছে, সে যা কিছু করছে তার প্রতি সহানুভূতি ও তার কল্যাণার্থেই করছে।

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿۱۵۴﴾

১৫৪. আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা (তাদের জীবিত থাকার বিষয়টা) উপলব্ধি করতে পার না।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۵۵﴾ۙ

১৫৫. আর দেখ আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব (কখনও) ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনও) ক্ষুধা দ্বারা এবং (কখনও) জান-মাল ও ফসলহানী দ্বারা। যেসব লোক (এরূপ অবস্থায়) সবরের পরিচয় দেয়, তাদেরকে সুসংবাদ শোনাও।

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿۱۵۶﴾ؕ

১৫৬. এরা হল সেই সব লোক, যারা তাদের কোন মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, 'আমরা সকলে আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।[১০২]

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

১৫৭. এরা সেই সব লোক, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণা ও দয়া রয়েছে এবং এরাই আছে হিদায়াতের উপর।

---

১০২. এ বাক্যের ভেতর প্রথমত এই সত্যের স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, আমরা সকলেই যেহেতু আল্লাহর মালিকানাধীন তাই আমাদের ব্যাপারে তাঁর যে-কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার আছে। আবার আমরা যেহেতু তাঁরই, আর কেউ নিজের জিনিসের অমঙ্গল চায় না তাই আমাদের সম্পর্কে তাঁর যে-কোনও ফায়সালা আমাদের কল্যাণার্থেই হবে; হতে পারে তাৎক্ষণিকভাবে সে কল্যাণ আমাদের বুঝে আসছে না। দ্বিতীয়ত এর মধ্যে এই সত্যেরও প্রকাশ রয়েছে যে, একদিন আমাকেও আল্লাহ তাআলার কাছে সেই জায়গায় যেতে হবে যেখানে আমার আত্মীয় বা প্রিয়জন চলে গেছে। কাজেই এ বিচ্ছেদ সাময়িক, স্থায়ী নয়। আর আমি যখন তাঁর কাছে ফিরে যাব তখন এই আঘাত বা কষ্টের কারণে ইনশাআল্লাহ সওয়াবও লাভ করব। অন্তরে যদি এ বিশ্বাস থাকে, তবে এটাই হয় সবর, তাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ুক না কেন!

১৫৮. নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তিই বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে বা উমরা করবে তার জন্য এ দুটোর প্রদক্ষিণ করাতে কোনও গুনাহ্ নেই।[১০৩] কোনও ব্যক্তি স্বত:স্ফূর্তভাবে কোন কল্যাণকর কাজ করলে আল্লাহ অবশ্যই গুণগ্রাহী (এবং) সর্বজ্ঞ।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

১৫৯. নিশ্চয়ই যে সকল লোক আমার নাযিলকৃত উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী ও হিদায়াতকে গোপন করে, যদিও আমি কিতাবে তা মানুষের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছি,[১০৪] তাদের প্রতি আল্লাহও লানত বর্ষণ করেন এবং অন্যান্য লানতকারীগণও লানত বর্ষণ করে।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ ۙ أُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾

১৬০. তবে যে সব লোক তাওবা করেছে, নিজেদেরকে সংশোধন করেছে এবং (গোপন করা বিষয়গুলো) সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছে, আমি এরূপ লোকদের তাওবা কবুল করে থাকি। বস্তুত আমি অতিশয় তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

---

১০৩. সাফা ও মারওয়া মক্কা মুকাররমার দু'টি পাহাড়। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্ত্রী হাজেরা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে কোলের শিশুপুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামসহ মক্কায় ছেড়ে গেলে হাজেরা (রাযি.) পানির সন্ধানে এ দুই পাহাড়ে ছোটাছুটি করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা হজ্জ ও উমরায় এ দুই পাহাড়ে সা'ঈ (ছোটাছুটি) করাকে ওয়াজিব করেছেন। সা'ঈ ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও এখানে যে 'কোন গুনাহ নেই' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার কারণ, জাহিলী যুগে এ পাহাড় দু'টিতে দু'টি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল, যদিও পরবর্তীকালে তা অপসারণ করা হয়। সাহাবীদের মধ্যে কারও কারও সন্দেহ হয়েছিল এ দুই পাহাড়ে দৌড়ানো যেহেতু সে যুগেরও আলামত তাই এটা করলে গুনাহ হতে পারে। আয়াতে তাদের সেই সন্দেহ দূর করা হয়েছে।

১০৪. এর দ্বারা সেই ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে পূর্বেকার কিতাবসমূহে প্রদত্ত সুসংবাদসমূহ গোপন করত।

১৬১. নিশ্চয়ই যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং কাফির অবস্থায়ই মারা গেছে, তাদের প্রতি আল্লাহর ফিরিশতাদের এবং সমস্ত মানুষের লানত।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾

১৬২. তারা সে লানতের মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকবে। তাদের থেকে শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।

خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾

১৬৩. তোমাদের মাবুদ একই মাবুদ, তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। তিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

[২০]

১৬৪. নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃজনে, রাত দিনের একটানা আবর্তনে, সেই সব নৌযানে যা মানুষের উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগরে বয়ে চলে, সেই পানিতে যা আল্লাহ আকাশ থেকে বর্ষণ করেছেন এবং তার মাধ্যমে ভূমিকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেছেন ও তাতে সর্বপ্রকার জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং সেই মেঘমালাতে যা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে আজ্ঞাবহ হয়ে সেবায় নিয়োজিত আছে, বহু নিদর্শন আছে সেই সকল লোকের জন্য যারা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।[১০৫]

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

---

১০৫. আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে বিশ্ব-জগতের এমন সব অভিজ্ঞানের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যা আমাদের চোখের সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যৌক্তিকভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় সেগুলো আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও একত্বের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ বহন করে। প্রতিদিন দেখতে দেখতে আমাদের চোখ যেহেতু তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তাই তাতে আমাদের কাছে বিস্ময়কর কিছু অনুভূত হয় না। নচেৎ তার একেকটি বস্তু এমন বিস্ময়কর বিশ্ব-ব্যবস্থার অংশ, যার সৃজন আল্লাহ তাআলার অপার কুদরত ছাড়া মহা বিশ্বের আর কোন শক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। আসমান-যমীনের সৃষ্টিরাজি নিরবধি যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে, চন্দ্র-সূর্য যেভাবে এক বাঁধাধরা সময়সূচি অনুযায়ী দিবা-রাত্র পরিভ্রমণরত আছে, সাগর যেভাবে অফুরন্ত পানির ভাণ্ডার হওয়ার সাথে সাথে

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

১৬৫. এবং (এতদসত্ত্বেও) মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে এমনভাবে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করে যে, তাদেরকে তারা ভালোবাসে আল্লাহর ভালোবাসার মত। আর যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসে। হায়! এ জালিমগণ (দুনিয়ায়) যখন কোন শাস্তি প্রত্যক্ষ করে, তখনই যদি এটা বুঝত যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহরই এবং (আখিরাতে) আল্লাহর আযাব বড় কঠিন হবে!

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾

১৬৬. এসব লোক যাদের পেছনে চলত তারা (অর্থাৎ সেই অনুসৃতগণ) যখন নিজেদের অনুসরণকারীদের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেবে এবং তারা সকলে নিজেদের চোখের সামনে আযাব দেখতে পাবে এবং তাদের পারস্পরিক সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ

১৬৭. আর যারা তাদের (অর্থাৎ নেতৃবর্গের) অনুসরণ করত তারা বলবে, হায়! একবার যদি (দুনিয়ায়) আমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হত, তবে আমরাও তাদের (অর্থাৎ নেতৃবর্গের) সঙ্গে এভাবেই সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করতাম, যেমন তারা আমাদের সঙ্গে

নৌযানের মাধ্যমে স্থলভাগের বিভিন্ন অংশকে পরস্পর জুড়ে রেখেছে এবং তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী স্থান থেকে স্থানান্তরে পৌঁছে দেয়, মেঘ ও বায়ু যেভাবে মানুষের জীবন-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেয়, তাতে এসব বস্তু সম্পর্কে কেবল আকাট মূর্খই এটা ভাবতে পারে যে, এগুলো কোন স্রষ্টা ছাড়া আপনা-আপনিই অস্তিত্ব লাভ করেছে। আরব মুশরিকগণও স্বীকার করত এ বিশ্বজগত আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। তবে সেই সাথে তারা এ বিশ্বাসও রাখত যে, এসব কাজে কয়েকজন দেব-দেবী তাঁর সাহায্যকারী রয়েছে। কুরআন মাজীদ বলছে, যেই সত্তার শক্তি এত বিশাল যে, তিনি অন্যের কোন অংশীদারিত্ব ছাড়াই এ মহা জগতকে সৃষ্টি করেছেন, ছোট ছোট কাজে তাঁর কোন শরীক বা সহযোগীর দরকার হবে কেন? সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগাবে সে জগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই আল্লাহ তাআলার একত্বের সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখতে পাবে।

أَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেছে। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে দেখাবেন যে, তাদের কার্যাবলী (আজ) তাদের জন্য সম্পূর্ণ মনস্তাপে পরিণত হয়েছে। আর তারা কোনও অবস্থায়ই জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না।

[২১]

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

১৬৮. হে মানুষ! পৃথিবীতে যা-কিছু হালাল, উৎকৃষ্ট বস্তু আছে তা খাও[১০৬] এবং শয়তানের পদচিহ্ন ধরে চলো না। নিশ্চিত জান সে তোমাদের এক প্রকাশ্য শত্রু।

اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯. সে তো তোমাদেরকে এই আদেশই করবে যে, তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ কর এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বল, যা তোমরা জান না।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٧٠﴾

১৭০. যখন তাদেরকে (কাফিরদেরকে) বলা হয়, আল্লাহ যে বাণী নাযিল করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, না, আমরা তো কেবল সে সকল বিষয়েরই অনুসরণ করব, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি। আচ্ছা! সেই অবস্থায়ও কি (তাদের এটাই করা উচিত) যখন তাদের বাপ-দাদা (দ্বীনের) কিছুমাত্র বুঝ-সমঝ রাখত না? আর তারা কোন (ঐশী) হিদায়াতও লাভ করেনি?

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا

১৭১. যারা কুফর অবলম্বন করেছে (সত্যের দাওয়াতের ব্যাপারে) তাদের দৃষ্টান্ত ঠিক

---

১০৬. আরব পৌত্তলিকদের একটি গোমরাহী ছিল এই যে, তারা কোনরূপ আসমানী শিক্ষা ছাড়াই মনগড়াভাবে বিভিন্ন বস্তুকে হালাল-হারাম সাব্যস্ত করে রেখেছিল। যেমন মৃত বস্তু খাওয়া তাদের নিকট জায়েয ছিল। আবার বহু হালাল জীবকে তারা নিজেদের পক্ষে হারাম করে রেখেছিল। ইনশাআল্লাহ সূরা আনআমে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে। তাদের সেই গোমরাহীর খণ্ডনে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ۭ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٧١﴾

এ রকম, যেমন কোন ব্যক্তি এমন কিছুকে (পশুকে) ডাকে, যা হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনে না। তারা বধির, মূক, অন্ধ। সুতরাং কিছুই বোঝে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾

১৭২. হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে জীবিকারূপে যে উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ দিয়েছি, তা থেকে (যা ইচ্ছা) খাও এবং আল্লাহর শুকর আদায় কর– যদি সত্যিই তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করে থাক।

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٧٣﴾

১৭৩. তিনি তো তোমাদের জন্য কেবল মৃত জন্তু, রক্ত ও শুকর হারাম করেছেন এবং সেই জন্তুও যার প্রতি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়।[১০৭] হাঁ, কোনও ব্যক্তি যদি চরম অনন্যোপায় অবস্থায় থাকে (ফলে এসব বস্তু হতে কিছু খেয়ে নেয়) আর তার উদ্দেশ্য মজা ভোগ করা না হয় এবং সে (প্রয়োজনের) সীমা অতিক্রমও না করে, তার কোন গুনাহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰۗىِٕكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٤﴾

১৭৪. প্রকৃতপক্ষে যারা আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবকে গোপন করে এবং তার বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া কিছুই ভরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না এবং তাদেরকে

---

১০৭. এ আয়াতে সমস্ত হারাম জিনিসের তালিকা দেওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য কেবল একথা জানানো যে, তোমরা যে সব জন্তুকে হারাম মনে করে বসে আছ আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে হারাম করেননি। তোমরা অযথা আল্লাহ তাআলার উপর তার নিষিদ্ধতাকে চাপিয়ে দিয়েছ। অপর দিকে এমন কিছু বস্তুও রয়েছে, যেগুলোকে তোমরা হারাম মনে কর না, অথচ আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে হারাম করেছেন। হারাম সেগুলো নয়, যেগুলোকে তোমরা হারাম মনে করছ; বরং হারাম সেইগুলো যেগুলোকে তোমরা হালাল মনে করে বসে আছ।

পবিত্রও করবেন না আর তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

১৭৫. এরা সেই সব লোক, যারা হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী এবং মাগফিরাতের পরিবর্তে আযাব ক্রয় করে নিয়েছে। সুতরাং (ভেবে দেখ) তারা জাহান্নামের আগুন সহ্য করার জন্য কতটা প্রস্তুত!

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾

১৭৬. এসব কিছু এ কারণে হবে যে, আল্লাহ সত্য সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছেন আর যারা এমন কিতাবের সাথে বিরুদ্ধাচরণের নীতি অবলম্বন করেছে তারা হঠকারিতায় বহু দূর পর্যন্ত চলে গেছে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

[২২]

১৭৭. পুণ্য তো কেবল এটাই নয় যে, তোমরা নিজেদের চেহারা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরাবে;[১০৮] বরং পুণ্য এই যে, লোকে আল্লাহর প্রতি, শেষ দিনের প্রতি, ফিরিশতাদের প্রতি, আল্লাহর কিতাব-সমূহের প্রতি ও তাঁর নবীগণের প্রতি ঈমান আনবে আর আল্লাহর ভালোবাসায় নিজ সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির ও সওয়ালকারীদেরকে দান করবে এবং দাস মুক্তিতে ব্যয় করবে আর সালাত কায়েম করবে,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ

---

১০৮. একথা বলা হচ্ছে সেই কিতাবীদেরকে লক্ষ্য করে যারা কিবলা নিয়ে এমনভাবে আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু করে দিয়েছিল যেন দ্বীনের ভেতর এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কোন বিষয় নেই। মুসলিমদেরকে বলা হচ্ছে, কিবলার বিষয়টাকে যতটুকু স্পষ্ট করার দরকার ছিল তা করা হয়েছে। এবার তোমাদের উচিত দ্বীনের অন্যান্য জরুরী বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়া। আর কিতাবীদেরকেও বলে দেওয়া চাই যে, কিবলার বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনায় লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা দরকারী বিষয় হল নিজ ঈমানকে দুরস্ত করে নেওয়া এবং নিজের ভেতর সেই সকল গুণ আনয়ন করা যা ঈমানেরই দাবী। কুরআন মাজীদ এ প্রসঙ্গে সৎকর্মের বিভিন্ন শাখার বিবরণ দিয়েছে এবং ইসলামী আইনের নানা দিক তুলে ধরেছে। সামনে এক-এক করে তা আসছে।

وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ ؕ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

যাকাত দেবে, যখন কোন প্রতিশ্রুতি দিবে তা পূরণে অভ্যস্ত থাকবে এবং সঙ্কটে-কষ্টে ও যুদ্ধকালে ধৈর্য-স্থৈর্যে অভ্যস্ত থাকবে। এরাই তারা যারা সত্যবাদী (নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত) এবং এরাই মুত্তাকী।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثٰى بِالْأُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ

১৭৮. হে মুমিনগণ! যাদেরকে (ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে) হত্যা করা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কিসাস (-এর বিধান) ফরয করা হয়েছে– স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, গোলামের বদলে গোলাম, নারীর বদলে নারী (-কেই হত্যা করা হবে)।[১০৯] অত:পর হত্যাকারীকে যদি তার ভাই (নিহতের অলি)-এর পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা করা হয়,[১১০] তবে ন্যায়ানুগভাবে (রক্তপণ)

---

১০৯. কিসাস অর্থ সম-পরিমাণ বদলা নেওয়া। এ আয়াতে আদেশ করা হয়েছে, কোনও ব্যক্তিকে যদি ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় এবং হত্যাকারীর অপরাধ প্রমাণিত হয়, তবে নিহতের ওয়ারিশের এ অধিকার থাকে যে, সে হত্যাকারী থেকে কিসাস গ্রহণের দাবী তুলবে। জাহিলী যুগেও কিসাস গ্রহণ করা হত, কিন্তু তাতে ইনসাফ রক্ষা করা হত না। তারা মানুষের মধ্যে নিজেদের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি করে রেখেছিল আর সে হিসেবে নিম্নস্তরের কোনও লোক উচ্চ স্তরের কাউকে হত্যা করলে ওয়ারিশগণ দাবী করত হত্যাকারীর পরিবর্তে তার গোত্রের এমন কাউকে হত্যা করতে হবে, যে মর্যাদায় নিহতের সমান হবে। যদি কোনও গোলাম স্বাধীন কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করত তবে দাবী করা হত আমরা গোলামের পরিবর্তে একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করব। এমনিভাবে হত্যাকারী নারী এবং নিহত পুরুষ হলে বলা হত সেই নারীর পরিবর্তে একজন পুরুষকে হত্যা করা হবে। পক্ষান্তরে হত্যাকারী যদি নিহত ব্যক্তি অপেক্ষা উচ্চ স্তরের লোক হত, যেমন হত্যাকারী পুরুষ এবং নিহত নারী, তবে হত্যাকারীর গোত্র বলত আমাদের কোন নারীকে হত্যা কর। পুরুষ হত্যাকারীর থেকে কিসাস নেওয়া যাবে না। আলোচ্য আয়াত জাহিলী যুগের এই অন্যায় প্রথার বিলোপ সাধন করেছে এবং ঘোষণা করে দিয়েছে প্রাণ সকলেরই সমান। সর্বাবস্থায় হত্যাকারীর থেকেই কিসাস নেওয়া হবে, তাতে সে পুরুষ হোক বা নারী এবং স্বাধীন ব্যক্তি হোক বা গোলাম।

১১০. বনী ইসরাঈলের বিধানে কিসাস তো ছিল, কিন্তু দিয়্যাত বা রক্তপণের কোন ধারণা ছিল না। আলোচ্য আয়াত নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে অধিকার দিয়েছে যে, তারা চাইলে নিহতের কিসাস ক্ষমা করে রক্তপণ হিসেবে কিছু অর্থ গ্রহণ করতে পারে। এরূপ অবস্থায় তাদের কর্তব্য সে অর্থের পরিমাণকে ন্যায়সঙ্গত সীমার মধ্যে রাখা। আর হত্যাকারীর উচিত উত্তম পন্থায় তা আদায় করে দেওয়া।

مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝١٧٨

দাবী করার অধিকার (অলির) আছে। আর উত্তমরূপে তা আদায় করা (হত্যাকারীর) ফরয। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক লঘুকরণ এবং একটি রহমত। এরপরও কেউ সীমালংঘন করলে সে যন্ত্রণাময় শাস্তির উপযুক্ত।[১১১]

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝١٧٩

১৭৯. এবং হে বুদ্ধিমানেরা! কিসাসের ভেতর তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন (রক্ষার ব্যবস্থা)। আশা করা যায় তোমরা (এর বিরুদ্ধাচরণ) পরিহার করবে।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۖۚ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۝١٨٠

১৮০. তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অর্থ-সম্পদ রেখে যায়, তবে যখন তার মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হবে, তখন নিজ পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে ন্যায়সঙ্গতভাবে ওসিয়ত করবে।[১১২] এটা মুত্তাকীদের জন্য একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

---

১১১. অর্থাৎ ওয়ারিশগণ যদি রক্তপণ নিয়ে কিসাস ক্ষমা করে দিয়ে থাকে, তবে এখন আর হত্যাকারীকে হত্যা করতে চাওয়া তাদের জন্য জায়েয হবে না। করলে তা সীমালংঘন হয়ে যাবে এবং সেজন্য তারা দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তির উপযুক্ত হবে।

১১২. মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদে যখন ওয়ারিশদের অংশ নির্দিষ্ট ছিল না সেই সময় এ আয়াত নাযিল হয়। তখন মায়্যিতের পুত্রই সমুদয় সম্পদ লাভ করত। এ আয়াতে বিধান দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার মৃত্যুকালে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে ওসিয়ত করে যেতে হবে এবং স্পষ্ট করে দিতে হবে তার সম্পদে কে কতটুকু অংশ পাবে। পরবর্তীতে সূরা নিসায় (আয়াত নং ১১-৪১) ওয়ারিশগণের তালিকা ও তাদের প্রাপ্য অংশ স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তারপর আর এ আয়াতে যে ওসিয়তের কথা বলা হয়েছে তা ফরয থাকেনি। অবশ্য কারও যদি কোনও রকমের দেনা থাকে, তবে এখনও সে সম্পর্কে ওসিয়ত করে যাওয়া ফরয। তাছাড়া যে সকল লোক শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ওয়ারিশ হয় না তাদের অনুকূলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের ভেতর ওসিয়ত করা এখনও জায়েয আছে।

فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَاۤ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۸۱﴾

১৮১. যে ব্যক্তি সে ওসিয়ত শোনার পর তাতে কোন রদ-বদল করবে, তার গুনাহ তাদের উপরই বর্তাবে যারা তাতে রদ-বদল করবে।[১১৩] নিশ্চিত জেন আল্লাহ (সবকিছু) শোনেন ও জানেন।

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۸۲﴾

১৮২. হাঁ কারও যদি আশংকা হয় ওসিয়তকারী অন্যায় পক্ষপাতিত্ব বা গুনাহের কাজ করবে আর সে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মীমাংসা করে দেয় তবে তার কোন গুনাহ হবে না।[১১৪] নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

[২৩]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۳﴾

১৮৩. হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়।

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ

১৮৪. গণা-গুণতি কয়েক দিন রোযা রাখতে হবে। তারপরও যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয় বা সফরে থাকে, তবে অন্য সময়ে সে সমান সংখ্যা পূরণ করবে। যারা এর শক্তি রাখে তারা একজন মিসকীনকে খাবার খাইয়ে (রোযার) ফিদয়া আদায় করতে পারবে।[১১৫] এছাড়া কেউ যদি

---

১১৩. অর্থাৎ যে সকল লোক মুমূর্ষ ব্যক্তির মুখ থেকে কোন ওসিয়ত শুনেছে তাদের পক্ষে সে ওসিয়তে কোনও রকমের কম-বেশি করা কিছুতেই জায়েয নয়। তার পরিবর্তে তাদের কর্তব্য ওসিয়তকারী যা বলেছে ঠিক সেই অনুযায়ী কাজ করা।

১১৪. অর্থাৎ কোন ওসিয়তকারী যদি বেইনসাফী করতে চায় আর কেউ তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মরার আগে সেই ওসিয়ত পরিবর্তন করে দিতে প্রস্তুত করে, তা জায়েয হবে।

১১৫. প্রথম দিকে যখন রোযা ফরয করা হয়, তখন এই সুবিধাও দেওয়া হয়েছিল যে, কোনও ব্যক্তি রোযা না রেখে তার পরিবর্তে ফিদয়া দিতে পারবে। পরবর্তীতে ১৮৫ নং আয়াত

খَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۴﴾

স্বত:স্ফূর্তভাবে কোন পুণ্যের কাজ করে, তবে তার পক্ষে তা শ্রেয়। আর তোমাদের যদি সমঝ থাকে, তবে রোযা রাখাই তোমাদের জন্য বেশি ভালো।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْۤ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَبَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِیْضًا اَوْ عَلٰی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَیَّامٍ اُخَرَ ؕ یُرِیْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ؗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰی مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۸۵﴾

১৮৫. রমাযান মাস– যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা আদ্যোপান্ত হিদায়াত এবং এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে সে যেন এ সময় অবশ্যই রোযা রাখে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয় বা সফরে থাকে, তবে অন্য সময় সে সমান সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের পক্ষে যা সহজ সেটাই করতে চান, তোমাদের জন্য জটিলতা সৃষ্টি করতে চান না, যাতে তোমরা রোযার সংখ্যা পূরণ করে নাও এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে পথ দেখিয়েছেন, সেজন্য আল্লাহর তাকবীর পাঠ কর[১১৬] এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ

১৮৬. (হে নবী!) আমার বান্দাগণ যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন (আপনি তাদেরকে বলুন

নাযিল হয়, যা সামনে আসছে। সে আয়াত এ সুবিধা প্রত্যাহার করে নেয় এবং চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হয় যে, যে ব্যক্তিই রমাযান মাস পাবে তাকে অবশ্যই রোযা রাখতে হবে। অবশ্য যারা অতি বৃদ্ধ, রোযা রাখার শক্তি নেই এবং ভবিষ্যতে রোযা রাখার মত শক্তি ফিরে আসারও কোন আশা নেই, তাদের জন্য এ সুবিধা এখনও বাকি রাখা হয়েছে।

১১৬. রমাযান শেষ হওয়া মাত্র ঈদুল ফিতরের নামাযে যে তাকবীর বলা হয় তার প্রতি এ আয়াতে এক সূক্ষ্ম ইশারা পাওয়া যায়।

دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿۱۸۶﴾

যে,) আমি এত নিকটবর্তী যে, কেউ যখন আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি।[১১৭] সুতরাং তারাও আমার কথা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করুক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে এসে যায়।

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۠ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۠ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ

১৮৭. রোযার রাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে নির্দ্বিধায় সহবাস করতে পার। তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরাও তাদের জন্য পোশাক। আল্লাহ তাআলার জানা ছিল যে, তোমরা নিজেদের সাথে খেয়ানত করছিলে। অত:পর তিনি তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন এবং তোমাদের ত্রুটি ক্ষমা করেছেন।[১১৮] সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা-কিছু লিখে রেখেছেন তা সন্ধান কর।[১১৯] আর

---

১১৭. রমাযান সম্পর্কিত আলোচনার মাঝখানে এ আয়াত আনার উদ্দেশ্য এই হয়ে থাকবে যে, উপরে রমাযানের সংখ্যা পূরণ করার কথা বলা হয়েছিল। তার দ্বারা কারও ধারণা জন্মাতে পারত যে, রমাযান চলে যাওয়ার পর হয়ত আল্লাহ তাআলার সাথে সেই নৈকট্য বাকি থাকবে না, যা রমাযানে ছিল। এ আয়াত সে ধারণা রদ করে দিয়েছে এবং পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা প্রতি মুহূর্তে নিজ বান্দার কাছে থাকেন এবং তিনি তার ডাক শোনেন।

১১৮. প্রথম দিকে বিধান ছিল, কোনও রোযাদার ইফতার করার পর সামান্য একটু ঘুমালেও তার জন্য রাতের বেলাও খাবার খাওয়া জায়েয ছিল না এবং স্ত্রী সহবাসও নয়। কারও কারও দ্বারা এ বিধান লংঘন হয়ে যায়। তারা রাতের বেলা স্ত্রীদের সাথে সহবাস করে ফেলেন। এ আয়াত তাদের সেই হুকুম লংঘনের প্রতি ইশারা করছে। সেই সঙ্গে যাদের দ্বারা এ ত্রুটি ঘটে গিয়েছিল তাদেরকে ক্ষমা করার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতের জন্য সে বিধানের কার্যকারিতা রহিত করে দেওয়া হয়েছে।

১১৯. অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর ব্যাখ্যা এই করেছেন যে, স্ত্রীর সাথে সহবাসকালে সেই সন্তান লাভের নিয়ত থাকা চাই, যা আল্লাহ তাআলা তাকদীরে লিখে রেখেছেন। কোনও কোনও মুফাসসির এই ব্যাখ্যাও করেছেন যে, সহবাসকালে কেবল সেই আনন্দই কামনা করা চাই যা আল্লাহ তাআলা জায়েয করেছেন। যে-কোন নাজায়েয পন্থা তথা বিকৃত ও স্বভাব-বিরুদ্ধ পন্থা পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য।

إِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِي الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٨٧﴾

যতক্ষণ না ভোরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে পৃথক হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা খাও ও পান কর। তারপর রাতের আগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। আর তাদের সাথে (স্ত্রীদের সাথে) সহবাস করো না, যখন তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত থাক। এসব আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমা। সুতরাং তোমরা এগুলো লংঘন করো না। এভাবেই আল্লাহ মানুষের সামনে স্বীয় নিদর্শনাবলী স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

وَلَا تَأْكُلُوْٓا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾

১৮৮. তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না এবং এই উদ্দেশ্যে বিচারকের কাছে সে সম্পর্কে মামলা রুজু করো না যে, মানুষের সম্পদ থেকে কোন অংশ জেনে শুনে গ্রাস করার গুনাহে লিপ্ত হবে।

[২৪]

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٨٩﴾

১৮৯. লোকে আপনার কাছে নতুন মাসের চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি তাদেরকে বলে দিন এটা মানুষের (বিভিন্ন কাজ-কর্মের) এবং হজ্জের সময় নির্ধারণ করার জন্য। আর এটা কোন পুণ্য নয় যে, তোমরা ঘরে তার পেছন দিক থেকে প্রবেশ করবে।[১২০] বরং পুণ্য এই যে, মানুষ তাকওয়া অবলম্বন করবে। তোমরা ঘরে তার দরজা দিয়েই প্রবেশ করো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পার।

---

১২০. আরবের কিছু লোকের নিয়ম ছিল হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর কোনও প্রয়োজনে বাড়ি ফিরে আসতে হলে তারা বাড়ির সাধারণ দরজা দিয়ে প্রবেশ করাকে জায়েয মনে করত না। এক্ষেত্রে তারা বাড়ির পেছন দিক থেকে প্রবেশ করত। এ কারণে যদি পেছন দিকের দেয়াল ভাঙ্গার প্রয়োজন হত, তাতেও দ্বিধাবোধ করত না। এ আয়াত তাদের সে কুসংস্কারকে ভিত্তিহীন সাব্যস্ত করছে।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

১৯০. যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর, তবে সীমালংঘন করো না। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না।[১২১]

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾

১৯১. তোমরা তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে সেই স্থান থেকে বের করে দাও, যেখান থেকে তারা তোমাদের বের করেছিল। বস্তুত ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ![১২২] আর তোমরা মসজিদুল হারামের নিকট তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা সেখানে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে, হাঁ তারা যদি সেখানে যুদ্ধ শুরু করে তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করতে পার। এরূপ কাফিরদের শাস্তি সেটাই।

فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾

১৯২. অত:পর তারা যদি নিরস্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

১২১. এ আয়াত সেই সময় নাযিল হয়, যখন মক্কার মুশরিকগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণকে হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে উমরা আদায়ে বাধা দিয়েছিল এবং চুক্তি হয়েছিল যে, পরবর্তী বছর এসে তাঁরা উমরা করবেন। পরবর্তী বছর উমরার ইচ্ছা করা হলে কতিপয় সাহাবীর মনে আশঙ্কা দেখা দেয় মক্কার মুশরিকগণ চুক্তি ভঙ্গ করে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দেবে না তো? তেমন কিছু ঘটলে মুসলিমগণ সংকটে পড়ে যাবে। কেননা হরমের সীমানায় এবং বিশেষত যূ-কা'দা মাসে তারা কিভাবে যুদ্ধ করবে? কেননা এ মাসে তো যুদ্ধ-বিগ্রহ জায়েয নয়। এ আয়াত নির্দেশনা দিল যে, নিজেদের পক্ষ থেকে তো যুদ্ধ শুরু করবে না। তবে কাফিরগণ যদি চুক্তি ভঙ্গ করত: নিজেরাই যুদ্ধ শুরু করে দেয়, তবে সেক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য যুদ্ধ জায়েয। তারা যদি হরমের সীমানা ও পবিত্র মাসের পবিত্রতাকে উপেক্ষা করে হামলা চালিয়ে বসে তবে মুসলিমদের জন্যও তাদের সে সীমালংঘনের বদলা নেওয়া জায়েয হয়ে যাবে।

১২২. কুরআন মাজীদে 'ফিতনা' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তার মধ্যে একটি অর্থ হল জুলুম ও অত্যাচার। এখানে সম্ভবত সে অর্থ বোঝানোই উদ্দেশ্য। মক্কার মুশরিকগণ মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন থেকে ফেরানোর জন্য চরম অন্যায় ও ন্যাক্কারজনক কঠোরতা অবলম্বন করেছিল। সুতরাং এস্থলে দৃশ্যত এটাই বোঝানো হচ্ছে যে, হত্যা করা মূলত যদিও কোনও ভালো কাজ নয় কিন্তু ফিতনা তার চেয়ে আরও মন্দ কাজ। যেখানে হত্যা ছাড়া ফিতনার দুয়ার বন্ধ করা সম্ভব হয় না। সেখানে তা করা ছাড়া উপায় কি?

১৯৩. তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন আল্লাহর হয়ে যায়।[১২৩] অত:পর তারা যদি ক্ষান্ত হয়, তবে (জেনে রাখ) জালিম ছাড়া অন্য কারও প্রতি কঠোরতা করা উচিত নয়।

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۹۳﴾

১৯৪. পবিত্র মাসের বদলা পবিত্র মাস আর পবিত্রতার ক্ষেত্রেও বদলার বিধান প্রযোজ্য হয়।[১২৪] সুতরাং কেউ যদি তোমাদের প্রতি জুলুম করে, তবে তোমরাও তার প্রতি সেই রকমের জুলুম করতে পার, যেমন জুলুম সে তোমাদের প্রতি করেছে। আর আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং ভালোভাবে বুঝে রাখ যে, আল্লাহ তাদেরই সঙ্গে থাকেন, যারা নিজেদের অন্তরে তার ভয় রাখে।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۹۴﴾

১৯৫. আর আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় কর এবং নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।[১২৫] এবং সৎকর্ম অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛۚ وَاَحْسِنُوْا ۛۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۹۵﴾

---

১২৩. এস্থলে এ বিষয়টি বুঝে রাখা উচিত যে, শরীয়তে জিহাদের উদ্দেশ্য কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা নয়। এ কারণেই সাধারণ অবস্থায় কেউ যদি কুফরেই অবিচল থাকতে চায়, তবে সে জিয্য়ার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের আইন-কানুনের প্রতি সম্মান দেখিয়ে তা থাকতে পারে, যদিও জাযিরাতুল আরবের বিষয়টা আলাদা। কেননা এটা এমন দেশ যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সরাসরি পাঠানো হয়েছে এবং যেখানকার লোকে তার মুজিযাসমূহ চাক্ষুষ দেখেছে ও তাঁর শিক্ষা সরাসরি শুনেছে। এরূপ লোক ঈমান না আনলে পূর্বেকার নবীগণের আমলে তো ব্যাপক আযাবের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে যেহেতু সে রকম আযাব স্থগিত রাখা হয়েছে, তাই আদেশ করা হয়েছে জাযিরাতুল আরবে কোন কাফির নাগরিক হিসেবে বাস করতে পারবে না। এখানে তার জন্য তিনটি উপায়ই আছে– হয় ইসলাম গ্রহণ করবে, নয়ত জাযিরাতুল আরব ত্যাগ করে চলে যাবে অথবা যুদ্ধে কতল হয়ে যাবে।

১২৪. অর্থাৎ কেউ যদি পবিত্র মাসের মর্যাদা পদদলিত করে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে রত হয়, তবে তোমরা তার থেকে প্রতিশোধ নিতে পার।

১২৫. ইশারা করা হচ্ছে যে, তোমরা যদি জিহাদে অর্থ ব্যয় করতে কার্পণ্য কর এবং সে কারণে জিহাদের লক্ষ্য অর্জিত না হয়, তবে সেটা হবে নিজ পায়ে কুঠারাঘাত করার নামান্তর। কেননা তার পরিণামে শত্রু শক্তি সঞ্চয় করে তোমাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ ۟ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ

১৯৬. এবং আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর। হাঁ তোমাদেরকে যদি বাধা দেওয়া হয়, তবে যে কুরবানী সম্ভব হয় (তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন কর)।[১২৬] আর নিজেদের মাথা ততক্ষণ পর্যন্ত কামিও না, যতক্ষণ না কুরবানী নিজ জায়গায় পৌঁছে যায়। হাঁ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে বা তার মাথায় ক্লেশ দেখা দেয়, তবে সে রোযা বা সাদাকা কিংবা কুরবানীর ফিদ্‌য়া দেবে।[১২৭] তারপর যখন তোমরা নিরাপদ হয়ে যাবে, তখন যে ব্যক্তি হজ্জের সাথে উমরার সুবিধাও ভোগ করবে, সে (আল্লাহর উদ্দেশ্যে পেশ করবে) যে কুরবানী সহজলভ্য হয়। কারও যদি সে সামর্থ্য না থাকে, তবে সে হজ্জের দিনে তিনটি রোযা রাখবে এবং সাতটি (রোযা রাখবে) সেই সময়, যখন তোমরা (বাড়িতে) প্রত্যাবর্তন করবে। এভাবে

---

১২৬. অর্থাৎ কেউ যখন হজ্জ বা উমরার ইহরাম বেঁধে ফেলবে, তখন হজ্জ বা উমরার কাজ সমাপণ না করা পর্যন্ত ইহরাম খোলা জায়েয হবে না। হাঁ কেউ যদি নিরুপায় হয়ে যায়, ফলে ইহরাম বাঁধার পর মক্কায় পৌঁছা সম্ভব হয় না, তার কথা ভিন্ন। খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সাহাবীগণকে নিয়ে তিনি উমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। কিন্তু যখন হুদায়বিয়ায় পৌঁছান, তখন মক্কার মুশরিকরা তাঁকে সেখানে আটকে দেয়। ফলে তিনি আর সামনে অগ্রসর হতে পারেননি। তখনই এ আয়াত নাযিল হয়। আয়াতে এরূপ পরিস্থিতিতে এই সমাধান দেওয়া হয়েছে যে, এরূপ অবস্থায় কুরবানী করে ইহরাম খোলা যেতে পারে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে এ কুরবানী হরমের সীমানার মধ্যে হতে হবে, যেমন পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে, 'নিজেদের মাথা ততক্ষণ পর্যন্ত কামিও না, যতক্ষণ না কুরবানী নিজ জায়গায় পৌঁছে যায়। অত:পর যেই হজ্জ বা উমরার ইহরাম বেঁধেছিল তার কাযা করাও জরুরী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরের বছর এ উমরার কাযা করেছিলেন।

১২৭. ইহরাম অবস্থায় মাথা কামানো জায়েয হয় না। তবে অসুস্থতা বা কোন কষ্ট-ক্লেশের কারণে যদি কারও মাথা কামানো দরকার হয়ে পড়ে, তবে তাকে ফিদয়া দিতে হবে, যা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের আলোকে তার ব্যাখ্যা এই যে, হয়ত সে তিনটি রোযা রাখবে অথবা তিনজন মিসকীনকে সদাকায়ে ফিতরের সমান সদকা দেবে অথবা একটা ছাগল কুরবানী করবে।

اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

মোট দশটি রোযা হবে।[১২৮] এ বিধান সেই সব লোকের জন্য, যাদের পরিবারবর্গ মসজিদুল হারামের নিকটে বাস করে না।[১২৯] আর আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং জেনে রেখ আল্লাহর আযাব সুকঠিন।

[২৫]

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ط وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ط وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ز وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

১৯৭. হজ্জের নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস আছে। যে ব্যক্তি সেসব মাসে (ইহরাম বেঁধে) নিজের উপর হজ্জ অবধারিত করে নেয়, সে হজ্জের সময়ে কোন অশ্লীল কথা বলবে না, কোন গুনাহ করবে না এবং ঝগড়াও নয়। তোমরা যা-কিছু সৎকর্ম করবে আল্লাহ তা জানেন। আর (হজ্জের সফরে) পথ খরচা সাথে নিয়ে নিও। বস্তুত তাকওয়াই উৎকৃষ্ট অবলম্বন।[১৩০] আর হে বুদ্ধিমানেরা! তোমরা আমাকে ভয় করে চলো।

---

১২৮. উপরে যে কুরবানীর হুকুম বর্ণিত হয়েছে তা সেই অবস্থায়, যখন কেউ শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। এবার বলা হচ্ছে, কুরবানী সাধারণ নিরাপত্তার অবস্থায়ও ওয়াজিব হতে পারে। যেমন কেউ যদি হজ্জের সাথে উমরাও যোগ করে, অর্থাৎ কিরান বা তামাত্তুর ইহরাম বাঁধে, তার জন্য কুরবানী ওয়াজিব। (কেবল হজ্জের ইহরাম বাঁধলে তাকে 'ইফরাদ হজ্জ' বলে। এক্ষেত্রে কুরবানী ওয়াজিব নয়)। তবে কিরান বা তামাত্তুর ইহরাম বাঁধা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি কুরবানী করার সামর্থ্য না রাখে, তবে কুরবানীর বদলে সে দশটি রোযা রাখতে পারে। তিনটি রোযা আরাফার দিন (৯ই যুলহিজ্জা) পর্যন্ত শেষ হতে হবে আর সাতটি রোযা হজ্জের কাজ শেষ হওয়ার পর।

১২৯. অর্থাৎ তামাত্তু বা কিরানের মাধ্যমে হজ্জ ও উমরাকে একত্র করা কেবল তাদের জন্যই জায়েয, যারা বাইর থেকে হজ্জ করতে আসবে। যারা হরমের সীমানার মধ্যে বাস করে কিংবা হানাফী মাযহাব অনুযায়ী যারা মীকাতের ভেতর বাস করে তারা কেবল ইফরাদই করতে পারে– তামাত্তু বা কিরান নয়।

১৩০. কোনও কোনও লোক হজ্জে রওয়ানা হওয়ার সময় সাথে পথ খরচা রাখত না। তারা বলত, আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে হজ্জ করব। কিন্তু পথে যখন খাওয়ার দরকার পড়ত, তখন অনেক সময় মানুষের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়ে যেত। এ আয়াত বলছে, তাওয়াক্কুলের অর্থ এ নয় যে, মানুষ হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে; বরং উপায় অবলম্বন করাই শরীয়তের শিক্ষা আর সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পাথেয় হল তাকওয়া অর্থাৎ এমন পাথেয় যার মাধ্যমে মানুষ অন্যের সামনে হাত পাতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ فَاِذَاۤ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۪ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿١٩٨﴾

১৯৮. তোমরা (হজ্জের সময়ে ব্যবসা বা মজুর খাটার মাধ্যমে) স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করলে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই।[১৩১] অত:পর তোমরা যখন আরাফাত থেকে রওয়ানা হবে, তখন মাশআরুল হারামের নিকট (যা মুযদালিফায় অবস্থিত) আল্লাহর যিকির করো। আর তার যিকির তোমরা সেভাবেই করবে, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত করেছেন।[১৩২] যদিও এর আগে তোমরা বিলকুল অজ্ঞ ছিলে।

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٩﴾

১৯৯. তাছাড়া (একথাও স্মরণ রেখ যে,) তোমরা সেই স্থান থেকেই রওয়ানা হবে, যেখান থেকে অন্যান্য লোক রওয়ানা হয়।[১৩৩] আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

১৩১. কেউ কেউ হজ্জের সফরে কোনও রকমের ব্যবসা করাকে নাজায়েয মনে করত। তাদের সে ভুল ধারণা খণ্ডন করার জন্য এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সফরে জীবিকা সংগ্রহের জন্য যে-কোনও রকমের কাজ করা জায়েয– যদি তা দ্বারা হজ্জের জরুরী কাজ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

১৩২. হজ্জের সময় আরাফাত থেকে এসে মুযদালিফায় রাত কাটাতে হয় এবং সূর্যোদয়ের আগে ভোরে সেখানে উকূফ (অবস্থান) করতে হয়। তখন আল্লাহ তাআলার যিকির করা হয় ও তাঁর কাছে দু'আ করা হয়। জাহিলী যুগেও আরবগণ আল্লাহর যিকির করত, কিন্তু তার সাথে নিজেদের দেব-দেবীদের যিকিরও যুক্ত করত। এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, মুমিনের যিকির কেবল আল্লাহ তাআলার জন্যই হওয়া চাই, যেমন আল্লাহ তাআলা নির্দেশ ও হিদায়াত করেছেন।

১৩৩. জাহিলী যুগে আরবগণ নিয়ম তৈরি করেছিল যে, ৯ই যুলহিজ্জা সমস্ত মানুষ তো আরাফাতে উকূফ করত, কিন্তু কুরাইশ ও হুম্‌স নামে অভিহিত হরমের আশপাশের কিছু গোত্র আরাফাতে না গিয়ে মুযদালিফায় অবস্থান করত। তারা বলত, আমরা হরমের বাসিন্দা। আরাফাত যেহেতু হরমের সীমানার বাইরে তাই আমরা সেখানে যাব না। ফলে অন্যান্য লোককে তো ৯ই যুলহিজ্জার দিন আরাফাতে কাটানোর পর রাতে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হত, কিন্তু কুরাইশ ও তার অনুসারী গোত্রসমূহ আগে থেকেই মুযদালিফায় থাকত এবং তাদের আরাফায় আসতে হত না, এ আয়াত তাদের সে রীতি বাতিল করে দিয়েছে এবং কুরাইশের লোকদেরকেও হুকুম দিয়েছে, তারা যেন অন্যদের মত আরাফাতে উকূফ করে এবং তাদের সাথেই রওয়ানা হয়ে মুযদালিফায় আসে।

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾

২০০. তোমরা যখন হজ্জের কার্যাবলী শেষ করবে, তখন আল্লাহকে সেইভাবে স্মরণ করবে, যেভাবে নিজেদের বাপ-দাদাকে স্মরণ করে থাক; বরং তার চেয়েও বেশি স্মরণ করবে।[১৩৪] কিছু লোক তো এমন আছে যারা (দু'আয় কেবল) বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান কর আর আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

২০১. আবার তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দান কর দুনিয়ায়ও কল্যাণ এবং আখিরাতেও কল্যাণ এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ۗ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

২০২. এরা এমন লোক, যারা তাদের অর্জিত কর্মের অংশ (সওয়াব রূপে) লাভ করবে। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ۗ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ

২০৩. এবং তোমরা আল্লাহকে গনা-গুণতি কয়েক দিন (যখন তোমরা মিনায় অবস্থানরত থাক) স্মরণ করতে থাক। অত:পর যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দু' দিনেই চলে যাবে তারও কোন গুনাহ নেই এবং যে ব্যক্তি (এক দিন) পরে

---

১৩৪. জাহিলী যুগের আরও একটি রেওয়াজ ছিল– হজ্জের মৌলিক কার্যাবলী শেষ করার পর যখন তারা মিনায় একত্র হত, তখন কিছু লোক সম্পূর্ণ একটা দিন নিজেদের বাপ-দাদার প্রশংসা ও গৌরবগাঁথা বর্ণনা করে কাটিয়ে দিত। এ আয়াতে তাদের সেই রসমের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। আবার কিছু লোক দু'আ তো করত, কিন্তু তারা যেহেতু আখিরাতে বিশ্বাস করত না তাই তাদের দু'আ কেবল দুনিয়ার কল্যাণ প্রার্থনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। পরবর্তী বাক্যে জানানো হয়েছে যে, একজন মুমিনের কর্তব্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানের মঙ্গল কামনা করা।

إِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

যাবে তারও কোন গুনাহ নেই।[১৩৫] এটা (অর্থাৎ এই ব্যাখ্যা) তার জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে। তোমরা সকলে তাকওয়া অবলম্বন কর এবং বিশ্বাস রাখ যে, তোমাদের সকলকে তাঁরই কাছে নিয়ে একত্র করা হবে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ۙ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۝

২০৪. এবং মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কে যার কথা তোমাকে মুগ্ধ করে আর তার অন্তরে যা আছে, সে ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষীও বানায়, অথচ সে (তোমার) শত্রুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কট্টর।

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۝

২০৫. সে যখন উঠে চলে যায়, তখন যমীনে তার দৌড়-ঝাপ হয় এই উদ্দেশ্যে যে, সে তাতে অশান্তি ছড়াবে এবং ফসল ও (জীব-জন্তুর) বংশ নিপাত করবে, অথচ আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টি পসন্দ করেন না।[১৩৬]

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

২০৬. যখন তাকে বলা হয় আল্লাহকে ভয় কর, তখন আত্মাভিমান তাকে আরও বেশি গুনাহে প্ররোচিত করে। সুতরাং এমন ব্যক্তির জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট হবে এবং তা অতি মন্দ বিছানা।

---

১৩৫. মিনায় তিন দিন কাটানো সুন্নত এবং এ সময়ে জামারাতে পাথর নিক্ষেপ ওয়াজিব। তবে ১২ তারিখের পর মিনা থেকে চলে আসা জায়েয। ১৩ তারিখ পর্যন্ত থাকা জরুরী নয়। কেউ থাকতে চাইলে ১৩ তারিখে পাথর নিক্ষেপ করে চলে আসতে পারে।

১৩৬. কোনও কোনও রিওয়ায়াতে আছে, আখনাস ইবনে শারীক নামক এক ব্যক্তি মদীনা মুনাওয়ারায় এসেছিল এবং সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বড় মনোমুগ্ধকর কথাবার্তা বলল এবং আল্লাহকে সাক্ষী রেখে নিজের ঈমান আনার কথা প্রকাশ করল, কিন্তু যখন ফিরে গেল তখন পথে সে মুসলিমদের ফসলে অগ্নিসংযোগ করল এবং তাদের গবাদি পশু যবাহ করে ফেলল। তার প্রতি লক্ষ্য করেই এ আয়াত নাযিল হয়েছিল, যদিও এটা সব রকমের মুনাফিকের জন্যই প্রযোজ্য।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ۝٢٠٧

২০৭. এবং (অপর দিকে) মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজ প্রাণকে বিক্রি করে দেয়।[১৩৭] আল্লাহ (এরূপ) বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝٢٠٨

২০৮. হে মুমিনগণ! ইসলামে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চিত জেন, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝٢٠٩

২০৯. তোমাদের কাছে যে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী এসেছে তারপরও যদি তোমরা (সঠিক পথ থেকে) স্খলিত হও, তবে মনে রেখ, আল্লাহ ক্ষমতায়ও পরিপূর্ণ এবং প্রজ্ঞায়ও পরিপূর্ণ।[১৩৮]

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝٢١٠

২১০. তারা (কাফিরগণ ঈমান আনার জন্য) কি এছাড়া আর কোনও জিনিসের অপেক্ষা করছে যে, আল্লাহ স্বয়ং মেঘের ছায়ায় তাদের সামনে এসে উপস্থিত হবেন এবং ফিরিশতাগণও (তাঁর সাথে থাকবে) আর সকল বিষয়ে মীমাংসা করে দেওয়া হবে?[১৩৯] অথচ সকল বিষয় শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

---

১৩৭. এর দ্বারা সেই সকল সাহাবীর কথা বলা হয়েছে, যারা ইসলামের জন্য নিজেদের প্রাণ বিকিয়ে দিয়েছিলেন। মুফাসসিরগণ এ রকম কয়েকজন সাহাবীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

১৩৮. বিশেষভাবে এ দুটো গুণ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, যেহেতু আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা পরিপূর্ণ, তাই তিনি যে-কোনও সময়ে তোমাদের দুষ্কর্মের শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু যেহেতু তার জ্ঞান-প্রজ্ঞাও পরিপূর্ণ, তাই তিনি স্বীয় প্রজ্ঞা অনুযায়ী স্থির করে রাখেন কাকে কখন এবং কতটুকু শাস্তি দিতে হবে। সুতরাং এ কাফিরদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না বলে তারা যে স্থায়ীভাবে শাস্তি থেকে বেঁচে গেছে এরূপ মনে করা চরম নির্বুদ্ধিতা হবে।

১৩৯. বিভিন্ন কাফির বিশেষত মদীনার ইয়াহুদীগণ এ ধরনের দাবী-দাওয়া পেশ করত যে, আল্লাহ তাআলা নিজে আমাদের দৃষ্টির সামনে এসে আমাদেরকে সরাসরি কেন ঈমান আনার হুকুম দিচ্ছেন না? এ আয়াত তার জবাব দিচ্ছে। জবাবের সারমর্ম এই যে, দুনিয়া

[২৬]

سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۢ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۲۱۱﴾

২১১. বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস কর তাদেরকে আমি কত সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম। যে ব্যক্তির নিকট আল্লাহর নিয়ামত এসে গেছে, তারপর সে তা পরিবর্তন করে ফেলেছে (তার মনে রাখা উচিত যে,) আল্লাহর শাস্তি বড় কঠিন।

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۱۲﴾

২১২. যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের জন্য পার্থিব জীবনকে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক করে তোলা হয়েছে। তারা মুমিনদেরকে উপহাস করে, অথচ যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তারা কিয়ামতের দিন তাদের চেয়ে কত উপরে থাকবে। আল্লাহ যাকে চান অপরিমিত রিযিক দান করেন।[১৪০]

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۫ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ

২১৩. (শুরুতে) সমস্ত মানুষ একই দ্বীনের অনুসারী ছিল। তারপর (যখন তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল তখন) আল্লাহ নবী পাঠালেন, যারা (সত্যপন্থীদেরকে) সুসংবাদ শোনাত ও (মিথ্যাশ্রয়ীদেরকে) ভীতি প্রদর্শন করত। আর তাদের সাথে

মূলত পরীক্ষার জায়গা। এখানে পরীক্ষা নেওয়া হয় যে, মানুষ নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা কাজে লাগিয়ে এবং বিশ্ব জগতে ছড়িয়ে থাকা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীর আলোকে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ ও রাসূলগণের রিসালাতের প্রতি ঈমান আনে কি না। এ কারণেই এ পরীক্ষায় প্রকৃত মূল্য গায়বে ঈমানের। আল্লাহ তাআলাকে যদি সরাসরি দেখা যায়, তবে পরীক্ষা হল কোথায়? আল্লাহ তাআলার নীতি হচ্ছে গায়বের জিনিসসমূহ যদি মানুষ চাক্ষুষ দেখে ফেলে, তখন আর তার ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না। আর এরূপ তখনই হবে যখন এ জগতকে খতম করে শাস্তি ও পুরস্কার দানের সময় এসে যাবে। আয়াতে 'মীমাংসা করে দেওয়া'–এর দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে।

১৪০. এ বাক্যটি মূলত কাফিরদের একটা মিথ্যা দাবীর জবাব। তারা বলত, আল্লাহ তাআলা যেহেতু আমাদেরকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ দিচ্ছেন তাই এটা প্রমাণ করে তিনি আমাদের বিশ্বাস ও কর্মের উপর অসন্তুষ্ট নন। জবাব দেওয়া হয়েছে এই যে, দুনিয়ায় অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য কারও সত্যপন্থী হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। পার্থিব রিযিকের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে আলাদা নিয়ম-নীতি স্থিরীকৃত রয়েছে। এখানে আল্লাহ তাআলা যাকে চান অপরিমিত অর্থ-সম্পদ দিয়ে দেন, তাতে হোক না সে ঘোরতর কাফির।

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

সত্য সম্বলিত কিতাব নাযিল করলেন, যাতে তারা মানুষের মধ্যে সেই সব বিষয়ে মীমাংসা করে দেয়, যা নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ ছিল। আর (পরিতাপের বিষয় হল) অন্য কেউ নয়; বরং যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারাই সমুজ্জল নিদর্শনাবলী আসার পরও কেবল পারস্পরিক রেষারেষির কারণে তাতেই (সেই কিতাবেই) মতভেদ সৃষ্টি করল। অত:পর যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত, সে বিষয়ে নিজ ইচ্ছায় সঠিক পথে পৌঁছে দেন। আর আল্লাহ যাকে চান তাকে সরল-সঠিক পথে পৌঁছে দেন।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

২১৪. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা কি মনে করেছ তোমরা জান্নাতে (এমনিতেই) প্রবেশ করবে, অথচ এখনও পর্যন্ত তোমাদের উপর সেই রকম অবস্থা আসেনি, যেমনটা এসেছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। তাদের উপর এসেছিল অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট এবং তাদেরকে করা হয়েছিল প্রকম্পিত, এমনকি রাসূল এবং তাঁর ঈমানদার সঙ্গীগণ বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? মনে রেখ, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

২১৫. লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য) তারা কী ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন, তোমরা যে সম্পদই ব্যয় কর তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য হওয়া চাই। আর তোমরা কল্যাণকর যে কাজই কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

২১৬. তোমাদের প্রতি (শত্রুর সাথে) যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে আর তোমাদের কাছে তা অপ্রিয়। এটা তো খুবই সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে মন্দ মনে কর, অথচ তোমাদের পক্ষে তা মঙ্গলজনক। আর এটাও সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে পসন্দ কর, অথচ তোমাদের পক্ষে তা মন্দ। আর (প্রকৃত বিষয় তো) আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

[২৭]

২১৭. লোকে আপনাকে মর্যাদাপূর্ণ মাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন?[১৪১] আপনি বলে দিন তাতে যুদ্ধ করা মহাপাপ, কিন্তু মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা, তার বিরুদ্ধে কুফুরী পন্থা অবলম্বন করা, মসজিদুল হারামে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা এবং তার বাসিন্দাদেরকে তা থেকে বের করে

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ

---

১৪১. সূরা তাওবায় (৯ : ৩৬) চারটি মাসকে 'আশহুরে হুরুম' তথা মর্যাদাপূর্ণ মাস বলা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাখ্যা করে বলেন, এ চার মাস হচ্ছে রজব, যু-কা'দা, যুল-হিজ্জা ও মুহাররম। এসব মাসে যুদ্ধ করা নিষেধ। অবশ্য কোন শত্রু যদি এ সময় হামলা করে বসে তবে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ আছে। একবার এক সফরে একদল মুশরিকের সঙ্গে কতিপয় সাহাবীর সংঘর্ষ লেগে যায়। তাতে আমর ইবনে উমাইয়া যামরী নামক এক মুশরিক মুসলিমদের হাতে নিহত হয়। এ ঘটনাটি ঘটেছিল ২৯ জুমুদাল উখরার সন্ধ্যাকালে। কিন্তু সেই ব্যক্তি নিহত হওয়ার পর পরই রজবের চাঁদ উঠে যায়। কিন্তু এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুশরিকগণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেয়। তারা বলতে থাকে যে, মুসলিমগণ মর্যাদাপূর্ণ মাসেরও কোনও পরওয়া করে না। তাদের সে প্রোপাগাণ্ডার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। আয়াতে যা বলা হয়েছে তার সারমর্ম এই যে, এক তো আমর ইবনে উমাইয়া নিহত হয়েছে একটি ভুল বোঝাবুঝির ভিত্তিতে। জেনেশুনে মর্যাদাপূর্ণ মাসে তাকে হত্যা করা হয়নি, অথচ যারা এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমালোচনার ঝড় বইয়ে দিয়েছে তারা তো এর চেয়ে আরও কত কঠিন অপরাধ করে বসে আছে। তারা মানুষকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেয় শুধু তাই নয়; বরং যারা সত্যিকার অর্থে মসজিদুল হারামে ইবাদত করার উপযুক্ত, তাদের প্রতি জুলুম-নির্যাতন করে তাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, ফলে তারা সেখান থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। তদুপরি তারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কুফরের নীতি অবলম্বন করেছে।

الْقِتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۗ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٧﴾

দেওয়া আল্লাহর নিকট আরও বড় পাপ। আর ফিতনা তো হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর জিনিস। তারা (কাফিরগণ) ক্রমাগত তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকবে, এমনকি পারলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফেরাতে চেষ্টা করবে। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ নিজ দ্বীন পরিত্যাগ করে এবং কাফির অবস্থায় মারা যায়, তবে এরূপ লোকের কর্ম দুনিয়া ও আখিরাতে বৃথা যাবে। তারাই জাহান্নামী। তারা সেখানেই সর্বদা থাকবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٨﴾

২১৮. (অপর দিকে) যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা নিঃসন্দেহে আল্লাহর রহমতের আশাবাদী। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ەۗ قُلِ

২১৯. লোকে আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এ দু'টোর মধ্যে মহা পাপও রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারও আছে। আর এ দু'টোর পাপ তার উপকার অপেক্ষা গুরুতর।[১৪২]

---

১৪২. আরববাসী শত-শত বছর থেকে মদপানে অভ্যস্ত ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তার নিষিদ্ধকরণে পর্যায়ক্রমিক পন্থা অবলম্বন করেছেন। প্রথমে সূরা নাহলে (১৬ : ৬৭) সূক্ষ্মভাবে ইশারা করেছেন যে, নেশাকর শরাব ভালো জিনিস নয়। তারপর সূরা বাকারার এ আয়াতে কিছুটা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, মদপানের ফলে মানুষের দ্বারা এমন বহু কার্যকলাপ ঘটে যায়, যা কঠিন গুনাহ, যদিও তার মধ্যে কিছু উপকারিতাও আছে। তবে এর ভেতর বিভিন্ন রকমের গুনাহের সম্ভাবনা অনেক বেশি। তারপর সূরা নিসায় (৪ : ৪৩) আদেশ দেওয়া হয়েছে, তোমরা নেশার অবস্থায় সালাত আদায় করো না। সবশেষে সূরা মায়িদায় (৫ : ৯০–৯১) মদকে অপবিত্র ও শয়তানী কর্ম সাব্যস্ত করত পরিপূর্ণরূপে তা পরিহার করার জন্য দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

الْعَفْوَ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١٩﴾

লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে) তারা কী ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন, যা তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত।[১৪৩] আল্লাহ এভাবেই স্বীয় বিধানাবলী সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পার–

فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ؕ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ؕ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٠﴾

২২০. দুনিয়া সম্পর্কেও এবং আখিরাত সম্পর্কেও। এবং লোকে আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন যে, তাদের কল্যাণ কামনা করা উত্তম কাজ। তোমরা যদি তাদের সাথে মিলেমিশে থাক, তবে (কোনও অসুবিধা নেই। কেননা) তারা তো তোমাদের ভাই-ই বটে। আর আল্লাহ ভালো করে জানেন কে অনর্থ সৃষ্টিকারী আর কে সমাধানকারী। আল্লাহ চাইলে তোমাদেরকে সংকটে ফেলে দিতেন।[১৪৪] নিশ্চয়ই আল্লাহর ক্ষমতাও পরিপূর্ণ এবং তার হিকমতও পরিপূর্ণ।

---

১৪৩. কোনও কোনও সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা দান-সদকার সওয়াব শুনে নিজেদের সমুদয় পুঁজি সদকা করে দেন। এমনকি নিজের ও পরিবারবর্গের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখেননি। ফলে ঘরের লোকজন অভুক্ত দিন কাটায়। এ আয়াত জানিয়ে দিয়েছে যে, দান-খয়রাত সেটাই সঠিক, যা নিজের ও পরিবারবর্গের জরুরত পূর্ণ করার পর করা হবে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে গুরুত্বের সাথে ইরশাদ করেন যে, দান-সদকা এ পরিমাণ হওয়া চাই, যাতে ঘরের লোকজন অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে পড়ে।

১৪৪. কুরআন মাজীদ যখন ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করার ব্যাপারে কঠিন সতর্কবাণী শোনাল (সূরা নিসা ৪ : ২, ১০) তখন যে সকল সাহাবীর তত্ত্বাবধানে ইয়াতীম ছিল তারা তাদের ব্যাপারে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন শুরু করে দিলেন। এমনকি তাঁরা ইয়াতীমদের খাবার পৃথক রান্না করতেন এবং আলাদাভাবেই তাদেরকে খাওয়াতেন। ফলে তাদের কিছু খাবার বেঁচে থাকলে তা নষ্ট হয়ে যেত। এতে যেমন কষ্ট বেশি হত তেমনি ক্ষতিও হত। এ আয়াত স্পষ্ট করে দিল যে, মূল উদ্দেশ্য হল– ইয়াতীমদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা। অভিভাবকদেরকে জটিলতায় ফেলা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং একত্রে তাদের খাবার রান্না করাতে এবং একত্রে খাওয়ানোতে কোন অসুবিধা নেই। শর্ত হল, তাদের সম্পদ থেকে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে তাদের খাওয়ার খরচ উসূল করতে হবে। যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۲۱﴾

২২১. মুশরিক নারীগণ যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে ততক্ষণ তাদেরকে বিবাহ করো না। নিশ্চয়ই একজন মুমিন দাসী যে-কোনও মুশরিক নারী অপেক্ষা শ্রেয়– যদিও সেই মুশরিক নারীকে তোমাদের পসন্দ হয়। আর নিজেদের নারীদের বিবাহ মুশরিক পুরুষদের সাথে সম্পন্ন করো না– যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। নিশ্চয়ই একজন মুমিন গোলাম যে-কোন মুশরিক পুরুষ অপেক্ষা শ্রেয়– যদিও সেই মুশরিক পুরুষকে তোমাদের পসন্দ হয়। তারা সকলে তো জাহান্নামের দিকে ডাকে, যখন আল্লাহ নিজ হুকুমে জান্নাত ও মাগফিরাতের দিকে ডাকেন এবং তিনি স্বীয় বিধানাবলী মানুষের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

[২৮]

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿۲۲۲﴾

২২২. লোকে আপনার কাছে হায়য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, তা অশুচি। সুতরাং হায়যের সময় স্ত্রীদের থেকে পৃথক থেক এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পবিত্র না হয়, ততক্ষণ তাদের কাছে যেও না (অর্থাৎ সহবাস করো না)। হাঁ যখন তারা পবিত্র হয়ে যাবে, তখন তাদের কাছে সেই পন্থায় যাবে, যেমনটা আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই সকল লোককে ভালোবাসেন, যারা তাঁর দিকে বেশি বেশি রুজু করে এবং ভালোবাসেন তাদেরকে যারা বেশি বেশি পাক-পবিত্র থাকে।

কিছু কম-বেশি হয়েও যায় তা ক্ষমাযোগ্য। হাঁ জেনে-শুনে তাদের ক্ষতি করা যাবে না। কে ইনসাফ ও কল্যাণকামিতার পরিচয় দেয় আর কার নিয়ত খারাপ আল্লাহ তাআলা তা ভালো করেই জানেন।

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۪ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰی شِئْتُمْ ۫ وَ قَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۲۳﴾

২২৩. তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র। সুতরাং নিজেদের শস্যক্ষেত্রে যেখান থেকে ইচ্ছা যাও[১৪৫] এবং নিজের জন্য (উৎকৃষ্ট কর্ম) সম্মুখে প্রেরণ কর এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো আর জেনে রেখ, তোমরা অবশ্যই তাঁর সঙ্গে মিলিত হবে এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ শোনাও।

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَ تَتَّقُوْا وَ تُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۲۴﴾

২২৪. এবং তোমরা আল্লাহ (-এর নাম)কে নিজেদের শপথসমূহে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করো না যে, তার মাধ্যমে পুণ্য ও তাকওয়ার কাজসমূহ থেকে এবং মানুষের মধ্যে আপোস রফা করানো থেকে বেঁচে যাবে।[১৪৬] আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন।

---

১৪৫. এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা এক তাৎপর্যপূর্ণ রূপকের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর আনন্দঘন মুহূর্ত সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথমত স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, স্বামী-স্ত্রীর এই মিলন কেবল সুখ ভোগের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত নয়; বরং একে মানব প্রজন্মের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যম মনে করা উচিত। একজন কৃষক যেমন নিজ শস্য ক্ষেত্রে বীজ বপণ করে এবং তাতে তার উদ্দেশ্য থাকে ফসল ফলানো, তেমনিভাবে এ কাজও মূলত মানব-প্রজন্মকে স্থায়ী করার একটি মাধ্যম। দ্বিতীয়ত জানানো হয়েছে যে, এটাই যখন মিলনের আসল উদ্দেশ্য তখন তা নারী দেহের সেই অংশেই হওয়া উচিত, যা এর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। পেছনের যে অংশকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি স্বভাব-প্রকৃতির বিপরীতে তাকে বিকৃত যৌনাচারের জন্য ব্যবহার করা সম্পূর্ণ হারাম। তৃতীয় বিষয় এই জানানো হয়েছে যে, নারীদেহের সামনের যে অংশকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তা ব্যবহার করার জন্য পন্থা যে কোনওটাই অবলম্বন করা যেতে পারে। ইয়াহুদীদের ধারণা ছিল সে অঙ্গকে ব্যবহার করার জন্য কেবল একটা পদ্ধতিই জায়েয অর্থাৎ সম্মুখ দিক থেকে ব্যবহার করা। মিলন যদি সামনের অঙ্গেই হয়, কিন্তু তা করা হয় পেছন দিক থেকে তবে তাদের মতে তা জায়েয ছিল না। তাদের ধারণা ছিল তাতে ট্যারা চোখের সন্তান জন্ম নেয়। এ আয়াত তাদের সে ভুল ধারণা খণ্ডন করেছে।

১৪৬. অনেক সময় মানুষ সাময়িক উত্তেজনাবশে কসম খেয়ে বসে যে, আমি অমুক কাজ করব না, অথচ সেটি পুণ্যের কাজ। যেমন একবার হযরত মিসতাহ (রাযি.)-এর দ্বারা একটি ভুল কাজ হয়ে গিয়েছিল। ফলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) কসম করেছিলেন যে, তিনি আর কখনও তাকে আর্থিক সাহায্য করবেন না। এমনিভাবে রূহুল মাআনীতে একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযি.) নিজ ভগ্নিপতি সম্পর্কে কসম করেছিলেন, তার সঙ্গে কখনও কথা বলবেন না এবং তার স্ত্রীর

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۲۲۵﴾

২২৫. তোমাদের লাগ্‌ব্ কসমের কারণে আল্লাহ তোমাদেরকে ধরবেন না।[১৪৭] কিন্তু যে কসম তোমরা তোমাদের মনের ইচ্ছাক্রমে করেছ সেজন্য তিনি তোমাদেরকে ধরবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَاۗىِٕهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَاۗءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۲۶﴾

২২৬. যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে ঈলা করে (অর্থাৎ তাদের কাছে না যাওয়ার কসম করে) তাদের জন্য রয়েছে চার মাসের অবকাশ।[১৪৮] সুতরাং যদি তারা (এর মধ্যে কসম ভেঙ্গে) ফিরে আসে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۲۷﴾

২২৭. আর সে যদি তালাকেরই সংকল্প করে নেয়, তবে আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন।

সঙ্গে তার আপোসরফা করিয়ে দেবেন যা। আলোচ্য আয়াত এ জাতীয় কসম করতে নিষেধ করছে। কেননা এতে আল্লাহ তাআলার নাম ভুল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সহীহ হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেউ এ রকম অনুচিত কসম করলে তার উচিত কসম ভেঙ্গে ফেলা ও তার কাফ্‌ফারা দেওয়া।

১৪৭. 'লাগ্‌ব্ কসম' দু' প্রকার। এক তো সেই কসম যা কসমের ইচ্ছায় করা হয় না; বরং যা কথার একটা মুদ্রারূপে মুখে এসে পড়ে, বিশেষত আরবদের মধ্যে এর বহুল প্রচলন ছিল। তারা কথায় কথায় والله, (আল্লাহর কসম) বলে দিত। দ্বিতীয় প্রকারের লাগ্‌ব্ হল সেই কসম, যা মানুষ অনেক সময় পেছনের কোনও ঘটনা সম্পর্কে করে থাকে, আর তার ধারণা অনুযায়ী তা সত্য, মিথ্যা বলার কোন ইচ্ছা তার থাকে না, কিন্তু পরে ধরা পড়ে যে, কসম করে সে যে কথা বলেছিল তা আসলে সঠিক ছিল না। এ উভয় প্রকারের কসমকেই লাগ্‌ব্ বলা হয়। এ আয়াত জানাচ্ছে যে, এ জাতীয় কসমে কোন গুনাহ নেই। অবশ্য মানুষের উচিত কসম করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং এ জাতীয় কসমও এড়িয়ে চলা।

১৪৮. আরবদের মধ্যে এই অন্যায় প্রথা চালু ছিল যে, কসম করে বলত সে তার স্ত্রীর কাছে যাবে না। ফলে স্ত্রী অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঝুলন্ত অবস্থায় পড়ে থাকত; সে স্ত্রী হিসেবে তার ন্যায্য অধিকারও পেত না আবার অন্যত্র বিবাহও করতে পারত না। এরূপ কসমকে ঈলা বলে। এ আয়াতে আইন করে দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঈলা করবে, সে চার মাসের ভেতর কসম ভেঙ্গে কাফফারা আদায় করবে এবং স্ত্রীর সঙ্গে যথারীতি দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল করবে। যদি তা না করে তবে তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটবে। পরের আয়াতে যে বলা হয়েছে, 'যদি সে তালাকেরই সংকল্প করে নেয়' তার অর্থ এটাই যে, সে যদি চার মাসের মধ্যে কসম ভঙ্গ না করে এবং এভাবে মেয়াদ উত্তীর্ণ করে ফেলে তবে বিবাহ আপনা আপনিই খতম হয়ে যাবে।

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۲۸﴾

২২৮. যে নারীদের তালাক দেওয়া হয়েছে, তারা তিন বার হায়েয আসা পর্যন্ত নিজেকে প্রতীক্ষায় রাখবে।[১৪৯] আর তারা যদি আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে, তবে আল্লাহ তাদের গর্ভাশয়ে যা-কিছু (ভ্রূণ বা হায়য) সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে হালাল হবে না। এ মেয়াদের মধ্যে তাদের স্বামীগণ যদি পরিস্থিতি ভালো করতে চায়, তবে সে নারীদেরকে (নিজেদের স্ত্রীত্বে) ওয়াপস গ্রহণের অধিকার তাদের রয়েছে। আর স্ত্রীদেরও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের প্রতি (স্বামীদের) অধিকার রয়েছে। অবশ্য তাদের উপর পুরুষদের এক স্তরের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।[১৫০] আল্লাহ পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।

[২৯]

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ

২২৯. তালাক (বেশির বেশি) দু'বার হওয়া চাই। অত:পর (স্বামীর জন্য দু'টি পথই খোলা আছে) হয়ত নীতিসম্মতভাবে (স্ত্রীকে) রেখে দেবে (অর্থাৎ তালাক প্রত্যাহার করে দেবে) অথবা উৎকৃষ্ট

---

১৪৯. এর দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ইদ্দতের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তালাকের পর তাদেরকে তিন বার মাসিক পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে। এরপর তারা অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। সূরা আহযাবে (৩৩ : ৪৯) স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হয় কেবল তখনই যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নির্জনবাস হয়ে থাকে। যদি তার আগেই তালাক হয়ে যায় তবে ইদ্দত ওয়াজিব হয় না। সূরা তালাকে (৬৫ : ৪) আরও বলা হয়েছে যে, যে নারীর হায়য স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা এখনও পর্যন্ত শুরুই হয়নি, তাদের ইদ্দত তিন মাস। যদি সে গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দ্বারা তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে।

১৫০. জাহিলী যুগে নারীর কোন অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এ আয়াত জানাচ্ছে যে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই একের উপর অন্যের অধিকার রয়েছে। অবশ্য এটা অনস্বীকার্য যে, জীবন চলার পথে আল্লাহ তাআলা স্বামীকে কর্তা ও তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে দিয়েছেন, যেমন সূরা নিসায় (৪ : ৩৪) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এ হিসেবে তার এক পর্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۲۹﴾

পন্থায় তাকে ছেড়ে দেবে (অর্থাৎ প্রত্যাহার না করে, বরং ইদ্দত শেষ করতে দেবে)। আর (হে স্বামীগণ!) তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীগণকে) যা-কিছু দিয়েছ, তালাকের বদলে তা ফেরত নেওয়া তোমাদের পক্ষে হালাল নয়। তবে উভয়ে যদি আশঙ্কা বোধ করে যে, তারা (বিবাহ বহাল রাখা অবস্থায়) আল্লাহর স্থিরীকৃত সীমা কায়েম রাখতে সক্ষম হবে না,[১৫১] তবে ভিন্ন কথা।

সুতরাং তোমরা যদি আশংকা কর তারা আল্লাহর সীমা প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারবে না, তবে তাদের জন্য এতে কোন গুনাহ নেই যে, স্ত্রী মুক্তিপণ দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবে। এটা আল্লাহর স্থিরীকৃত সীমা। সুতরাং তোমরা এটা লংঘন করো না। যারা আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে তারা বড়ই জালিম।

---

১৫১. আয়াতে এক নির্দেশ তো এই দেওয়া হয়েছে যে, তালাক যদি দিতেই হয় তবে সর্বোচ্চ দুই তালাক দেওয়া উচিত। কেননা এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক বহাল রাখার সুযোগ থাকে, যেহেতু তখন ইদ্দত চলাকালে তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়ার অধিকার স্বামীর থাকে এবং ইদ্দতের পর উভয়ে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নতুন মোহরানায় নতুনভাবে বিবাহ সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু তিন তালাক দিয়ে ফেললে এ উভয় পথ বন্ধ হয়ে যায়, যেমন পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে সম্পর্ক বহাল করার কোনও পথই খোলা থাকে না। দ্বিতীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই যে, স্বামী তালাক প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিক বা সম্পর্কচ্ছেদের, উভয় অবস্থায়ই ব্যাপারটা সুন্দরভাবে সদাচরণের সাথে সম্পন্ন করা চাই। সাধারণ অবস্থায় স্বামীর পক্ষে এটা হালাল নয় যে, সে তালাকের বদলে মোহরানা ফেরত দেওয়ার বা মাফ করে দেওয়ার দাবী জানাবে। হাঁ স্ত্রীর পক্ষ থেকেই যদি তালাক চাওয়া হয় এবং সেটা স্বামীর পক্ষ হতে কোন জুলুমের কারণে না হয়, বরং অন্য কোনও কারণে হয়, যেমন স্ত্রী স্বামীকে পসন্দ করতে পারছে না, আর এ কারণে উভয়ের আশঙ্কা হয় তারা স্বচ্ছন্দভাবে বৈবাহিক দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় করতে পারবে না, তবে এ অবস্থায় এটা জায়েয রাখা হয়েছে যে, স্ত্রী আর্থিক বিনিময় হিসেবে পূর্ণ মোহরানা বা তার অংশবিশেষ স্বামীকে ওয়াপস করবে কিংবা এখনও পর্যন্ত তা আদায় না হয়ে থাকলে তা মাফ করে দেবে (পরিভাষায় এটাকে 'খুলা' বলে)।

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يَّتَرَاجَعَاۤ اِنْ ظَنَّاۤ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿۲۳۰﴾

২৩০. অত:পর (স্বামী) যদি তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয় তবে সে (তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী) তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে অন্য কোনও স্বামীকে বিবাহ করবে। অত:পর যদি সে (দ্বিতীয় স্বামী) তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তাদের জন্য এতে কোন গুনাহ নেই যে, তারা (নতুন বিবাহের মাধ্যমে) পুনরায় একে অন্যের কাছে ফিরে আসবে– শর্ত হল তাদের প্রবল ধারণা থাকতে হবে যে, এবার তারা আল্লাহর সীমা কায়েম রাখতে পারবে। এসব আল্লাহর স্থিরীকৃত সীমা, যা তিনি জ্ঞানবান লোকদের জন্য স্পষ্টরূপে বর্ণনা করছেন।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۪ وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَا تَتَّخِذُوْۤا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ز وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَاۤ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۳۱﴾

২৩১. যখন তোমরা নারীদেরকে তালাক দিয়ে দাও, তারপর তারা তাদের ইদ্দতের কাছাকাছি পৌঁছে যায়, তখন হয় তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে (নিজ স্ত্রীত্বে) রেখে দেবে, নয়ত তাদেরকে ন্যায়সঙ্গত-ভাবে ছেড়ে দেবে। তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার লক্ষ্যে এজন্য আটকে রেখ না যে, তাদের প্রতি জুলুম করতে পারবে।[১৫২] যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে স্বয়ং নিজ সত্তার প্রতিই জুলুম করবে। তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে তামাশায় পরিণত করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন

---

১৫২. জাহিলী যুগে একটা নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা এই ছিল যে, লোকে তাদের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিত, তারপর যখন ইদ্দত শেষ হওয়ার উপক্রম করত তখন প্রত্যাহার করে নিত, যাতে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করতে না পারে। তারপর তার হক আদায়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে বরং কিছু দিনের ভেতর আবারও তালাক দিত এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে-আগে প্রত্যাহার করে নিত। এভাবে সে বেচারী মাঝখানে ঝুলে থাকত– না অন্য কোন স্বামী গ্রহণ করতে পারত আর না বর্তমান স্বামীর কাছ থেকে নিজ অধিকার আদায় করতে পারত। আলোচ্য আয়াত তাদের সে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাকে হারাম ঘোষণা করছে।

এবং তোমাদেরকে উপদেশ দানের লক্ষ্যে তোমাদের প্রতি যে কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন তা স্মরণ রেখ। আর আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং জেনে রেখ আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবগত।

[৩০]

২৩২. তোমরা যখন নারীদেরকে তালাক দেবে তারপর তারা ইদ্দত পূর্ণ করবে, তখন (হে অভিভাবকেরা!) তোমরা তাদেরকে এ কাজে বাধা দিও না যে, তারা তাদের (প্রথম) স্বামীদেরকে (পুনরায়) বিবাহ করবে– যদি তারা পরস্পরে ন্যায়সম্মতভাবে একে অন্যের প্রতি রাজি হয়ে যায়।[১৫৩] এসব বিষয় দ্বারা তোমাদের মধ্যে সেই সব লোককে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে। এটাই তোমাদের পক্ষে বেশি শুদ্ধ ও পবিত্র পন্থা। আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ط ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ط وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

২৩৩. মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু' বছর দুধ পান করাবে। এ সময়কাল তাদের জন্য, যারা দুধ পান করানোর মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। সন্তান যে পিতার তার কর্তব্য ন্যায়সম্মতভাবে মায়েদের খোরপোষের ভার বহন করা।[১৫৪] (হাঁ) কাউকে তার সামর্থ্যের

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط

---

১৫৩. অনেক সময় তালাকের পর ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর শিক্ষা লাভ হত, ফলে তারা নতুনভাবে জীবন শুরু করার জন্য পরস্পরে পুনরায় বিবাহ সম্পন্ন করতে চাইত। যেহেতু তালাক তিনটি হত না, তাই শরীয়তে নতুন বিবাহ জায়েযও ছিল এবং স্ত্রীও তাতে সম্মত থাকত, কিন্তু তার আত্মীয়-স্বজন নিজেদের কাল্পনিক অহমিকার কারণে তাকে তার প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধা দিত। এ আয়াত তাদের সে ভ্রান্ত রসমকে অবৈধ সাব্যস্ত করছে।

১৫৪. তালাক সংক্রান্ত বিধানাবলীর মাঝখানে শিশুর দুধ পান করানোর বিষয়টা উল্লেখ করা হয়েছে এ হিসেবে যে, অনেক সময় এটাও পিতা-মাতার মধ্যে কলহের কারণ হয়ে

لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۲۳۳﴾

বাইরে ক্লেশ দেওয়া হয় না। মাকে তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া যাবে না এবং পিতাকেও তার সন্তানের কারণে নয়।[১৫৫] অনুরূপ দায়িত্ব ওয়ারিশের উপরও রয়েছে।[১৫৬] অত:পর তারা (পিতা-মাতা) পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে (দু' বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই) যদি দুধ ছাড়াতে চায়, তবে তাতেও তাদের কোন গুনাহ নেই। তোমরা যদি তোমাদের সন্তানদেরকে কোন ধাত্রীর দুধ পান করাতে চাও, তাতেও তোমাদের কোন গুনাহ নেই– যদি তোমরা ধার্যকৃত পারিশ্রমিক (ধাত্রীমাতাকে) আদায় কর এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ ভালোভাবে দেখছেন।

দাঁড়ায়। তবে এ স্থলে যে আহকাম বর্ণিত হয়েছে, তা তালাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সাধারণভাবে সর্বাবস্থায়ই প্রযোজ্য। এ স্থলে প্রথমে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, দুধ সর্বোচ্চ দু' বছর পর্যন্ত পান করানো যায়। অত:পর মায়ের দুধ ছাড়ানো অবশ্য কর্তব্য। দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, পিতা-মাতা শিশুর পক্ষে ভালো মনে করলে দু' বছরের আগেও দুধ ছাড়াতে পারে। দু' বছর পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়। তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, দুগ্ধদানকারিণী মায়ের খোরপোষ তার স্বামী তথা শিশুর পিতাকে বহন করতে হবে। বিবাহ কায়েম থাকলে তো বিবাহের কারণেই এটা বহন করা তার উপর ওয়াজিব হয়। আর তালাক হয়ে গেলে ইদ্দতের ভেতর দুধ পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব। এক্ষেত্রেও তার খোরপোষ তালাকদাতা স্বামীকেই বহন করতে হবে। ইদ্দতের পর খোরপোষ না পেলেও দুধ পান করানোর কারণে তালাকপ্রাপ্ত মা পারিশ্রমিক দাবী করতে পারবে।

১৫৫. অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত কোন কারণে মা যদি দুধ পান না করায়, তবে তাকে বাধ্য করা যাবে না, অন্য দিকে শিশু যদি মা ছাড়া অন্য কারও দুধ গ্রহণ না করে, তবে তাকে দুধ পান করাতে অস্বীকার করা মায়ের জন্য জায়েয নয়। কেননা এ অবস্থায় দুধ পান করাতে অস্বীকার করা পিতাকে অহেতুক কষ্টে ফেলার নামান্তর।

১৫৬. অর্থাৎ কোন শিশুর পিতা যদি জীবিত না থাকে, তবে দুধ পান করানো সংক্রান্ত যেসব দায়-দায়িত্ব পিতার উপর থাকে, তা ওয়ারিশদের উপর বর্তাবে। অর্থাৎ শিশুটি মারা গেলে যারা তার সম্পত্তির ওয়ারিশ হতে পারে, তাদের উপরই এ দায়িত্ব বর্তায় যে, তারা এ শিশুর দুধ পান করানোর ব্যবস্থা করবে এবং সে ব্যাপারে যা-কিছু খরচ হয়, তা বহন করবে।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۲۳۴﴾

২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় ও স্ত্রী রেখে যায় তাদের সে স্ত্রীগণ নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় রাখবে। অত:পর তারা যখন (নিজ) ইদ্দত (-এর মেয়াদ)-এ পৌঁছে যাবে, তখন তারা নিজেদের ব্যাপারে ন্যায়সম্মতভাবে যা-কিছু করবে (যেমন দ্বিতীয় বিবাহ) তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই, তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ؕ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۲۳۵﴾

২৩৫. এবং (ইদ্দতের ভেতর) তোমরা যদি নারীদেরকে ইশারা-ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব দাও অথবা (তাদেরকে বিবাহ করার ইচ্ছা) অন্তরে গোপন রাখ তবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা অন্তরে তাদেরকে (বিবাহ করার) কল্পনা করবে। তবে তাদেরকে বিবাহ করার দ্বিপাক্ষিক প্রতিশ্রুতি দিও না। হাঁ ন্যায়সম্মতভাবে কোন কথা বললে[১৫৭] সেটা ভিন্ন কথা। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইদ্দতের নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিবাহের আকদ পাকা করার ইচ্ছাও করো না। স্মরণ রেখ, তোমাদের অন্তরে যা-কিছু আছে আল্লাহ তা ঢের জানেন। সুতরাং তাঁকে ভয় করে চলো এবং স্মরণ রেখ আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

১৫৭. যে নারী ইদ্দত পালন করছে তাকে পরিষ্কার ভাষায় বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া কিংবা এ কথা পাকা করে নেওয়া যে, ইদ্দতের পর তুমি কিন্তু আমাকেই বিবাহ করবে, সম্পূর্ণ নাজায়েয। অবশ্য আয়াতে এমন কোন ইশারা-ইঙ্গিত করাকে জায়েয রাখা হয়েছে, যা দ্বারা সে নারী বুঝতে পারে যে, ইদ্দতের পর বিবাহের প্রস্তাব দেওয়াই এ ব্যক্তির উদ্দেশ্য। যেমন এতটুকু বলে দেওয়া যে, আমিও কোন উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করছি।

[৩১]

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

২৩৬. এতেও তোমাদের কোন গুনাহ নেই যে, তোমরা স্ত্রীদেরকে এমন সময়ে তালাক দেবে যে, তখনও পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করনি এবং তাদের মোহরও ধার্য করনি। (এরূপ অবস্থায়) তোমরা তাদেরকে কিছু উপহার দিও–[১৫৮] সচ্ছল ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এবং অসচ্ছল ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী। উত্তম পন্থায় এ উপঢৌকন দিও। এটা সৎকর্মশীলদের প্রতি এক অত্যাবশ্যকীয় করণীয়।

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

২৩৭. তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই যদি তালাক দাও এবং তোমরা (বিবাহকালে) তাদের জন্য মোহর ধার্য করে থাক, তবে যে পরিমাণ মোহর ধার্য করেছিলে তার অর্ধেক (দেওয়া ওয়াজিব), অবশ্য স্ত্রীগণ যদি ছাড় দেয় (এবং অর্ধেক মোহরও দাবী না করে) অথবা যার হাতে বিবাহের গ্রন্থি (অর্থাৎ স্বামী) সে যদি ছাড় দেয় (এবং পূর্ণ মোহর দিয়ে দেয়), তবে ভিন্ন কথা। যদি তোমরাই ছাড় দাও, তবে সেটাই তাকওয়ার বেশি নিকটবর্তী। আর পরস্পরে ঔদার্যপূর্ণ আচরণ ভুলে যেও না। তোমরা যা-কিছুই কর, আল্লাহ তা নিশ্চিত দেখছেন।

---

১৫৮. বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রী যদি মোহর ধার্য না করে, তারপর উভয়ের মধ্যে নিভৃত সাক্ষাতের সুযোগ আসার আগেই তালাক হয়ে যায়, তবে এ অবস্থায় মোহর আদায় করা স্বামীর উপর ওয়াজিব নয় বটে কিন্তু অন্ততপক্ষে এক জোড়া কাপড় দেওয়া ওয়াজিব। অতিরিক্ত কিছু উপঢৌকন দিলে আরও ভালো। (পরিভাষায় এ উপঢৌকনকে 'মুতআ' বলে)। বিবাহের সময় যদি মোহর ধার্য করা হয়ে থাকে, অত:পর নিভৃত সাক্ষাতের আগেই তালাক হয়ে যায়, তবে অর্ধেক মোহর দেওয়া ওয়াজিব হয়।

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۚ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿٢٣٨﴾

২৩৮. তোমরা নামাযসমূহের প্রতি পুরোপুরি যত্নবান থেক এবং (বিশেষভাবে) মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি[১৫৯] এবং আল্লাহর সামনে আদবের সাথে অনুগত হয়ে দাঁড়িয়ো।

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٩﴾

২৩৯. তোমরা যদি (শত্রুর) ভয় কর, তবে দাঁড়িয়ে বা আরোহী অবস্থায় (নামায পড়ে নিও)।[১৬০] অত:পর তোমরা যখন নিরাপদ অবস্থা লাভ কর, তখন আল্লাহর যিকির সেইভাবে কর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যে সম্পর্কে তোমরা অনবগত ছিলে।

وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚۖ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا

২৪০. তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু হয়ে যায় এবং স্ত্রী রেখে যায়, তারা যেন (মৃত্যুকালে) স্ত্রীদের অনুকূলে ওসিয়ত করে যায় যে, তারা এক বছর পর্যন্ত (পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে খোরপোষ গ্রহণের) সুবিধা ভোগ করবে এবং তাদেরকে (স্বামীগৃহ থেকে) বের করা যাবে না।[১৬১] হাঁ, তারা নিজেরাই যদি

---

১৫৯. ১৫৩ নং আয়াত থেকে ইসলামী আকায়েদ ও আহকামের যে বর্ণনা শুরু হয়েছিল (সে আয়াতের অধীনে আমাদের টীকা দেখুন) তা এবার শেষ হতে যাচ্ছে। ১৫৩ নং আয়াতে সে বর্ণনার সূচনা হয়েছিল সালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ দ্বারা। এবার উপসংহারে পুনরায় সালাতের গুরুত্ব তুলে ধরা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, যুদ্ধের কঠিন অবস্থায়ও সম্ভাব্যতার সর্বশেষ পর্যায় পর্যন্ত সালাতের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। 'মধ্যবর্তী নামায' দ্বারা আসরের নামায বোঝানো হয়েছে। তার বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ, সাধারণত লোকে এ সময় নিজ কাজ-কর্ম গোছাতে ব্যস্ত থাকে। ফলে সালাত আদায়ে গাফলতি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

১৬০. যুদ্ধ অবস্থায় যখন যথারীতি সালাত আদায় করার সুযোগ হয় না, তখন দাঁড়িয়ে ইশারায় সালাত আদায়ের অনুমতি আছে। তবে চলন্ত অবস্থায় সালাত আদায় বৈধ নয়। যদি দাঁড়ানোরও সুযোগ না হয়, তবে সালাত কাযা করাও জায়েয।

১৬১. শেষ দিকে তালাক সম্পর্কিত যে মাসাইলের আলোচনা চলছিল তার একটি পরিশেষ এ স্থলে উল্লেখ করা হচ্ছে। বিষয়টি তালাকপ্রাপ্তা নারীদের অধিকার সম্পর্কিত। জাহিলী যুগে বিধবার ইদ্দত হত এক বছর। ইসলাম সে মেয়াদ কমিয়ে চার মাস দশ দিন করে দিয়েছে (দ্র. আয়াত ২৩৪)। এ আয়াত যখন নাযিল হয়, তখনও পর্যন্ত মীরাছের আহকাম নাযিল

فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۴۰﴾

বের হয়ে যায়, তবে নিজেদের ব্যাপারে তারা বিধিমত যা করবে, তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। আল্লাহ ক্ষমতাবানও, প্রজ্ঞাময়ও।

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿۲۴۱﴾

২৪১. তালাকপ্রাপ্তাদেরকে বিধিমত ফায়দা দান মুত্তাকীদের উপর তাদের অধিকার।[১৬২]

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۲۴۲﴾

২৪২. এভাবেই আল্লাহ স্বীয় বিধানাবলী তোমাদের কাছে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ কর।

হয়নি। উপরে ১৮০ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, মৃত্যুপথ যাত্রীর কর্তব্য তার সম্পদ থেকে কোন আত্মীয় কতটুকু পাবে সে সম্পর্কে ওসিয়ত করে যাওয়া। এ আয়াতে সে নীতি অনুসারেই বলা হচ্ছে যে, যদিও বিধবার ইদ্দত চার মাস দশ দিন, কিন্তু তার স্বামীর উচিত স্ত্রীর সম্পর্কে এই ওসিয়ত করে যাওয়া যে, তাকে যেন এক বছর পর্যন্ত তার সম্পদ থেকে খোরপোষ দেওয়া হয় এবং তাকে যেন তার ঘরে থাকারও সুযোগ দেওয়া হয়। অবশ্য সে নিজেই যদি তার এ হক ছেড়ে দেয় এবং চার মাস দশ দিন পর স্বামীর ঘর থেকে বের হয়ে যায়, তবে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু চার মাস দশ দিন পূর্ণ হওয়ার আগে তার জন্য স্বামীগৃহ ত্যাগ করা জায়েয নয়। পরবর্তী বাক্যে যে বলা হয়েছে, 'হাঁ সে নিজেই যদি বের হয়ে যায়, তবে নিজের ব্যাপারে সে বিধিমত যা-কিছুই করবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই; তাতে বিধিমত বলতে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, সে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর বের হতে পারবে, তার আগে নয়। তবে এ সমস্ত বিধান মীরাছের আহকাম নাযিল হওয়ার আগে ছিল। যখন সূরা নিসায় মীরাছের বিধান এসে গেছে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীর অংশ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তখন এক বছরের খোরপোষ ও স্বামীগৃহে অবস্থানের হক রহিত হয়ে গেছে।

১৬২. তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে 'ফায়দা দান'-এর যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এটা অতি ব্যাপক। ইদ্দতকালীন খোরপোষ যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি মোহরানা পরিশোধ করা না হয়ে থাকলে তাও এর মধ্যে পড়ে। তাছাড়া পূর্বে ২৩৬ নং আয়াতে যে উপঢৌকনের কথা বলা হয়েছে তাও এর মধ্যে শামিল রয়েছে। বিবাহে যদি মোহরানা ধার্য করা না হয় এবং নিভৃত সাক্ষাতের আগেই তালাক হয়ে যায়, তখন উপঢৌকন দেওয়া ওয়াজিব, কিন্তু যখন মোহরানা ধার্য থাকে, তখন তা (উপঢৌকন) দেওয়া ওয়াজিব না হলেও মুস্তাহাব বটে। কাজেই তাকে মোহরানার সাথে কিছু উপঢৌকনও দেওয়া চাই। এসব বিধান দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তালাক দেওয়া কিছু ভালো কাজ নয়। যখন অন্য কোন উপায় বাকি না থাকে, কেবল তখনই তালাক দেওয়ার চিন্তা করা যায়। অত:পর যখন তালাক দেওয়া হবে তখন দাম্পত্য সম্পর্কের অবসানও ভদ্রোচিত, ঔদার্য ও সম্মানজনকভাবে শান্ত-সংযত পরিবেশে ঘটানো উচিত, শত্রুতামূলক পরিবেশে নয়।

[৩২]

২৪৩. তুমি কি তাদের অবস্থা জান না, যারা মৃত্যু হতে বাঁচার জন্য নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিল এবং তারা সংখ্যায় ছিল হাজার-হাজার? অত:পর আল্লাহ তাদের বললেন, মরে যাও। তারপর তিনি তাদের জীবিত করলেন।[১৬৩] প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মানুষের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾

২৪৪. এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং নিশ্চিত জেন আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾

---

১৬৩. এখান থেকে ২৬০ আয়াত পর্যন্ত দু'টি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা। কিন্তু মুনাফিক ও ভীরু প্রকৃতির লোক যেহেতু মৃত্যুকে বড় ভয় পেত তাই তারা যুদ্ধে যেতে গড়িমসি করত, যে কারণে একই সঙ্গে দ্বিতীয় বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। তার সারমর্ম এই যে, জীবন ও মৃত্যু আল্লাহ তাআলারই হাতে। তিনি চাইলে যুদ্ধ ছাড়াও মৃত্যু দিতে পারেন এবং চাইলে ঘোরতর লড়াইয়ের ভেতরও প্রাণ রক্ষা করতে পারেন। বরং তার এ ক্ষমতাও রয়েছে যে, মৃত্যুর পরও তিনি মানুষকে জীবিত করতে পারেন। তাঁর এ ক্ষমতার সাধারণ প্রকাশ তো আখিরাতেই ঘটবে, কিন্তু এ দুনিয়াতেও তিনি জগতকে এমন কিছু নমুনা দেখিয়ে দিয়েছেন, যাতে মৃত লোককে আবার জীবিত করে তোলা হয়েছে। তার একটি দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছে এ আয়াতে (২৪৩)। তাছাড়া ২৫৩ নং আয়াতে ইশারা করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের হাতে আল্লাহ তাআলা কয়েকজন মৃত লোককে জীবন দান করেছেন। এমনিভাবে ২৫৮ নং আয়াতে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও নমরূদের কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে, যাতে দেখানো হয়েছে মৃত্যু ও জীবন দানের বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। চতুর্থ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ২৫৯ নং আয়াতে। তাতে হযরত উযায়র (আ.)-এর ঘটনা দেখানো হয়েছে। তারপরে ২৬০ নং আয়াতে পঞ্চম ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাতে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছে আরজ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা মৃতকে কিভাবে জীবিত করেন তা তিনি দেখতে চান।

বর্তমান আয়াত (নং ২৪৩)-এ যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে কুরআন মাজীদে তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, কোনও এক কালে একটি সম্প্রদায় মৃত্যু থেকে বাঁচার লক্ষ্যে নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে পড়েছিল। তাদের সংখ্যা ছিল হাজার-হাজার। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঠিকই তাদের মৃত্যু ঘটান। তারপর আবার তাদেরকে জীবিত করে দেখিয়ে দেন, মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ তাআলার হুকুম অমান্য করে কোন কৌশলের আশ্রয় নেয়, তবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই যে, ঠিকই সে মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। যত বড় কৌশলই গ্রহণ করুক, তারপরও আল্লাহ তাআলা তাকে মৃত্যুর স্বাদ চাখাতে পারেন।

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۪ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۲۴۵﴾

২৪৫. কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম পন্থায় ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার কল্যাণে তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন?[১৬৪] আল্লাহই সংকট সৃষ্টি করেন এবং তিনিই স্বচ্ছলতা দান করেন আর তাঁরই কাছে তোমাদের সকলকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

এসব লোক কারা ছিল? কোন কালের ছিল? সেটা কি ছিল যে কারণে তারা মৃত্যু ভয়ে পালাচ্ছিল? এসব বিষয়ে কুরআন মাজীদে কিছু বলা হয়নি। বলা হয়নি এ কারণে যে, কুরআন মাজীদ তো কোন ইতিহাসগ্রন্থ নয়। এতে যে-সব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য কেবল কোনও বিষয়ে সবক দেওয়া। তাই আকছার ঘটনার সেই অংশই বর্ণিত হয়, যার দ্বারা সেই সবক লাভ হয়। এ ঘটনার যতটুকু বর্ণিত হয়েছে তা দ্বারা উপরে বর্ণিত সবক লাভ হয়ে যায়। অবশ্য কুরআন মাজীদ যে ভঙ্গিতে ঘটনার প্রতি ইশারা করেছে তা দ্বারা অনুমান করা যায়, সে কালে এ ঘটনা মানুষের মধ্যে বিখ্যাত ও সুবিদিত ছিল। আয়াতের শুরুতে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে– 'তুমি কি তাদের অবস্থা জান না?' এটা নির্দেশ করে ঘটনাটি তখন প্রসিদ্ধ ছিল। সুতরাং হাফেজ ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) এস্থলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) ও কয়েক তাবিঈ থেকে কয়েকটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন, যা দ্বারা জানা যায় এটা বনী ইসরাঈলের ঘটনা। তারা সংখ্যায় হাজার-হাজার হওয়া সত্ত্বেও শত্রুর মুকাবিলা করতে সাহস পায়নি। উল্টো তারা প্রাণ ভয়ে ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল। অথবা তারা প্লেগে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে এলাকা ছেড়েছিল। তারা যে স্থানকে নিরাপদ ভূমি মনে করেছিল সেখানে পৌঁছামাত্র আল্লাহ তাআলার হুকুমে তাদের মৃত্যু এসে যায়। অনেক পরে যখন তাদের অস্থিরাজি জরাজীর্ণ হয়ে যায় তখন হযরত হিযকীল আলাইহিস সালাম সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আদেশ করলেন তিনি যেন সে অস্থিরাজিকে লক্ষ্য করে ডাক দেন। তিনি ডাক দেওয়া মাত্র অস্থিসমূহে প্রাণ সঞ্চার হয় এবং পূর্ণ মানব আকৃতিতে তারা জীবিত হয়ে ওঠে। হযরত হিযকীল আলাইহিস সালামের এ ঘটনা বর্তমান বাইবেলেও বর্ণিত রয়েছে (দেখুন হিযকীল ৩৭ : ১–১৫)। কাজেই অসম্ভব নয় যে, মদীনায় এ ঘটনা ইয়াহুদীদের মাধ্যমে প্রচার লাভ করেছিল।

ঘটনার উপরিউক্ত বিবরণ নির্ভরযোগ্য হোক বা না হোক, এতটুকু কথা তো কুরআন মাজীদের আয়াত দ্বারা সরাসরি ও সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, তাদেরকে সত্যিকারের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা হয়েছিল। আমাদের এ যুগের কোনও কোনও গ্রন্থকার মৃত লোকের জীবিত হওয়াকে অযৌক্তিক মনে করত এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন যে, আয়াতে মৃত্যু দ্বারা রাজনৈতিক ও চারিত্রিক মৃত্যু বোঝানো হয়েছে আর দ্বিতীয়বার জীবিত করার অর্থ হচ্ছে রাজনৈতিক বিজয়। কিন্তু এ জাতীয় ব্যাখ্যা এক তো কুরআন মাজীদের সুস্পষ্ট শব্দাবলীর সাথে খাপ খায় না, দ্বিতীয়ত এটা আরবী ভাষাশৈলী ও কুরআনী বর্ণনাভঙ্গির সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সোজা-সাপ্টা কথা এই যে, আল্লাহ তাআলার অপার শক্তির উপর ঈমান থাকলে এ জাতীয় ঘটনায় বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। সুতরাং এ রকম দূর-দূরান্তের ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন কি? বিশেষত এখান থেকে ২৬০ নং আয়াত পর্যন্ত যে আলোচনা পরম্পরা চলছে, যার সারমর্ম পূর্বে বলা হয়েছে, সে আলোকে এস্থলে মৃত্যু ও জীবনের প্রকৃত অর্থই উদ্দিষ্ট হওয়া বেশি যুক্তিযুক্ত।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ ۘ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌۢ بِالظَّٰلِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

২৪৬. তুমি কি মূসা পরবর্তী বনী ইসরাঈলের সেই ঘটনা জান না, যখন তারা তাদের এক নবীকে বলেছিল, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ ঠিক করে দিন, যাতে (তার পতাকা তলে) আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি।[১৬৫] নবী বললেন, তোমাদের দ্বারা এমন কিছু ঘটা অসম্ভব কি যে, যখন তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হবে, তখন আর তোমরা যুদ্ধ করবে না? তারা বলল, আমাদের এমন কি কারণ থাকতে পারে যে, আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না, অথচ আমাদেরকে আমাদের ঘর-বাড়ি ও আমাদের সন্তান-সন্ততিদের থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে? অত:পর (এটাই ঘটল যে,) যখন তাদের প্রতি যুদ্ধ ফরয করা হল তাদের মধ্যকার অল্প কিছু লোক ছাড়া বাকি সকলে পেছনে ফিরে গেল। আল্লাহ জালিমদেরকে ভালো করেই জানেন।

---

১৬৪. আল্লাহ তাআলাকে ঋণ দেওয়ার অর্থ তাঁর পথে খরচ করা। গরীবদেরকে সাহায্য করা যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি জিহাদের ক্ষেত্রসমূহে ব্যয় করাও। একে ঋণ বলা হয়েছে রূপকার্থে। কেননা এর বিনিময় দেওয়া হবে সওয়াবরূপে। 'উত্তম পন্থা'-এর অর্থ ইখলাসের সাথে আল্লাহ তাআলাকে খুশী করার মানসে দান করা। মানুষকে দেখানো কিংবা পার্থিব প্রতিদান লাভ উদ্দেশ্য হবে না। যদি জিহাদের জন্য বা গরীবদের সাহায্য করার জন্য ঋণও দেওয়া হয়, তবে তাতে কোনরূপ সুদের দাবী না থাকা। কাফিরগণ তাদের সামরিক প্রয়োজনে সুদে ঋণ নিত। মুসলিমদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, প্রথমত তারা যেন ঋণ না দিয়ে বরং চাঁদা দেয়। অগত্যা যদি ঋণ দেয়, তবে মূল অর্থের বেশি দাবী না করে। কেননা যদিও দুনিয়ায় তারা সুদ পাবে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আখিরাতে তার যে সওয়াব দেবেন তা আসলের চেয়ে বহুগুণ বেশি হবে। এরূপ ব্যয় করলে অর্থ-সম্পদ কমে যাওয়ার যে খতরা থাকে সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, সংকট ও সচ্ছলতা আল্লাহরই হাতে। আল্লাহর দ্বীনের জন্য যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ ব্যয় করবে আল্লাহ তাআলা তাকে সংকটের সম্মুখীন করবেন না– যদি সে তা আল্লাহর হুকুম মোতাবেক ব্যয় করে থাকে।

১৬৫. এস্থলে নবী বলে হযরত সামুয়েল আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে। তাকে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের আনুমানিক সাড়ে তিনশ বছর পর নবী করে পাঠানো হয়েছিল।

وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْۤا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ

২৪৭. তাদের নবী তাদেরকে বলল, আল্লাহ তোমাদের জন্য তালূতকে বাদশাহ করে পাঠিয়েছেন। তারা বলতে লাগল, সে কি করে বাদশাহীর অধিকার লাভ করতে পারে, যখন তার বিপরীতে আমরাই বাদশাহীর বেশি হকদার? তাছাড়া তার তো আর্থিক সচ্ছলতাও লাভ হয়নি। নবী বলল, আল্লাহ তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে তোমাদের উপর মনোনীত করেছেন

সূরা মায়েদায় আছে (৫ : ২৪) ফিরাউনের কবল থেকে মুক্তি লাভের পর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলকে আমালিকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ডাক দিয়েছিলেন। কেননা আমালিকা সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের দেশ ফিলিস্তিনকে দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু বনী ইসরাঈল যুদ্ধ করতে সাফ অস্বীকার করল। তার শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে সিনাই মরুভূমিতে আটকে দেওয়া হয়। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম সে মরুভূমিতেই ইন্তিকাল করেন। পরবর্তীকালে হযরত ইউশা আলাইহিস সালামের নেতৃত্বে ফিলিস্তীনের একটি বড় এলাকায় তাদের বিজয় অর্জিত হয়। হযরত ইউশা আলাইহিস সালাম জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাদের তত্ত্বাবধান করতে থাকেন। তিনি তাদের বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসার জন্য বিচারক নিযুক্ত করে দিতেন, কিন্তু তাদের কোন বাদশাহ বা শাসনকর্তা ছিল না এবং এ অবস্থায়ই প্রায় তিনশ' বছর তাদের অতিবাহিত হয়ে যায়। এ সময় গোত্রপতি এবং হযরত ইউশা আলাইহিস সালামের দেওয়া ব্যবস্থা অনুযায়ী কাযী বা বিচারকই তাদের নিয়ন্ত্রণ করত। তাই এ কালকে 'কাযীদের যুগ' বলা হত। বাইবেলের 'বিচারকবর্গ' অধ্যায়ে এ কালেরই ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। গোটা জাতির একক কোন শাসক না থাকার কারণে আশপাশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তরফ থেকে তাদের উপর একের পর এক হামলা চলতে থাকত। সবশেষে ফিলিস্তিনের পৌত্তলিক সম্প্রদায় আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে ফেলে এবং তাদের বরকতপূর্ণ সিন্দুকও লুট করে নিয়ে যায়। এ সিন্দুকে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও হযরত হারুন আলাইহিস সালামের বিভিন্ন স্মৃতি সংরক্ষিত ছিল। আরও ছিল তাওরাতের কপি ও আসমানী খাদ্য 'মান্ন'-এর নমুনা। যুদ্ধকালে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে বনী ইসরাঈল এ সিন্দুকটি তাদের সম্মুখভাগে রাখত। এ পরিস্থিতিতে সামুয়েল নামক তাদের এক বিচারপতিকে নবুওয়াত দান করা হয়। তার কালেও ফিলিস্তিনীদের উপর যথারীতি জুলুম-নিপীড়ন চলতে থাকে। শেষে বনী ইসরাঈল তাঁর কাছে আবেদন রাখল, তিনি যেন তাদের জন্য কাউকে বাদশাহ মনোনীত করেন। সেমতে তালূতকে তাদের বাদশাহ বানিয়ে দেওয়া হয়, যার ঘটনা এস্থলে বর্ণিত হচ্ছে। বাইবেলের দু'টি অধ্যায় হযরত সামুয়েল আলাইহিস সালামের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। তার প্রথম অধ্যায়ে বনী ইসরাঈলের পক্ষ হতে বাদশাহ নিযুক্তি সম্পর্কিত আবেদনের কথাও উল্লেখ আছে। কিন্তু তাতে বাদশাহের নাম তালূতের স্থলে সাউল বলা হয়েছে। তাছাড়া আরও কিছু খুঁটিনাটি পার্থক্য আছে।

وَزَادَهٗ بَسۡطَةً فِی الۡعِلۡمِ وَالۡجِسۡمِ ؕ وَاللّٰهُ یُؤۡتِیۡ مُلۡکَهٗ مَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیۡمٌ ﴿۲۴۷﴾

এবং জ্ঞান ও শরীরের দিক থেকে তাকে (তোমাদের অপেক্ষা) সমৃদ্ধি দান করেছেন। আল্লাহ তাঁর রাজত্ব যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।

وَقَالَ لَهُمۡ نَبِیُّهُمۡ اِنَّ اٰیَةَ مُلۡکِهٖۤ اَنۡ یَّاۡتِیَکُمُ التَّابُوۡتُ فِیۡهِ سَکِیۡنَةٌ مِّنۡ رَّبِّکُمۡ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَکَ اٰلُ مُوۡسٰی وَاٰلُ هٰرُوۡنَ تَحۡمِلُهُ الۡمَلٰٓئِکَةُ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیَةً لَّکُمۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ ﴿۲۴۸﴾

২৪৮. তাদেরকে তাদের নবী আরও বলল, তালূতের বাদশাহীর আলামত এই যে, তোমাদের কাছে সেই সিন্দুক (ফিরে) আসবে, যার ভেতর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রশান্তির উপকরণ এবং মূসা ও হারুন যা-কিছু রেখে গেছে তার কিছু অবশেষ রয়েছে। ফিরিশতাগণ সেটি বয়ে আনবে।[১৬৬] তোমরা মুমিন হয়ে থাকলে তার মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক বড় নিদর্শন রয়েছে।

---

১৬৬. বনী ইসরাঈল যখন তালূতকে বাদশাহ মানতে অস্বীকার করল এবং তার বাদশাহীর সপক্ষে কোন নিদর্শন দাবী করল, তখন আল্লাহ তাআলা হযরত সামুয়েল আলাইহিস সালামকে দিয়ে বলালেন, তালূত যে আল্লাহর পক্ষ থেকেই মনোনীত তার একটি নিদর্শন হল- আশদূদী সম্প্রদায়ের লোকেরা যে বরকতপূর্ণ সিন্দুকটি লুট করে নিয়ে গিয়েছিল, তালূতের আমলে ফিরিশতাগণ সেটি তোমাদের কাছে বয়ে আনবে। ইসরাঈলী রিওয়ায়াত মোতাবেক আল্লাহ তাআলা এক্ষেত্রে যা করেছিলেন তা এই যে, আশদূদীগণ সিন্দুকটি তাদের এক মন্দিরে নিয়ে রেখেছিল, কিন্তু এর পর থেকে তারা নানা রকম বিপদ-আপদে আক্রান্ত হতে থাকে। কখনও দেখত তাদের প্রতিমা উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। কখনও মহামারি দেখা দিত। কখনও ইঁদুরের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ত। পরিশেষে তাদের জ্যোতিষীগণ তাদেরকে পরামর্শ দিল যে, এসব বিপদের মূল কারণ ওই সিন্দুক। শীঘ্র ওটি সরিয়ে ফেল। সুতরাং তারা সিন্দুকটি একটি গরুর গাড়িতে তুলে দিয়ে গরুদেরকে শহরের বাইরের দিকে হাঁকিয়ে দিল। বাইবেলে এ কথার উল্লেখ নেই যে, ফিরিশতারা সিন্দুকটি নিয়ে এসেছিল। কিন্তু কুরআন মাজীদে একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। বাইবেলের এ বর্ণনাকে যদি সঠিক বলে ধরা হয় যে, তারা নিজেরাই সিন্দুকটি বের করে দিয়েছিল, তবে বলা যেতে পারে গরুর গাড়ি সেটি শহরের বাইরে নিয়ে ফেলেছিল আর ফিরিশতাগণ সেটি সেখান থেকে তুলে নিয়ে বনী ইসরাঈলের কাছে পৌছে দিয়েছিল। এমনও হতে পারে যে, গরুর গাড়িতে তোলার ঘটনাটাই সঠিক নয়; বরং ফিরিশতাগণ সেটি সরাসরিই তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

[৩৩]

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً ۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً ۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۲۴۹﴾

২৪৯. অত:পর তালূত যখন সৈন্যদের সাথে রওয়ানা হল, তখন সে (সৈন্যদেরকে) বলল, আল্লাহ একটি নদীর দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি সে নদীর পানি পান করবে, সে আমার লোক নয়। আর যে তা আস্বাদন করবে না, সে আমার লোক। অবশ্য কেউ নিজ হাত দ্বারা এক আঁজলা ভরে নিলে কোন দোষ নেই।[১৬৭] তারপর (এই ঘটল যে,) অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া বাকি সকলে নদী থেকে (প্রচুর) পানি পান করল। সুতরাং যখন সে (তালূত) এবং তার সঙ্গের মুমিনগণ নদীর ওপারে পৌঁছল তখন তারা (যারা তালূতের আদেশ মানেনি) বলতে লাগল, আজ জালূত ও তার সৈন্যদের সাথে লড়াই করার কোন শক্তি আমাদের নেই। (কিন্তু) যাদের বিশ্বাস ছিল যে, তারা অবশ্যই আল্লাহর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে, তারা বলল, এমন কত ছোট দলই না রয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুমে বড় দলের উপর জয়যুক্ত হয়েছে! আর আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন, যারা সবরের পরিচয় দেয়।

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۵۰﴾

২৫০. তারা যখন জালূত ও তার সৈন্যদের মুখোমুখি হল, তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর সবরের গুণ ঢেলে দাও এবং আমাদেরকে অবিচল-পদ রাখ আর কাফির সম্প্রদায়ের উপর আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান কর।

---

১৬৭. এটা ছিল জর্ডান নদী। সৈন্যদের মধ্যে কতজন এমন আছে, যারা অধিনায়কের আনুগত্যের খাতিরে এমনকি নিজেদের স্বভাবগত চাহিদাকেও বিসর্জন দিতে পারে সম্ভবত সেটা দেখার জন্য এভাবে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। কেননা এ জাতীয় যুদ্ধে এরূপ পরিপক্ক ও নিঃশর্ত আনুগত্যই দরকার। তা না হলে জয়লাভ করা সম্ভব হয় না।

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ۫ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۵۱﴾

২৫১. সুতরাং আল্লাহর হুকুমে তারা (জালূতের বাহিনীকে) পরাভূত করল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল।[১৬৮] এবং আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দান করলেন এবং যে জ্ঞান চাইলেন তাকে দান করলেন। আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের কতকের মাধ্যমে কতককে প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু আল্লাহ জগতসমূহের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল।

---

১৬৮. জালূত ছিল শত্রু সৈন্যের মধ্যে এক বিশালাকায় পালোয়ান। বাইবেলে সামুয়েল (আলাইহিস সালাম)-এর নামে যে প্রথম অধ্যায় আছে, তাতে বর্ণিত হয়েছে যে, সে কয়েক দিন পর্যন্ত বনী ইসরাঈলকে লক্ষ্য করে চ্যালেঞ্জ দিতে থাকে 'কে আছে তার সাথে লড়াই করতে পারে?' কিন্তু কারওই তার সাথে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হওয়ার হিম্মত হল না। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম তখন ছিলেন উঠতি নওজোয়ান। যুদ্ধে তার তিন ভাই শরীক ছিল। তিনি সবার ছোট হওয়ায় বৃদ্ধ পিতার সেবায় থেকে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ শুরুর পর যখন কয়েক দিন গত হয়ে গেল, তখন পিতা তাকে তার ভাইদের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য রণক্ষেত্রে পাঠাল। তিনি ময়দানে গিয়ে দেখেন জালূত অবিরাম চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে যাচ্ছে এবং কেউ তার সাথে লড়বার জন্য ময়দানে নামছে না। এ অবস্থা দেখে তার আত্মাভিমান জেগে উঠল। তিনি তালূতের কাছে অনুমতি চাইলেন যে, জালূতের সাথে লড়বার জন্য তিনি ময়দানে যেতে চান। তাঁর বয়সের স্বল্পতা দেখে প্রথম দিকে তালূত ও অন্যান্যদের মনে দ্বিধা লাগছিল। শেষ পর্যন্ত তার পীড়াপীড়ির কারণে অনুমতি লাভ হল। তিনি জালূতের সামনে গিয়ে আল্লাহর নাম নিলেন এবং একটা পাথর তুলে তার কপাল বরাবর নিক্ষেপ করলেন। পাথরটি তার মাথার ভেতর ঢুকে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তারপর দাউদ আলাইহিস সালাম তার কাছে গিয়ে তার তরবারি দ্বারাই তার শিরোশ্ছেদ করলেন (১- সামুয়েল, পরিচ্ছেদ ১৭)। এ পর্যন্ত বাইবেল ও কুরআন মাজীদের বর্ণনায় কোন দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু এরপর বাইবেলে বলা হয়েছে, তালূত (বা মাউল) হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের জনপ্রিয়তার কারণে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে বাইবেলে তার সম্পর্কে নানা রকম অবিশ্বাস্য কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। খুব সম্ভব এসব বনী ইসরাঈলের যে অংশ শুরু থেকেই তালূতের বিরোধী ছিল, তাদের অপপ্রচার। কুরআন মাজীদ যে ভাষায় তালূতের প্রশংসা করেছে, তাতে হিংসা-বিদ্বেষের মত ব্যাধি তার মধ্যে থাকার কথা নয়। যা হোক জালূত নিধনের কৃতিত্ব প্রদর্শন করার কারণে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এমন জনপ্রিয়তা লাভ করলেন যে, পরবর্তীতে তিনি বনী ইসরাঈলের বাদশাহীও লাভ করেন। তদুপরি আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবুওয়াতের মর্যাদায়ও ভূষিত করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যার সত্তায় একই সঙ্গে নবুওয়াত ও বাদশাহী উভয়ের সম্মিলন ঘটে।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۲۵۲﴾

২৫২. এগুলো আল্লাহর আয়াত, যা আমি আপনার সামনে যথাযথভাবে পড়ে শোনাচ্ছি এবং নিশ্চয়ই আপনি সেই সকল নবীর অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে রাসূল করে পাঠানো হয়েছে।[১৬৯]

[তৃতীয় পারা]

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۟ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿۲۵۳﴾

২৫৩. এই যে, রাসূলগণ, যাদেরকে আমি (মানুষের ইসলাহের জন্য) পাঠিয়েছি, তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ এমন আছে, যার সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে তিনি বহু উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।[১৭০] আর আমি মারয়ামের পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দিয়েছি ও রূহুল-কুদসের মাধ্যমে তার সাহায্য করেছি।[১৭১] আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে তাদের পরবর্তীকালের মানুষ তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী এসে যাওয়ার পর আত্মকলহে লিপ্ত হত না। কিন্তু তারা নিজেরাই বিরোধ সৃষ্টি করল। তাদের মধ্যে কিছু তো এমন, যারা ঈমান

---

১৬৯. এ ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা এটাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের একটি নিদর্শন সাব্যস্ত করেন। অর্থাৎ তার মুবারক মুখে এসব আয়াতের উচ্চারণ তার রাসূল হওয়ারই প্রমাণ বহন করে। কেননা এসব ঘটনা জানার জন্য ওহী ছাড়া তাঁর অন্য কোন মাধ্যম ছিল না। 'যথাযথভাবে' শব্দটি ব্যবহার করে সম্ভবত ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, কিতাবীগণ এসব ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে যে বাড়াবাড়ি করেছে ও মনগড়া কাহিনী প্রচার করে দিয়েছে, কুরআন মাজীদ তা হতে মুক্ত থেকে কেবল সঠিক বিষয়ই বর্ণনা করে থাকে।

১৭০. অর্থাৎ অল্প-বিস্তর ফযীলত তো বহু নবীরই একের উপর অন্যের অর্জিত রয়েছে, কিন্তু অন্যান্য নবীর উপর কোনও কোনও নবীর অনেক বেশি ফযীলত রয়েছে। এর দ্বারা সূক্ষ্মভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৭১. পূর্বে ৮৭ নং আয়াতেও একথা আছে। এর ব্যাখ্যার জন্য সেই আয়াতের টীকা দেখুন।

এনেছে এবং কিছু এমন, যারা কুফর অবলম্বন করেছে। আল্লাহ চাইলে তারা আত্মকলহে লিপ্ত হত না। কিন্তু আল্লাহ সেটাই করেন যা তিনি চান।[১৭২]

[৩৪]

২৫৪. হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে সেই দিন আসার আগেই (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর, যে দিন কোন বেচাকেনা থাকবে না, কোন বন্ধুত্ব (কাজে আসবে) না এবং কোনও সুপারিশও না।[১৭৩] আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারাই জালিম।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

২৫৫. আল্লাহ তিনি, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, যিনি চিরঞ্জীব, সমগ্র সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক, যাঁর কখনও তন্দ্রা পায় না এবং নিদ্রাও নয়, আকাশমণ্ডলে যা-কিছু আছে (তাও) এবং পৃথিবীতে যা-কিছু আছে (তাও) সব তারই। কে আছে যে তাঁর সমীপে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করবে? তিনি সকল বান্দার পূর্ব-পশ্চাৎ সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত।

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ

১৭২. কুরআন মাজীদের বহু আয়াতে একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমস্ত মানুষকে জবরদস্তিমূলকভাবে ঈমান আনতে বাধ্য করার মত শক্তি আল্লাহর রয়েছে। আর তা করলে সকলের দ্বীন একই হয়ে যেত এবং তখন কোন মতভেদ থাকত না, কিন্তু তাতে এ দুনিয়া যে ব্যবস্থার অধীনে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যে উদ্দেশ্যে মানুষকে এখানে পাঠানো হয়েছে তা সবই পণ্ড ও বিপর্যস্ত হয়ে যেত। এখানে মানুষকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে তার পরীক্ষা নেওয়া যে, আল্লাহর প্রেরিত নবীদের থেকে হিদায়াতের পথ জানার পর কে স্বেচ্ছায় সেই হিদায়াতের উপর চলে এবং কে তা উপেক্ষা করে নিজের মনগড়া ধ্যান-ধারণাকে নিজের পথ প্রদর্শক বানায়। তাই আল্লাহ জবরদস্তিমূলকভাবে মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করেননি। সুতরাং সামনে ২৫৬ নং আয়াতে স্পষ্টভাবেই একথা বলে দেওয়া হয়েছে যে, দ্বীনে কোন জবরদস্তি নেই। সত্যের প্রমাণসমূহ স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অত:পর যে ব্যক্তি সত্যকে গ্রহণ করবে সে তা নিজ কল্যাণের জন্যই করবে আর যে ব্যক্তি তা উপেক্ষা করে শয়তানের শেখানো পথে চলবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে।

১৭৩. এর দ্বারা কিয়ামতের দিনকে বোঝানো হয়েছে।

وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

তারা তাঁর জ্ঞানের কোন বিষয় নিজ আয়ত্তে নিতে পারে না- কেবল সেই বিষয় ছাড়া যা তিনি নিজে ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসী আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আর এ দু'টোর তত্ত্বাবধানে তাঁর বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না এবং তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও মহিমময়।

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

২৫৬. দ্বীনের বিষয়ে কোন জবরদস্তি নেই। হিদায়াতের পথ গোমরাহী থেকে পৃথকরূপে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এর পর যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে সে এক মজবুত হাতল আকড়ে ধরল, যা ভেঙ্গে যাওয়ার কোন আশঙ্কা নেই। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

২৫৭. আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের অভিভাবক শয়তান, যে তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা সকলে অগ্নিবাসী। তারা সর্বদা তাতেই থাকবে।

[৩৫]

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ

২৫৮. তোমরা কি সেই ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করেছ, যাকে আল্লাহ রাজত্ব দান করার কারণে সে নিজ প্রতিপালকের (অস্তিত্ব) সম্পর্কে ইবরাহীমের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়? যখন ইবরাহীম বলল, আমার প্রতিপালক তিনিই যিনি জীবনও দান করেন এবং মৃত্যুও! তখন সে বলতে লাগল, আমিও জীবনও দেই

بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

এবং মৃত্যু[১৭৪] ঘটাই! ইবরাহীম বলল, আচ্ছা! তা আল্লাহ তো সূর্যকে পূর্ব থেকে উদিত করেন, তুমি একটু পশ্চিম থেকে উদিত কর তো! এ কথায় সে কাফির নিরুত্তর হয়ে গেল। আর আল্লাহ এরূপ জালিমদেরকে হিদায়াত করেন না।

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ۚ قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ

২৫৯. অথবা (তুমি) সেই রকম ব্যক্তি (-এর ঘটনা) সম্পর্কে (চিন্তা করেছ), যে একটি বসতির উপর দিয়ে এমন এক সময় গমন করছিল, যখন তা ছাদ উল্টে (থুবড়ে) পড়ে রয়েছিল।[১৭৫] সে বলল, আল্লাহ এ বসতিকে এর মৃত্যুর পর কিভাবে জীবিত করবেন? অনন্তর

---

১৭৪. বাবেলের বাদশাহ নমরূদের কথা বলা হচ্ছে। সে নিজেকে খোদা বলে দাবী করত। তার দাবী 'আমি জীবন ও মৃত্যু দান করি'–এর অর্থ ছিল আমি বাদশাহ হওয়ার কারণে যাকে ইচ্ছা করি তার প্রাণনাশ করতে পারি এবং যাকে ইচ্ছা করি মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করে দেই ও তাকে মুক্তি দান করি। আর এভাবে আমি তার জীবন দান করি। বলাবাহুল্য তার এ জবাব মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। কেননা আলোচনা জীবন ও মৃত্যুর উপকরণ সম্পর্কে নয়, বরং তার সৃষ্টি সম্পর্কে হচ্ছিল। কিন্তু হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দেখলেন সে মৃত্যু ও জীবনের সৃষ্টি কাকে বলে সেটাই বুঝতে পারছে না অথবা সে কূটতর্কে লিপ্ত হয়েছে। অগত্যা তিনি এমন একটা কথা বললেন, যার কোন উত্তর নমরূদের কাছে ছিল না। কিন্তু লা জওয়াব হয়ে যে সত্য কবুল করে নেবে তা নয়; বরং উল্টো সে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে প্রথমে বন্দী করল, তারপর তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিল, যা সূরা আম্বিয়া (২১ : ৬৮–৭১), সূরা আনকাবূত (২৯ : ২৪) ও সূরা সাফফাত (৩৭ : ৯৭)- এ বর্ণিত হয়েছে।

১৭৫. ২৫৯ ও ২৬০ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা এমন দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে তিনি তাঁর দু'জন খাস বান্দাকে দুনিয়াতেই মৃতকে জীবিত করার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। প্রথম ঘটনায় একটি জনবসতির কথা বলা হয়েছে, যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। তার সমস্ত বাসিন্দা মারা গিয়েছিল এবং ঘর-বাড়ি ছাদসহ মাটিতে মিশে গিয়েছিল। সেখান দিয়ে এক ব্যক্তি পথ চলছিল। বসতির বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে সে মনে মনে চিন্তা করল আল্লাহ তাআলা এই গোটা বসতিকে কিভাবে জীবিত করবেন! বস্তুত তার এ চিন্তাটি কোনও রকম সন্দেহপ্রসূত ছিল না, বরং এটা ছিল তার বিস্ময়ের প্রকাশ। আল্লাহ তাআলা তাকে যেভাবে নিজ ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়েছিলেন, তা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে এই ব্যক্তি কে ছিলেন? এই জনবসতিটি কোথায় ছিল? কুরআন মাজীদ এ বিষয়ে কিছু বলেনি এবং এমন কোন নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়াতও নেই, যা দ্বারা নিশ্চিতভাবে এসব বিষয় নিরূপণ করা যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, এ জনপদটি ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস

قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ ۫ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۵۹﴾

আল্লাহ তাকে একশ' বছরের জন্য মৃত্যু দান করলেন এবং তারপর তাকে জীবিত করলেন। (অত:পর) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কত কাল যাবৎ এ অবস্থায় থেকেছ? সে বলল, এক দিন বা এক দিনের কিছু অংশ! আল্লাহ বললেন, না, বরং তুমি এভাবে একশ' বছর থেকেছ। এবার নিজ পানাহার সামগ্রীর প্রতি লক্ষ্য করে দেখ– তা একটুও পচেনি। আবার (অন্যদিকে) নিজ গাধাটিকে দেখ (পচে গলে তার কী অবস্থা হয়েছে)। আমি এটা করেছি এজন্য যে, আমি তোমাকে মানুষের জন্য (নিজ কুদরতের) একটি নিদর্শন বানাতে চাই এবং (এবার নিজ গাধার) অস্থিসমূহ দেখ আমি কিভাবে সেগুলোকে উত্থিত করি এবং তাতে গোশতের পোশাক পরাই। সুতরাং যখন সত্য তার সামনে উন্মোচিত হয়ে গেল, তখন সে বলে উঠল, আমার বিশ্বাস আছে আল্লাহ সব বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ؕ

২৬০. এবং (সেই সময়ের বিবরণ শোন) যখন ইবরাহীম বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি মৃতকে কিভাবে জীবিত করবেন আমাকে তা দেখান। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করছ

এবং এটা সেই সময়ের ঘটনা যখন বুখত নাস্‌সার হামলা চালিয়ে গোটা জনপদটিকে ধ্বংস করে ফেলেছিল। আর এই ব্যক্তি ছিলেন হযরত উযায়র আলাইহিস সালাম কিংবা হযরত আরমিয়া আলাইহিস সালাম। কিন্তু এটাই যে সঠিক তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অবশ্য এটা অনুসন্ধান করারও কোন প্রয়োজন নেই। এর অনুসন্ধানে পড়া ছাড়াও কুরআন মাজীদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়। তবে এই ব্যক্তি যে একজন নবী ছিলেন তা প্রায় নিশ্চিতভাবেই জানা যায়। কেননা প্রথমত এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তার সাথে কথোপকথন করেছেন। তাছাড়া এ জাতীয় ঘটনা নবীদের সাথেই ঘটে থাকে। সামনের ১৭৭ নং টীকা দেখুন।

قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ؕ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

না? বললেন, বিশ্বাস কেন হবে না? কিন্তু (এ আগ্রহ প্রকাশ করেছি এজন্য যে,) যাতে আমার অন্তর পরিপূর্ণ প্রশান্তি লাভ করে।[১৭৬] আল্লাহ বললেন, আচ্ছা, চারটি পাখি ধর এবং সেগুলোকে তোমার পোষ মানিয়ে নাও। তারপর (সেগুলোকে যবাহ্ করে) তার একেক অংশ একেক পাহাড়ে রেখে দাও। তারপর তাদেরকে ডাক দাও। সবগুলো তোমার কাছে ছুটে চলে আসবে।[১৭৭]

---

১৭৬. এই প্রশ্নোত্তরের দ্বারা আল্লাহ তাআলা একথা পরিষ্কার করে দিলেন যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এ ফরমায়েশ কোন সন্দেহের কারণে ছিল না। আল্লাহ তাআলার অসীম শক্তির উপর তার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু চোখে দেখার বিষয়টিই অন্য কিছু হয়ে থাকে। তাতে যে কেবল অধিকতর প্রশান্তি লাভ হয় তাই নয়; তারপর মানুষ অন্যদেরকে বলতে পারে, আমি যা বলছি দলীল-প্রমাণ দ্বারা সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল হওয়া ছাড়াও তা নিজ চোখে দেখে বলছি।

১৭৭. অর্থাৎ মৃতকে জীবিত করার বিষয়কে সর্বদাই মানুষকে প্রত্যক্ষ করানোর মত ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার আছে, কিন্তু তাঁর হিকমতের দাবী হল সর্বদা তা প্রত্যক্ষ না করানো। আসল কথা হচ্ছে এ দুনিয়া যেহেতু পরীক্ষাক্ষেত্র, তাই এখানে ঈমান বিল-গায়ব (না দেখে বিশ্বাস)-এরই মূল্য আছে। মানুষ চোখে না দেখে কেবল দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে এসব বিষয়কে বিশ্বাস করবে এটাই তার কাছে আল্লাহর কাম্য। তবে নবীগণের ব্যাপার সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন। তাঁরা যেহেতু গায়বী বিষয়াবলীতে অটুট ও অনড় বিশ্বাস এনে এ কথার প্রমাণ দিয়ে থাকেন যে, তাদের ঈমান কোনও রকম সন্দেহের অবকাশ রাখে না এবং তা চাক্ষুষ দেখার উপর কিছুমাত্র নির্ভরশীল নয়, তাই ঈমান বিল-গায়বের ব্যাপারে তাদের পরীক্ষা এ দুনিয়াতেই পূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ তাআলার অপার হিকমতের অধীনে কখনও কখনও বিভিন্ন গায়বী রহস্য তাঁদেরকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দেওয়া হয়, যাতে তাঁদের জ্ঞান ও প্রশান্তির মান সাধারণ লোকদের অপেক্ষা উপরে থাকে এবং তাঁরা দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারেন, আমি যে বিষয়ের প্রতি ডাকছি তার সত্যতা নিজ চোখেও দেখে নিয়েছি।

অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ঘটনাবলীকে স্বীকার করতে যারা দ্বিধাবোধ করে, সেই শ্রেণীর কিছু লোক এ আয়াতেরও টেনে-কষে এমন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছে যাতে পাখীদের বাস্তবিকই মরে জীবিত হওয়ার বিষয়টাকে স্বীকার করতে না হয়। কিন্তু কুরআন মাজীদের বর্ণনা-পরম্পরা, ব্যবহৃত শব্দাবলী ও বর্ণনা-ভঙ্গী তাদের সে সব ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে। যে ব্যক্তি আরবী ভাষার ব্যবহার শৈলী ও বাক-ভঙ্গী সম্পর্কে অবগত, তারা এসব আয়াতের যে মর্ম তরজমায় ব্যক্ত করা হয়েছে তাছাড়া অন্য কোন মর্ম বের করার চেষ্টা করবে না।

আর জেনে রেখ আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ ক্ষমতাবানও, সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রজ্ঞাবানও।

[৩৬]

২৬১. যারা আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত এ রকম- যেমন একটি শস্য দানা সাতটি শীষ উদ্গত করে (এবং) প্রতিটি শীষে একশ' দানা জন্মায়।[১৭৮] আর আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন (সওয়াবে) কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ অতি প্রাচুর্যময় (এবং) সর্বজ্ঞ।

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۶۱﴾

২৬২. যারা নিজ সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, আর ব্যয় করার পর খোঁটা দেয় না এবং কোনরূপ কষ্টও দেয় না তারা নিজ প্রতিপালকের কাছে তাদের সওয়াব পাবে। তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা কোন দুঃখও পাবে না।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَاۤ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَاۤ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۶۲﴾

২৬৩. উত্তম কথা বলে দেওয়া ও ক্ষমা করা সেই সদাকা অপেক্ষা শ্রেয়, যার পর কোন কষ্ট দেওয়া হয়।[১৭৯] আল্লাহ অতি বেনিয়ায, অতি সহনশীল।

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَاۤ اَذًى ؕ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿۲۶۳﴾

২৬৪. হে মুমিনগণ! খোটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের সদাকাকে সেই ব্যক্তির মত নষ্ট করো না, যে নিজের সম্পদ ব্যয়

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ

---

১৭৮. অর্থাৎ আল্লাহর পথে খরচ করলে সাতশ' গুণ সওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে আরও অনেক বেশি দেন। প্রকাশ থাকে যে, কুরআন মাজীদে আল্লাহর পথে ব্যয় করার কথা বারবার বলা হয়েছে। এর দ্বারা এমন যে-কোন অর্থব্যয়কে বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য ব্যয় করা হয়। যাকাত, সাদাকা ও দান-খয়রাত সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

১৭৯. অর্থাৎ কোন সওয়ালকারী যদি কারও কাছে চায় এবং সে কোনও কারণে দিতে না পারে, তবে তার উচিত নম্র ভাষায় তার কাছে ক্ষমা চাওয়া আর সে যদি অনুচিত পীড়াপীড়ি করে, সেজন্য তাকে ক্ষমা করা। আর এই কর্মপন্থা সেই দান অপেক্ষা বহু শ্রেয়, যে দানের পর খোটা দেওয়া হয় কিংবা অপমান করে কষ্ট দেওয়া হয়।

وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦٤﴾

করে মানুষকে দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে না। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত এই রকম- যেমন এক মসৃণ পাথরের উপর মাটি জমে আছে, অত:পর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ে এবং (সেই মাটিকে ধুয়ে নিয়ে যায় এবং) সেটিকে (পুনরায়) মসৃণ পাথর বানিয়ে দেয়।[১৮০] এরূপ লোক যা উপার্জন করে, তার কিছুমাত্র তাদের হস্তগত হয় না। আর আল্লাহ (এরূপ) কাফিরদেরকে হিদায়াতে উপনীত করেন না।

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٦٥﴾

২৬৫. আর যারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং নিজেদের মধ্যে পরিপক্কতা আনয়নের জন্য, তাদের দৃষ্টান্ত এ রকম- যেমন কোন টিলার উপর একটি বাগান রয়েছে, তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হল, ফলে তা দ্বিগুণ ফল জন্মাল। যদি তাতে প্রবল বৃষ্টি নাও পড়ে, তবে হালকা বৃষ্টিও তার জন্য যথেষ্ট। আর তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ্ তা অতি উত্তমরূপে দেখেন।

اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۚ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ

২৬৬. তোমাদের মধ্যে কেউ কি এটা পসন্দ করবে যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটা বাগান থাকবে, যার পাদদেশ দিয়ে নদী-নালা প্রবাহিত থাকবে (এবং) তা থেকে আরও বিভিন্ন রকমের ফল তার অর্জিত হবে, অত:পর সে বার্ধক্য-কবলিত হবে আর তখনও তার সন্তান-

---

১৮০. বড় পাথরের উপর মাটি জমলে তার উপর কোন জিনিস বপণ করার আশা করা যেতে পারে, কিন্তু বৃষ্টি যদি মাটিকে ধুয়ে নিয়ে যায়, তবে মসৃণ পাথর কোনও চাষাবাদের উপযুক্ত থাকে না। এভাবে দান-খয়রাত দ্বারা আখিরাতে সওয়াব পাওয়ার আশা থাকে, কিন্তু সে দান-খয়রাত যদি করা হয় মানুষকে দেখানোর ইচ্ছায় এবং তারপর খোঁটাও দেওয়া হয়, তবে তা দান-খয়রাতকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ফলে সওয়াবের কোন আশা থাকে না।

فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۶۶﴾

সন্ততি কমজোর থাকবে, এ অবস্থায় অকস্মাৎ এক অগ্নিক্ষরা ঝড় এসে সে বাগানে আঘাত হানবে, ফলে গোটা বাগান ভস্মিভূত হয়ে যাবে?[১৮১] এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় আয়াতসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

[৩৭]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۠ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿۲۶۷﴾

২৬৭. হে মুমিনগণ! তোমরা যা-কিছু উপার্জন করেছ এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা-কিছু উৎপন্ন করেছি তার উৎকৃষ্ট জিনিসসমূহ থেকে একটি অংশ (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর। আর এরূপ মন্দ জিনিস (আল্লাহর নামে) দেওয়ার নিয়ত করো না যা (অন্য কেউ তোমাদেরকে দিলে ঘৃণার কারণে) তোমরা চক্ষু বন্ধ না করে তা গ্রহণ করবে না। মনে রেখ আল্লাহ বেনিয়ায, সর্বপ্রকার প্রশংসা তাঁরই দিকে ফেরে।

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۚ ﴿۲۶۸﴾

২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং তোমাদেরকে অশ্লীলতার আদেশ করে আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় মাগফিরাত ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ অতি প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۲۶۹﴾

২৬৯. তিনি যাকে চান জ্ঞানবত্তা দান করেন আর যাকে জ্ঞানবত্তা দান করা হল, তার বিপুল পরিমাণে কল্যাণ লাভ হল। উপদেশ তো কেবল তারাই গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধির অধিকারী।

১৮১. দান-খয়রাত নষ্ট করার এটা দ্বিতীয় উদাহরণ। অগ্নিপূর্ণ ঝড় যেভাবে সবুজ-শ্যামল বাগানকে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে ফেলে, তেমনিভাবে মানুষকে দেখানোর জন্য দান করলে বা দান করার পর খোটা দিলে কিংবা অন্য কোনওভাবে গরীব মানুষকে কষ্ট দিলে তাতে দান-খয়রাতের বিশাল সওয়াব বরবাদ হয়ে যায়।

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

২৭০. তোমরা যা-কিছু ব্যয় কর বা যে মানতই মান আল্লাহ্ তা জানেন। আর জালিমগণ কোনও রকমের সাহায্যকারী পাবে না।

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٧١﴾

২৭১. তোমরা দান-সদাকা যদি প্রকাশ্যে দাও, সেও ভালো আর যদি তা গোপনে গরীবদেরকে দান কর তবে তা তোমাদের পক্ষে কতই না শ্রেয়! আল্লাহ তোমাদের মন্দকর্মসমূহের প্রায়শ্চিত্ত করে দেবেন। বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٢﴾

২৭২. (হে নবী!) তাদেরকে (কাফির-দেরকে) সঠিক পথে আনয়ন করা আপনার দায়িত্ব নয়। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান সঠিক পথে আনয়ন করেন।[১৮২] তোমরা যে সম্পদই ব্যয় কর তা তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণার্থে হয়ে থাকে, যেহেতু তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় কর না। আর তোমরা যে সম্পদই ব্যয় করবে তোমাদেরকে তা পরিপূর্ণরূপে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

২৭৩. (আর্থিক সহযোগিতার জন্য বিশেষভাবে) উপযুক্ত সেই সকল গরীব,

১৮২. কোনও কোনও আনসারী সাহাবীর কিছু গরীব আত্মীয়-স্বজন ছিল, কিন্তু তারা কাফির ছিল বলে তারা তাদের সাহায্য করতেন না। তারা অপেক্ষায় ছিলেন কবে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে আর তখন তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করবেন। কোনও কোনও বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই তাদেরকে এরূপ পরামর্শ দিয়েছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় (রূহুল মাআনী)। এভাবে মুসলিমদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের ইসলাম গ্রহণের দায়-দায়িত্ব তোমাদের উপর বর্তায় না। আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যদি ওই সকল গরীব কাফিরের পেছনেও অর্থ ব্যয় কর, তবুও তোমরা তার পুরোপুরি সওয়াব পাবে।

لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ۡ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿۲۷۳﴾

যারা নিজেদেরকে আল্লাহর পথে এভাবে আবদ্ধ করে রেখেছে যে, (অর্থের সন্ধানে) তারা ভূমিতে চলাফেরা করতে পারে না। তারা যেহেতু অতি সংযমী হওয়ার কারণে কারও কাছে সওয়াল করে না তাই অনবগত লোকে তাদেরকে বিত্তবান মনে করে। তোমরা তাদের চেহারার আলামত দ্বারা তাদেরকে (অর্থাৎ তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা) চিনতে পারবে। (কিন্তু) তারা মানুষের কাছে না-ছোড় হয়ে সওয়াল করে না।[১৮৩] তোমরা যে সম্পদই ব্যয় কর আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন।

[৩৮]

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۷۴﴾

২৭৪. যারা নিজেদের সম্পদ দিনে ও রাতে ব্যয় করে প্রকাশ্যেও এবং গোপনেও, তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে নিজেদের সওয়াব পাবে এবং তাদের কোন ভয় থাকবে না আর তারা কোন দুঃখও পাবে না।

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ

২৭৫. যারা সুদ খায় (কিয়ামতের দিন) তারা সেই ব্যক্তির মত উঠবে, শয়তান

---

১৮৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, এ আয়াত 'আসহাবে সুফফা' সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। 'আসহাবে সুফফা' বলা হয় সেই সকল সাহাবীকে, যারা দ্বীনী ইলম শেখার জন্য নিজেদের জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মসজিদে নববী সংলগ্ন চত্বরে পড়ে থাকতেন। দ্বীনী ইলম শেখায় নিয়োজিত থাকার কারণে জীবিকা সংগ্রহের সুযোগ পেতেন না। তাই বলে যে তারা মানুষের কাছে হাত পাততেন তাও নয়। দারিদ্র্যের সকল কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নিতেন। এ আয়াত জানাচ্ছে, অর্থ সাহায্য লাভের বেশি উপযুক্ত তারাই, যারা সমগ্র উম্মতের কল্যাণ সাধনের মহতি উদ্দেশ্যে কোথাও আবদ্ধ হয়ে থাকে এবং নিদারুণ কষ্ট-ক্লেশ সত্ত্বেও কারও সামনে নিজ প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করে না। ২৬১ নং আয়াত থেকে ২৭৪ নং আয়াত পর্যন্ত দান-সদাকার ফযীলত ও তার বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছিল। সামনে এর বিপরীত বিষয় তথা সুদ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। দান-সদকা মানুষের দানশীল চরিত্রের আলামত আর সুদ হচ্ছে কৃপণতা ও বিষয়াসক্তির পরিচায়ক।

الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۭ فَمَنْ جَاۗءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۭ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

যাকে স্পর্শ দ্বারা পাগল বানিয়ে দিয়েছে। এটা এজন্য হবে যে, তারা বলেছিল, 'বিক্রিও তো সুদেরই মত হয়ে থাকে।[১৮৪] অথচ আল্লাহ বিক্রিকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশ বাণী এসে গেছে সে যদি (সুদী কারবার হতে) নিবৃত্ত হয়, তবে অতীতে যা-কিছু হয়েছে তা তারই।[১৮৫] আর তার (অভ্যন্তরীণ অবস্থার) ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যে ব্যক্তি পুনরায় সে কাজই করল,[১৮৬] তো এরূপ লোক জাহান্নামী হবে। তারা তাতেই সর্বদা থাকবে।

---

১৮৪. কোন ঋণের উপর যে অতিরিক্ত অর্থ ধার্য করা হয় তাকে 'রিবা' বা সুদ বলে। মুশরিকরা বলত, আমরা যেমন কোন পণ্য বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করি এবং শরীয়ত তাকে হালাল করেছে, তেমনি ঋণ দিয়ে যদি মুনাফা অর্জন করি তাতে অসুবিধা কী? তাদের সে প্রশ্নের জবাব তো ছিল এই যে, ব্যবসায়-পণ্যের উদ্দেশ্যই হচ্ছে তা বিক্রি করে মুনাফা হাসিল করা। পক্ষান্তরে টাকা-পয়সা এ উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়নি যে, তাকে ব্যবসায়-পণ্য বানিয়ে তা দ্বারা মুনাফা অর্জন করা হবে। টাকা-পয়সা হল বিনিময়ের মাধ্যম। প্রয়োজনীয় সামগ্রী যাতে এর মাধ্যমে বেচাকেনা করা যায় সে লক্ষ্যেই এর সৃষ্টি। মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রার লেনদেন করে তাকে মুনাফা অর্জনের মাধ্যম বানানো হলে তাতে নানা রকম অনিষ্ট ও অনর্থ জন্ম নেয় (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টে 'রিবা' সম্পর্কে আমি যে রায় লিখেছিলাম তা দেখা যেতে পারে 'সুদ পর তারীখী ফয়সালা' নামে তার উর্দূ তরজমাও প্রকাশ করা হয়েছে)। কিন্তু এস্থলে আল্লাহ তাআলা বিক্রি ও সুদের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনার পরিবর্তে এক শাসক সুলভ জবাব দিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা যখন বিক্রিকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন, তখন আল্লাহ তাআলার কাছে এর তাৎপর্য ও দর্শন জানতে চাওয়া এবং তা না জানা পর্যন্ত হুকুম তামিল না করার ভাব দেখানো একজন বান্দার কাজ হতে পারে না। প্রকৃত ব্যাপার হল- আল্লাহ তাআলার প্রতিটি হুকুমের ভেতর নিঃসন্দেহে কোনও না কোনও হিকমত নিহিত থাকে, কিন্তু সে হিকমত যে প্রত্যেকেরই বুঝে আসবে এটা অবধারিত নয়। কাজেই আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান থাকলে প্রথমেই তাঁর হুকুম শিরোধার্য করে নেওয়া উচিত। তারপর কেউ যদি অতিরিক্ত প্রশান্তি লাভের জন্য হিকমত ও রহস্য অনুধাবনের চেষ্টা করে তাতে কোন দোষ নেই। দোষ হচ্ছে সেই হিকমত উপলব্ধি করার উপর হুকুম পালনকে মূলতবী রাখা, যা কোনও মুমিনের কর্মপন্থা হতে পারে না।

يَمۡحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرۡبِي الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيۡمٍ ﴿۲۷۶﴾

২৭৬. আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-সদাকাকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ এমন প্রতিটি লোককে অপসন্দ করেন যে নাশোকর, পাপিষ্ঠ।

اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمۡ اَجۡرُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ۚ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ ﴿۲۷۷﴾

২৭৭. (হাঁ) যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে নিজেদের প্রতিদান লাভের উপযুক্ত হবে। তাদের কোনও ভয় থাকবে না এবং তারা কোনও দুঃখও পাবে না।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوۡا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰۤوا اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ﴿۲۷۸﴾

২৭৮. হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা যদি প্রকৃত মুমিন হয়ে থাক, তবে সুদের যে অংশই (কারও কাছে) অবশিষ্ট রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও।

فَاِنۡ لَّمۡ تَفۡعَلُوۡا فَاۡذَنُوۡا بِحَرۡبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ ۚ وَاِنۡ تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوۡسُ اَمۡوَالِكُمۡ ۚ لَا تَظۡلِمُوۡنَ وَلَا تُظۡلَمُوۡنَ ﴿۲۷۹﴾

২৭৯. তবুও যদি তোমরা এটা না কর তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর তোমরা যদি (সুদ থেকে) তাওবা কর, তবে তোমাদের মূল পুঁজি তোমাদের প্রাপ্য। তোমরাও কারও প্রতি জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না।

---

১৮৫. অর্থাৎ সুদের নিষেধাজ্ঞা নাযিলের আগে যারা মানুষের কাছ থেকে সুদ নিয়েছে, তাদের পক্ষে পেছনের সেই কাজ ক্ষমাযোগ্য, যেহেতু তখনও পর্যন্ত সুদ হারাম হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়নি। কাজেই তখনকার সুদী পন্থায় অর্জিত সম্পদ ফেরত দেওয়ার দরকার নেই। তবে নিষেধাজ্ঞার ঘোষণাকালে যাদের উপর সুদের দায় ছিল, তাদের থেকে তা গ্রহণ করা জায়েয হবে না। বরং তা ছেড়ে দিতে হবে। যেমন সামনে ২৭৮ নং আয়াতে হুকুম দেওয়া হয়েছে।

১৮৬. অর্থাৎ সুদ হারাম হওয়ার বিষয়টিকে যারা মেনে নেয়নি; বরং এই আপত্তি তোলে যে, সুদ ও বেচাকেনার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে নাকি? তারা কাফির। কাজেই তারা অনন্তকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। সুদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) রচিত 'মাআরিফুল কুরআন'-এর সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তাফসীর এবং তার লেখা 'মাসআলায়ে সুদ'। আরও দেখুন আমার উপরে বর্ণিত ("সূদপার তারিখী ফায়সালা" নামক) রায়ের মুদ্রিত কপি।

২৮০. এবং কোন (দেনাদার) ব্যক্তি যদি অসচ্ছল হয়, তবে সচ্ছলতা লাভ পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিতে হবে। আর যদি সদাকাই করে দাও, তবে তোমাদের পক্ষে সেটা অধিকতর শ্রেয়– যদি তোমরা উপলব্ধি কর।

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

২৮১. এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যখন তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। অত:পর পরিপূর্ণরূপে দেওয়া হবে যা সে অর্জন করেছে আর তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

[৩৯]

২৮২. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কোন ঋণের কারবার কর, তখন তা লিখে নাও। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি লিখতে জানে সে যেন ন্যায়নিষ্ঠভাবে তা লেখে। যে ব্যক্তি লিখতে জানে সে যেন লিখতে অস্বীকার না করে। আল্লাহ যখন তাকে এটা শিক্ষা দিয়েছেন, তখন তার লেখা উচিত। হক যার উপর সাব্যস্ত হচ্ছে সে যেন তা লেখায়। আর সে যেন তার প্রতিপালককে ভয় করে এবং তাতে (সেই হকের মধ্যে) কিছু না কমায়।[১৮৭] যার উপর হক সাব্যস্ত হচ্ছে সে যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা (অন্য কোন কারণে) লেখার বিষয় লেখাতে সক্ষম না হয়, তবে তার অভিভাবক যেন ন্যায্যভাবে তা লেখায়। আর নিজেদের

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ
أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ

---

১৮৭. এটা কুরআন মাজীদের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ আয়াত। সুদ নিষিদ্ধ করার পর এ আয়াতে বাকী লেনদেনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সমস্ত কারবার যাতে সুষ্ঠুভাবে ও স্বচ্ছতার সাথে হয় এটাই তার উদ্দেশ্য। কারও কাছে যদি কারও প্রাপ্য বা দেনা সাব্যস্ত হয়, তবে তার এমনভাবে তা লেখা বা লেখানো উচিত, যাতে কারবারের ধরণ পরিষ্কার হয়ে যায়। সমস্ত কথা তাতে স্পষ্ট থাকা চাই এবং অন্যের হক মারার জন্য কোনও রকম কাটছাঁটের আশ্রয় না নেওয়া চাই।

فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ
تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ
وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ
تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ
عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ
اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۪ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ؕ۬ وَاِنْ
تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۸۲﴾

পুরুষদের মধ্য হতে দু'জনকে সাক্ষী বানাবে। যদি দু'জন পুরুষ উপস্থিত না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক– সেই সকল সাক্ষীদের মধ্য হতে, যাদেরকে তোমরা পসন্দ কর, যাতে স্ত্রীলোকদের মধ্য হতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। সাক্ষীদেরকে যখন সাক্ষ্য (দেওয়ার জন্য) ডাকা হবে, তখন তারা যেন অস্বীকার না করে। যে কারবার মেয়াদের সাথে সম্পৃক্ত তা ছোট হোক বা বড়, লিখতে বিরক্ত হয়ো না। এ বিষয়টি আল্লাহর নিকট অধিকতর ইনসাফসম্মত এবং সাক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখার পক্ষে বেশি সহায়ক এবং তোমাদের মধ্যে যাতে ভবিষ্যতে সন্দেহ দেখা না দেয় তার নিশ্চয়তা বিধানের নিকটতর। হাঁ, তোমাদের মধ্যে যদি কোন নগদ লেনদেনের কারবার হয়, তবে তা না লেখার ভেতর তোমাদের জন্য অসুবিধা নেই। যখন বেচাকেনা করবে তখন সাক্ষী রাখবে। যে লেখবে তাকে কোন কষ্ট দেওয়া যাবে না এবং সাক্ষীকেও নয়। তোমরা যদি তা কর তবে তোমাদের পক্ষ হতে তা অবাধ্যতা হবে। তোমরা অন্তরে আল্লাহর ভয় রেখ। আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দান করেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞান রাখেন।

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ
مَّقْبُوْضَةٌ ؕ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ؕ

২৮৩. তোমরা যদি সফরে থাক এবং তখন কোন লেখক না পাও, তবে (আদায়ের নিশ্চয়তা স্বরূপ) বন্ধক রাখা যেতে পারে। অবশ্য তোমরা যদি একে অন্যের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তবে যার প্রতি বিশ্বাস রাখা হয়েছে, সে যেন নিজ আমানত

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

যথাযথভাবে আদায় করে দেয় এবং আল্লাহকে ভয় করে– যিনি তার প্রতিপালক। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করবে না। যে তা গোপন করবে সে পাপী মনের ধারক। তোমরা যে-কাজই কর না কেন আল্লাহ সে সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত।

[৪০]

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

২৮৪. যা-কিছু আছে আকাশমণ্ডলে এবং যা-কিছু আছে পৃথিবীতে সব আল্লাহরই। তোমাদের অন্তরে যেসব কথা আছে, তা তোমরা প্রকাশ কর বা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের থেকে তার হিসাব নেবেন।[১৮৮] অত:পর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতা রাখেন।

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾

২৮৫. রাসূল (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, যা তাঁর উপর তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে নাযিল করা হয়েছে এবং (তাঁর সাথে) মুমিনগণও। তাঁরা সকলে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। (তারা বলে,) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না (যে, কারও প্রতি ঈমান আনব এবং কারও প্রতি আনব না)। এবং তাঁরা বলে, আমরা (আল্লাহ ও রাসূলের বিধানসমূহ মনোযোগ

---

১৮৮. সামনে ২৮৬ নং আয়াতের প্রথম বাক্যে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের অন্তরে তার ইচ্ছার বাইরে যেসব ভাবনা দেখা দেয় তাঁতে তার কোন গুনাহ নেই। সুতরাং এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, মানুষ তার অন্তরে জেনে শুনে যে ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা পোষণ করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে গুনাহের যে সংকল্প করে তার হিসাব নেওয়া হবে।

সহকারে) শুনেছি এবং তা খুশী মনে পালন করছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার মাগফিরাতের ভিখারী আর আপনারই কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾

২৮৬. আল্লাহ্ কারও উপর তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করেন না। তার উপকার লাভ হবে সে কাজেই যা সে স্বেচ্ছায় করে এবং তার ক্ষতিও হবে সে কাজেই, যা সে স্বেচ্ছায় করে। (হে মুসলিমগণ!) তোমরা আল্লাহ্র কাছে এই দু'আ কর যে,) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দ্বারা যদি কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তবে সেজন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি সেই রকমের দায়িত্বভার অর্পণ করো না, যে রকম ভার অর্পণ করেছিলে আমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন ভার চাপিয়ো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের ত্রুটিসমূহ মার্জনা কর, আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

আলহামদুলিল্লাহ, আজ ৫ই জুমাদাছ-ছানী ১৪২৬ হিজরী মোতাবেক ১৩ জুলাই ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ করাচিতে সূরা বাকারার তরজমা ও টীকার কাজ সমাপ্ত হল। আল্লাহ তাআলা স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহের তরজমা ও তাফসীরের কাজও সহজ করে দিন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

[আলহামদুলিল্লাহ এ পর্যন্ত বাংলা অনুবাদের কাজ শেষ হল আজ ১৭ শাওয়াল ১৪৩০ হিজরী মোতাবেক ৭ অক্টোবর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ। আল্লাহ তাআলা মূলের মত অনুবাদকেও কবুল করুন। আমীন।]

সূরা আলে-ইমরান

পরিচিতি

ইমরান হযরত মারয়াম আলাইহাস সালামের পিতার নাম। আলে ইমরান অর্থ ইমরানের খান্দান। এ সূরার ৩৩নং আয়াত থেকে ৩৭ নং আয়াত পর্যন্ত এ খান্দান সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। সে হিসেবেই এ সূরার নাম সূরা আলে ইমরান।

এ সূরার সিংহভাগই সেই সময় নাযিল হয়েছে, যখন মুসলিমগণ মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় এসে গিয়েছিলেন, কিন্তু এখানেও কাফিরদের পক্ষ হতে তাদেরকে নানা রকম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। এক পর্যায়ে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলিমগণ অসাধারণ বিজয় অর্জন করেন। অপর দিকে কুরাইশ কাফিরদের বড় বড় সর্দার নিহত হয়। এ পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে তারা পরবর্তী বছর মদীনা মুনাওয়ারায় হামলা চালায়। ফলে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলিমদেরকে সাময়িক পরাজয় স্বীকার করতে হয়। বদর ও উহুদ উভয় যুদ্ধের আলোচনা এ সূরায় এসেছে এবং এ প্রসঙ্গে মুসলিমদেরকে অতি মূল্যবান হিদায়াত ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

মদীনা মুনাওয়ারা ও তার আশেপাশে বিপুল সংখ্যক ইয়াহুদী বাস করত। সূরা বাকরায় তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে খ্রিস্টানদের সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছিল। সূরা আলে-ইমরানে আলোচনার মূল লক্ষ্য খ্রিস্টান সম্প্রদায়। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে ইয়াহুদীদের সম্পর্কেও আলোচনা এসেছে। আরবের নাজরান অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টান বাস করত। তাদের একটি প্রতিনিধিদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়েছিল। সূরা আলে-ইমরানের প্রথম দিকে প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে তাদের সম্পর্কেই আলোচনা। এতে রয়েছে তাদের দলীল-প্রমাণের জবাব। সেই সঙ্গে হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের প্রকৃত অবস্থাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এ সূরায় যাকাত, সুদ ও জিহাদ সম্পর্কিত বিধি-বিধানও বর্ণিত হয়েছে। সূরার শেষ দিকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ যেন বিশ্বজগতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কুদরতের নিদর্শনাবলীতে চিন্তা করত আল্লাহর একত্বে ঈমান আনে ও প্রতিটি প্রয়োজনে কেবল তাঁকেই ডাকে।

৩– সূরা আলে-ইমরান–৮৯

মাদানী ; আয়াত ২০০; রুকূ ২০

سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٢٠٠ رُكُوْعَاتُهَا ٢٠

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাফ-মীম

الٓمّٓ ①

২. আল্লাহ তিনিই, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। যিনি চিরঞ্জীব, সমগ্র জগতের নিয়ন্ত্রক।

اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ②

৩. তিনি তোমার প্রতি সত্য সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছেন, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থন করে এবং তিনিই তাওরাত ও ইনজীল নাযিল করেছেন–

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ اَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ③

৪. যা এর আগে মানুষের জন্য সাক্ষাত হিদায়াতরূপে এসেছিল এবং তিনিই সত্য ও মিথ্যা যাচাইয়ের মানদণ্ড নাযিল করেছেন।[১] নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আল্লাহ অতি পরাক্রমশালী ও মন্দের প্রতিফলদাতা।

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۬ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ④

৫. নিশ্চিত জেনে রেখ আল্লাহর কাছে কোন জিনিস গোপন থাকতে পারে না– পৃথিবীতেও নয় এবং আকাশেও নয়।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ ⑤

---

১. কুরআন মাজীদ এস্থলে 'ফুরকান' শব্দ ব্যবহার করেছে। 'ফুরকান' বলা হয় এমন জিনিসকে, যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়। কুরআন মাজীদেরও এক নাম ফুরকান। কেননা এটা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী কিতাব। সুতরাং কোনও কোনও মুফাসসির মনে করেন এস্থলে 'ফুরকান' দ্বারা কুরআন মাজীদকে বোঝানো হয়েছে। অন্যদের মতে এর দ্বারা সেই সকল মুজিযা বা নিদর্শনাবলীকে বোঝানো উদ্দেশ্য, যা নবীগণের হাতে প্রকাশ করা হয়েছে এবং যা দ্বারা তাদের নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। তাছাড়া এর দ্বারা সেই সকল দলীল-প্রমাণও বোঝানো হতে পারে, যা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের প্রতি নির্দেশ করে।

هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑥

৬. তিনিই সেই সত্তা, যিনি মায়ের পেটে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি দান করেন। তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি পরম পরাক্রান্তও এবং সমুচ্চ প্রজ্ঞারও অধিকারী।[২]

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ

৭. (হে রাসূল!) তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, যার কিছু আয়াত মুহকাম, যার উপর কিতাবের মূল ভিত্তি এবং অপর কিছু আয়াত মুতাশাবিহ[৩]। যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা সেই মুতাশাবিহ

---

২. মানুষ যদি তার সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক স্তরসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ও চিন্তা করে যে, সে মাতৃগর্ভে কিভাবে প্রতিপালিত হয় এবং কিভাবে অপরাপর অগণ্য মানুষ থেকে তার আকৃতিকে এমন পৃথকভাবে তৈরি করা হয় যে, অন্য কারও সাথে সে শতভাগ মিলে যায় না, তবে এসব যে, এক আল্লাহর কুদরত ও হিকমতের অধীনেই হচ্ছে এটা মানতে তার এক মুহূর্ত দেরী হবে না। এ আয়াতে এই বাস্তবতাকে তুলে ধরার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, তাঁর একত্ব ও হিকমতের প্রতি ইশারা করা উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে এর দ্বারা আরও একটি দিক স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, একবার নাজরান থেকে খ্রিস্টানদের একটি প্রতিনিধিদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসেছিল এবং তারা তাঁর সঙ্গে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে কথা বলেছিল। সূরা আলে-ইমরানের কয়েকটি আয়াত সেই প্রেক্ষাপটেই নাযিল হয়েছে। প্রতিনিধি দলটির দাবী ছিল ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র। এর সপক্ষে তাদের দলীল ছিল যে, তিনি পিতা ছাড়া জন্ম লাভ করেছিলেন। এ আয়াত তাদের সে দলীল খণ্ডন করছে। ইশারা করা হচ্ছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই সৃজন ও আকৃতি দানের কাজ আল্লাহ তাআলাই করেন। যদিও তিনি এই নিয়ম চালু করে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক শিশু পিতার মাধ্যমে জন্ম লাভ করে, কিন্তু তিনি এ নিয়মের অধীন ও মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং যখন চান এবং যাকে চান পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেন আর তা দ্বারা কারও খোদা বা খোদার পুত্র হওয়া অনিবার্য হয়ে যায় না।

৩. এ আয়াতটি বুঝবার আগে একটা বাস্তবতা উপলব্ধি করে নেওয়া জরুরী। তা এই যে, এই জগতে এমন বহু বিষয় আছে য়া মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উর্ধ্বে। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ব তো এমন এক সত্য, যা প্রতিটি মানুষ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু তাঁর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞান মানুষের সীমিত বুদ্ধি দ্বারা আহরণ করা সম্ভব নয়। কেননা তা এর বহু উর্ধ্বের বিষয়। কুরআন মাজীদ যেখানে আল্লাহ তাআলার সে সকল গুণের উল্লেখ করেছে, সেখানে তা দ্বারা তাঁর অপার শক্তি ও মহা প্রজ্ঞাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোনও লোক যদি সে সকল গুণের হাকীকত ও সত্তাসারের দার্শনিক অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়, তবে তার হয়রানী ও গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হবে না। কেননা সে তার সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা আল্লাহ তাআলার অসীম গুণাবলীর রহস্য আয়ত্ত

করতে চাচ্ছে, যা তার উপলব্ধির বহু উর্ধ্বের। উদাহরণত কুরআন মাজীদ কয়েক জায়গায় ইরশাদ করেছে– আল্লাহ তাআলার একটি আরশ আছে এবং তিনি সেই আরশে 'মুসতাবী' (সমাসীন) হয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আরশ কেমন? আর তাতে তাঁর সমাসীন হওয়ার দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? এসব এমন প্রশ্ন যার উত্তর মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরের জিনিস। তাছাড়া মানব জীবনের কোনও কর্মগত মাসআলা এর উপর নির্ভরশীলও নয়। এ জাতীয় বিষয় যেসব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, তাকে 'মুতাশাবিহ' আয়াত বলে, এমনিভাবে বিভিন্ন সূরার শুরুতে যে পৃথক পৃথক হরফ নাযিল করা হয়েছে (যেমন এ সূরারই শুরুতে আছে 'আলিফ-লাম-মীম') যাকে 'আল-হুরুফুল মুকাত্তাআত' বলা হয়, তাও 'মুতাশাবিহাত'-এর অন্তর্ভুক্ত। মুতাশাবিহাত সম্পর্কে কুরআন মাজীদ এ আয়াতে নির্দেশনা দিয়েছে যে, এর তত্ত্ব-তালাশের পেছনে না পড়ে বরং মোটামুটিভাবে এর প্রতি ঈমান আনতে হবে আর এর প্রকৃত মর্ম কী, তা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে। এর বিপরীতে কুরআন মাজীদের অন্যান্য যে আয়াতসমূহ আছে। তার মর্ম সুস্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে সে সকল আয়াতই মানুষের সামনে কর্মগত পথ-নির্দেশ পেশ করে। এ রকম আয়াতকে 'মুহ্কাম' আয়াত বলে। একজন মুমিনের কর্তব্য বিশেষভাবে এ জাতীয় আয়াতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা।

মুতাশাবিহাত সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা দেওয়া তো এমনিতেই জরুরী ছিল, কিন্তু এ সূরায় বিষয়টিকে স্পষ্ট করার বিশেষ কারণ ছিল এই যে, নাজরানের যে খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়েছিল, যাদের কথা পূর্বের টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে, তারা 'হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র'– এ দাবীর সপক্ষে বিভিন্ন দলীল পেশ করেছিল, যার মধ্যে একটা এই ছিল যে, খোদ কুরআন মাজীদ তাঁকে 'কালিমাতুল্লাহ' (আল্লাহর কালিমা) ও 'রূহুম মিনাল্লাহ' (আল্লাহর পক্ষ হতে আগত রূহ) নামে অভিহিত করেছে। এর দ্বারা বোঝা যায় তিনি আল্লাহর বিশেষ গুণ 'কালাম' ও আল্লাহর রূহ ছিলেন। এ আয়াত তার জবাব দিয়েছে যে, কুরআন মাজীদই বিভিন্ন স্থানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, আল্লাহ তাআলার কোন পুত্র কন্যা থাকতে পারে না এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে 'আল্লাহ' বা 'আল্লাহর পুত্র' বলা শিরক ও কুফরের নামান্তর। এসব সুস্পষ্ট আয়াত ছেড়ে দিয়ে 'কালিমাতুল্লাহ' শব্দটিকে ধরে বসে থাকা এবং এর ভিত্তিতে এমন সব তাবীল ও ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া, যা কুরআন মাজীদের মুহকাম আয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, এটা অন্তরের বক্রতারই পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে 'কালিমাতুল্লাহ' বলার অর্থ কেবল এই যে, তিনি পিতার মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ তাআলার 'কুন' (হও) কালিমা (শব্দ) দ্বারা জন্মলাভ করেছিলেন– (যেমন কুরআন মাজীদের এ সূরারই ৫৯নং আয়াতে বলা হয়েছে)। আর তাঁকে 'রূহুম মিনাল্লাহ' বলা হয়েছে এ কারণে যে, তাঁর রূহ সরাসরি আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছিলেন। অবশ্য 'কুন' শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করার অবস্থাটা কেমন ছিল এটা মানব-বুদ্ধির উর্ধ্বের বিষয়। এমনিভাবে তাঁর রূহ সরাসরি কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাও আমাদের বুদ্ধির অতীত। এসব বিষয় 'মুতাশাবিহাত'-এর অন্তর্ভুক্ত। তাই এর তত্ত্ব-তালাশের পেছনে পড়া নিষেধ, (যেহেতু এসব জিনিস মানুষ বুঝতে সক্ষম নয়)। অনুরূপ এর মনগড়া তাবীল করে এর থেকে 'আল্লাহর পুত্র' থাকার ধারণা উদ্ভাবন করাও টেড়া মেজাজের পরিচায়ক।

الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا
اللَّهُ ۘ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ۙ
كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝٧

আয়াতসমূহের পেছনে পড়ে থাকে, উদ্দেশ্য ফিতনা সৃষ্টি করা এবং সেসব আয়াতের তাবীল খোঁজা, অথচ সে সব আয়াতের যথার্থ মর্ম আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর যাদের জ্ঞান পরিপক্ক তারা বলে, আমরা এর (সেই মর্মের) প্রতি বিশ্বাস রাখি (যা আল্লাহ তাআলার জানা)। সবকিছুই আমাদের প্রতিপাল-কের পক্ষ হতে এবং উপদেশ কেবল তারাই গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধিমান।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا
مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝٨

৮. (এরূপ লোক প্রার্থনা করে) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে যে হিদায়াত দান করেছ তারপর আর আমাদের অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি করো না এবং একান্তভাবে নিজের পক্ষ হতে আমাদেরকে রহমত দান কর। নিশ্চয়ই কেবল তোমারই সত্তা এমন, যা অসীম দানশীলতার অধিকারী।

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝٩

৯. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি সমস্ত মানুষকে এমন এক দিন একত্র করবে, যে দিনের আগমনে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ নিজ ওয়াদার বিপরীত করেন না।

[২]

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ
وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ
هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۝١٠

১০. বাস্তবতা এই যে, যারা কুফর অবলম্বন করেছে, আল্লাহর বিপরীতে তাদের সম্পদও তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও নয়। আর তারাই জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে।

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ

১১. তাদের অবস্থা ফিরাউন ও তার পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থার মত। তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল। ফলে আল্লাহ তাদেরকে তাদের পাপাচারের

وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ⑪

কারণে পাকড়াও করেছিলেন। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি অতি কঠিন।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ⑫

১২. যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদেরকে বলে দাও, তোমরা পরাভূত হবে[৪] এবং তোমাদেরকে একত্র করে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে আর তা অতি মন্দ ঠিকানা।

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْيَ الْعَيْنِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ⑬

১৩. তোমাদের জন্য সেই দুই দলের (ঘটনার) মধ্যে নিদর্শন রয়েছে, যারা একে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের মধ্যে একটি দল আল্লাহর পথে লড়াই করছিল এবং দ্বিতীয়টি ছিল কাফির। তারা নিজেদেরকে খোলা চোখে তাদের চেয়ে দ্বিগুণ দেখছিল।[৫] আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয়ই এ ঘটনার ভেতর চক্ষুষ্মানদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের বড় উপকরণ রয়েছে।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ⑭

১৪. মানুষের জন্য ওই সকল বস্তুর আসক্তিকে মনোরম করা হয়েছে, যা তার প্রবৃত্তির চাহিদা মোতাবেক হয় অর্থাৎ নারী, সন্তান, রাশিকৃত সোনা-রূপা, চিহ্নিত অশ্বরাজি, চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত-খামার। এসব ইহ-জীবনের ভোগ-সামগ্রী। (কিন্তু) স্থায়ী পরিণামের সৌন্দর্য কেবল আল্লাহরই কাছে।

---

৪. এর দ্বারা দুনিয়ায় কাফিরদের পরাস্ত হওয়ারও ভবিষ্যদ্বাণী করা হতে পারে এবং আখিরাতের পরাজয়ও বোঝানো হতে পারে।

৫. পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, কাফিরগণ মুসলিমদের কাছে পরাভূত হবে। এবার তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়ার লক্ষ্যে বদর যুদ্ধের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। এ যুদ্ধে কাফিরদের বাহিনী ছিল এক হাজার সশস্ত্র সৈন্য সম্বলিত। আর মুসলিমদের সংখ্যা ছিল সর্ব সাকুল্যে তিনশ তের জন। কাফিরগণ খোলা চোখে দেখছিল তাদের সংখ্যা অনেক বেশি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে সাহায্য করেন এবং কাফিরদেরকে চরম পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়।

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾

১৫. বল, আমি কি তোমাদেরকে সেই সব জিনিসের কথা বলে দেব, যা এসব থেকে উৎকৃষ্টতর? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে আছে এমন বাগ-বাগিচা, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত, যেখানে তারা সর্বদা থাকবে এবং তাদের জন্য আছে পবিত্র স্ত্রী ও আল্লাহর পক্ষ হতে সন্তুষ্টি। আল্লাহ সকল বান্দাকে ভালোভাবে দেখছেন।

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

১৬. তারা সেই সব লোক, যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার প্রতি ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদের পাপরাশি ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

১৭. তারা অত্যন্ত ধৈর্যশীল, সত্য বলতে অভ্যস্ত, ইবাদতগোযার, (আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে) অর্থ ব্যয়কারী এবং সাহরীর সময় ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

১৮. আল্লাহ স্বয়ং এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশতাগণ ও জ্ঞানীগণও যে, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, যিনি ইনসাফের সাথে (বিশ্ব জগতের) নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাঁর ক্ষমতাও পরিপূর্ণ এবং হিকমতও পরিপূর্ণ।

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ

১৯. নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দ্বীন কেবল ইসলামই। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা স্বতন্ত্র পথ অজ্ঞতাবশত নয়; বরং জ্ঞান আসার পর কেবল বিদ্বেষবশত অবলম্বন করেছে। আর যে-কেউ আল্লাহর আয়াতসমূহ

فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيۡعُ الۡحِسَابِ ﴿١٩﴾

প্রত্যাখ্যান করবে (তার স্মরণ রাখা উচিত যে,) আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

فَاِنۡ حَآجُّوۡكَ فَقُلۡ اَسۡلَمۡتُ وَجۡهِىَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ؕ وَقُلۡ لِّلَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ وَالۡاُمِّيّٖنَ ءَاَسۡلَمۡتُمۡ ؕ فَاِنۡ اَسۡلَمُوۡا فَقَدِ اهۡتَدَوۡا ۚ وَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَاِنَّمَا عَلَيۡكَ الۡبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيۡرٌۢ بِالۡعِبَادِ ﴿٢٠﴾

২০. তারপরও যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তবে বলে দাও, আমি তো নিজের চেহারাকে আল্লাহর অভিমুখী করেছি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর কিতাবীদেরকে এবং (আরবের মুশরিক) নিরক্ষরদেরকে বলে দাও, তোমরাও কি ইসলাম গ্রহণ করলে? যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে হিদায়াত পেয়ে যাবে আর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার দায়িত্ব কেবল বার্তা পৌঁছে দেওয়া। আল্লাহ সকল বান্দাদের সম্যক দেখছেন।

[৩]

اِنَّ الَّذِيۡنَ يَكۡفُرُوۡنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقۡتُلُوۡنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيۡرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقۡتُلُوۡنَ الَّذِيۡنَ يَاۡمُرُوۡنَ بِالۡقِسۡطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرۡهُمۡ بِعَذَابٍ اَلِيۡمٍ ﴿٢١﴾

২১. যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে, নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা ইনসাফের নির্দেশ দেয় তাদেরকেও হত্যা করে, তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তির 'সুসংবাদ' দাও।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ حَبِطَتۡ اَعۡمَالُهُمۡ فِى الدُّنۡيَا وَالۡاٰخِرَةِ ۫ وَمَا لَهُمۡ مِّنۡ نّٰصِرِيۡنَ ﴿٢٢﴾

২২. তারা সেই লোক, দুনিয়া ও আখিরাতে যাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে আর তাদের কোনও রকমের সাহায্যকারী লাভ হবে না।

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ اُوۡتُوۡا نَصِيۡبًا مِّنَ الۡكِتٰبِ يُدۡعَوۡنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيۡقٌ مِّنۡهُمۡ وَهُمۡ مُّعۡرِضُوۡنَ ﴿٢٣﴾

২৩. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছিল। তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকা হয়, যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়। তথাপি তাদের একদল উপেক্ষা করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۪ وَّغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৪. এসব এ কারণে যে, তারা বলে থাকে আগুন কখনই আমাদেরকে দিন কতকের বেশি স্পর্শ করবে না। আর তারা যেসব মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করেছে তাই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে।

فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۫ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৫. কিন্তু সেই সময় তাদের কী অবস্থা হবে, যখন আমি তাদেরকে এমন এক দিন (-এর সম্মুখীন করা)-এর জন্য একত্র করব, যার আগমনের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর প্রত্যেককে সে যা-কিছু অর্জন করেছে তা পুরোপুরি দেওয়া হবে এবং কারও প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۶﴾

২৬. বল, হে আল্লাহ! হে সার্বভৌম শক্তির মালিক! তুমি যাকে চাও ক্ষমতা দান কর আর যার থেকে চাও ক্ষমতা কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর এবং যাকে চাও লাঞ্ছিত কর। সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।[৬]

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۫ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ

২৭. তুমিই রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করাও।[৭] তুমিই নিষ্প্রাণ বস্তু হতে প্রাণবান বস্তু বের কর এবং প্রাণবান

---

৬. খন্দকের যুদ্ধকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন রোম ও ইরান সাম্রাজ্য মুসলিমদের করতলগত হবে। কাফিরগণ এটা শুনে ঠাট্টা করতে লাগল যে, নিজেদের রক্ষা করার জন্য যাদের গর্ত খুড়তে হচ্ছে এবং না খেয়ে যারা দিন কাটাচ্ছে তারা কিনা দাবী করছে রোম ও ইরান জয় করে ফেলবে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এতে মুসলিমদেরকে এ দু'আ শিক্ষাদানের মাধ্যমে এক সূক্ষ্ম পন্থায় তাদের ঠাট্টার জবাব দেওয়া হয়েছে।

৭. শীতকালে দিন ছোট হয়। তখন গ্রীষ্মকালীন দিনের কিছু অংশ রাত হয়ে যায়। আবার গ্রীষ্মকালে দিন বড় হলে শীতকালীন রাতের কিছু অংশ দিনের মধ্যে ঢুকে যায়। আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে।

الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

থেকে নিষ্প্রাণ বস্তু বের কর[৮] আর যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান কর।

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨﴾

২৮. মুমিনগণ যেন মুমিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে নিজেদের মিত্র ও সাহায্যকারী না বানায়। যে এরূপ করবে আল্লাহর সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। তবে তাদের (জুলুম) থেকে বাঁচার জন্য যদি আত্মরক্ষামূলক কোনও পন্থা অবলম্বন কর,[৯] সেটা ভিন্ন কথা। আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ (শাস্তি) হতে রক্ষা করেন আর তাঁরই দিকে (সকলকে) ফিরে যেতে হবে।

---

৮. উদাহরণত নিষ্প্রাণ ডিম থেকে প্রাণবান বাচ্চা বের হয় এবং প্রাণবান পাখীর ভেতর থেকে নিষ্প্রাণ ডিম বের হয়।

৯. আরবী ولى (বহুবচনে اولياء)-এর অর্থ করা হয়েছে 'মিত্র ও সাহায্যকারী'। ওলী বা মিত্র বানানোকে 'মুওয়ালাত'-ও বলা হয়। এর দ্বারা এমন বন্ধুত্ব ও আন্তরিক ভালোবাসাকে বোঝানো হয়, যার ফলে দু'জন লোকের জীবনের লক্ষ্য ও লাভ-লোকসান অভিন্ন হয়ে যায়। মুসলিমদের এ জাতীয় সম্পর্ক কেবল মুসলিমদের সাথেই হতে পারে। অমুসলিমদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন কঠিন পাপ। এ আয়াতে কঠোরভাবে তা নিষেধ করা হয়েছে। এই একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সূরা নিসা (৪ : ১৩৯, ১৪৪), সূরা মায়েদা (৫ : ৫১, ৫৭, ৮১), সূরা তাওবা (৯ : ৩৩), সূরা মুজাদালা (৫৮ : ২২) ও সূরা মুমতাহিনায় (৬০ : ১)। অবশ্য যে অমুসলিম যুদ্ধরত নয়, তার সাথে সদাচরণ, সৌজন্যমূলক ব্যবহার ও তার কল্যাণ কামনা করা কেবল জায়েযই নয়, বরং এটাই কাম্য। যেমন কুরআন মাজীদেই সূরা মুমতাহানায় (৬০ : ৮) পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। গোটা জীবনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নীতি এটাই ছিল যে, এরূপ লোকদের সাথে তিনি সর্বদা সদয় আচরণ করেছেন। এমনিভাবে অমুসলিমদের সাথে এমন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতামূলক চুক্তি বা ব্যবসায়িক কারবারও করা যেতে পারে, যাকে অধুনা পরিভাষায় 'মৈত্রী চুক্তি' বলে। শর্ত হচ্ছে এরূপ চুক্তি ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থবিরোধী হতে পারবে না এবং তাতে শরীয়তের পরিপন্থী কোনও কর্মপন্থাও অবলম্বন করা যাবে না। খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরে সাহাবায়ে কিরাম এরূপ কারবার ও চুক্তি সম্পাদন করেছেন। কুরআন মাজীদ অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকে নিষেধ করে দেওয়ার পর যে ইরশাদ করেছে, 'তবে তাদের (জুলুম) থেকে বাঁচার জন্য আত্মরক্ষামূলক কোন পন্থা অবলম্বন করলে সেটা ভিন্ন কথা', এর অর্থ কাফিরদের জুলুম ও নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে যদি এমন কোন পন্থা অবলম্বন করতে হয়, যা দ্বারা বাহ্যত মনে হয় তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা হয়েছে, তবে তা করার অবকাশ আছে।

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۹﴾

২৯. (হে রাসূল!) মানুষকে বলে দাও, তোমাদের অন্তরে যা-কিছু আছে, তোমরা তা গোপন রাখ বা প্রকাশ কর আল্লাহ তা অবগত আছেন। তিনি জানেন যা-কিছু আকাশমণ্ডল ও যমীনে আছে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۛۚ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚۛ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًۢا بَعِيْدًا ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿۳۰﴾

৩০. সেই দিনকে স্মরণ রেখ, যে দিন প্রত্যেকে যে যে ভালো কাজ করেছে তা সামনে উপস্থিত পাবে এবং যে মন্দ কাজ করেছে (তাও নিজের সামনে উপস্থিত দেখে) আকাঙ্ক্ষা করবে তার ও সেই মন্দ কাজের মধ্যে যদি অনেক দূরের ব্যবধান থাকত! আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ (শাস্তি) হতে সাবধান করছেন। আর আল্লাহ নিজ বান্দাদের প্রতি বিপুল মমতা রাখেন।

[৪]

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۱﴾

৩১. (হে নবী!) মানুষকে বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাক, তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের খাতিরে তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۲﴾

৩২. বলে দাও, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। তারপরও যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ কাফিরদেরকে পসন্দ করেন না।

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰۤى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۳۳﴾ۙ

৩৩. আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধরগণ ও ইমরানের বংশধরগণকে মনোনীত করে সমস্ত জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

ذُرِّيَّةً بَعۡضُهَا مِنۡۢ بَعۡضٍ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ۚ﴿۳۴﴾

৩৪. এরা এমন বংশধর, যার সদস্যগণ (সৎকর্ম ও ইখলাসে) একে অন্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল।[১০] আর আল্লাহ (প্রত্যেকের কথা) শোনেন এবং সবকিছু জানেন।

اِذۡ قَالَتِ امۡرَاَتُ عِمۡرٰنَ رَبِّ اِنِّىۡ نَذَرۡتُ لَكَ مَا فِىۡ بَطۡنِىۡ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلۡ مِنِّىۡ ۚ اِنَّكَ اَنۡتَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ ﴿۳۵﴾

৩৫. (সুতরাং দু'আ শ্রবণ-সংক্রান্ত সেই ঘটনা স্মরণ কর) যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি মানত করলাম আমার গর্ভে যে শিশু আছে, আমি তাকে সকল কাজ থেকে মুক্ত রেখে তোমার জন্য ওয়াকফ করে রাখব। আমার এ মানত কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সকল কিছু শোন ও সকল বিষয়ে জান।

فَلَمَّا وَضَعَتۡهَا قَالَتۡ رَبِّ اِنِّىۡ وَضَعۡتُهَاۤ اُنۡثٰى ؕ وَاللّٰهُ اَعۡلَمُ بِمَا وَضَعَتۡ ؕ وَلَيۡسَ الذَّكَرُ كَالۡاُنۡثٰى ۚ وَاِنِّىۡ سَمَّيۡتُهَا مَرۡيَمَ وَاِنِّىۡۤ اُعِيۡذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ﴿۳۶﴾

৩৬. অত:পর যখন তার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করল তখন সে (আক্ষেপ করে) বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার যে কন্যা সন্তান জন্ম নিল!' অথচ আল্লাহ ভালো করেই জানেন, তার কী জন্ম নিয়েছে। আর 'ছেলে তো মেয়ের মত হয় না'। আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম এবং আমি তাকে ও তার বংশধরগণকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফাজতের জন্য তোমার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম।

---

১০. আয়াতের এ তরজমা করা হয়েছে কাতাদা (রাযি.)-এর তাফসীরের উপর ভিত্তি করে (দেখুন রুহুল মাআনী, ৩য় খণ্ড, ১৭৬)। প্রকাশ থাকে যে, ইমরান যেমন হযরত মুসা আলাইহিস সালামের পিতার নাম ছিল তেমনি হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালামেরও পিতার নাম। এস্থলে ইমরান দ্বারা উভয়কেই বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু সামনে যেহেতু হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালামের ঘটনা আসছে, তাই এটাই বেশি পরিষ্কার যে, এস্থলে ইমরান বলতে হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালামের পিতাকে বোঝানোই উদ্দেশ্য।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۚ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

৩৭. সুতরাং তার প্রতিপালক তাকে (মারইয়ামকে) উত্তমভাবে কবুল করলেন এবং তাকে উৎকৃষ্ট পন্থায় লালন-পালন করলেন। আর যাকারিয়া তার তত্ত্বাবধায়ক হল।[১১] যখনই যাকারিয়া তার কাছে তার ইবাদতখানায় যেত, তার কাছে কোন রিযিক পেত। সে জিজ্ঞেস করল, মারইয়াম! তোমার কাছে এসব জিনিস কোথা থেকে আসে? সে বলল, আল্লাহর নিকট থেকে। আল্লাহ যাকে চান অপরিমিত রিযিক দান করেন।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾

৩৮. এ সময় যাকারিয়া স্বীয় প্রতিপালকের কাছে দু'আ করল। বলতে লাগল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার নিকট হতে কোন পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি দু'আ শ্রবণকারী।[১২]

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. সুতরাং (একদা) যাকারিয়্যা যখন ইবাদতখানায় সালাত আদায় করছিলেন, তখন ফিরিশতাগণ তাঁকে ডাক দিয়ে বলল, আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়া (-এর জন্ম) সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন, যিনি জন্মগ্রহণ করবেন আল্লাহর এক

---

১১. হযরত ইমরান ছিলেন বায়তুল মুকাদ্দাসের ইমাম। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল হান্না। তাঁর কোন ছেলে-মেয়ে ছিল না। তাই তিনি মান্নত করেছিলেন তাঁর কোন সন্তান হলে তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমত করার জন্য উৎসর্গ করবেন। অত:পর হযরত মারইয়ামের জন্ম হল, কিন্তু তাঁর জন্মের আগেই তাঁর পিতার ইন্তিকাল হয়ে যায়। হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ছিলেন হান্নার ভগ্নিপতি এবং মারইয়ামের খালু। হযরত মারইয়ামের তত্ত্বাবধান করার অধিকার কে পাবে তার মীমাংসার্থে যখন লটারি করা হল, তখন সে লটারিতে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের নাম উঠল। এ সূরাতেই সামনে ৪৪ নং আয়াতে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

১২. আল্লাহ তাআলার কুদরতে হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালামের নিকট অসময়ের ফল আসত। হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম যখন এটা দেখলেন তখন তাঁর খেয়াল হল যে, যেই আল্লাহ মারইয়ামকে অসময়ে ফল দিয়ে থাকেন, তিনি আমাকে এ বৃদ্ধ বয়সে সন্তানও দান করতে পারেন। এ কথা খেয়াল হতেই তিনি আয়াতে বর্ণিত দু'আটি করলেন।

কালিমার সমর্থকরূপে,[১৩] যিনি মানুষের নেতা হবেন, নিজেকে ইন্দ্রিয়-চাহিদা হতে পরিপূর্ণরূপে নিবৃত্ত রাখবেন,[১৪] নবী হবেন এবং পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝

৪০. যাকারিয়া বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র সন্তান জন্ম নেবে কিভাবে, যখন আমার বার্ধক্য এসে পড়েছে এবং আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা?[১৫] আল্লাহ বললেন, এভাবেই! আল্লাহ যা চান করেন।

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْۤ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ؕ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ۝

৪১. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য কোন নিদর্শন স্থির করে দিন। আল্লাহ বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারা ব্যতিরেকে কোনও কথা বলতে পারবে না।[১৬] এবং তুমি স্বীয়

---

১৩. 'আল্লাহর কালিমা' **দ্বারা** হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে, যেমন এ সূরার শুরুতে স্পষ্ট করা হয়েছে। তাঁকে আল্লাহর কালিমা বলা হয় এ কারণে যে, তিনি বিনা পিতায় কেবল আল্লাহ তাআলার 'কুন' (হও) কালিমা (শব্দ) দ্বারা সৃষ্ট। হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছিল তাঁর আগে। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম তাঁর আগমনের তসদীক করেছিলেন।

১৪. আয়াতে হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের বিশেষ গুণ বলা হয়েছে যে, তিনি জিতেন্দ্রিয় হবেন; প্রবৃত্তির চাহিদাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে রাখবেন। যদিও এ বৈশিষ্ট্য অন্যান্য নবীদের মধ্যেও পাওয়া যায়, তথাপি বিশেষভাবে তাঁকে এ গুণের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, আল্লাহ তাআলার ইবাদতে অত্যধিক পরিমাণে মশগুল থাকার কারণে তাঁর বিবাহের প্রতি আগ্রহই সৃষ্টি হতে পারেনি। সাধারণ অবস্থায় বিবাহ করা সুন্নত বটে এবং তার প্রতি উৎসাহও প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের মত কেউ যদি নিজ ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত রাখতে সক্ষম হয়, তবে তার জন্য অবিবাহিত জীবন যাপন করা জায়েয এবং তা মাকরূহও নয়।

১৫. যেহেতু হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম নিজেই সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন, তাই তাঁর এ জিজ্ঞাসা কোনও রকমের অবিশ্বাসের কারণে ছিল না; বরং এক অস্বাভাবিক নিয়ামতের সংবাদ শুনে কৌতুহল প্রকাশ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এটাও কৃতজ্ঞতার এক ধরণ। তাছাড়া তাঁর এ জিজ্ঞাসার মর্ম এটাও হতে পারে যে, আমার পুত্র সন্তান কি আমার এ বার্ধক্য অবস্থায়ই হবে, নাকি আমার যৌবন ফিরিয়ে দেওয়া হবে? আল্লাহ তাআলা উত্তরে জানিয়ে দিলেন, এভাবেই। অর্থাৎ তোমার এ বৃদ্ধ অবস্থায়ই পুত্র সন্তান জন্ম নেবে।

১৬. হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমাকে এমন কোন আলামত বলে দিন, যা দ্বারা আমি গর্ভ ধারণের বিষয়টি বুঝতে পারব, যাতে তখন আমি শুকর

প্রতিপালকের অধিক পরিমাণে যিকির করতে থাক আর তার তাসবীহ পাঠ কর বিকাল বেলায় ও ঊষাকালে।

[৫]

৪২. এবং (এবার সেই সময়কার বিবরণ শোন) যখন ফিরিশতাগণ বলেছিল, হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে বেছে নিয়েছেন, তোমাকে পবিত্রতা দান করেছেন এবং বিশ্বের সমস্ত নারীর মধ্যে তোমাকে মনোনীত করত: শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩. হে মারইয়াম! তুমি নিজ প্রতিপালকের ইবাদতে মশগুল থাক এবং সিজদা কর ও রুকূকারীদের সাথে রুকূও কর।

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪. (হে নবী!) এসব অদৃশ্যের সংবাদ, যা ওহীর মাধ্যমে তোমাকে দিচ্ছি। তখন তুমি তাদের কাছে ছিলে না, যখন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তারা নিজ-নিজ কলম নিক্ষেপ করছিল যে, কে মারইয়ামের তত্ত্বাবধান করবে।[১৭] এবং তখনও তুমি তাদের কাছে ছিলে না, যখন তারা (এ বিষয়ে) একে অন্যের সাথে বাদানুবাদ করছিল।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫. (সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর) যখন ফিরিশতাগণ বলেছিল, হে মারইয়াম!

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ

আদায়ে মশগুল হতে পারি। আল্লাহ তাআলা আলামত বলে দিলেন যে, তোমার স্ত্রীর যখন গর্ভ সঞ্চার হবে তখন তোমার ভেতর এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হবে, যদ্দরুণ তুমি আল্লাহ তাআলার যিকির ও তাসবীহ ছাড়া কোনও রকমের কথাবার্তা বলতে পারবে না। কোন কথা বলার প্রয়োজন দেখা দিলে তা কেবল ইশারাতেই বলতে হবে।

১৭. পূর্বে ৩৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালামের পিতার মৃত্যুর পর তার লালন-পালনের ভার গ্রহণ সম্পর্কে বিরোধ দেখা দিয়েছিল এবং তার মীমাংসা করা হয়েছিল লটারির মাধ্যমে। সে কালে লটারি করা হত কলমের মাধ্যমে। তাই এস্থলে কলম নিক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾

আল্লাহ তোমাকে নিজের এক কালিমার (জন্মগ্রহণের) সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হবে মাসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম,[১৮] যে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে মর্যাদাবান হবে এবং (আল্লাহর) নিকটতম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬. এবং সে দোলনায়ও মানুষের সাথে কথা বলবে[১৯] এবং পূর্ণ বয়সেও আর সে হবে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত।

قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

৪৭. মারইয়াম বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার কিভাবে পুত্র জন্ম নেবে, যখন কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি? আল্লাহ বললেন, এভাবেই আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন কেবল এতটুকু বলেন যে, 'হয়ে যাও'। ফলে তা হয়ে যায়।

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ﴿٤٨﴾

৪৮. এবং তিনি (আল্লাহ) তাঁকে (অর্থাৎ ঈসা ইবনে মারইয়ামকে) কিতাব ও হিকমত এবং তাওরাত ও ইনজিল শিক্ষা দান করবেন।

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ

৪৯. এবং তাঁকে বনী ইসরাঈলের নিকট রাসূল বানিয়ে পাঠাবেন। (সে মানুষকে বলবে) আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে নিদর্শন নিয়ে

---

১৮. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে 'আল্লাহর কালিমা' বলার 'কারণ' পূর্বে ১৩ নং টীকায় বলা হয়েছে।

১৯. হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালামের চারিত্রিক পবিত্রতা স্পষ্ট করার লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে অলৌকিকভাবে সেই সময় কথা বলার শক্তি দান করেছিলেন, যখন তিনি ছিলেন দুধের শিশু। সূরা মারইয়ামের ২৯-৩৩ নং আয়াতে এটা বর্ণিত হয়েছে।

اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۴۹﴾

এসেছি (আর সে নিদর্শন এই) যে, আমি তোমাদের সামনে কাদা দ্বারা এক পাখির আকৃতি তৈরি করব, তারপর তাতে ফু দেব, ফলে তা আল্লাহর হুকুমে পাখি হয়ে যাবে এবং আমি আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করে দেব, মৃতদেরকে জীবিত করব এবং তোমরা নিজ গৃহে যা খাও কিংবা মওজুদ কর, তা সব তোমাদেরকে জানিয়ে দেব।[২০] তোমরা ঈমান আনলে এসব বিষয়ের মধ্যে তোমাদের জন্য (যথেষ্ট) নিদর্শন রয়েছে।

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۫ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿۵۰﴾

৫০. এবং আমার পূর্বে যে কিতাব এসেছে অর্থাৎ তাওরাত, আমি তার সমর্থনকারী এবং (আমাকে এজন্য পাঠানো হয়েছে) যাতে তোমাদের প্রতি যা হারাম করা হয়েছে তন্মধ্যে কিছু জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করি[২১] এবং আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান।

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿۵۱﴾

৫১. নিশ্চয়ই আল্লাহ আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। এটাই সরল পথ (যে,) তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে।

---

২০. এগুলো ছিল মুজিযা, যা আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে তাঁর নবুওয়াতের নিদর্শনস্বরূপ দান করেছিলেন এবং তিনি এগুলো করে দেখিয়েছিলেন।

২১. হযরত মূসা আলাইহিস সালামের শরীয়তে বনী ইসরাঈলের প্রতি কিছু জিনিস, যেমন উটের গোশত, চর্বি, কোন কোন মাছ ও কয়েক প্রকার পাখি হারাম করা হয়েছিল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শরীয়তে সেগুলোকে হালাল করে দেওয়া হয়।

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيۡسٰى مِنۡهُمُ الۡكُفۡرَ قَالَ مَنۡ اَنۡصَارِىۡۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الۡحَوَارِيُّوۡنَ نَحۡنُ اَنۡصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشۡهَدۡ بِاَنَّا مُسۡلِمُوۡنَ ﴿۵۲﴾

৫২. অত:পর ঈসা যখন উপলব্ধি করল যে, তারা কুফর করতে প্রস্তুত, তখন সে (তার অনুসারীদেরকে) বলল, 'কে কে আছে, যারা আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী হবে'? হাওয়ারীগণ[২২] বলল, আমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা অনুগত।

رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا بِمَاۤ اَنۡزَلۡتَ وَاتَّبَعۡنَا الرَّسُوۡلَ فَاكۡتُبۡنَا مَعَ الشّٰهِدِيۡنَ ﴿۵۳﴾

৫৩. হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যা-কিছু নাযিল করেছেন আমরা তাতে ঈমান এনেছি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং আমাদেরকে সেই সকল লোকের মধ্যে লিখে নিন, যারা (সত্যের) সাক্ষ্যদাতা।

وَمَكَرُوۡا وَمَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيۡرُ الۡمٰكِرِيۡنَ ﴿۵۴﴾

৫৪. আর কাফিরগণ (ঈসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে) গুপ্ত কৌশল অবলম্বন করল এবং আল্লাহও গুপ্ত কৌশল করলেন। বস্তুত আল্লাহ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৌশলী।

[৬]

اِذۡ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيۡسٰۤى اِنِّىۡ مُتَوَفِّيۡكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا وَجَاعِلُ الَّذِيۡنَ اتَّبَعُوۡكَ فَوۡقَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡۤا اِلٰى يَوۡمِ الۡقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ

৫৫. (তাঁর কৌশল সেই সময় প্রকাশ পেল) যখন আল্লাহ বলেছিলেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে সহি-সালামতে ওয়াপস নিয়ে নেব,[২৩] তোমাকে নিজের কাছে তুলে নেব এবং যারা কুফরী অবলম্বন করেছে তাদের (উৎপীড়ন) থেকে তোমাকে মুক্ত

---

২২. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাহাবীদেরকে হাওয়ারী বলা হয়।

২৩. শত্রুগণ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে শূলে চড়ানোর ষড়যন্ত্র এঁটেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে আসমানে তুলে নেন এবং যারা তাঁকে গ্রেফতার করতে এসেছিল তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে তাঁর সদৃশ বানিয়ে দেন। শত্রুগণ হযরত ঈসা মনে করে তাকেই শূলে চড়ায়। আয়াতের যে তরজমা করা হয়েছে তার ভিত্তি توفى -এর আভিধানিক অর্থের উপর। মুফাসসিরদের একটি বড় দল এস্থলে এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। শব্দটির আরও একটি ব্যাখ্যা করা সম্ভব, যা হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকেও বর্ণিত আছে। তার জন্য দেখুন মাআরিফুল কুরআন ২য় খণ্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা।

إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

করব আর যারা তোমার অনুসরণ করেছে তাদেরকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সেই সকল লোকের উপর প্রবল রাখব, যারা তোমাকে অস্বীকার করেছে।[২৪] তারপর তোমাদের সকলকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের মধ্যে সেই বিষয়ে মীমাংসা করব, যা নিয়ে তোমরা বিরোধ করতে।

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٥٦﴾

৫৬. সুতরাং যারা কুফরী অবলম্বন করেছে তাদেরকে তো আমি দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি দেব এবং তাদের কোনও রকমের সাহায্যকারী লাভ হবে না।

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদেরকে আল্লাহ তাদের পরিপূর্ণ সওয়াব দান করবেন। আল্লাহ জালিমদেরকে ভালোবাসেন না।

ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾

৫৮. (হে নবী!) এসব এমন আয়াত ও সারগর্ভ উপদেশ, যা আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾

৫৯. আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মত। আল্লাহ তাঁকে মাটি হতে সৃষ্টি করেন তারপর তাঁকে বলেন, 'হয়ে যাও'। ফলে সে হয়ে যায়।

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾

৬০. সত্য সেটাই, যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে। সুতরাং তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

---

২৪. অর্থাৎ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে যারা স্বীকার করে (তা সঠিকভাবে স্বীকার করুক, যেমন মুসলিম সম্প্রদায় অথবা ভ্রান্তভাবে স্বীকার করুক, যেমন খ্রিস্টান সম্প্রদায়) তাদেরকে আমি তার বিরুদ্ধবাদীদের উপর সর্বদা প্রবল রাখব। সুতরাং ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায় যে, সর্বদা এমনই হয়েছে। হ্যাঁ সুদীর্ঘ শত-শত বছরের ইতিহাসে স্বল্পকালের জন্য যদি তাঁর বিরুদ্ধবাদীদেরকে ক্ষেত্রবিশেষে প্রবল দেখা যায়, তবে এটা সে সাধারণ রীতির পরিপন্থী নয়।

৬১. তোমার কাছে (হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্পর্কে) যে প্রকৃত জ্ঞান এসেছে, তারপরও যারা এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদেরকে বলে দাও, এসো, আমরা ডাকি আমাদের সন্তানদেরকে এবং তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে আমরা আমাদের নারীদেরকে এবং তোমরা তোমাদের নারীদেরকে এবং আমরা আমাদের নিজ লোকদেরকে আর তোমরা তোমাদের নিজ লোকদেরকে, তারপর আমরা সকলে মিলে আল্লাহর সামনে কাকুতি-মিনতি করি এবং যারা মিথ্যাবাদী, তাদের প্রতি আল্লাহর লানত পাঠাই।[২৫]

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦١﴾

৬২. নিশ্চিত জেন, এটাই ঘটনাবলীর প্রকৃত বর্ণনা। আল্লাহ ছাড়া কোনও মাবুদ নেই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতারও মালিক এবং হিকমতেরও অধিকারী।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٢﴾

---

২৫. এ কাজকে 'মুবাহালা' বলে। তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে কোনও এক পক্ষ যদি দলীল-প্রমাণ না মেনে হঠকারিতা প্রদর্শন করে, তবে সর্বশেষ পন্থা হচ্ছে তাকে মুবাহালার জন্য ডাকা। তাতে উভয় পক্ষ আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করবে যে, আমাদের মধ্যে যারাই মিথ্যা ও বিভ্রান্তির মধ্যে আছে তারাই যেন ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন এ সূরার শুরুতে বর্ণিত হয়েছে যে, নাজরানের এক খ্রিস্টান প্রতিনিধি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিল। তারা তাঁর **সঙ্গে** হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের খোদা হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করলে কুরআন মাজীদের পক্ষ হতে তার সন্তোষজনক জবাব দেওয়া হয়, যেমন পূর্বের আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু এসব সুস্পষ্ট প্রমাণ হাতে পাওয়া সত্ত্বেও যখন তারা তাদের গোমরাহীতে অটল থাকল, তখন আলোচ্য আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, তিনি যেন তাদেরকে মুবাহালার জন্য ডাকেন। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে মুবাহালার জন্য ডাকলেন এবং নিজেও সেজন্য প্রস্তুত হয়ে আহলে বায়তকে **সঙ্গে** নিয়ে বের হলেন, কিন্তু খ্রিস্টান প্রতিনিধিরা মুবাহালা করতে সাহস করল না। তারা পশ্চাদপসরণ করল।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. তথাপি যদি এসব লোক মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ তো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে ভালোভাবেই জানেন।

[৭]

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. (হে মুসলিমগণ! ইয়াহুদী ও নাসারাদের) বলে দাও যে, হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক কথার দিকে এসে যাও, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই রকম। (আর তা এই যে,) আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না। তাঁর সঙ্গে কোনও কিছুকে শরীক করব না এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে 'রব্ব' বানাব না। তথাপি যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. হে আহলে কিতাব! তোমরা ইবরাহীম সম্পর্কে কেন বিতর্ক করছ, অথচ তাওরাত ও ইনজীল তো তাঁর পরে নাযিল হয়েছিল। তোমরা কি এতটুকুও বোঝ না?

هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاللّٰهُ

৬৬. দেখ, তোমরাই তো তারা, যারা এমন বিষয়ে বিতর্ক করেছ, যে বিষয়ে কিছু না কিছু জ্ঞান তোমাদের ছিল।[২৬] এবার এমন সব বিষয়ে কেন বিতর্ক করছ, যে

২৬. ইয়াহুদীরা বলত, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইয়াহুদী ছিলেন এবং খ্রিস্টানগণ বলত তিনি ছিলেন খ্রিস্টান। কুরআন মাজীদ প্রথমত বলছে, এ সম্প্রদায় দু'টোর অস্তিত্বই হয়েছে তাওরাত ও ইনজীল নাযিল হওয়ার পর, যার বহু আগেই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম গত হয়েছিলেন। কাজেই তাঁকে ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান বলাটা চরম নির্বুদ্ধিতা। অত:পর কুরআন মাজীদ বলছে, তোমাদের যেসব দলীলের ভেতর কিছু না কিছু সত্যতা নিহিত ছিল তাই যখন তোমাদের দাবীসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এসব ভিত্তিহীন ও মূর্খতাসুলভ কথা কিভাবে তোমাদের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে? উদাহরণত তোমরা জানতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বিনা বাপে জন্ম নিয়েছেন আর এর ভিত্তিতে তোমরা তাঁর খোদা হওয়ার পক্ষে দলীল পেশ করেছ ও বিতর্কে লিপ্ত হয়েছ, কিন্তু তোমরা তাতে সফল হওনি। কেননা বিনা পিতায় জন্ম নেওয়াটা কারও

يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

সম্পর্কে তোমাদের মোটেই জ্ঞান নেই। আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. ইবরাহীম ইয়াহুদীও ছিল না এবং খ্রিস্টানও নয়। বরং সে তো একনিষ্ঠ মুসলিম ছিল। সে কখনও শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. ইবরাহীমের সাথে ঘনিষ্ঠতার সর্বাপেক্ষা বেশি হকদার লোক তারা, যারা তাঁর অনুসরণ করেছে এবং এই নবী (অর্থাৎ শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সেই সকল লোক, যারা ঈমান এনেছে। আর আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক।

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. (হে মুমিনগণ!) কিতাবীদের একটি দল তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে চায়, প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করছে না, যদিও তাদের সে উপলব্ধি নেই।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. হে আহলে কিতাব! তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ কেন অস্বীকার করছ, যখন তোমরা নিজেরাই সাক্ষী (যে, তা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ)?[২৭]

খোদা হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। হযরত আদম আলাইহিস সালাম তো পিতা ও মাতা উভয় ছাড়াই পয়দা হয়েছিলেন। অথচ তোমরাও তাকে খোদা বা খোদার পুত্র মনে কর না। এ অবস্থায় কেবল পিতা ছাড়া জন্ম নেওয়াটা কিভাবে খোদা হওয়ার প্রমাণ হতে পারে? তো তোমাদের যে প্রমাণের ভিত্তি সত্য ঘটনার উপর তাই যখন কোন কাজে আসেনি, তখন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম খ্রিস্টান বা ইয়াহুদী ছিলেন- এই নিরেট মূর্খতাসুলভ কথা তোমাদের জন্য কী সুফল বয়ে আনতে পারে?

২৭. এস্থলে আয়াত দ্বারা তাওরাত ও ইনজীলের সেই সব আয়াত বোঝানো উদ্দেশ্য, যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, এক দিকে তো তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ তাওরাত ও ইনজীল আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ, অপর দিকে তাতে যার রাসূল হয়ে আসার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, সেই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতকে অস্বীকার করছ, যা তাওরাত ও ইনজীলের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করারই নামান্তর।

يٰۤاَهۡلَ الۡكِتٰبِ لِمَ تَلۡبِسُوۡنَ الۡحَقَّ بِالۡبَاطِلِ وَتَكۡتُمُوۡنَ الۡحَقَّ وَاَنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۷۱﴾

৭১. হে আহলে কিতাব! তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে কেন গোলাচ্ছ? এবং জেনে শুনে কেন সত্য গোপন করছ?

[৮]

وَقَالَتۡ طَّآئِفَةٌ مِّنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ اٰمِنُوۡا بِالَّذِىۡۤ اُنۡزِلَ عَلَى الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَجۡهَ النَّهَارِ وَاكۡفُرُوۡۤا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُوۡنَ ﴿۷۲﴾

৭২. আহলে কিতাবের একটি দল (একে অন্যকে) বলে, মুসলিমদের প্রতি যে কিতাব নাযিল হয়েছে, দিনের শুরু দিকে তো তাতে ঈমান আনবে আর দিনের শেষাংশে তা অস্বীকার করবে। হয়ত এভাবে মুসলিমগণ (-ও তাদের দ্বীন থেকে) ফিরে যাবে।[২৮]

وَلَا تُؤۡمِنُوۡۤا اِلَّا لِمَنۡ تَبِعَ دِيۡنَكُمۡؕ قُلۡ اِنَّ الۡهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنۡ يُّؤۡتٰۤى اَحَدٌ مِّثۡلَ مَاۤ اُوۡتِيۡتُمۡ اَوۡ يُحَآجُّوۡكُمۡ عِنۡدَ رَبِّكُمۡؕ قُلۡ اِنَّ الۡفَضۡلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤۡتِيۡهِ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيۡمٌ ﴿۷۳﴾

৭৩. আর যারা তোমাদের দ্বীনের অনুসারী, তাদের ছাড়া অন্য কাউকে আন্তরিকভাবে মানবে না। আপনি তাদের বলে দিন, আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতই প্রকৃত হিদায়াত। তোমরা এসব করছ কেবল এই জিদের বশবর্তীতে যে, তোমাদেরকে যে জিনিস (নবুওয়াত ও আসমানী কিতাব) দেওয়া হয়েছিল, সে রকম জিনিস অন্য কেউ পাবে কেন? কিংবা তারা (মুসলিমগণ) তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তোমাদের উপর বিজয়ী হয়ে গেল কেন? আপনি বলে দিন, সকল শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহরই হাতে। তিনি যাকে চান তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।

---

২৮. একদল ইয়াহুদী মুসলিমদেরকে ইসলাম হতে ফেরানোর লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল যে, তাদের মধ্যে কিছু লোক সকাল বেলা ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেবে। তারপর সন্ধ্যা বেলা এই বলে ইসলাম থেকে ফিরে যাবে যে, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাছ থেকে দেখে নিয়েছি। আসলে তিনি সেই নবী নন, তাওরাতে যার সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল এতে করে কিছু মুসলিম এই ভেবে ইসলাম থেকে ফিরে যাবে যে, ইয়াহুদীরা তো তাওরাতের আলেম। তারা যখন ইসলামে দাখিল হওয়ার পরও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, তখন তাদের এ কথার অবশ্যই গুরুত্ব আছে।

يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾

৭৪. তিনি নিজ রহমতের জন্য যাকে ইচ্ছা বিশেষভাবে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহের মালিক।

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّھُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَي اللّٰهِ الْكَذِبَ وَھُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. কিতাবীদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যার কাছে তুমি সম্পদের একটা স্তূপও যদি আমানত রাখ, তবে সে তা তোমাকে ওয়াপস করবে। আবার তাদের মধ্যেই এমন লোকও আছে, যার কাছে একটি দীনারও আমানত রাখলে সে তোমাকে তা ফেরত দেবে না– যদি না তুমি তার মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাক। তাদের এ কর্মপন্থা এ কারণে যে, তারা বলে থাকে, উম্মীদের (অর্থাৎ অইয়াহূদী আরবদের) সাথে কারবারে আমাদের থেকে কোন কৈফিয়ত নেওয়া হবে না। আর (এভাবে) জেনে শুনে তারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যাচার করে।

بَلٰي مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. নিশ্চয়ই, কেন কৈফিয়ত নেওয়া হবে না? (নিয়ম তো এই যে,) যে কেউ নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করে ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, আল্লাহ এরূপ পরহেযগারদেরকে ভালোবাসেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰۗئِكَ لَا خَلَاقَ لَھُمْ فِي الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُھُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۠ وَلَھُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٧﴾

৭৭. (পক্ষান্তরে) যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ও নিজেদের কসমের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, আখিরাতে তাদের কোনও অংশ নেই। আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের দিকে (সদয় দৃষ্টিতে) তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য থাকবে কেবল যন্ত্রণাময় শাস্তি।

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. তাদেরই মধ্যে একদল লোক এমন আছে, যারা কিতাব (তাওরাত) পড়ার সময় নিজেদের জিহ্বাকে পেঁচায়, যাতে তোমরা (তাদের পেঁচিয়ে তৈরি করা) সে কথাকে কিতাবের অংশ মনে কর, অথচ তা কিতাবের অংশ নয় এবং তারা বলে এটা আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ, অথচ তা আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ নয় এবং (এভাবে) তারা জেনে শুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯. এটা কোনও মানুষের কাজ নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করবেন আর সে তা সত্ত্বেও মানুষকে বলবে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও।[২৯] এর পরিবর্তে (সে তো এটাই বলবে যে,) তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও। কেননা তোমরা যে কিতাব শিক্ষা দাও ও যা-কিছু নিজেরা পড়, তার পরিণাম এটাই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. এবং সে তোমাদেরকে এ নির্দেশও দিতে পারে না যে, ফিরিশতা ও নবীগণকে আল্লাহ সাব্যস্ত কর। তোমরা মুসলিম হয়ে যাওয়ার পরও কি তারা তোমাদেরকে কুফরীর হুকুম দেবে?

[৯]

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَاۤ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ

৮১. এবং (তাদেরকে সেই সময়ের কথা স্মরণ করাও) যখন আল্লাহ নবীগণ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, আমি যদি

---

২৯. এর দ্বারা খ্রিস্টানদেরকে রদ করা হচ্ছে, যারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে খোদা বা খোদার পুত্র বলে এবং এভাবে যেন দাবী করে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে তাঁর নিজেরই ইবাদত করার হুকুম দিয়েছেন। একই অবস্থা সেই ইয়াহুদীদেরও, যারা হযরত উযায়র আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলত।

لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰی ذٰلِكُمْ اِصْرِیْ ؕ قَالُوْۤا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِیْنَ ﴿۸۱﴾

তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করি, তারপর তোমাদের নিকট কোন রাসূল আগমন করে, যে তোমাদের কাছে যে কিতাব আছে তার সমর্থন করেন, তবে তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তার সাহায্য করবে। আল্লাহ (সেই নবীদেরকে) বলেছিলেন, তোমরা কি একথা স্বীকার করছ এবং আমার পক্ষ হতে প্রদত্ত এ দায়িত্ব গ্রহণ করছ? তারা বলেছিল, আমরা স্বীকার করছি। আল্লাহ বললেন, তবে তোমরা (একে অন্যের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে) সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী থাকলাম।

فَمَنْ تَوَلّٰی بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۸۲﴾

৮২. এরপরও যারা (হিদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারাই নাফরমান।

اَفَغَیْرَ دِیْنِ اللّٰهِ یَبْغُوْنَ وَلَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَیْهِ یُرْجَعُوْنَ ﴿۸۳﴾

৮৩. তবে কি তারা আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কোনও দ্বীনের সন্ধানে আছে? অথচ আসমান ও যমীনে যত মাখলুক আছে, তারা সকলে আল্লাহরই সামনে মাথা নত করে রেখেছে (কতক তো) স্বেচ্ছায় এবং (কতক) বাধ্য হয়ে।[৩০] এবং তাঁরই দিকে তারা সকলে ফিরে যাবে।

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ عَلَیْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ عَلٰۤی

৮৪. বলে দাও, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, আমাদের উপর যে

---

৩০. অর্থাৎ নিখিল বিশ্বে কেবল আল্লাহ তাআলার হুকুমই চলে। ঈমানদারগণ আল্লাহ তাআলার প্রতিটি হুকুম খুশী মনে, সাগ্রহে মেনে চলে আর যারা আল্লাহকে স্বীকার করে না, তারাও চাক বা না চাক সর্বাবস্থায় তাঁর সেই সব বিধান মেনে চলতে বাধ্য, যা তিনি জগত পরিচালনার জন্য জারী করেন। উদাহরণত তিনি যদি কাউকে অসুস্থ করার সিদ্ধান্ত নেন, তবে সে তা পসন্দ করুক আর নাই করুক, তার উপর সে সিদ্ধান্ত কার্যকর হবেই। মুমিন হোক বা কাফির কারওই সে সিদ্ধান্তের সামনে মাথা নোয়ানো ছাড়া উপায় থাকে না।

اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۪ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۫ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۸۴﴾

কিতাব নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও (তাঁদের) বংশধরের প্রতি যা (যে হিদায়াত) নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা দেওয়া হয়েছে তার প্রতি। আমরা তাঁদের (উল্লিখিত নবীদের) মধ্যে কোনও পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই (এক আল্লাহরই) সম্মুখে নতশির।

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۸۵﴾

৮৫. যে ব্যক্তিই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও দ্বীন অবলম্বন করতে চাবে, তার থেকে সে দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে যারা মহা ক্ষতিগ্রস্ত সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۸۶﴾

৮৬. আল্লাহ এমন লোকদের কিভাবে হিদায়াত দেবেন যারা ঈমান আনার পর কুফর অবলম্বন করেছে, অথচ তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, রাসূল সত্য এবং তাদের কাছে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীও এসেছিল। আল্লাহ এরূপ জালিমদেরকে হিদায়াত দান করেন না।

اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۙ﴿۸۷﴾

৮৭. এরূপ লোকদের শাস্তি এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহর, ফিরিশতাদের ও সমস্ত মানুষের লানত।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۙ﴿۸۸﴾

৮৮. তারই মধ্যে (লানতের মধ্যে) তারা সর্বদা থাকবে। তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۟

৮৯. অবশ্য যারা এসব কিছুর পরও তাওবা করবে ও নিজেদেরকে সংশোধন করবে,

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٨٩﴾

(তাদের জন্য) আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾

৯০. (পক্ষান্তরে) যারা ঈমান আনার পর কুফরী অবলম্বন করেছে, তারপর কুফরীতে অগ্রগামী হতে থেকেছে, তাদের তাওবা কিছুতেই কবুল হবে না।[৩১] এরূপ লোক (সঠিক) পথ থেকে বিলকুল বিচ্যুত হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٩١﴾

৯১. যারা কুফর অবলম্বন করেছে ও কাফির অবস্থায়ই মারা গেছে, তাদের কারও থেকে পৃথিবী ভরতি সোনাও গৃহীত হবে না– যদিও তারা নিজেদের প্রাণ রক্ষার্থে তা দিতে চায়। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং তাদের কোনও রকমের সাহায্যকারী লাভ হবে না।

[চতুর্থ পারা] [১০]

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

৯২. তোমরা কিছুতেই পুণ্যের স্তরে উপনীত হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে (আল্লাহর জন্য) ব্যয় করবে।[৩২] তোমরা যা-কিছুই ব্যয় কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ

৯৩. তাওরাত নাযিল হওয়ার আগে বনী ইসরাঈলের জন্য (-ও) সমস্ত খাদ্যদ্রব্য হালাল ছিল (-যা মুসলিমদের জন্য হালাল), কেবল সেই বস্তু ছাড়া, যা

---

৩১. অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কুফর হতে তাওবা করে ঈমান না আনবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য গুনাহের ব্যাপারে তাদের তাওবা কবুল হবে না।

৩২. পূর্বে সূরা বাকারার ২৬৭ নং আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, দান-সদকায় কেবল খারাপ ও রদ্দী কিসিমের মাল দিও না। বরং আল্লাহর পথে উৎকৃষ্ট মাল ব্যয় করো। এবার এ আয়াতে আরও আগে বেড়ে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে উৎকৃষ্ট মাল ব্যয় করবে তাই নয়; বরং যে সব বস্তু তোমাদের বেশি প্রিয়, তা থেকেই আল্লাহর পথে ব্যয় করো, যাতে যথার্থভাবে তাঁর জন্য ত্যাগ ও কুরবানীর জযবা প্রকাশ পায়। এ আয়াত নাযিল হলে সাহাবীগণ তাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু সদকা করতে শুরু করলেন। এ সম্পর্কিত বহু ঘটনা হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন মাআরিফুল কুরআন, ২য় খণ্ড, ১০৭–১০৮ পৃষ্ঠা।

التَّوْرٰىةُ ؕ قُلْ فَأْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٣﴾

ইসরাঈল (অর্থাৎ ইয়াকুব আলাইহিস সালাম) নিজের জন্য হারাম করেছিল। (হে নবী! ইয়াহুদীদেরকে) বলে দাও, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ করো।[৩৩]

---

৩৩. ইয়াহুদীরা মুসলিমদের উপর আপত্তি তুলত যে, তোমরা নিজেদেরকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অনুসারী বলে দাবী কর, অথচ তোমরা উটের গোশত খাও? যা তাওরাতের দৃষ্টিতে হারাম। এ আয়াতে তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, উটের গোশত হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বীনে হারাম ছিল না; বরং যে সকল জিনিস মুসলিমদের জন্য হালাল, তাওরাত নাযিল হওয়ার আগে তার সবই বনী ইসরাঈলের জন্যও হালাল ছিল। অবশ্য একথা ঠিক যে, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নিজের জন্য উটের গোশত হারাম করেছিলেন আর তার কারণ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এই ছিল যে, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম সায়্যাটিকা (ইরকুন নাসা) রোগে ভুগছিলেন। তাই তিনি মানত করেছিলেন, এ রোগ থেকে মুক্তি লাভ করলে আমি আমার প্রিয় খাদ্য ত্যাগ করব। উটের গোশত ছিল তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় খাবার। তাই আরোগ্য লাভের পর তিনি তা ছেড়ে দেন (রুহুল মাআনী, মুস্তাদরাক হাকিমের বরাতে, এর সনদ সহীহ)। পরবর্তীকালে বনী ইসরাঈলের জন্যও উটের গোশত হারাম করা হয়েছিল কি না, সে সম্পর্কে কুরআন মাজীদ স্পষ্ট ভাষায় কিছু বলেনি। তবে সূরা নিসায় (৪খণ্ড, ১৬০) আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি বনী ইসরাঈলের প্রতি তাদের নাফরমানীর কারণে বহু উৎকৃষ্ট জিনিস হারাম করে দিয়েছিলেন। আর এ সূরারই ৫০ নং আয়াতে গত হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলকে বলেছিলেন, 'আমার পূর্বে যে কিতাব নাযিল হয়েছে, আমি তার সমর্থক। আর (আমাকে এজন্য পাঠানো হয়েছে) যাতে আমি তোমাদের প্রতি যেসব বস্তু হারাম করা হয়েছিল, তন্মধ্যে কতক হালাল করে দেই'। তাছাড়া এস্থলে 'তাওরাত নাযিল হওয়ার আগে' কথাটি দ্বারাও বোঝা যায় যে, সম্ভবত তাওরাত নাযিলের পর উটের গোশত তাদের জন্য হারাম করা হয়েছিল। অত:পর তাদেরকে যে চ্যালেঞ্জ করা হল- 'তোমরা সত্যবাদী হলে তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ করো', এর অর্থ তাওরাতের কোথাও একথার উল্লেখ নেই যে, উটের গোশত হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময় থেকেই হারাম হিসেবে চলে এসেছে। বরং বিষয়টি এর বিপরীত। এটা কেবল বনী ইসরাঈলের জন্যই হারাম করা হয়েছিল। এখনও বাইবেলের 'আহবার' পুস্তিকা, যা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়ের মতে বাইবেলের অংশ, তাতে বনী ইসরাঈলের প্রতি উটের গোশত খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তুমি বনী ইসরাঈলকে বল, তোমরা এ পশু খেও না, অর্থাৎ উট... এটা তোমাদের পক্ষে অপবিত্র (আহবার : ১১:১-৪)। সারকথা এই যে, উটের গোশত মৌলিকভাবে হালাল। কেবল হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের জন্য তাঁর মানতের কারণে আর বনী ইসরাঈলের জন্য তাদের নাফরমানীর কারণে হারাম করা হয়েছিল। এখন উম্মতে মুহাম্মাদীকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আমলের মূল বিধান ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪. এসব বিষয় (স্পষ্ট হয়ে যাওয়া)-এর পরও যারা আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, সে সকল লোক ঘোর জালিম।

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫. আপনি বলুন, আল্লাহ সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা ইবরাহীমের দ্বীন অনুসরণ কর, যে ছিল সম্পূর্ণরূপে সঠিক পথের উপর। সে যারা আল্লাহর শরীক স্থির করে তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬. বাস্তবতা এই যে, মানুষের (ইবাদতের) জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর তৈরি করা হয়, নিশ্চয়ই তা সেটি, যা মক্কায় অবস্থিত, (এবং) তৈরির সময় থেকেই সেটি বরকতময় এবং সমগ্র জগতের মানুষের জন্য হিদায়াতের উপায়।[৩৪]

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾

৯৭. তাতে আছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী, মাকামে ইবরাহীম। যে তাতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে যারা সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে তাদের উপর আল্লাহর জন্য এ ঘরের হজ্জ করা ফরয। কেউ এটা অস্বীকার করলে আল্লাহ তো বিশ্ব জগতের সমস্ত মানুষ হতে বেনিয়ায।

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٨﴾

৯৮. বলে দাও, হে কিতাবীগণ! তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ কেন অস্বীকার করছ? তোমরা যা-কিছু করছ আল্লাহ তার সাক্ষী।

---

৩৪. এটা ইয়াহুদীদের আরেকটি আপত্তির উত্তর। তাদের কথা ছিল, বনী ইসরাঈলের সমস্ত নবী বায়তুল মুকাদ্দাসকে নিজেদের কিবলা মেনে আসছেন। মুসলিমগণ সেটি ছেড়ে মক্কার কাবাকে কেন কিবলা বানিয়ে নিয়েছে? আয়াত এর জবাব দিচ্ছে, কাবা তো অস্তিত্ব লাভ করেছে বায়তুল মুকাদ্দাসের বহু আগে। এটা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নিদর্শন। সুতরাং এটাকে পুনরায় কিবলা ও পবিত্র ইবাদতখানা বানিয়ে নেওয়াটা কিছুতেই আপত্তির বিষয় হতে পারে না।

৯৯. বলে দাও, হে কিতাবীগণ! আল্লাহর পথে বক্রতা সৃষ্টির চেষ্টা করে মুমিনদের জন্য তাতে অন্তরায় সৃষ্টি করছ কেন, অথচ তোমরা নিজেরাই প্রকৃত অবস্থার সাক্ষী?[৩৫] তোমরা যা-কিছু করছ, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٩﴾

১০০. হে মুমিনগণ! তোমরা যদি কিতাবীদের একটি দলের কথা মেনে নাও, তবে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় কাফির বানিয়ে ছাড়বে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٠﴾

---

৩৫. এখান থেকে ১০৮ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহ একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। মদীনা মুনাওয়ারায় আউস ও খাযরাজ নামে দু'টো গোত্র বাস করত। প্রাক-ইসলামী যুগে এ দুই গোত্রের মধ্যে প্রচণ্ড শত্রুতা ছিল। তাদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। সেসব যুদ্ধ কখনও বছরের পর বছর স্থায়ী হত। গোত্র দু'টি যখন ইসলাম গ্রহণ করল তখন ইসলামের বরকতে তাদের পারস্পরিক শত্রুতা খতম হয়ে গেল এবং তারা পরস্পরে পরম বন্ধু ও ভাই-ভাই হয়ে গেল। তাদের এ ঐক্য ইয়াহুদীদের পক্ষে চোখের কাঁটায় পরিণত হল। একবার উভয় গোত্রের লোক একটি মজলিসে বসা ছিল। শাম্মাস ইবনে কায়স নামক এক ইয়াহুদী যখন তাদের সে সম্প্রীতিপূর্ণ দৃশ্য দেখল তখন সে তা সহ্য করতে পারল না। সে তাদের মধ্যে কলহ সৃষ্টির পাঁয়তারা করল এবং সেই লক্ষ্যে এই কৌশল অবলম্বন করল যে, এক ব্যক্তিকে বলল, জাহিলী যুগে আউস ও খাযরাজের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চলা কালে উভয় পক্ষের কবিগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে যেসব কবিতা পাঠ করত, তুমি ওই মজলিসে গিয়ে তা আবৃত্তি কর। সেই ব্যক্তি গিয়ে তা আবৃত্তি করতে শুরু করল। তা শোনামাত্র পুরানো ঘা তাজা হয়ে উঠল। প্রথম দিকে উভয় পক্ষে কথা কাটাকাটি চলল। ক্রমে তা বিবাদে রূপ নিল এবং নতুনভাবে আবার যুদ্ধের দিন-ক্ষণ স্থির হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। ইত্যবসরে বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে গেল। তিনি ভীষণ দুঃখ পেলেন। দ্রুত সেখানে চলে আসলেন এবং তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন যে, এটা এক শয়তানী চাল। পরিশেষে তাঁর বোঝানো-সমঝানোর ফলে সে ফিতনা খতম হয়ে গেল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা প্রথমে তো ইয়াহুদীদেরকে সম্বোধন করে বলছেন, প্রথমত তোমাদের নিজেদেরই তো ঈমান আনা উচিত। আর যদি নিজেরা সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হও, তবে অন্ততপক্ষে যে সকল লোক ঈমান এনেছে তাদের ঈমানের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হতে তো ক্ষান্ত থাক। অত:পর মুমিনদেরকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সবশেষে আত্মকলহ থেকে বাঁচার জন্য এই ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে যে, নিজেদেরকে দ্বীনের তাবলীগ ও প্রচার কার্যে নিয়োজিত রাখ। তাতে যেমন ইসলাম প্রচার লাভ করবে, সেই সঙ্গে নিজেদের মধ্যে সংহতিও গড়ে ওঠবে।

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ
وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ
اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۱۰۱﴾

১০১. তোমরা কি করেই বা কুফর অবলম্বন করবে, যখন তোমাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হচ্ছে এবং তাঁর রাসূল তোমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছেন? আর (আল্লাহর নীতি এই যে,) যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয়কে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে, তাকে সরল পথ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়।

[১১]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ
وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

১০২. হে মুমিনগণ! অন্তরে আল্লাহকে সেইভাবে ভয় কর, যেভাবে তাকে ভয় করা উচিত। সাবধান অন্য কোনও অবস্থায় যেন তোমাদের মৃত্যু না আসে, বরং এই অবস্থায়ই যেন আসে যে তোমরা মুসলিম।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۪
وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً
فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ
وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۰۳﴾

১০৩. আল্লাহর রশিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ এবং পরস্পরে বিভেদ করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা স্মরণ রাখ। একটা সময় ছিল, যখন তোমরা একে অন্যের শত্রু ছিলে। অত:পর আল্লাহ তোমাদের অন্তরসমূহকে জুড়ে দিলেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিল। আল্লাহ তোমাদেরকে সেখান থেকে মুক্তি দিলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা সঠিক পথে চলে আস।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰۴﴾

১০৪. তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজে বাধা দেবে। এরূপ লোকই সফলতা লাভকারী।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ﴿۱۰۵﴾

১০৫. এবং তোমরা সেই সকল লোকের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসার পরও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল ও আপসে মতভেদ সৃষ্টি করেছিল। এরূপ লোকদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি–

يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۣ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۱۰۶﴾

১০৬. সেই দিন, যে দিন কতক মুখ উজ্জ্বল হবে এবং কতক মুখ কালো হয়ে যাবে। যাদের মুখ কালো হয়ে যাবে, তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফর অবলম্বন করেছিলে?[৩৬] সুতরাং তোমরা এ শাস্তি আস্বাদন কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করতে।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ۭ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۱۰۷﴾

১০৭. পক্ষান্তরে যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে তারা আল্লাহর রহমতের ভেতর স্থান পাবে এবং তারা তাতেই সর্বদা থাকবে।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۭ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۸﴾

১০৮. এসব আল্লাহর আয়াত, যা আমি তোমাকে যথাযথভাবে পড়ে শোনাচ্ছি। আল্লাহ জগদ্বাসীর প্রতি কোনও রকম জুলুম করতে চান না।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۱۰۹﴾

১০৯. আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে সকল বিষয় ফিরে যাবে।

[১২]

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ

১১০. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা সেই শ্রেষ্ঠতম দল মানুষের কল্যাণের জন্য

---

৩৬. এটা যদি ইয়াহুদীদের সম্পর্কে হয়, তবে ঈমান দ্বারা তাওরাতের প্রতি ঈমান আনা বোঝানো হয়েছে আর মুনাফিকদের সম্পর্কে হলে ঈমান দ্বারা তাদের মৌখিক ঘোষণাকে বোঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে মুমিন বলে প্রকাশ করত। তৃতীয় সম্ভাবনা এ-ও রয়েছে যে, এর দ্বারা সেই সকল লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা কোনও সময় ঈমান আনার পর আবার মুরতাদ হয়ে গেছে। পূর্বে যেহেতু মুসলিমদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, খবরদার ইসলাম থেকে সরে যেও না, তাই এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যারা ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যায় (অর্থাৎ ইসলাম থেকে সরে যায়) আখিরাতে তাদের পরিণাম কী হবে।

بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١١٠﴾

যাদের অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। তোমরা পুণ্যের আদেশ করে থাক ও অন্যায় কাজে বাধা দিয়ে থাক এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত, তবে তাদের পক্ষে তা কতই না ভালো হত। তাদের মধ্যে কতক তো ঈমানদার, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নাফরমান।

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّاۤ اَذًى ؕ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۟ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١١١﴾

১১১. তারা অল্প-বিস্তর কষ্ট দান ছাড়া তোমাদের বিশেষ কোনও ক্ষতি কখনওই করতে পারবে না। আর তারা যদি কখনও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তবে অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে অত:পর তারা কোনও সাহায্যও লাভ করবে না।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْۤا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَ بَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿١١٢﴾ ۙ

১১২. তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাক, তাদের উপর লাঞ্ছনার ছাপ মেরে দেওয়া হয়েছে, তবে আল্লাহর তরফ থেকে যদি কোন উপায় সৃষ্টি হয়ে যায় কিংবা মানুষের পক্ষ হতে কোনও অবলম্বন বের হয়ে আসে, যা তাদেরকে পোষকতা দান করবে (তবে ভিন্ন কথা)। পরিণামে তারা আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে ফিরেছে এবং তাদের উপর অভাবগ্রস্ততা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর কারণ এই যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। (তাছাড়া) এর কারণ এই যে, তারা অবাধ্যতা করত ও সীমালংঘনে লিপ্ত থাকত।

لَيْسُوْا سَوَآءً ؕ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩. (তবে) কিতাবীদের সকলে এক রকম নয়। কিতাবীদের মধ্যেই এমন লোকও আছে যারা সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত, যারা

রাতের বেলা আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং তারা (আল্লাহর উদ্দেশে) সিজদাবনত হয়।[৩৭]

يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ ۖ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪. তারা আল্লাহ ও আখিরাত-দিবসে ঈমান রাখে, সৎকাজের আদেশ করে, অসৎকাজে নিষেধ করে এবং উত্তম কাজের দিকে ধাবিত হয়। আর এরাই সালিহীনের মধ্যে গণ্য।

وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৫. তারা যেসব ভালো কাজ করে কিছুতেই তার অমর্যাদা করা হবে না। আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۖ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١١٦﴾

১১৬. (এর বিপরীতে) যারা কুফর অবলম্বন করেছে, আল্লাহর বিপরীতে তাদের অর্থ-সম্পদ তাদের কোনও কাজে আসবে না এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও নয়। তারা জাহান্নামবাসী। তাতেই তারা সর্বদা থাকবে।

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ۗ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৭. তারা দুনিয়ার জীবনে যা-কিছু ব্যয় করে, তার দৃষ্টান্ত এ রকম, যেমন তীব্র শীতল বায়ু, যা এমন একদল লোকের শস্য-ক্ষেতে আঘাত হানে[৩৮] ও তা ধ্বংস করে দেয়, যারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করেননি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করছে।

---

৩৭. এর দ্বারা সেই সব কিতাবীদেরকে বোঝানো উদ্দেশ্য, যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল, যেমন ইয়াহুদীদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.)।

৩৮. কাফিরগণ দান-খয়রাত ইত্যাদি যা-কিছু করে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিদান তাদেরকে দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। তাদের কুফরীর কারণে তারা আখিরাতে সেসব কাজের কোনও সওয়াব পাবে না। সুতরাং তাদের সেবামূলক কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত হল শস্যক্ষেত্র আর তাদের কুফরী কাজের দৃষ্টান্ত হিমশীতল ঝড়ো হাওয়া। সেই ঝড়ো হাওয়া যেমন মনোরম শস্যক্ষেত্রকে তছনছ করে দেয়, তেমনি তাদের কুফরও তাদের সেবামূলক কার্যক্রম ধ্বংস করে দেয়।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ۖ وَدُّوا۟ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

১১৮. হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের বাইরের কোনও ব্যক্তিকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিও না। তারা তোমাদের অনিষ্ট কামনায় কোন রকম ক্রটি করে না।[৩৯] তাদের আন্তরিক ইচ্ছা তোমরা যেন কষ্ট ভোগ কর। তাদের মুখ থেকেই আক্রোশ বের হয়ে গেছে। আর তাদের অন্তরে যা-কিছু (বিদ্বেষ) গোপন আছে, তা আরও অনেক বেশি। আমি আসল কথা তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলাম– যদি তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাও!

هَٰٓأَنتُمْ أُو۟لَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَٰبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ عَضُّوا۟ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا۟ بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿١١٩﴾

১১৯. দেখ, তোমরা তো এমন যে, তোমরা তাদেরকে মহব্বত কর, কিন্তু তারা তোমাদেরকে মহব্বত করে না। আর তোমরা তো সমস্ত (আসমানী) কিতাবের উপর ঈমান রাখ, কিন্তু (তাদের অবস্থা এই যে,) তারা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা (কুরআনের উপর) ঈমান এনেছি আর যখন নিভৃতে চলে যায় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে নিজেদের আঙ্গুল কামড়ায়। (তাদেরকে) বলে দাও, তোমরা নিজেদের আক্রোশে নিজেরা মর। আল্লাহ অন্তরের গুপ্ত বিষয়ও ভালো করে জানেন।

---

৩৯. মদীনা মুনাওয়ারায় আউস ও খাযরাজ নামে যে দু'টি গোত্র বাস করত, ইয়াহুদীদের সাথে তাদের দীর্ঘকাল থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চলে আসছিল। ইসলাম গ্রহণের পরও তারা তাদের সাথে সে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলত। কিন্তু ইয়াহুদীদের অবস্থা ছিল অন্য রকম। তারা প্রকাশ্যে তো বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ করত এবং তাদের মধ্যে কিছু লোক নিজেদেরকে মুসলিম বলেও জাহির করত, কিন্তু তাদের অন্তর ছিল বিষে ভরা। তারা মুসলিমদের প্রতি চরম বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। কখনও এমনও হত যে, বন্ধুত্বের ভরসায় মুসলিমগণ সরল মনে তাদের কাছে নিজেদের কোনও গোপন কথা প্রকাশ করে দিত। আলোচ্য আয়াত তাদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দেয় যে, তারা যেন ইয়াহুদীদেরকে বিলকুল বিশ্বাস না করে এবং তাদেরকে অন্তরঙ্গ বানানো হতে বিরত থাকে।

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

১২০. তোমাদের যদি কোন কল্যাণ লাভ হয়, তবে তাদের খারাপ লাগে, পক্ষান্তরে তোমাদের যদি মন্দ কিছু ঘটে, তাতে তারা খুশী হয়। তোমরা সবর ও তাকওয়া অবলম্বন করলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। তারা যা-কিছু করছে তা সবই আল্লাহর (জ্ঞান ও শক্তির) আওতাভুক্ত।

[১৩]

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

১২১. (হে নবী! উহুদ যুদ্ধের সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন সকাল বেলা তুমি নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে মুসলিমদেরকে যুদ্ধের ঘাঁটিসমূহে মোতায়েন করেছিলে।[৪০] আর আল্লাহ তো সব কিছুই শোনেন ও জানেন।

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

১২২. যখন তোমাদেরই মধ্যকার দু'টি দল চিন্তা করছিল যে, তারা হিম্মত হারিয়ে ফেলেছে।[৪১] অথচ আল্লাহ তাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী ছিলেন। মুমিনদের তো আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত।

---

৪০. উহুদের যুদ্ধে মক্কার কাফিরদের থেকে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী মদীনায় আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে এসেছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মুকাবিলা করার জন্য উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে শিবির স্থাপন করেন। সেখানেই এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সামনের আয়াতসমূহে এ যুদ্ধেরই বিভিন্ন ঘটনার প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

৪১. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুকাবিলার উদ্দেশ্যে যখন মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের হন তখন তাঁর সঙ্গে সৈন্য সংখ্যা ছিল এক হাজার। কিন্তু মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই রাস্তা থেকে এই বলে তার তিনশ' লোককে নিয়ে ফেরত চলে যায় যে, আমাদের মত ছিল শহরের ভেতর থেকে শত্রুদের প্রতিরোধ করা। কিন্তু আপনি আমাদের মতের বিরুদ্ধে শহরের বাইরে চলে এসেছেন। কাজেই আমরা এ যুদ্ধে শরীক হব না। এ পরিস্থিতিতে খাঁটি মুসলিমদের দু'টি গোত্রও হতোদ্যম হয়ে পড়ে। একটি গোত্র বনু হারিছা, অন্যটি বনু সালিমা। তাদের অন্তরে এই ভাবনা সৃষ্টি হল যে, তিন হাজার সৈন্যের মুকাবিলায় সাতশ' লোক তো নিতান্তই কম। এরূপ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করার চেয়ে ফিরে যাওয়াই শ্রেয়। কিন্তু পরক্ষণেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করেন। ফলে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এ আয়াতে সে দিকেই ইশারা করা হয়েছে।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. আল্লাহ বদর (যুদ্ধ)-এর ক্ষেত্রে এমন অবস্থায় তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, যখন তোমরা সম্পূর্ণ সহায়-সম্বলহীন ছিলে।[৪২] সুতরাং তোমরা অন্তরে (কেবল) আল্লাহর ভয়কেই জায়গা দিও, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার।

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. (বদরের যুদ্ধকালে) যখন তুমি মুমিনদেরকে বলছিলে, তোমাদের জন্য কি এটা যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তিন হাজার ফিরিশতা পাঠিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন?

بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. নিশ্চয়ই, বরং তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তারা এই মুহূর্তে অকস্মাৎ তোমাদের কাছে এসে পড়ে, তবে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হাজার ফিরিশতাকে তোমাদের সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দেবেন, যারা তাদের বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত থাকবে।[৪৩]

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ؕ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١٢٦﴾

১২৬. আল্লাহ এ ব্যবস্থা কেবল এজন্যই করেছিলেন, যাতে তোমরা সুসংবাদ লাভ কর এবং এর দ্বারা তোমাদের অন্তরে স্বস্তি লাভ হয়। অন্যথায় বিজয় তো অন্য কারও পক্ষ থেকে নয়, কেবল

---

৪২. বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল সর্বমোট তিনশ' তেরজন। রণসামগ্রী বলতে ছিল সত্তরটি উট, দু'টি ঘোড়া এবং মাত্র আটখানা তরবারি।

৪৩. এ সবই বদর যুদ্ধের কথা। সে যুদ্ধে শুরুতে তিন হাজার ফিরিশতা পাঠানোর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সাহাবীগণ খবর পেলেন মক্কার কাফিরদের সাহায্য করার লক্ষ্যে কুর্‌য ইবনে জাবির তার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে। আগে থেকেই কাফিরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মুসলিমদের তিন গুণ। এখন যখন এই খবর পাওয়া গেল, তখন মুসলিম বাহিনী অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়ল। এহেন পরিস্থিতিতে ওয়াদা করা হল, যদি কুর্‌যের বাহিনী হঠাৎ এসেই পড়ে তবে তিন হাজারের স্থলে পাঁচ হাজার ফিরিশতা পাঠানো হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুর্‌যের বাহিনী আসেনি। তাই পাঁচ হাজার ফিরিশতা পাঠানোরও অবকাশ আসেনি।

আল্লাহর পক্ষ থেকে লাভ হয়, যিনি পরিপূর্ণ ক্ষমতারও মালিক এবং পরিপূর্ণ হিকমতেরও মালিক।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. (এবং আল্লাহ তাআলা বদরের যুদ্ধে এ সাহায্য করেছিলেন এজন্য) যাতে যে সকল লোক কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের একাংশকে খতম করে ফেলেন অথবা তাদেরকে এমন গ্লানিময় পরাজয় দান করেন, যাতে তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যায়।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. (হে নবী!) তোমার এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোন এখতিয়ার নেই যে, আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন, না তাদেরকে শাস্তি দেবেন, যেহেতু তারা জালিম।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾

১২৯. আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন আর যাকে চান শাস্তি দেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[১৪]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۪ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩০. হে মুমিনগণ! তোমরা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে সুদ খেও না এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার।[৪৪]

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿١٣١﴾

১৩১. এবং সেই আগুনকে ভয় কর, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

---

৪৪. 'আত-তাফ্সীরুল কাবীর' গ্রন্থে ইমাম রাযী (রহ.) বলেন, উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে মক্কার মুশরিকগণ সুদে ঋণ নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। তাই কোনও কোনও মুসলিমের মনে এই চিন্তা এসেছিল যে, যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য তারাও তো এ পন্থা অবলম্বন করতে পারে। এ আয়াত তাদেরকে সাবধান করছে যে, সুদে ঋণ নেওয়া সম্পূর্ণ হারাম। এস্থলে যে কয়েক গুণ বেশি সুদ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার মানে এ নয় যে, সুদের পরিমাণ অল্প হলে তা বৈধ হয়ে যাবে। আসলে সেকালে যেহেতু সুদের পরিমাণ মূলের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি হত। তাই সে হিসেবেই আয়াতে কয়েক গুণের কথা বলা হয়েছে, নয়ত সূরা বাকারায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে মূল ঋণের উপর যতটুকুই বেশি হোক না কেন তাই সুদ এবং সেটাই হারাম (দেখুন সূরা বাকারা, আয়াত নং ২৭৭–২৭৮)

وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩২. এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি রহমতের আচরণ করা হয়।

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩. এবং নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে মাগফিরাত ও সেই জান্নাত লাভের জন্য একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও, যার প্রশস্ততা এ পরিমাণ যে, তার মধ্যে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ধরে যাবে। তা সেই মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে—

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. যারা সচ্ছল অবস্থায়ও এবং অসচ্ছল অবস্থায়ও (আল্লাহর জন্য) অর্থ ব্যয় করে এবং যারা নিজের ক্রোধ হজম করতে ও মানুষকে ক্ষমা করতে অভ্যস্ত। আল্লাহ এরূপ পুণ্যবানদেরকে ভালোবাসেন।

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۪ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۪ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾

১৩৫. এবং তারা সেই সকল লোক, যারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা (অন্য কোনওভাবে) নিজেদের প্রতি জুলুম করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার ফলশ্রুতিতে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে— আর আল্লাহ ছাড়া আর কেইবা আছে, যে গুনাহ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা জেনেশুনে তাদের কৃতকর্মে অবিচল থাকে না।

اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. এরাই সেই লোক, যাদের পুরস্কার হচ্ছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে মাগফিরাত এবং সেই উদ্যানসমূহ যার তলদেশে নহর প্রবাহিত, যাতে তারা স্থায়ী জীবন লাভ করবে। তা কতই না উৎকৃষ্ট প্রতিদান, যা কর্ম সম্পাদনকারীগণ লাভ করবে।

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ

১৩৭. তোমাদের পূর্বে বহু ঘটনা ঘটে গেছে। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে

فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٣٧﴾

পরিভ্রমণ করে দেখে নাও, যারা নবীগণকে অস্বীকার করেছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছে!

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮. এসব মানুষের জন্য সুস্পষ্ট ঘোষণা। আর মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ।

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিত হয়ো না। তোমরা প্রকৃত মুমিন হলে তোমরাই বিজয়ী হবে।[৪৫]

---

৪৫. উহুদ যুদ্ধের ঘটনা সংক্ষেপে এ রকম– প্রথম দিকে মুসলিমগণ হানাদার কাফিরদের উপর জয়লাভ করেছিল এবং কাফির বাহিনী পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পঞ্চাশ জন তীরন্দাজ সৈন্যের একটি দলকে একটি টিলায় নিযুক্ত করেছিলেন। যাতে শত্রু বাহিনী পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে না পারে। যখন শত্রুরা পলায়ন করতে শুরু করল এবং যুদ্ধ ক্ষেত্র শূন্য হয়ে গেল, তখন সাহাবীগণ তাদের ফেলে যাওয়া মালামাল গনীমতরূপে কুড়াতে শুরু করলেন। তীরন্দাজ বাহিনী যখন দেখলেন শত্রুরা পলায়ন করেছে তখন তারা মনে করলেন, এখন আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে এবং এখন আমাদেরও গনীমত কুড়ানোর কাজে লেগে যাওয়া উচিত। তাদের নেতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রাযি.) এবং তাঁর আরও কিছু সঙ্গী ঘাঁটি ত্যাগ করার বিরোধিতা করলেন এবং সকলকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি আমাদেরকে সর্বাবস্থায় এ টিলায় অবস্থানরত থাকতে বলেছিলেন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই সে স্থলে অবস্থান করাকে অর্থহীন মনে করলেন এবং তারা ঘাঁটি ত্যাগ করলেন। শত্রুরা দূর থেকে যখন দেখল সে জায়গা খালি হয়ে গেছে এবং মুসলিমগণ গনীমতের মালামাল কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, তখন তারা সে সুযোগকে কাজে লাগাল এবং সেই ঘাঁটিতে হামলা চালাল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রাযি.) ও তাঁর সাথীগণ তাদের সাধ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ করতে থাকলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সকলেই শহীদ হয়ে গেলেন। অত:পর শত্রুগণ সেই টিলা থেকে নেমে আসল এবং যে সকল মুসলিম গনীমত কুড়াচ্ছিল তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাল। তাদের এ আক্রমণ এমনই অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক ছিল যে, মুসলিমদের পক্ষে তা প্রতিহত করা সম্ভব হল না। মুহূর্তের মধ্যে রণ পরিস্থিতি পাল্টে গেল। ঠিক এই সময়ে কেউ গুজব রটিয়ে দিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়ে গেছেন। এ গুজবে বহু মুসলিম উদ্যমহারা হয়ে পড়লেন। তাদের মধ্যে কতক তো ময়দান ত্যাগ করলেন এবং কতক যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি উৎসর্গিত প্রাণ সাহাবীদের একটি দল তাঁর চারপাশে অবিচল থেকে মুকাবিলা করতে থাকলেন। কাফিরদের আক্রমণ এতটাই তীব্র ছিল যে, এক পর্যায়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দাঁত শহীদ হয়ে গেল এবং মুবারক

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾

১৪০. তোমাদের যদি আঘাত লেগে থাকে, তবে তাদেরও অনুরূপ আঘাত ইত:পূর্বে লেগেছিল।[৪৬] এ তো দিন-পরিক্রমা, যা আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে বদলাতে থাকি। এর উদ্দেশ্য ছিল মুমিনদেরকে পরীক্ষা করা এবং তোমাদের মধ্যে কিছু লোককে শহীদ করা। আর আল্লাহ জালিমদেরকে ভালোবাসেন না।

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿١٤١﴾

১৪১. এবং উদ্দেশ্য ছিল এই (-ও) যে, আল্লাহ মুমিনদেরকে যাতে পরিশুদ্ধ করতে পারেন ও কাফিরদেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলেন।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾

১৪২. নাকি তোমরা মনে কর যে, তোমরা (এমনিতেই) জান্নাতে পৌঁছে যাবে, অথচ আল্লাহ এখনও পর্যন্ত তোমাদের মধ্য হতে সেই সকল লোককে যাচাই করে দেখেননি, যারা জিহাদ করবে এবং তাদেরকেও যাচাই করে দেখেননি, যারা অবিচল থাকবে।

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ

১৪৩. তোমরা নিজেরাই তো মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার আগে (শাহাদতের) মৃত্যু কামনা

চেহারা রক্ত-রঞ্জিত হয়ে গেল। একটু পরেই সাহাবায়ে কিরাম বুঝতে পারলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শহীদ হওয়ার খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা ও গুজব। তখন তাদের হুঁশ ফিরে আসল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের অধিকাংশ ময়দানে ফিরে আসলেন। অত:পর কাফিরদেরকে আবারও পলায়ন করতে হল। কিন্তু মধ্যবর্তী এই সময়ের ভেতর সত্তরজন সাহাবী শাহাদত বরণ করেন। বলার অপেক্ষা রাখে না এ ঘটনায় সাহাবীগণ ভীষণভাবে মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। তাই কুরআন মাজীদের এ আয়াতসমূহ তাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে, এটা কেবল কালের চড়াই-উতরাই। এতে হতাশ ও হতোদ্যম হওয়া উচিত নয়। সেই সঙ্গে আয়াতসমূহ এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যে, সাময়িক এ পরাজয় ছিল তাদের কিছু ভুলেরই খেসারত। এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪৬. এর দ্বারা বদর যুদ্ধের দিকে ইশারা করা হয়েছে, যাতে কাফিরদের পক্ষের সত্তর জন নিহত এবং সত্তর জন বন্দী হয়েছিল।

تَلْقَوْهُ ۖ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿١٤٣﴾

করেছিলে।[৪৭] সুতরাং এবার তোমরা তা চাক্ষুষ দেখে নিলে।

[১৫]

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَ سَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন রাসূল বৈ তো নন! তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। তাঁর যদি মৃত্যু হয়ে যায় কিংবা তাঁকে হত্যা করে ফেলা হয়, তবে কি তোমরা উল্টো দিকে ফিরে যাবে? যে-কেউ উল্টো দিকে ফিরে যাবে, সে কখনই আল্লাহর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ বান্দা, আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কার দান করবেন।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ؕ وَ سَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٥﴾

১৪৫. কোনও ব্যক্তির এখতিয়ারে নয় যে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া তার মৃত্যু আসবে, নির্দিষ্ট এক সময়ে তার আগমন লিখিত রয়েছে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতিদান চাইবে আমি তাকে তার অংশ দিয়ে দেব। আর যে ব্যক্তি আখিরাতের প্রতিদান চাইবে আমি তাকে তার অংশ দিয়ে দেব।[৪৮] আর যারা কৃতজ্ঞ, আমি শীঘ্রই তাদেরকে তাদের পুরস্কার প্রদান করব।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَاۤ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا

১৪৬. এমন কত নবী রয়েছে, যাদের সঙ্গে মিলে বহু আল্লাহওয়ালা যুদ্ধ করেছে। এর ফলে আল্লাহর পথে তাদের যে

---

৪৭. যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তারা বদর যুদ্ধের শহীদদের ফযীলত শুনে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করত যে, তাদেরও যদি শাহাদতের মর্যাদা লাভ হত!

৪৮. এর দ্বারা গনীমতের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ কেউ যদি কেবল গনীমত লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, সে গনীমত থেকে তো অংশ লাভ করবে, কিন্তু আখিরাতের সওয়াব তার অর্জিত হবে না। পক্ষান্তরে আসল নিয়ত যদি হয় আল্লাহর হুকুম পালন করা, তবে আখিরাতের সওয়াব তো সে পাবেই, বাড়তি ফায়দা হিসেবে সে গনীমতের অংশও লাভ করবে (রুহুল মাআনী)।

ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۭ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾

কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করতে হয়েছে, তাতে তারা হিম্মত হারায়নি, দুর্বল হয়ে পড়েনি এবং তারা নতি স্বীকারও করেনি। আল্লাহ এরূপ অবিচল লোকদেরকে ভালোবাসেন।

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭. তাদের মুখ থেকে যে কথা বের হয়েছিল তা এছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তারা বলছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহসমূহ এবং আমাদের দ্বারা আমাদের কার্যাবলীতে যে সীমালংঘন ঘটে গেছে তা ক্ষমা করে দিন। আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয় দান করুন।

فَاٰتٰىھُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ۭ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤٨﴾

১৪৮. সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কারও দান করলেন এবং আখিরাতের উৎকৃষ্টতর পুরস্কারও। আল্লাহ এরূপ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।

[১৬]

يٰٓاَيُّھَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓي اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯. হে মুমিনগণ! যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তোমরা যদি তাদের কথা মান, তবে তারা তোমাদেরকে তোমাদের পেছন দিকে (কুফরের দিকে) ফিরিয়ে দেবে। ফলে তোমরা উল্টে গিয়ে কঠিনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَھُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫০. (তারা তোমাদের কল্যাণকামী নয়) বরং আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী এবং তিনি শ্রেষ্ঠতম সাহায্যকারী।

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىھُمُ النَّارُ ۭ

১৫১. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, আমি অচিরেই তাদের অন্তরে ভীতি-সঞ্চার করব। কেননা তারা এমন সব জিনিসকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছে, যাদের

وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ⑮١

সম্পর্কে আল্লাহ কোনও প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। তা জালিমদের নিকৃষ্টতম ঠিকানা।

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ⑮٢

১৫২. আল্লাহ সেই সময় নিজ প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিলেন, যখন তাঁরই হুকুমে তোমরা শত্রুদেরকে হত্যা করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা দুর্বলতা প্রদর্শন করলে এবং নির্দেশ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করলে এবং যখন আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পসন্দের বস্তু[৪৯] দেখালেন, তখন তোমরা (নিজেদের আমীরের) কথা অমান্য করলে। তোমাদের মধ্যে কিছু লোক তো এমন, যারা দুনিয়া কামনা করছিল আর কিছু ছিল এমন, যারা চাচ্ছিল আখিরাত। অত:পর আল্লাহ তাদের থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন। অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল।

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰٓى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْٓ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّاۢ بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ اَصَابَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ⑮٣

১৫৩. (সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন তোমরা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিলে এবং কারও দিকে ঘুরে তাকাচ্ছিলে না আর রাসূল পিছন দিক থেকে তোমাদেরকে ডাকছিল। ফলে আল্লাহ (রাসূলকে) বেদনা (দেওয়া)-এর বদলে তোমাদেরকে (পরাজয়ের) বেদনা দিলেন, যাতে তোমরা ভবিষ্যতে বেশি দুঃখ না কর,[৫০]

---

৪৯. 'পসন্দের বস্তু' বলে গনীমতের মাল বোঝানো হয়েছে, যা দেখে অধিকাংশেই দলনেতার আদেশ অমান্য করলেন ও টিলার ঘাঁটি ছেড়ে ময়দানে নেমে আসলেন।

৫০. অর্থাৎ এ জাতীয় ঘটনার কারণে তোমাদের ভেতর পরিপক্কতা আসবে। ফলে ভবিষ্যতে কোন ক্লেশ দেখা দিলে তজ্জন্য বেশি পেরেশানী ও দুঃখ প্রকাশ না করে বরং ধৈর্য ও অবিচলতা প্রদর্শন করবে।

না সেই জিনিসের কারণে যা তোমাদের হাতছাড়া হয়েছে এবং না অন্য কোনও মসিবতের কারণে যা তোমাদের দেখা দিতে পারে। আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত।

১৫৪. অত:পর আল্লাহ তোমাদের প্রতি দুঃখের পর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন– তন্দ্রারূপে, যা তোমাদের মধ্যে কতক লোককে আচ্ছন্ন করেছিল।[৫১] আর একটি দল এমন ছিল, যাদের চিন্তা ছিল কেবল নিজেদের জান নিয়ে। তারা আল্লাহ সম্পর্কে এমন অন্যায় ধারণা করছিল, যা ছিল সম্পূর্ণ জাহিলী ধারণা। তারা বলছিল, আমাদের কোনও এখতিয়ার আছে নাকি? বলে দাও, সমস্ত এখতিয়ার কেবল আল্লাহরই। তারা তাদের অন্তরে এমন সব কথা গোপন রাখে যা তোমার কাছে প্রকাশ করে না।[৫২] তারা বলে, আমাদের যদি কিছু এখতিয়ার থাকত, তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না। বলে দাও, তোমরা যদি নিজ-গৃহেও থাকতে, তবুও কতল হওয়া যাদের নিয়তিতে লেখা আছে, তারা নিজেরাই

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ؕ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ

---

৫১. উহুদের যুদ্ধে অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের কারণে সাহাবায়ে কেরাম চরম দুঃখ ও গ্লানিতে ভুগছিলেন। শত্রু বাহিনীর প্রস্থানের পর আল্লাহ তাআলা বহু সাহাবীকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দেন। যার ফলে তাদের দুঃখ ঘুচে যায়।

৫২. এর দ্বারা মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। তারা যে, বলছিল, 'আমাদের কোন এখতিয়ার আছে না কি?' এর বাহ্য অর্থ তো ছিল, আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তির সামনে কারও কোনও এখতিয়ার চলে না। আর এটা তো সঠিক কথাই, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল অন্য, যা কুরআন মাজীদ সামনে পরিষ্কার করে দিয়েছে। তা এই যে, আমাদের কথা শোনা হলে এবং বাইরে এসে শত্রুর মুকাবিলা করার পরিবর্তে শহরের ভিতর থেকে প্রতিরোধ করা হলে এতগুলো লোকের প্রাণহানি ঘটত না।

وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۵۴﴾

বের হয়ে নিজ-নিজ বধ্যভূমিতে পৌঁছে যেত। এসব হয়েছিল এ কারণে যে, তোমাদের বক্ষ দেশে যা-কিছু আছে আল্লাহ তা পরীক্ষা করতে চান এবং যা-কিছু তোমাদের অন্তরে আছে, তার ময়লা দূর করতে চান।[৫৩] আল্লাহ অন্তরের ভেদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۵۵﴾

১৫৫. উভয় বাহিনীর পারস্পরিক সংঘর্ষের দিন তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, প্রকৃতপক্ষে শয়তান তাদেরকে কিছু কৃতকর্মের কারণে পদস্খলনে লিপ্ত করেছিল।[৫৪] নিশ্চিত জেনে রেখ আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

[১৭]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۵۶﴾

১৫৬. হে মুমিনগণ! সেই সব লোকের মত হয়ে যেও না, যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং তাদের ভাইয়েরা যখন কোনও দেশে সফর করে কিংবা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, তখন তাদের সম্পর্কে তারা বলে, তারা আমাদের সঙ্গে থাকলে মারা যেত না এবং নিহতও হত না। (তাদের এ কথার) পরিণাম তো (কেবল) এই যে, এরূপ কথাকে আল্লাহ তাদের অন্তরের আক্ষেপে পরিণত করেন। (নচেৎ) জীবন ও মৃত্যু তো আল্লাহই দেন। আর তোমরা যে কর্মই কর, আল্লাহ তা দেখছেন।

---

৫৩. ইশারা করা হয়েছে যে, এ রকম মসিবতের দ্বারা ঈমান পরিপক্ক হয় এবং অভ্যন্তরীণ রোগ-ব্যাধি দূর হয়।

৫৪. অর্থাৎ যুদ্ধের আগে তাদের দ্বারা এমন কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছিল, যা দেখে শয়তান উৎসাহী হয় এবং তাদেরকে আরও কিছু ত্রুটিতে লিপ্ত করে দেয়।

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭. তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও বা মারা যাও, তবুও আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্তব্য মাগফিরাত ও রহমত সেইসব বস্তু হতে ঢের শ্রেয়, যা তারা সঞ্চয় করছে।

وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮. তোমরা যদি মারা যাও বা নিহত হও, তবে তোমাদেরকে আল্লাহরই কাছে নিয়ে একত্র করা হবে।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۠ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. (হে নবী!) এসব ঘটনার পর এটা আল্লাহর রহমতই ছিল, যদ্দরুণ তুমি মানুষের সাথে কোমল আচরণ করেছ। তুমি যদি রূঢ় প্রকৃতির ও কঠোর হৃদয় হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে গিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা কর, তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ কর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করতে থাক। অত:পর তুমি যখন কোন বিষয়ে মতস্থির করে সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহর উপর নির্ভর করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালোবাসেন।

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬০. আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করলে কেউ তোমাদেরকে পরাস্ত করতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমাকে একা ছেড়ে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাকে সাহায্য করবে? মুমিনদের উচিত কেবল আল্লাহরই উপর ভরসা করা।

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ؕ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا

১৬১. এটা কোনও নবীর পক্ষে সম্ভব নয় যে, গনীমতের সম্পদে খেয়ানত

غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦١﴾

করবে।[৫৫] যে-কেউ খেয়ানত করবে, সে কিয়ামতের দিন সেই মাল নিয়ে উঠবে, যা সে খেয়ানতের মাধ্যমে হস্তগত করেছিল। অত:পর প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান দেওয়া হবে এবং কারও প্রতি জুলুম করা হবে না।

اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ مَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦٢﴾

১৬২. তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসরণ করে, সে কি ওই ব্যক্তির মত হতে পারে যে, আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিয়ে ফিরেছে আর যার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম; যা অতি নিকৃষ্ট ঠিকানা?

هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. আল্লাহর নিকট তারা বিভিন্ন স্তরবিশিষ্ট। তারা যা-কিছু করে আল্লাহ তা ভালোভাবেই দেখেন।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অতি বড় অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও এর আগে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল।

اَوَ لَمَّاۤ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ

১৬৫. যখন তোমরা এমন এক মসিবতে আক্রান্ত হলে, যার দ্বিগুণ মসিবতে তোমরা (শত্রুদেরকে) আক্রান্ত করেছ,[৫৬]

---

৫৫. এস্থলে একথা বলার কারণ সম্ভবত এই যে, গনীমতের মালামাল সংগ্রহের জন্য এত তাড়াহুড়া করার দরকার ছিল না। কেননা যুদ্ধে যে সম্পদ অর্জিত হত, তা যে-ই কুড়াক না কেন, শেষ পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই শরয়ী বিধান অনুসারে তা বণ্টন করতেন। প্রত্যেকে তার অংশ যথাযথভাবে পেয়ে যেত। কেননা কোনও নবী গনীমতের মালে খেয়ানত করতে পারে না।

৫৬. বদরের যুদ্ধের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। তাতে কুরাইশ-কাফিরদের সত্তর জন লোক কতল হয়েছিল এবং সত্তর জন বন্দী হয়েছিল। অপর দিকে উহুদের যুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষে সত্তর

قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۱۶۵﴾

তখন কি তোমরা এরূপ কথা বল যে, এ মসিবত কোথা হতে এসে গেল? বল, এটা তোমাদের নিজেদের থেকেই এসেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

وَمَاۤ اَصَابَكُمْ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِیَعْلَمَ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۱۶۶﴾

১৬৬. উভয় বাহিনীর পারস্পরিক সংঘর্ষের দিন তোমাদের যে বিপদ ঘটেছিল, তা আল্লাহর হুকুমেই ঘটেছিল, যাতে তিনি মুমিনদেরকেও পরখ করে দেখতে পারেন।

وَلِیَعْلَمَ الَّذِیْنَ نَافَقُوْا ۚۖ وَقِیْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ یَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِیْمَانِ ۚ یَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَیْسَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا یَكْتُمُوْنَ ﴿۱۶۷﴾

১৬৭. এবং দেখতে পারেন মুনাফিক-দেরকেও। আর তাদেরকে (মুনাফিক-দেরকে) বলা হয়েছিল, এসো, আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর কিংবা প্রতিরোধ কর। তখন তারা বলেছিল, 'আমরা যদি দেখতাম (যুদ্ধের মত) যুদ্ধ হবে, তবে অবশ্যই তোমাদের পেছনে চলতাম।'[৫৭] সে দিন (যখন তারা একথা বলছিল) তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরেরই বেশি নিকটবর্তী ছিল। তারা তাদের মুখে এমন কথা বলে, যা তাদের অন্তরে থাকে না।[৫৮] তারা যা-কিছু লুকায় আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন।

জন শহীদ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাদের কেউ বন্দী হননি। এ হিসেবে বদরে মুসলিমগণ কাফিরদের যে ক্ষয়ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছিল, তা উহুদে কাফিরগণ তাদের যে ক্ষয়ক্ষতি করেছে তার দ্বিগুণ ছিল।

৫৭. তারা বলতে চাচ্ছিল যে, এটা সমানে-সমানে যুদ্ধ হলে আমরা অবশ্যই এতে শরীক হতাম, কিন্তু এটাতো অসম যুদ্ধ। শত্রুসংখ্যা তিন গুণেরও বেশি। কাজেই এটা যুদ্ধ নয়, আত্মহত্যা। এতে আমরা শরীক হতে পারি না।

৫৮. অর্থাৎ মুখে তো বলত অসম যুদ্ধ না হলে আমরা অবশ্যই শরীক হতাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের বাহানা মাত্র। আসলে তাদের মনের কথা হল যে, সসম যুদ্ধ হলেও তারা অংশগ্রহণ করত না।

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾

১৬৮. তারা সেই লোক, যারা নিজেদের (শহীদ) ভাইদের সম্পর্কে বসে বসে মন্তব্য করে যে, তারা যদি আমাদের কথা শুনত, তবে কতল হত না। বলে দাও, তোমরা সত্যবাদী হলে খোদ নিজেদের থেকেই মৃত্যুকে হটিয়ে দাও তো দেখি!

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯. এবং (হে নবী!) যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনওই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত। তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রিযিক দেওয়া হয়।

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾

১৭০. আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা-কিছু দিয়েছেন, তারা তাতে প্রফুল্ল। আর তাদের পরে এখনও যারা (শাহাদতে) তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি, তাদের ব্যাপারে এ কারণে তারা আনন্দ বোধ করে যে, (তারা যখন তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হবে, তখন) তাদের কোনও ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

১৭১. তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের কারণেও আনন্দ উদযাপন করে এবং এ কারণেও যে, আল্লাহ মুমিনদের কর্মফল নষ্ট করেন না।

[১৮]

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾

১৭২. যারা যখম হওয়ার পরও আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে আনুগত্যের সাথে সাড়া দিয়েছে, এরূপ সৎকর্মশীল ও মুত্তাকীদের জন্য আছে মহা প্রতিদান।

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ۖ وَقَالُوا حَسْبُنَا

১৭৩. যাদেরকে লোকে বলেছিল, (মক্কার কাফির) লোকেরা তোমাদের (সাথে যুদ্ধ করার) জন্য (পুনরায়) একত্র হয়েছে, সুতরাং তাদেরকে ভয় করো। তখন এটা

اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٣﴾

(এই সংবাদ) তাদের ঈমানের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং তারা বলে ওঠে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।[৫৯]

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿١٧٤﴾

১৭৪. পরিণামে তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে এভাবে ফিরে আসল যে, বিন্দুমাত্র অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহ যাতে খুশী হন তার অনুসরণ করেছে। বস্তুত আল্লাহ মহা অনুগ্রহের মালিক।

---

৫৯. মক্কার কাফিরগণ উহুদের যুদ্ধ থেকে ফিরে যাওয়ার সময় রাস্তায় এই বলে পস্তাতে লাগল যে, যুদ্ধে জয়লাভ করা সত্ত্বেও আমরা অহেতুক ফিরে আসলাম। আমরা আরেকটু অগ্রসর হলে তো সমস্ত মুসলিমকেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারতাম। এই চিন্তা করে তারা পুনরায় মদীনা মুনাওয়ারার দিকে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা করল। অন্য দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্ভবত তাদের এ ইচ্ছা সম্পর্কে অবহিত হয়ে অথবা উহুদ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের ইচ্ছায় পর দিন ভোরে ঘোষণা করে দিলেন যে, আমরা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবণের উদ্দেশ্যে বের হব আর এতে আমাদের সঙ্গে কেবল তারাই যাবে, যারা উহুদের যুদ্ধে শরীক ছিল। সাহাবায়ে কেরাম যদিও উহুদের যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত ও ক্লান্ত-শ্রান্ত ছিলেন, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ডাকে সাড়া দিতে তারা এক মুহূর্ত দেরি করলেন না। এ আয়াতে তাদের সে আত্মোৎসর্গেরই প্রশংসা করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে পৌঁছলে সেখানে বনু খুযাআর এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়। তার নাম ছিল মা'বাদ। কাফির হওয়া সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তার সহানুভূতি ছিল। এ সময় মুসলিমদের উদ্যম ও সাহসিকতা তার নজর কাড়ে। অত:পর সে আরও সামনে অগ্রসর হলে আবু সুফিয়ানসহ অন্যান্য কুরাইশ নেতাদের সঙ্গে তার সাক্ষাত হল। তখন সে তাদেরকে মুসলিম সৈন্যদের উদ্দীপনা ও সাহসিকতার কথা জানাল এবং পরামর্শ দিল যে, তাদের উচিত মদীনায় গিয়ে হামলা করার পরিকল্পনা ত্যাগ করে মক্কায় ফিরে যাওয়া। এতে কাফিরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার হল। ফলে তারা ওয়াপস চলে গেল। কিন্তু যাওয়ার সময় তারা আবদুল কায়স গোত্রের মদীনাগামী এক কাফেলাকে বলে গেল যে, পথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তাদের সাক্ষাত হলে যেন জানিয়ে দেয়, আবু সুফিয়ান এক বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করেছে এবং সে মুসলিমদের নিপাত করার জন্য আক্রমণ চালাতে আসছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করা। সেমতে এ কাফেলা হামরাউল আসাদে পৌঁছে যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত পেল তখন তাঁকে একথা বলল। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম তাতে ভয় তো পেলেনই না, উল্টো তাঁরা সেই কথা শুনিয়ে দিলেন, যা প্রশংসার সাথে আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

১৭৫. প্রকৃতপক্ষে সে তো শয়তান, যে তার বন্ধুদের সম্পর্কে ভয় দেখায়। সুতরাং তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক, তবে তাদেরকে ভয় করো না। বরং কেবল আমাকেই ভয় কর।

وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْـًٔا ۗ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْءَاخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾

১৭৬. এবং (হে নবী!) যারা কুফরীতে একে অন্যের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে দাপট দেখাচ্ছে, তারা যেন তোমাকে দুঃখে না ফেলে। নিশ্চিত জেন, তারা আল্লাহর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ চান আখিরাতে যেন তাদের কোন অংশ না থাকে। তাদের জন্য মহা শাস্তি (প্রস্তুত) রয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَٰنِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْـًٔا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾

১৭৭. যারা ঈমানের বদলে কুফর খরিদ করেছে, তারা কখনওই আল্লাহর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের জন্য (প্রস্তুত) রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٧٨﴾

১৭৮. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা যেন কিছুতেই মনে না করে আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিয়েছি তাদের পক্ষে তা ভালো জিনিস। প্রকৃতপক্ষে আমি তাদেরকে অবকাশ দেই কেবল এ কারণে, যাতে তারা পাপাচারে আরও অগ্রগামী হয় এবং (পরিশেষে) তাদের জন্য আছে এমন শাস্তি, যা তাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।

مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ

১৭৯. আল্লাহ্ এরূপ করতে পারেন না যে, তোমরা এখন যে অবস্থায় আছো মুমিনদেরকে সে অবস্থায়ই রেখে দেবেন, যতক্ষণ না তিনি পবিত্র হতে অপবিত্রকে পৃথক করে দেন এবং (অপর দিকে)

اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٩﴾

তিনি এরূপও করতে পারেন না যে, তোমাদেরকে (সরাসরি) গায়বের বিষয় জানিয়ে দেবেন। হাঁ, তিনি (যতটুকু জানানো দরকার মনে করেন, তার জন্য) নিজ নবীগণের মধ্য হতে যাকে চান বেছে নেন।[৬০] সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা বিশ্বাস রাখ ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে মহা প্রতিদানের উপযুক্ত হবে।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ

১৮০. আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহে (সম্পদে) যারা কৃপণতা করে, তারা যেন কিছুতেই মনে না করে এটা তাদের জন্য ভালো কিছু। বরং এটা তাদের পক্ষে অতি মন্দ। যে সম্পদের ভেতর তারা কৃপণতা করে, কিয়ামতের দিন তাকে তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে দেওয়া হবে।[৬১]

---

৬০. ১৭৬ নং আয়াত থেকে ১৭৮ নং আয়াত পর্যন্ত এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরগণ আল্লাহ তাআলার অপ্রিয় হলে দুনিয়ায় তারা আরাম-আয়েশের জীবন লাভ করে কেন? উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, আখিরাতে যেহেতু তাদের কোনও অংশ নাই, তাই দুনিয়ায় তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে তারা আরও বেশি গুনাহ কামাই করে এবং তারা তাই করছে। একটা সময় আসবে, যখন তাদেরকে একত্র করে আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। ১৭৯ নং আয়াতে এর বিপরীতে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, মুসলিমগণ আল্লাহ তাআলার প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তাদের উপর এত বিপদ কেন? তার এক উত্তর এ আয়াতে এই দেওয়া হয়েছে যে, মুসলিমদের জন্য এটা পরীক্ষা। এ পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্য ঈমানের দাবীতে কে খাঁটি এবং কে ভেজাল এটা পরিষ্কার করে দেওয়া! আল্লাহ তাআলা এটা পরিষ্কার না করা পর্যন্ত মুসলিমদেরকে আপন অবস্থায় রেখে দিতে পারেন না। বস্তুত কে ঈমানে অটল থাকে আর কে টলে যায় তার পরিচয় বিপদের সময়ই পাওয়া যায়। এর উপর প্রশ্ন হতে পারত যে, আল্লাহ মুসলিমদেরকে বিপদে ফেলা ছাড়াই কেন এ বিষয়টি জানিয়ে দেন না? এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা গায়বের বিষয় প্রত্যেককে জানান না। বরং যতটুকু জানাতে চান তা নিজ নবীকে জানিয়ে দেন। তাঁর হিকমতের দাবি হচ্ছে, মুসলিমগণ মুনাফিকদের দুষ্কর্ম নিজেদের চোখে দেখে নিক ও তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিক। সে কারণেই এসব বিপদ-আপদ আসে। এর আরও তাৎপর্য সামনে ১৮৫ ও ১৮৬ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

৬১. যে কৃপণতাকে হারাম করা হয়েছে, তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা যে ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয়ের আদেশ করেছেন, সে ক্ষেত্রে ব্যয় না করা, যেমন যাকাত না দেওয়া। এর দ্বারা মানুষ যে সম্পদ

وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝١٨٠

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর মীরাছ কেবল আল্লাহরই জন্য। তোমরা যা-কিছুই কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

[১৯]

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّ نَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝١٨١

১৮১. আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলে, আল্লাহ গরীব এবং আমরা ধনী।[৬২] আমি তাদের একথাও (তাদের আমলনামায়) লিখে রাখি এবং তারা নবীগণকে অন্যায়ভাবে যে হত্যা করেছে সেটাও। অত:পর আমি বলব, জ্বলন্ত আগুনের স্বাদ গ্রহণ কর।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝١٨٢

১৮২. এসব তোমাদের নিজ হাতের কামাই, যা তোমরা সম্মুখে প্রেরণ করেছিলে। নয়ত আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন।

اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ؕ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِىْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِىْ

১৮৩. এরা সেই লোক, যারা বলে, আল্লাহ আমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, আমরা কোনও নবীর প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনব না, যতক্ষণ না সে আমাদের কাছে এমন কোন কুরবানী উপস্থিত করবে, যাকে আগুন গ্রাস করবে।[৬৩] তুমি বল,

---

রক্ষা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে বেড়ি বানিয়ে তার গলায় পরিয়ে দেওয়া হবে। হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাখ্যা করেন যে, এরূপ সম্পদকে বিষাক্ত সাপ বানিয়ে তার গলায় জড়িয়ে দেওয়া হবে। সে সাপ তার গলা কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ! আমি তোমার সঞ্চিত ধনভাণ্ডার।

৬২. যাকাত ও অন্যান্য অর্থ-ব্যয় সংক্রান্ত বিধানাবলী নাযিল হলে ইয়াহূদীরা এ জাতীয় ধৃষ্ঠতামূলক উক্তি করেছিল। বলাবাহুল্য এ রকম বিশ্বাস তো তাদেরও ছিল না যে, আল্লাহ তাআলা গরীব- নাউযুবিল্লাহ। আসলে তারা এসব বলে যাকাতের বিধানকে উপহাস ও ব্যঙ্গ করত। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের এ বেহুদা কথার কোনও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। বরং এ চরম বেয়াদবীর কারণে তিনি তাদেরকে শাস্তির সতর্কবাণী শুনিয়ে দিয়েছেন।

৬৩. পূর্ববর্তী নবীগণের সময়ে নিয়ম ছিল, কোনও ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে যখন কোনও পশু কুরবানী করত, তখন তাদের জন্য তা খাওয়া হালাল হত না; বরং

قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٨٣﴾

আমার আগেও তোমাদের নিকট বহু নবী সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল এবং সেই জিনিস নিয়েও যার কথা তোমরা (আমাকে) বলছ। তা সত্ত্বেও তোমরা তাদেরকে হত্যা করলে কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿١٨٤﴾

১৮৪. (হে নবী!) তথাপি যদি তারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে (এটা নতুন কোন বিষয় নয়) তোমার আগেও এমন বহু নবীকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, যারা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীও নিয়ে এসেছিল এবং লিখিত সহীফা ও এমন কিতাবও, যা ছিল (সত্যকে) আলোকিতকারী।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٥﴾

১৮৫. প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং তোমাদের সকলকে (তোমাদের কর্মের) পুরোপুরি প্রতিদান কেবল কিয়ামতের দিনই দেওয়া হবে। অত:পর যাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সফলকাম হবে। আর (জান্নাতের বিপরীতে) এই পার্থিব জীবন তো প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়।

তারা সে পশু যবাহ করে মাঠে বা টিলায় রেখে আসত। অত:পর আল্লাহ তাআলা সে কুরবানী কবুল করলে আসমান থেকে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। তাকে 'দাহ্য কুরবানী' বলা হত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়তে সে নিয়ম রহিত করে দেওয়া হয়েছে। এখন কুরবানীর গোশত হালাল। ইয়াহুদীরা বলেছিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু এরূপ কুরবানী নিয়ে আসেননি, তাই আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনতে পারি না। আসলে এটা ছিল তাদের কালক্ষেপণের এক বাহানা। ঈমান আনার কোন উদ্দেশ্য তাদের আদৌ ছিল না। তাই তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অতীতে এসব নিদর্শন তো তোমাদের কাছে এসেছিল। তখনও তোমরা ঈমান আননি; বরং নবীগণকে হত্যা করেছিলে।

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۖ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٨٦﴾

১৮৬. (হে মুসলিমগণ!) তোমাদেরকে তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও জীবনের ব্যাপারে (আরও) পরীক্ষা করা হবে এবং তোমরা 'আহলে কিতাব' ও 'মুশরিক' উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে অনেক পীড়াদায়ক কথা শুনবে। তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে নিশ্চয়ই এটা অতি বড় হিম্মতের কাজ (যা তোমাদেরকে অবলম্বন করতেই হবে)।

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ ۫ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ﴿١٨٧﴾

১৮৭. আর (সেই সময়ের কথা তাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়) যখন আল্লাহ 'আহলে কিতাব' থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমরা এ কিতাবকে অবশ্যই মানুষের সামনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং এটা গোপন করবে না। অত:পর তারা এ প্রতিশ্রুতিকে তাদের পেছন দিকে ছুড়ে মারে এবং এর বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য অর্জন করে। কতই না মন্দ সেই জিনিস, যা তারা ক্রয় করছে।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨٨﴾

১৮৮. তোমরা কিছুতেই মনে করো না যে, যারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর বড় খুশী আর যে কাজ করেনি তার জন্য প্রশংসার আশাবাদী, এরূপ লোকদের সম্পর্কে কিছুতেই মনে করো না যে, তারা শাস্তি হতে আত্মরক্ষায় সফল হবে। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (প্রস্তুত) রয়েছে।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٨٩﴾

১৮৯. আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহরই। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

[২০]

১৯০. নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃজনে ও রাত-দিনের পালাক্রমে আগমনে বহু নিদর্শন আছে ঐ সকল বুদ্ধিমানদের জন্য-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

১৯১. যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে (এবং তা লক্ষ্য করে বলে ওঠে)- হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এসব উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। আপনি এমন (ফজুল) কাজ থেকে পবিত্র। সুতরাং আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

১৯২. হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যাকেই জাহান্নামে দাখিল করবেন, তাকে নিশ্চিতভাবেই লাঞ্ছিত করলেন। আর জালিমগণ তো কোনও রকমের সাহায্যকারী পাবে না।

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهٗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾

১৯৩. হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক ঘোষককে ঈমানের দিকে ডাক দিতে শুনেছি যে, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন।' সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। কাজেই হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন, আমাদের মন্দসমূহ আমাদের থেকে মিটিয়ে দিন এবং আমাদেরকে পুণ্যবানদের মধ্যে শামিল করে নিজের কাছে ডেকে নিন।

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

১৯৪. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সেই সবকিছু দান করুন, যার প্রতিশ্রুতি

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ

الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿۱۹۴﴾

আপনি নিজ রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে দিয়েছেন। আমাদেরকে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি কখনও প্রতিশ্রুতির বিপরীত করেন না।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَ قٰتَلُوْا وَ قُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿۱۹۵﴾

১৯৫. সুতরাং তাদের প্রতিপালক তাদের দু'আ কবুল করলেন এবং (বললেন,) আমি তোমাদের মধ্যে কারও কর্মফল নষ্ট করব না, তাতে সে পুরুষ হোক বা নারী। তোমরা পরস্পরে একই রকম। সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং তাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, আমার পথে উৎপীড়ন করা হয়েছে এবং (দ্বীনের জন্য) তারা যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের সকলের দোষ-ত্রুটি মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে অবশ্যই এমন সব উদ্যানে দাখিল করব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। এসব কিছু আল্লাহর পক্ষ হতে পুরস্কারস্বরূপ হবে। বস্তুত আল্লাহরই কাছে আছে উৎকৃষ্ট পুরস্কার।

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ۟ؕ ﴿۱۹۶﴾

১৯৬. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, দেশে দেশে তাদের (সাচ্ছন্দ্যপূর্ণ) বিচরণ যেন তোমাকে কিছুতেই ধোঁকায় না ফেলে।

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۫ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۱۹۷﴾

১৯৭. এটা সামান্য ভোগ (যা তারা লুটছে) অত:পর তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, যা নিকৃষ্টতম বিছানা।

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ

১৯৮. কিন্তু যারা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে চলে তাদের জন্য আছে এমন সব উদ্যান, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। আল্লাহর পক্ষ হতে

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

আতিথেয়তা স্বরূপ তারা সর্বদা সেখানে থাকবে। আর আল্লাহর কাছে যা-কিছু আছে, পুণ্যবানদের জন্য তা কতই না শ্রেয়।

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

১৯৯. নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যেও এমন লোক আছে, যারা আল্লাহর সম্মুখে বিনয় প্রদর্শনপূর্বক আল্লাহর প্রতিও ঈমান রাখে এবং সেই কিতাবের প্রতিও, যা তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে আর সেই কিতাবের প্রতিও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল। আর আল্লাহর আয়াতসমূহকে তারা তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে না। এরাই তারা, যারা তাদের প্রতিপালকের কাছে নিজেদের প্রতিদানের উপযুক্ত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٢٠٠﴾

২০০. হে মুমিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মুকাবিলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষার জন্য স্থিত হয়ে থাক।[৬৪] আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

---

৬৪. কুরআনী পরিভাষায় 'সবর' শব্দের অর্থ অতি ব্যাপক। এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা আছে, যথা– আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে অবিচলতা প্রদর্শন করা, গুনাহ হতে বেঁচে থাকার জন্য মনের ইচ্ছা ও চাহিদাকে দমন করা এবং কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা। এস্থলে এ তিনও প্রকার সবরের হুকুম করা হয়েছে। সীমান্ত রক্ষা বলতে যেমন ভৌগলিক সীমানাকে বোঝায়, তেমনি চিন্তাধারাগত সীমানাও। উভয় প্রকার সীমান্তই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই সকল বিধানের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে সূরা আলে-ইমরানের তরজমা ও ব্যাখ্যার কাজ আজ বুধবার ১৮ই রজব ১৪২৬ হিজরী মোতাবেক ২৪ আগস্ট ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ সমাপ্ত হল। [অনুবাদ শেষ হল আজ রোববার ২৮ শাওয়াল ১৪৩০ হিজরী মোতাবেক ১৮ অক্টোবর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ] আল্লাহ তাআলা অবশিষ্টাংশও নিজ মরজি মোতাবেক সহজে সমাপ্ত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সূরা নিসা

পরিচিতি

মদীনা মুনাওয়ারায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরত করে আসার পর প্রাথমিক বছরগুলোতে এ সূরা নাযিল হয়। এর বেশির ভাগই নাযিল হয়েছিল বদর যুদ্ধের পর। এটা সেই সময়ের কথা, যখন মদীনা মুনাওয়ারার সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রটি নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন ছিল। জীবনের এক নতুন কাঠামো প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল এবং তার জন্য মুসলিমদের নিজেদের ইবাদত, আখলাক ও সমাজব্যবস্থা সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধি-বিধান ও পথ-নির্দেশের প্রয়োজন ছিল। শত্রুশক্তি ইসলামের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছিল। ফলে নিজেদের ভৌগলিক ও চিন্তা-চেতনাগত সীমারেখার সংরক্ষণের জন্য মুসলিমদের নিত্য-নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। সূরা নিসা এই যাবতীয় বিষয়ে বিস্তারিত পথ-নির্দেশ পেশ করেছে। যেহেতু যে-কোনও সমাজের বুনিয়াদ স্থাপিত হয় এক মজবুত পারিবারিক কাঠামোর উপর। তাই এ সূরা পারিবারিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত বিধি-নিষেধের বর্ণনা দ্বারা শুরু হয়েছে। পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলায় যেহেতু নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, তাই নারীদের সম্পর্কে এ সূরায় বিস্তারিত আহকাম পেশ করা হয়েছে। এ কারণেই এ সূরার নাম হয়েছে সূরা নিসা। উহুদ যুদ্ধের পর বহু নারী বিধবা ও বহু শিশু ইয়াতীম হয়ে গিয়েছিল। তাই এ সূরা শুরুতেই ইয়াতীমদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে এবং ১৪ নং আয়াত পর্যন্ত মীরাছ সম্পর্কে বিস্তারিত আহকাম বর্ণনা করেছে।

জাহিলী যুগে নারীর প্রতি নানা রকম জুলুম ও অবিচার করা হত। এ সূরায় একেকটি করে সেসব জুলুমকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সমাজ থেকে তা নির্মূল করার ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বিবাহ ও তালাক সম্পর্কে বিস্তারিত বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে এবং স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার স্থির করে দেওয়া হয়েছে। আয়াত নং ৩৫ পর্যন্ত এসব বিষয় আলোচিত হওয়ার পর মানুষের অভ্যন্তরীণ ও সামাজিক সংস্কারের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

মরুভূমি প্রধান আরবে সফর করতে গিয়ে মুসলিমগণ পানি সংকটের সম্মুখীন হত। তাই ৪৩ নং আয়াতে তায়াম্মুমের নিয়ম এবং ১০১ নং আয়াতে সফরকালে সালাত কসর করার সহূলত (সুবিধা) প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া জিহাদকালে ভীতি অবস্থার সালাত (সালাতুল খাওফ)-এর বিধান বর্ণনায় ১০২ ও ১০৩ নং আয়াত নাযিল হয়েছে।

মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাসকারী ইয়াহুদীগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের এক অনিঃশেষ সিলসিলা চালু রেখেছিল। ৪৪ থেকে ৫৭ ও ১৫৩ থেকে ১৭৫ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে তাদের দুষ্কর্মসমূহ উম্মোচিত করা হয়েছে এবং তাদেরকে সঠিক পথে চলে আসতে উৎসাহিত করা হয়েছে। ১৭১ থেকে ১৭৫ নং আয়াতে তাদের সাথে খ্রিস্টান সম্প্রদায়কেও যুক্ত করা হয়েছে এবং তাদেরকে সম্বোধন করে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, তারা যেন ত্রিত্ববাদের আকীদা পরিত্যাগ করে খাঁটি তাওহীদের আকীদা গ্রহণ করে নেয়।

৫৮ ও ৫৯ নং আয়াতে রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে পথ-নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপর ৬০-৭০ ও ১৩৭-১৫২ নং আয়াতে মুনাফিকদের দুষ্কর্মসমূহের ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে।

৭১ থেকে ৯৬ পর্যন্ত আয়াতসমূহে জিহাদ সংক্রান্ত আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেই প্রসঙ্গে মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে। মাঝখানে ৯২ ও ৯৩ নং আয়াতে অন্যায় হত্যার শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে।

যে সকল মুসলিম মক্কা মুকাররমায় থেকে গিয়েছিল ও কাফিরদের হাতে নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছিল ৯৭ থেকে ১০০ পর্যন্ত আয়াতসমূহে তাদের হিজরত সংক্রান্ত মাসাইল বর্ণিত হয়েছে। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের থেকে মীমাংসা লাভের জন্য তার সম্মুখে বিভিন্ন বিষয়ে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছিল। ১০৫ থেকে ১১৫ পর্যন্ত আয়াতসমূহে তাঁকে সে বিষয়ে ফায়সালার নিয়ম জানানো হয়েছে এবং মুসলিমদেরকে জোর তাকীদ করা হয়েছে, তারা যেন তাঁর ফায়সালাকে মনে-প্রাণে মেনে নেয়।

১১৬ থেকে ১২৬ পর্যন্ত আয়াতসমূহে তাওহীদের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম পারিবারিক নিয়ম-নীতি ও মীরাছ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চেয়েছিলেন। ১২৭ থেকে ১২৯ ও ১৭৬ নং আয়াতে সেসব জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়া হয়েছে।

মোদ্দাকথা এই সম্পূর্ণ সূরাটিই বিভিন্ন বিষয়ের আহকাম ও শিক্ষা দ্বারা পরিপূর্ণ। প্রথমে যে তাকওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে, বলা যেতে পারে পূর্ণ সূরাটি তারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করেছে।

৩– সূরা নিসা, মাদানী–৯২

سُوۡرَةُ النِّسَآءِ مَدَنِيَّةٌ

এ সূরায় একশ' ছিয়াত্তরটি আয়াত ও চব্বিশটি রুকূ আছে।

اٰيَاتُهَا ١٧٦ رُكُوۡعَاتُهَا ٢٤

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

১. হে লোক সকল! নিজ প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে এবং তারই থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার অছিলা দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে নিজেদের হক চেয়ে থাক।[১] এবং আত্মীয়দের (অধিকার খর্ব করা)কে ভয় কর। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ তোমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখছেন।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوۡا رَبَّكُمُ الَّذِيۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالًا كَثِيۡرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيۡ تَسَآءَلُوۡنَ بِهٖ وَالۡاَرۡحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيۡبًا ①

২. ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ দিয়ে দাও আর ভালো মালকে মন্দ মাল দ্বারা পরিবর্তন করো না। আর তাদের (ইয়াতীমদের) সম্পদকে নিজেদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে খেও না।[২] নিশ্চয়ই এটা অতি বড় গুনাহ।

وَاٰتُوا الۡيَتٰمٰۤى اَمۡوَالَهُمۡ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الۡخَبِيۡثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَهُمۡ اِلٰۤى اَمۡوَالِكُمۡ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوۡبًا كَبِيۡرًا ②

---

১. দুনিয়ায় মানুষ যখন একে অন্যের কাছে নিজের প্রাপ্য অধিকার দাবী করে, তখন অধিকাংশ সময়ই বলে থাকে, 'আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি আমাকে আমার পাওনা মিটিয়ে দাও।' আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বলছেন যে, তোমরা যখন নিজেদের হক ও প্রাপ্য অধিকারসমূহের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে অছিলা বানাও তখন অন্যদের হক আদায়ের ব্যাপারেও আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর এবং মানুষের সর্বপ্রকার হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করে দাও।

২. কেউ মারা গেলে তার মীরাছে তার ইয়াতীম সন্তানদেরও অংশ থাকে। কিন্তু বয়স কম হওয়ার কারণে সে সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করা হয় না; তাদের যারা অভিভাবক থাকে, যেমন চাচা, ভাই প্রমুখ তারা ইয়াতীম শিশু সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তাদের অংশ আমানত হিসেবে নিজেদের হেফাজতে রাখে। এ আয়াতে সেই অভিভাবকদেরকে তিনটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (ক) ইয়াতীম শিশু যখন সাবালক হয়ে যায়, তখন বিশ্বস্ততার সাথে তাদের সে আমানত তাদের বুঝিয়ে দাও। (খ) তোমরা এরূপ অবিশ্বস্ততার কাজ করো না যে, তারা তো

وَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تُقۡسِطُوۡا فِی الۡیَتٰمٰی فَانۡکِحُوۡا مَا طَابَ لَکُمۡ مِّنَ النِّسَآءِ مَثۡنٰی وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ۚ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تَعۡدِلُوۡا فَوَاحِدَۃً اَوۡ مَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُکُمۡ ؕ ذٰلِکَ اَدۡنٰۤی اَلَّا تَعُوۡلُوۡا ؕ﴿۳﴾

৩. তোমরা যদি আশংকা বোধ কর যে, ইয়াতীমের ব্যাপারে ইনসাফের সাথে কাজ করতে পারবে না তবে (তাদেরকে বিবাহ না করে) অন্য নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের পসন্দ হয় বিবাহ কর[৩]– দুই-দুইজন, তিন-তিনজন অথবা চার-চারজনকে।[৪] অবশ্য যদি আশংকা বোধ কর যে, তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে এক স্ত্রীতে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীতে ক্ষান্ত থাক। এ পন্থায় তোমাদের অবিচারে লিপ্ত না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحۡلَۃً ؕ فَاِنۡ طِبۡنَ لَکُمۡ

৪. নারীদেরকে খুশী মনে তাদের মোহরানা আদায় কর। তারা নিজেরা যদি

তাদের পিতার মীরাছ হিসেবে ভালো ভালো জিনিস পেয়েছিল আর তোমরা তা নিজেরা রেখে দিয়ে তার পরিবর্তে তাদেরকে মন্দ কিসিমের মাল দিয়ে দিলে। (গ) এরূপ করো না যে, তাদের মাল নিজেদের মালের সাথে মিশিয়ে তার কিছু অংশ জেনেশুনে বা অবহেলাভরে নিজেরা ব্যবহার করলে।

৩. বুখারী শরীফের এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাযি.) এ বিধানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন যে, অনেক সময় কোনও ইয়াতীম মেয়ে তার চাচাত ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে থাকত। সে যেমন সুন্দরী হত, তেমনি পিতার রেখে যাওয়া সম্পদেরও একটা মোটা অংশ পেত। এ অবস্থায় তার চাচাত ভাই চাইত, সে বালেগা হলে নিজেই তাকে বিবাহ করবে, যাতে তার সম্পদ হাতছাড়া না হয়ে যায়। কিন্তু বিবাহে তার মত মেয়ের মোহরানা যে পরিমাণ হওয়া উচিত সে পরিমাণ তাকে দিত না। আবার সেই মেয়ে যদি তেমন রূপসী না হত, তবে তার সম্পদের লোভে তাকে বিবাহ তো করত, কিন্তু তাকে মোহরানা তো কম দিতই, সেই সঙ্গে তার সাথে আচার-আচরণও প্রীতিকর করত না। এ আয়াত এ জাতীয় লোকদেরকে হুকুম দিয়েছে যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি তোমাদের যদি এ ধরনের জুলুম ও অবিচার করার আশংকা থাকে, তবে তাদেরকে বিবাহ করো না; বরং অন্য যে সকল নারীকে আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন তাদের মধ্য হতে কাউকে বিবাহ কর।

৪. জাহিলী যুগে স্ত্রী গ্রহণের জন্য কোনও সংখ্যা নির্ধারিত ছিল না। এক ব্যক্তি একই সময়ে দশ-বিশজন নারীকে নিজ বিবাহাধীনে রাখতে পারত। আলোচ্য আয়াত এর সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ধারণ করেছে চার পর্যন্ত এবং তাও এই শর্তসাপেক্ষে যে, সকল স্ত্রীর সাথে সমতাপূর্ণ আচরণ করতে হবে। যদি পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা থাকে, তবে এক স্ত্রীতেই ক্ষান্ত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরূপ অবস্থায় একাধিক বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

عَنۡ شَیۡءٍ مِّنۡهُ نَفۡسًا فَکُلُوۡهُ هَنِیۡٓـًٔا مَّرِیۡٓـًٔا ﴿۴﴾

স্বত:স্ফূর্তভাবে তার কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা সানন্দে, স্বচ্ছন্দভাবে ভোগ করতে পার।

وَلَا تُؤۡتُوا السُّفَهَآءَ اَمۡوَالَکُمُ الَّتِیۡ جَعَلَ اللّٰهُ لَکُمۡ قِیٰمًا وَّارۡزُقُوۡهُمۡ فِیۡهَا وَاکۡسُوۡهُمۡ وَقُوۡلُوۡا لَهُمۡ قَوۡلًا مَّعۡرُوۡفًا ﴿۵﴾

৫. তোমরা অবুঝ (ইয়াতীম)দের কাছে নিজেদের সেই সম্পদ অর্পণ করো না, যাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য জীবনের অবলম্বন বানিয়েছেন। তবে তাদেরকে তা হতে খাওয়াও ও পরাও আর তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গতভাবে কথা বল।[৫]

وَابۡتَلُوا الۡیَتٰمٰی حَتّٰۤی اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ ۚ فَاِنۡ اٰنَسۡتُمۡ مِّنۡهُمۡ رُشۡدًا فَادۡفَعُوۡۤا اِلَیۡهِمۡ اَمۡوَالَهُمۡ ۚ وَلَا تَاۡکُلُوۡهَاۤ اِسۡرَافًا وَّبِدَارًا اَنۡ یَّکۡبَرُوۡا ؕ وَمَنۡ کَانَ غَنِیًّا فَلۡیَسۡتَعۡفِفۡ ۚ وَمَنۡ کَانَ فَقِیۡرًا فَلۡیَاۡکُلۡ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ؕ

৬. ইয়াতীমদেরকে পরীক্ষা করতে থাক। অবশেষে তারা যখন বিবাহ করার উপযুক্ত বয়সে পৌঁছায়, তখন যদি উপলব্ধি কর তাদের মধ্যে বুঝ-সমঝ এসে গেছে, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ কর। আর সে সম্পদ এই ভেবে অপচয়ের সাথে ও তাড়াহুড়া করে খেয়ে ফেল না যে, পাছে তারা বড় হয়ে যায়। আর (ইয়াতীমদের অভিভাকদের মধ্যে) যে নিজে সচ্ছল, সে তো নিজেকে (ইয়াতীমদের সম্পদ খাওয়া

---

৫. ইয়াতীমদের যারা অভিভাবকত্ব করে তাদের দায়িত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, এক দিকে তো ইয়াতীমদের অর্থ-সম্পদকে আমানত মনে করে সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, অন্যদিকে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তাদের সম্পদ যেন অসময়ে তাদের হাতে সোপর্দ করা না হয়। বরং যখন টাকা-পয়সা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি ও সঠিক খাতে তা ব্যয় করার মত যোগ্যতা তাদের মধ্যে এসে যাবে, তখনই যেন তাদের হাতে তা অর্পণ করা হয়। যতক্ষণ তারা অবুঝ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের হাতে তা ন্যস্ত করা যাবে না। তারা নিজেরাই যদি দাবী করে যে, তাদের সম্পদ তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হোক, তবে তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে বোঝানো উচিত। পরবর্তী আয়াতে এ মূলনীতিরই কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে, মাঝে মধ্যে ইয়াতীম শিশুদেরকে পরীক্ষা করা চাই যে, নিজেদের অর্থ-সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করার মত বুঝ-সমঝ তাদের হয়েছে কি না। আরও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কেবল বালেগ হওয়াই যথেষ্ট নয়। বালেগ হওয়ার পরও যদি তারা সমঝদার না হয়, তবে তাদের হাতে সম্পদ ন্যস্ত করা যাবে না; বরং যখন বুঝে আসবে যে, তাদের মধ্যে বুদ্ধি-শুদ্ধি এসে গেছে কেবল তখনই তা তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

فَاِذَا دَفَعۡتُمۡ اِلَیۡهِمۡ اَمۡوَالَهُمۡ فَاَشۡهِدُوۡا عَلَیۡهِمۡ ؕ وَكَفٰی بِاللّٰهِ حَسِیۡبًا ⑥

থেকে) সম্পূর্ণরূপে পবিত্র রাখবে আর যে অভাবগ্রস্ত সে ন্যায়সঙ্গত পন্থায় তা খেতে পারবে।[৬] অত:পর তোমরা তাদের সম্পদ যখন তাদের হাতে অর্পণ করবে, তখন তাদের সম্পর্কে সাক্ষী রাখবে। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

لِلرِّجَالِ نَصِیۡبٌ مِّمَّا تَرَكَ الۡوَالِدٰنِ وَالۡاَقۡرَبُوۡنَ ۪ وَلِلنِّسَآءِ نَصِیۡبٌ مِّمَّا تَرَكَ الۡوَالِدٰنِ وَالۡاَقۡرَبُوۡنَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ اَوۡ كَثُرَ ؕ نَصِیۡبًا مَّفۡرُوۡضًا ⑦

৭. পুরুষদের জন্যও সেই সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়বর্গ রেখে যায় আর নারীদের জন্যও সেই সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়বর্গ রেখে যায়, চাই সে (পরিত্যক্ত) সম্পদ কম হোক বা বেশি। এ অংশ (আল্লাহর তরফ থেকে) নির্ধারিত।[৭]

وَاِذَا حَضَرَ الۡقِسۡمَةَ اُولُوا الۡقُرۡبٰی وَالۡیَتٰمٰی وَالۡمَسٰكِیۡنُ فَارۡزُقُوۡهُمۡ مِّنۡهُ وَقُوۡلُوۡا لَهُمۡ قَوۡلًا مَّعۡرُوۡفًا ⑧

৮. আর যখন (মীরাছ) বণ্টনের সময় (ওয়ারিশ নয় এমন) আত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তখন

---

৬. নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্য ইয়াতীমের অভিভাবকদের বহু কাজ আঞ্জাম দিতে হয়। সে যদি সচ্ছল ব্যক্তি হয়, তবে সে সব কাজের জন্য ইয়াতীমের সম্পদ হতে তার কোনও রকম বিনিময় গ্রহণ জায়েয নয়। এটা ঠিক সেই রকমের, যেমন একজন পিতা তার সন্তানদের দেখাশোনা করছে। অবশ্য সে যদি অসচ্ছল হয় আর ইয়াতীম উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়, তবে ইয়াতীমের সম্পদ হতে নিজের প্রয়োজনীয় খরচা গ্রহণ করা তার পক্ষে জায়েয হবে। তবে এ ব্যাপারে তাকে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কেবল ততটুকুই সে গ্রহণ করবে, দেশের চল ও নিয়ম অনুযায়ী সে যতটুকু পেতে পারে; তার বেশি নেওয়া কিছুতেই জায়েয হবে না।

৭. জাহিলী যুগে নারীদেরকে মীরাছের কোনও অংশ দেওয়া হত না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এ জাতীয় কিছু ঘটনা পেশ করা হল, যেমন এক ব্যক্তির ইন্তিকাল হয়ে গেল এবং এক স্ত্রী ও নাবালেগ সন্তান রেখে গেল। এ অবস্থায় তার ভাইয়েরা তার রেখে যাওয়া সমুদয় সম্পত্তি কব্জা করে নিল। স্ত্রীকে তো বঞ্চিত করা হল নারী হওয়ার কারণে আর সন্তানগণ যেহেতু নাবালেগ ছিল তাই তাদেরকেও কিছু দেওয়া হল না। এ প্রেক্ষাপটেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এতে পরিষ্কার করে দেওয়া হয় যে, নারীদেরকে মীরাছ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। অত:পর সামনে ১১ নং আয়াত থেকে যে রুকূ শুরু হয়েছে তাতে সকল নর-নারী আত্মীয়বর্গের কে কি পরিমাণ পাবে তাও আল্লাহ তাআলা স্থির করে দিয়েছেন।

তাদেরকেও তা থেকে কিছু দাও এবং তাদের সাথে সদালাপ কর।[৮]

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٩﴾

৯. আর সেই সব লোক (ইয়াতীমদের সম্পদে অসাধুতা করতে) ভয় করুক, যারা নিজেদের পেছনে অসহায় সন্তান রেখে গেলে তাদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকত।[৯] সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সরল-সঠিক কথা বলে।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ﴿١٠﴾

১০. নিশ্চিত জেন, যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ভরতি করে। তাদেরকে অচিরেই এক জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করতে হবে।

[২]

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ أَوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ

১১. আল্লাহ তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান।[১০]

---

৮. মীরাছ বণ্টনকালে এমন কিছু লোকও উপস্থিত থাকে, যারা শরীয়ত অনুযায়ী ওয়ারিশ হয় না। কুরআন মাজীদের নির্দেশনা হচ্ছে, তাদেরকেও কিছু দেওয়া ভালো। অবশ্য এক্ষেত্রে দুটো বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে– (ক) এরূপ লোকদেরকে দেওয়া ওয়াজিব নয়; বরং মুস্তাহাব এবং (খ) তাদেরকে নাবালেগ ওয়ারিশদের অংশ থেকে দেওয়া জায়েয নয়। কেবল বালেগ ওয়ারিশগণ নিজেদের অংশ থেকে দেবে।

৯. অর্থাৎ তোমাদের যেমন নিজ সন্তানদের ব্যাপারে চিন্তা থাকে যে, আমাদের মৃত্যুর পর তাদের অবস্থা কী হবে, তেমনি অন্যদের সন্তানদের ব্যাপারেও চিন্তা কর এবং ইয়াতীমদের সম্পদে যে কোনও রকমের অসাধু পন্থা অবলম্বন করা হতে বিরত থাক।

১০. ১১, ১২ নং আয়াতে আত্মীয়দের মধ্যে কে কতটুকু মীরাছ পাবে তা বর্ণিত হয়েছে। যে সকল আত্মীয়ের অংশ এ দুই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরকে 'যাবিল ফুরূয' বলে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এসব অংশ প্রদানের পর যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে, তা মৃত ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী সেই আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করা হবে, যাদের অংশ এ আয়াতসমূহে উল্লেখ করা হয়নি। তাদেরকে 'আসাবা' বলে, যেমন পুত্র। আর কন্যা যদিও সরাসরি 'আসাবা' নয়, কিন্তু পুত্রদের সাথে মিলে সেও 'আসাবা'র অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এ অবস্থায় তাদের মধ্যে যে নিয়মে মীরাছ বণ্টন করা হবে, তা এ আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ এক পুত্র পাবে দুই কন্যার সমান। এই একই নিয়ম সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন মৃত ব্যক্তির কোনও সন্তান না থাকে এবং ভাই-বোন তার ওয়ারিশ হয়। তখন ভাইকে বোনের দ্বিগুণ অংশ দেওয়া হবে।

ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ⑪

যদি (কেবল) দুই বা ততোধিক নারীই থাকে, তবে মৃত ব্যক্তি যা-কিছু রেখে গেছে, তারা তার দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। যদি কেবল একজন নারী থাকে, তবে সে (পরিত্যক্ত সম্পত্তির) অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার মধ্য হতে প্রত্যেকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ পাবে– যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে। আর যদি তার কোন সন্তান না থাকে এবং তার পিতা-মাতাই তার ওয়ারিশ হয়, তবে তার মা এক-তৃতীয়াংশের হকদার। অবশ্য তার যদি কয়েক ভাই থাকে, তবে তার মাকে এক-ষষ্ঠাংশ দেওয়া হবে (আর এ বণ্টন করা হবে) মৃত ব্যক্তি যে ওসিয়ত করে গেছে তা কার্যকর করার কিংবা তার যদি কোন দেনা থাকে, তা পরিশোধ করার পর।[১১] তোমরা আসলে জান না তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে উপকার সাধনের দিক থেকে তোমাদের নিকটতর। এসব আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ।[১২] নিশ্চিত জেন, আল্লাহ জ্ঞানেরও মালিক, হিকমতেরও মালিক।

---

১১. এ আয়াতগুলোতে এই নিয়মটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, মীরাছ বণ্টন করা হবে মৃত ব্যক্তির দেনা পরিশোধ ও তার ওসিয়ত কার্যকর করার পর। অর্থাৎ মায়্যিতের যদি দেনা থাকে, তবে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি দ্বারা সর্বপ্রথম সেই দেনা পরিশোধ করা হবে। তারপর সে যদি কোনও ওসিয়ত করে থাকে, যেমন অমুক ব্যক্তিকে (যে তার ওয়ারিশ নয়) আমার সম্পত্তি থেকে এই পরিমাণ দিও, তবে সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের ভেতর থেকে সেই ওসিয়ত পূরণ করা হবে। তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

১২. কেউ ভাবতে পারত 'অমুক ওয়ারিশকে আরও বেশি দেওয়া হলে ভাল হত', কিংবা 'অমুককে আরও কম দেওয়া উচিত ছিল', তাই আল্লাহ তাআলা এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, প্রকৃত মঙ্গল সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান তোমাদের নেই। আল্লাহ তাআলা যার যে অংশ স্থির করে দিয়েছেন, সেটাই যথার্থ।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَّلَهٗٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوْٓا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿١٢﴾

১২. তোমাদের স্ত্রীগণ যা-কিছু রেখে যায়, তার অর্ধাংশ তোমাদের– যদি তাদের কোনও সন্তান (জীবিত) না থাকে। যদি তাদের কোনও সন্তান থাকে, তবে তারা যে ওসিয়ত করে যায় তা কার্যকর করার এবং যে দেনা রেখে যায় তা পরিশোধ করার পর, তোমরা তার রেখে যাওয়া সম্পদের এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর তোমরা যা-কিছু ছেড়ে যাও, তার এক-চতুর্থাংশ তারা (স্ত্রীগণ) পাবে– যদি তোমাদের (জীবিত) কোন সন্তান না থাকে। যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তোমরা যে ওসিয়ত করে যাও তা কার্যকর করার এবং তোমাদের দেনা পরিশোধ করার পর তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ পাবে। যার মীরাছ বণ্টন করা হচ্ছে, সেই পুরুষ বা নারী যদি এমন হয় যে, না তার পিতা-মাতা জীবিত আছে, না সন্তান-সন্ততি আর তার এক ভাই বা এক বোন জীবিত থাকে, তবে তাদের প্রত্যেকে এক-ষষ্ঠাংশের হকদার হবে। তারা যদি আরও বেশি সংখ্যক থাকে, তবে তারা সকলে এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে অংশীদার হবে, (কিন্তু তা) যে ওসিয়ত করা হয়েছে তা কার্যকর করার বা মৃত ব্যক্তির দেনা থাকলে তা পরিশোধ করার পর– যদি (ওসিয়ত বা দেনার স্বীকারোক্তি দ্বারা) সে কারও ক্ষতি না করে থাকে।[১৩] এসব আল্লাহর হুকুম। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, সহনশীল।

---

১৩. এর দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, যদিও মীরাছ বণ্টন করার আগে দেনা পরিশোধ ও ওসিয়ত পূরণ করা জরুরী, কিন্তু মৃত ব্যক্তির এমন কোনও কাজ করা উচিত নয়, যার উদ্দেশ্য বৈধ ওয়ারিশদের ক্ষতি সাধন করা। যেমন কোনও ব্যক্তি তার ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করার বা

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۳﴾

১৩. এসব আল্লাহর স্থিরীকৃত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হবে। এরূপ লোক সর্বদা তাতে থাকবে আর এটা মহা সাফল্য।

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۱۴﴾

১৪. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর স্থিরীকৃত সীমা লংঘন করবে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জাহান্নামে, যাতে সে সর্বদা থাকবে এবং তার জন্য আছে এমন শাস্তি, যা তাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।

[৩]

وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿۱۵﴾

১৫. তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা অশ্লীল কাজ করবে, তাদের সম্পর্কে নিজেদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী রাখ। তারা যদি (তাদের অশ্লীল কাজ সম্পর্কে) সাক্ষ্য দেয়, তবে সে নারীদেরকে ঘরের ভেতর আবদ্ধ রাখ, যাবত না মৃত্যু তাদের তুলে নিয়ে যায় কিংবা আল্লাহ তাদের জন্য কোন পথ সৃষ্টি করে দেন।[১৪]

তাদের অংশ হ্রাস করার লক্ষ্যে তার কোনও বন্ধুর অনুকূলে ওসিয়ত করল কিংবা তার অনুকূলে মিথ্যা ঋণের কথা স্বীকার করল, যাতে তার গোটা সম্পত্তি বা তার সিংহভাগ সেই ব্যক্তির দখলে চলে যায় আর ওয়ারিশগণ কিছুই না পায় অথবা পেলেও তার পরিমাণ খুব সামান্যই হয়। এটা সম্পূর্ণ অবৈধ। এজন্যই শরীয়ত এই মূলনীতি প্রদান করেছে যে, কোনও ওয়ারিশের পক্ষে ওসিয়ত করা যাবে না এবং যে ওয়ারিশ নয় তার পক্ষেও সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশি ওসিয়ত করা যাবে না।

১৪. কোনও নারী ব্যভিচার করলে প্রথম দিকে তাকে যাবজ্জীবন গৃহবন্দী করে রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ইশারা করা হয়েছিল যে, পরবর্তীকালে তাদের জন্য অন্য কোনও দণ্ডবিধি দেওয়া হবে। 'কিংবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ সৃষ্টি করে দেবেন' দ্বারা সে কথাই বোঝানো হয়েছে। সুতরাং সূরা 'নূর'-এ নর-নারী উভয়ের জন্য ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে একশ' চাবুক। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা নূরের সে আয়াত নাযিল হলে ইরশাদ করেন, এবার আল্লাহ তাআলা নারীদের জন্য পথ সৃষ্টি করে দিয়েছেন আর তা এই যে, অবিবাহিত নর বা নারীকে একশ' চাবুক মারা হবে এবং বিবাহিতকে রাজ্‌ম (পাথর মেরে হত্যা) করা হবে।

وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿۱۶﴾

১৬. আর তোমাদের মধ্যে যে দুই পুরুষ অশ্লীল কর্ম করবে, তাদেরকে শাস্তি দান কর।[১৫] অত:পর তারা যদি তাওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে ফেলে তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۷﴾

১৭. আল্লাহ তাওবা কবুলের যে দায়িত্ব নিয়েছেন তা কেবল সেই সকল লোকের জন্য, যারা অজ্ঞতাবশত কোনও গুনাহ করে ফেলে, তারপর জলদি তাওবা করে নেয়। সুতরাং আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, প্রজ্ঞাময়।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۸﴾

১৮. তাওবা কবুলের বিষয়টি তাদের জন্য নয়, যারা অসৎকর্ম করতে থাকে। পরিশেষে তাদের কারও যখন মৃত্যুক্ষণ এসে পড়ে, তখন বলে, এখন আমি তাওবা করলাম এবং তাদের জন্যও নয়, যারা কুফর অবস্থায়ই মারা যায়। এরূপ লোকদের জন্য তো আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ

১৯. হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য এটা হালাল নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক নারীদের মালিক বনে বসবে। আর তাদেরকে এই উদ্দেশ্যে অবরুদ্ধ করে রেখ না যে, তোমরা তাদেরকে যা-কিছু দিয়েছ তার কিয়দংশ আত্মসাৎ করবে,

---

১৫. এর দ্বারা পুরুষের স্বভাব-বিরুদ্ধ যৌনক্রিয়া তথা 'সমকাম'-এর দিকে ইশারা করা হয়েছে। এর জন্য নির্দিষ্ট কোন শাস্তির বিধান না দিয়ে কেবল এই আদেশ করা হয়েছে যে, এরূপ পুরুষদেরকে শাস্তি দেওয়া চাই। ফুকাহায়ে কিরাম এর বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। তবে তার মধ্যে বিশেষ কোনওটি অপরিহার্য নয়। সঠিক এই যে, এটা বিচারকের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

অবশ্য তারা যদি প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, তবে ভিন্ন কথা[১৬] আর তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর। তোমরা যদি তাদেরকে অপসন্দ কর, তবে এর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যে, তোমরা কোনও জিনিসকে অপসন্দ করছ অথচ আল্লাহ তাতে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

২০. আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করতে চাও এবং তাদের একজনকে অগাধ মোহরানা দিয়ে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না। তোমরা কি অপবাদ দিয়ে এবং প্রকাশ্য গুনাহে লিপ্ত হয়ে (মোহরানা) ফেরত নেবে?[১৭]

---

১৬. জাহিলী যুগে এই নিপীড়নমূলক প্রথা চালু ছিল যে, কোনও নারীর স্বামী মারা গেলে ওয়ারিশগণ সেই নারীকেও মীরাছের অংশ মনে করত এবং এই অর্থে তারা তার মালিক বনে যেত যে, তাদের অনুমতি ছাড়া সে যেমন অন্য কোনও স্বামী গ্রহণ করতে পারত না, তেমনি নিজ জীবন সম্পর্কে অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও অধিকার রাখত না। এ আয়াত সেই জুলুমের রেওয়াজকে খতম করে দিয়েছে। এমনিভাবে আরও একটা অন্যায় রীতি ছিল যে, কোনও স্বামী যখন স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করত আবার তাকে যে মোহরানা দিয়েছে সেটাও হস্তগত করতে চাইত, তখন সে স্ত্রীকে নানাভাবে কষ্ট দিতে থাকত, যেমন সে তাকে ঘরের ভেতর এভাবে অবরুদ্ধ করে রাখত যদ্দরুণ সে তার বৈধ প্রয়োজন মেটানোর জন্যও বাইরে যেতে পারত না। এভাবে নির্যাতন করার উদ্দেশ্য ছিল যাতে সে বেচারী বাধ্য হয়ে স্বামীর থেকে মুক্তি লাভের জন্য নিজেই বিবাহ বিচ্ছেদের প্রস্তাব দেয় আর বলে, তুমি যে মোহরানা দিয়েছ তা ফেরত নিয়ে যাও এবং তালাক দিয়ে আমাকে তোমার কবল থেকে মুক্তি দাও। আয়াতের দ্বিতীয় অংশে এই প্রথাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

১৭. উপরে ১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছিল যে, স্ত্রীদেরকে তাদের মুক্তি লাভের জন্য মোহরানা ওয়াপস করতে বাধ্য করা কেবল সেই অবস্থায়ই বৈধ, যখন তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয়ে পড়বে। এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, তোমরা যদি মোহরানা ফেরত দেওয়ার জন্য তাদেরকে চাপ দাও, তবে তোমাদের পক্ষ হতে এটা তাদের প্রতি অপবাদ আরোপের নামান্তর হবে। তোমরা যেন বলতে চাচ্ছ, তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতা করেছে, যেহেতু মোহরানা ওয়াপস করতে বাধ্য করা এ অবস্থা ছাড়া অন্য কোনও অবস্থায় বৈধ নয়।

২১. আর কি করেই বা তোমরা তা ফেরত নিতে পার, যখন তোমরা একে অন্যের বড় ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলে এবং তারা তোমাদের থেকে কঠিন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিল?

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ
وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿٢١﴾

২২. যে নারীদেরকে তোমাদের বাপ-দাদা (কখনও) বিবাহ করেছে, তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। তবে পূর্বে যা হয়েছে, হয়েছে।[১৮] এটা অত্যন্ত অশ্লীল ও ঘৃণ্য কর্ম এবং কুপথের আচরণ।

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ
وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿٢٢﴾

[৪]

২৩. তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাতিজী, ভাগ্নি, তোমাদের সেই সকল মা, যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে, তোমাদের দুধ বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের প্রতিপালনাধীন তোমাদের সৎ কন্যা,[১৯] যারা তোমাদের এমন স্ত্রীদের গর্ভজাত, যাদের সাথে তোমরা নিভৃতে মিলিত হয়েছ। তোমরা যদি তাদের সাথে নিভৃত-মিলন না করে থাক (এবং তাদেরকে তালাক দিয়ে দাও বা তাদের মৃত্যু হয়ে যায়) তবে (তাদের কন্যাদেরকে বিবাহ করাতে) তোমাদের কোন গুনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণও তোমাদের জন্য হারাম

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ
وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ
وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ
وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ
مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ز وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ
الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ
اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٣﴾

---

১৮. জাহিলী যুগে সৎ মা'কে বিবাহ করা দূষনীয় মনে করা হত না। এ আয়াত সে নির্লজ্জতাকে নিষিদ্ধ করেছে। অবশ্য যারা ইসলামের আগে এরূপ বিবাহ করেছিল তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আগের গুনাহ মাফ। কেননা ইসলাম গ্রহণ দ্বারা পূর্বের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। শর্ত হল এ আয়াত নাযিলের পর সে বিবাহের সম্বন্ধ ত্যাগ করতে হবে।

১৯. সাধারণভাবে সৎকন্যা যেহেতু সৎপিতার লালন-পালনে থাকে তাই এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। নয়ত যে সৎ কন্যা সৎ পিতার প্রতিপালনাধীন নয়, সেও হারাম।

এবং এটাও হারাম যে, তোমরা দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করবে। তবে পূর্বে যা হয়েছে, হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[পঞ্চম পারা]

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۲۴﴾

২৪. সেই সকল নারীও (তোমাদের জন্য হারাম), যারা অন্য স্বামীদের বিবাহাধীন আছে। তবে যে দাসীরা তোমাদের মালিকানায় এসে গেছে, (তারা ব্যতিক্রম)।[২০] আল্লাহ তোমাদের প্রতি এসব বিধান ফরয করেছেন। আর এ সকল নারী ছাড়া অন্য নারীদেরকে নিজেদের অর্থ-সম্পদ খরচের মাধ্যমে (অর্থাৎ মোহরানা দিয়ে নিজেদের বিবাহে আনার) কামনা করাকে বৈধ করা হয়েছে, এই শর্তে যে, তোমরা যথারীতি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করত: চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার ইচ্ছা করবে, কেবল কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা উদ্দেশ্য হবে না।[২১] সুতরাং তোমরা (বিবাহ সূত্রে) যে সকল নারী দ্বারা আনন্দ ভোগ করেছ, তাদেরকে ধার্যকৃত মোহর প্রদান কর। অবশ্য মোহর ধার্য করার পরও তোমরা

---

২০. জিহাদের সময় যেসব নারীকে বন্দী করে ইসলামী রাষ্ট্রে নিয়ে আসা হত এবং তাদের স্বামীগণ অমুসলিম রাষ্ট্রে থেকে যেত, তাদের বিবাহ আপনা-আপনি খতম হয়ে যেত। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রে আসার পর যখন এরূপ নারীর এক হায়যের মেয়াদ পূর্ণ হত এবং প্রাক্তন স্বামী দ্বারা সে গর্ভবতী না থাকত, তখন মুসলিম রাষ্ট্রের যে-কোনও মুসলিমের সাথে তার বিবাহ জায়েয হত। মনে রাখতে হবে এ বিধান কেবল এমন দাসীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যে শরীয়তসম্মতভাবে দাসী সাব্যস্ত হয়েছে। বর্তমানে কোথাও এরূপ দাসীর অস্তিত্ব নেই।

২১. বোঝানো উদ্দেশ্য, বিবাহ একটি দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের নাম, যার উদ্দেশ্য শুধু ইন্দ্রিয়-চাহিদা পূরণ করা নয়; বরং এক সুদৃঢ় পারিবারিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, যে ব্যবস্থার অধীনে নর-নারী উভয়ে একে অন্যের অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি বিশ্বস্ত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে এবং এ সম্পর্ককে চারিত্রিক পবিত্রতার সংরক্ষণ ও মানব-প্রজন্মের ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যম বানাবে। কেবল ইন্দ্রিয় সুখ হাসিলের জন্য একটা সাময়িক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে নেওয়া কিছুতেই জায়েয নয়। তা অর্থ-সম্পদের বিনিময়েই হোক না কেন!

পরস্পরে যেই (কম-বেশি করা) সম্পর্কে সম্মত হবে, তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞানও রাখেন, হিকমতেরও অধিকারী।

২৫. তোমাদের মধ্যে যারা স্বাধীন মুসলিম নারীদের বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না, তারা তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম দাসীদেরকে বিবাহ করতে পারে। আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তোমরা সকলে পরস্পর সমতুল্য।[২২] সুতরাং সেই দাসীদেরকে তাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে বিবাহ করবে এবং তাদেরকে ন্যায়ানুগভাবে তাদের মোহর প্রদান করবে– এই শর্তে যে, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাদেরকে চারিত্রিক পবিত্রতাসম্পন্ন বানানো হবে, কেবল কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তারা কোন (অবৈধ) কাজ করবে না এবং গোপনে কোন অবৈধ সম্পর্কও স্থাপন করবে না। তারা যখন বিবাহের হেফাজতে এসে গেল, তখন যদি কোনও গুরুতর অশ্লীলতায় (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তাদের শাস্তি হবে স্বাধীনা (অবিবাহিতা) নারীর জন্য ধার্যকৃত শাস্তির অর্ধেক।[২৩] এসব

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَ اٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَاۤ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۵﴾

---

২২. যেহেতু স্বাধীন নারীদের মোহর সাধারণত দাসীদের তুলনায় বেশি হত, তাই এক দিকে তো আদেশ দেওয়া হয়েছে, স্বাধীন নারীদের বিবাহ করার সামর্থ্য না থাকলে তবেই দাসীদের বিবাহ করবে, অন্যদিকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, কখনও কোন দাসীকে বিবাহ করতে হলে কেবল দাসী হওয়ার কারণে তাকে হেয় জ্ঞান করা যাবে না। কেননা মর্যাদার আসল মাপকাঠি হল তাকওয়া-পরহেযগারী। কার ঈমানের অবস্থা কেমন সেটা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। বস্তুত আদম সন্তান হওয়ার বিচারে দুনিয়ার সকল মানুষই সমান।

২৩. স্বাধীন অবিবাহিতা নারী ব্যভিচার করলে তার শাস্তি একশ' চাবুক, যা সূরা নূরের প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে দাসীদের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে তার অর্ধেক, অর্থাৎ পঞ্চাশটি চাবুকের আঘাত।

(অর্থাৎ দাসীদেরকে বিবাহ করার বিষয়টা) তোমাদের মধ্য হতে যারা (বিবাহ না করলে) গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশংকা বোধ করে তাদের জন্য। আর তোমরা যদি সংযমী হয়ে থাক, তবে সেটাই তোমাদের পক্ষে শ্রেয়। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[৫]

يُرِيۡدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمۡ وَيَهۡدِيَكُمۡ سُنَنَ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِكُمۡ وَيَتُوۡبَ عَلَيۡكُمۡ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ ﴿۲۶﴾

২৬. আল্লাহ চান তোমাদের জন্য (বিধানসমূহ) স্পষ্ট করে দিতে, তোমাদের পূর্ববর্তী (নেককার) লোকদের রীতি-নীতির উপর তোমাদেরকে পরিচালিত করতে এবং তোমাদের প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি দিতে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, প্রজ্ঞাময়।

وَاللّٰهُ يُرِيۡدُ اَنۡ يَّتُوۡبَ عَلَيۡكُمۡ ۟ وَيُرِيۡدُ الَّذِيۡنَ يَتَّبِعُوۡنَ الشَّهَوٰتِ اَنۡ تَمِيۡلُوۡا مَيۡلًا عَظِيۡمًا ﴿۲۷﴾

২৭. আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দিতে চান আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুগমন করে, তারা চায় তোমরা যেন সঠিক পথ থেকে বহু দূরে সরে যাও।

يُرِيۡدُ اللّٰهُ اَنۡ يُّخَفِّفَ عَنۡكُمۡ ۚ وَخُلِقَ الۡاِنۡسَانُ ضَعِيۡفًا ﴿۲۸﴾

২৮. আল্লাহ তোমাদের ভার লঘু করতে চান। মানুষকে দুর্বলরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে।[২৪]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَ تِجَارَةً عَنۡ تَرَاضٍ مِّنۡكُمۡ ۟ وَلَا تَقۡتُلُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيۡمًا ﴿۲۹﴾

২৯. হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, তবে পারস্পরিক সন্তুষ্টিক্রমে কোন ব্যবসায় করা হলে (তা জায়েয)। এবং তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না।[২৫] নিশ্চিত জেন, আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

---

২৪. অর্থাৎ কামপ্রবৃত্তির মুকাবিলা করার ক্ষেত্রে মানুষ সহজাতভাবেই দুর্বল। তাই আল্লাহ তাআলা এ চাহিদা জায়েয পন্থায় পূরণ করতে বাধা দেননি; বরং তার জন্য বিবাহকে সহজ করে দিয়েছেন।

২৫. এর সহজ-সরল অর্থ এই যে, যেভাবে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা হারাম, নরহত্যা তদপক্ষো কঠিন হারাম। অন্যকে হত্যা করাকে 'নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করা'

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝٣٠

৩০. যে ব্যক্তি সীমালংঘন ও জুলুমের সাথে এরূপ করবে আমি তাকে আগুনে ঢোকাব আর আল্লাহর পক্ষে এটা অতি সহজ।

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ۝٣١

৩১. তোমাদেরকে যেই বড় বড় গুনাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তোমরা যদি তা পরিহার করে চল, তবে আমি নিজেই তোমাদের ছোট ছোট গুনাহ মিটিয়ে দেব[২৬] এবং তোমাদেরকে এক মর্যাদাপূর্ণ স্থানে দাখিল করব।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝٣٢

৩২. যে সব জিনিসের দ্বারা আমি তোমাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি তার আকাঙ্ক্ষা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে তাতে তার অংশ থাকবে এবং নারী যা অর্জন করে তাতে তার অংশ থাকবে।[২৭] আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, অন্য কাউকে হত্যা করলে পরিশেষে তার দ্বারা নিজেকেই হত্যা করা হয়। কেননা তার বদলে হত্যাকারী নিজেই নিহত হতে পারে। যদি দুনিয়াতে তাকে হত্যা করা নাও হয়, তবে আখিরাতে তার জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তা মৃত্যু অপেক্ষাও কঠিনতর। এভাবে এর দ্বারা আত্মহত্যার নিষিদ্ধতাও স্পষ্ট হয়ে গেল। অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার সাথে এ বাক্যের উল্লেখ দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইশারা হয়ে থাকবে যে, সমাজে অন্যায়ভাবে সম্পত্তি গ্রাস করার বিষয়টি যখন ব্যাপক আকার ধারণ করে, তখন তার পরিণাম দাঁড়ায় সামাজিক আত্মহত্যা।

২৬. অর্থাৎ মানুষ কবীরা গুনাহ (বড় বড় গুনাহ) হতে বিরত থাকলে আল্লাহ তাআলা তার ছোট ছোট গুনাহ এমনিতেই ক্ষমা করে দেন। কুরআন ও হাদীস দ্বারা জানা যায়, অযূ, সালাত, সাওম, সদাকা প্রভৃতি সৎকর্ম দ্বারা সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

২৭. কতিপয় নারী আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিল, তারা যদি পুরুষ হত, তবে তারাও জিহাদ ইত্যাদিতে শরীক হয়ে অধিকতর সওয়াব অর্জনে সক্ষম হত। এ আয়াত মূলনীতি জানিয়ে দিয়েছে যে, যেসব বিষয়ে মানুষের কোন এখতিয়ার নেই, তাতে আল্লাহ তাআলা কারও উপর কাউকে এক হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, আবার অপরকে অন্য হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, যেমন কেউ নর, কেউ নারী; কেউ শক্তিমান, কেউ দুর্বল; আবার কেউ অন্যের তুলনায় বেশি সুন্দর। এসব জিনিস যেহেতু মানুষের এখতিয়ারে নয়, তাই এর আকাঙ্ক্ষা করার দ্বারা অহেতুক দুঃখবোধ ছাড়া কোনও ফায়দা নেই। সুতরাং এসব জিনিসে

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿٣٣﴾

৩৩. পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়বর্গ যে সম্পদ রেখে যায়, তার প্রতিটিতে আমি কিছু ওয়ারিশ নির্ধারণ করেছি। আর যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছ, তাদেরকে তাদের অংশ প্রদান কর।[২৮] নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সাক্ষী।

[৬]

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

৩৪. পুরুষ নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীগণ অনুগত হয়ে থাকে, পুরুষের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ প্রদত্ত হিফাজতে (তার অধিকারসমূহ) সংরক্ষণ করে। আর যে সকল স্ত্রীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশংকা কর, (প্রথমে) তাদেরকে বুঝাও এবং (তাতে কাজ না হলে) তাদেরকে শয়ন শয্যায় একা ছেড়ে দাও এবং (তাতেও সংশোধন না হলে) তাদেরকে প্রহার করতে পার। অত:পর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের পথ খুঁজো না। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ সকলের উপর, সকলের বড়।

তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা চাই। হাঁ যেসব ভালো জিনিসে মানুষের এখতিয়ার আছে, তা অর্জনে সচেষ্ট থাকা অবশ্য কর্তব্য। তাতে আল্লাহ তাআলার রীতি হল, যে ব্যক্তি যেমন কাজ করবে, তার ক্ষেত্রে তেমনই ফল প্রকাশ পাবে। তাতে নর-নারীর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

২৮. যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, মুসলিমদের মধ্যে তার যদি কোনও আত্মীয় না থাকে, তবে সে যে ব্যক্তির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে, কখনও কখনও তার সাথে পরস্পর ভাই-ভাই হওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এ অবস্থায় তারা একে অন্যের ওয়ারিশও হবে এবং তাদের কারও উপর কোনও ব্যাপারে অর্থদণ্ড আরোপিত হলে তা আদায়ের ব্যাপারে অন্যজন সহযোগিতাও করবে। এই সম্পর্ককে 'মুওয়ালাত' বলে। এ আয়াতে এই চুক্তির কথাই বলা হয়েছে। এ আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মত এটাই যে, নওমুসলিমের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। তার যদি কোন মুসলিম আত্মীয় না থাকে, তবে চুক্তিবদ্ধ সেই ব্যক্তিই তার মীরাছ পাবে।

৩৫. তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ সৃষ্টির আশঙ্কা কর, তবে (তাদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য) পুরুষের পরিবার হতে একজন সালিস ও নারীর খান্দান হতে একজন সালিস পাঠিয়ে দেবে। তারা দু'জন যদি মীমাংসা করতে চায়, তবে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত এবং সর্ববিষয়ে অবহিত।

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿۳۵﴾

৩৬. এবং আল্লাহর ইবাদত কর ও তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করো না। পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর। আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী,[২৯] সঙ্গে বসা (বা দাঁড়ানো) ব্যক্তি,[৩০] পথচারী এবং নিজেদের দাস-দাসীর প্রতিও (সদ্ব্যবহার কর)। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দর্পিত অহংকারীকে পসন্দ করেন না।

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ﴿۳۶﴾

---

২৯. কুরআন-সুন্নাহ প্রতিবেশীর হক আদায় ও তার প্রতি সদ্ব্যবহারের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ আয়াতে প্রতিবেশীদের তিনটি স্তর বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম স্তরকে الجارذى القربى (নিকট প্রতিবেশী), দ্বিতীয় স্তরকে الجار الجنب (দূর প্রতিবেশী) বলা হয়েছে। প্রথম স্তর দ্বারা সেই প্রতিবেশীকে বোঝানো হয়েছে, যার গৃহ নিজ গৃহ-সংলগ্ন থাকে। দ্বিতীয় স্তরের প্রতিবেশী তারা, যাদের ঘর অতটা মিলিত নয়। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, প্রথম স্তর হল সেই প্রতিবেশী যে আত্মীয়ও বটে, আর দ্বিতীয় স্তর যারা কেবলই প্রতিবেশী। আবার কেউ বলেন, প্রথম স্তর হল মুসলিম প্রতিবেশী আর দ্বিতীয় স্তর অমুসলিম প্রতিবেশী। কুরআন মাজীদের শব্দাবলীতে সবগুলোরই অবকাশ আছে। মোদ্দাকথা প্রতিবেশী আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়, মুসলিম হোক বা অমুসলিম এবং তার গৃহ সংলগ্ন হোক বা না হোক সর্বাবস্থায়ই তার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে হবে।

৩০. এটা প্রতিবেশীদের তৃতীয় স্তর, যাকে কুরআন মাজীদ الصاحب بالجنب শব্দে ব্যক্ত করেছে। এর দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে সাময়িকভাবে অল্প সময়ের জন্য সঙ্গী হয়ে যায়, যেমন সফরকালে যে ব্যক্তি পাশে থাকে বা কোনও মজলিসে বা কোনও লাইনে সঙ্গে থাকে। এরূপ লোকও এক ধরনের প্রতিবেশী। কুরআন মাজীদ তাদের প্রতিও সদাচরণ করার উপর জোর দিয়েছে। বরং এ হুকুমের আরও বিস্তার ঘটিয়ে যে-কোনও পথিক ও মুসাফিরের সাথে সদ্ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, তাতে সে নিজের সঙ্গী ও প্রতিবেশী হোক বা নাই হোক।

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۳۷﴾

৩৭. যারা নিজেরাও কৃপণতা করে এবং মানুষকেও কৃপণতার নির্দেশ দেয়, আর আল্লাহ তাদের নিজ অনুগ্রহ হতে যা দান করেছেন তা গোপন করে। আমি এরূপ অকৃতজ্ঞদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ﴿۳۸﴾

৩৮. এবং যারা নিজেদের অর্থ-সম্পদ খরচ করে মানুষকে দেখানোর জন্য, না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং না আখিরাত দিবসের প্রতি। বস্তুত শয়তান যার সঙ্গী হয়ে যায়, তার সঙ্গী বড়ই নিকৃষ্ট।

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿۳۹﴾

৩৯. তাদের কী ক্ষতি হত, যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান আনত এবং আল্লাহ তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে কিছু (সৎকাজে) ব্যয় করত? আল্লাহ তাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۴۰﴾

৪০. আল্লাহ কারও প্রতি অণু-পরিমাণও জুলুম করেন না। আর যদি কোন সৎকর্ম হয়, তবে তাকে কয়েক গুণে পরিণত করেন এবং নিজের পক্ষ হতে মহা পুরস্কার দান করেন।

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ﴿۴۱﴾

৪১. সুতরাং (তারা ভেবে দেখুক) সেই দিন তাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং (হে নবী) আমি তোমাকে ওইসব লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব?[৩১]

---

৩১. কিয়ামতের দিন নবী-রাসূলগণ নিজ-নিজ উম্মতের ভালো-মন্দ কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর নিজ উম্মত সম্পর্কে সাক্ষীরূপে পেশ করা হবে।

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ﴿٤٢﴾

৪২. যারা কুফুর অবলম্বন করেছে এবং রাসূলের অবাধ্যতা করেছে, সে দিন তারা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে, যদি তাদেরকে মাটির (ভেতর ধ্বসিয়ে তার) সাথে একাকার করে ফেলা হত! আর তারা আল্লাহ হতে কোনও কথাই গোপন করতে পারবে না।

[৭]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

৪৩. হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নেশাগ্রস্ত থাক, তখন সালাতের কাছেও যেও না, যাবৎ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার।[৩২] এবং জুনুবী (সহবাসজনিত অপবিত্রতা) অবস্থায়ও নয়, যতক্ষণ না গোসল করে নাও (সালাত জায়েয নয়)। তবে তোমরা মুসাফির হলে (এবং পানি না পেলে, তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করতে পার)। তোমরা যদি অসুস্থ হও বা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ শৌচস্থান হতে আসে অথবা তোমরা নারীদের স্পর্শ করে থাক, অত:পর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নেবে এবং নিজেদের চেহারা ও হাত (সে মাটি দ্বারা) মাসেহ করে নেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি পাপমোচনকারী, ক্ষমাশীল।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ﴿٤٤﴾

৪৪. যাদেরকে কিতাবের একটা অংশ (অর্থাৎ তাওরাতের জ্ঞান) দেওয়া হয়েছিল, তোমরা কি দেখনি তারা কিভাবে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করছে? এবং তারা চায় তোমরাও যেন পথভ্রষ্ট হয়ে যাও।

---

৩২. এটা সেই সময়ের কথা, যখন মদ নিষিদ্ধ ছিল না, তবে এ আয়াতের মাধ্যমে ইশারা করে দেওয়া হয়েছিল যে, এটা কোনও ভালো জিনিস নয়, যেহেতু এটা পান করা অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং কোনও সময়ে এটা সম্পূর্ণ হারামও করা হতে পারে।

৪৫. আল্লাহ তোমাদের শত্রুদেরকে ভালো করেই জানেন। অভিভাবকরূপেও আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহই যথেষ্ট।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ﴿۴۵﴾

৪৬. ইয়াহুদীদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা (তাওরাতের) শব্দাবলীকে তার প্রকৃত স্থান থেকে সরিয়ে দেয় এবং নিজেদের জিহ্বা বাঁকিয়ে ও দ্বীনকে নিন্দা করে বলে, 'সামি'না ওয়া আসায়না' এবং 'ইসমা' গায়রা মুসমা'ইন' এবং 'রা'ইনা', অথচ তারা যদি বলত 'সামি'না ওয়া আতা'না' এবং 'ইসমা' ওয়ানজুরনা' তবে সেটাই তাদের পক্ষে উত্তম ও সঠিক পন্থা হত।[৩৩] বস্তুত তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি লানত করেছেন। সুতরাং অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া তারা ঈমান আনবে না।

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۴۶﴾

---

৩৩. এ আয়াতে ইয়াহুদীদের দু'টি দুষ্কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি দুষ্কর্ম তো এই যে, তারা তাওরাতের শব্দাবলীকে তার প্রকৃত স্থান থেকে সরিয়ে তার মধ্যে শাব্দিক বা অর্থগত বিকৃতি সাধন করত। অর্থাৎ কখনও তার শব্দকেই অন্য কোন শব্দ দ্বারা বদলে দিত এবং কখনও শব্দের উপর ভুল অর্থ আরোপ করে মনগড়া ব্যাখ্যা দান করত। তাদের দ্বিতীয় দুষ্কর্ম ছিল এই যে, তারা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসত তখন এমন অস্পষ্ট ও কপটতাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করত, যার বাহ্যিক অর্থ দূষনীয় হত না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা এমন মন্দ অর্থ বোঝাতো, যা সেই ভাষার ভেতর প্রচ্ছন্ন থাকত। কুরআন মাজীদ এ আয়াতে তার তিনটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। (ক) তারা বলত- سمعنا وعصينا (সামি'না ওয়া 'আসাইনা)-এর অর্থ 'আমরা আপনার কথা শুনলাম এবং অবাধ্যতা করলাম'। তারা এর ব্যাখ্যা করত যে, আমরা আপনার কথা শুনলাম এবং আপনার বিরোধীদের অবাধ্যতা করলাম, প্রকৃতপক্ষে তারা বোঝাতে চাইত, আমরা আপনার কথা শুনলাম ঠিক, কিন্তু তা মানলামই না। (খ) এমনিভাবে তারা বলত, اسمع غير مسمع (ইসমা' গায়রা মুসমা'ইনা)-এর শাব্দিক অর্থ হল 'আপনি আমাদের কথা শুনুন, আল্লাহ করুন, আপনাকে যেন কোন কথা শোনানো না হয়। বাহ্যত তারা যেন এর দ্বারা দু'আ করছে যে, আপনাকে যেন কোন অপ্রীতিকর কথা শুনতে না হয়। কিন্তু আসলে তারা বোঝাতে চাচ্ছিল, আল্লাহ করুন আপনাকে যেন প্রীতিকর কোন কথা শোনানো না হয়। (গ) তাদের তৃতীয় ব্যবহৃত শব্দ ছিল راعنا, (রা'ইনা) আরবীতে এর অর্থ 'আমাদের প্রতি লক্ষ রাখুন'। কিন্তু হিব্রু ভাষায় এটা ছিল একটি গালি এবং তারা সেটাই বোঝাতে চাইত।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى اَدْبَارِهَاۤ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٤٧﴾

৪৭. হে কিতাবীগণ! তোমাদের কাছে যে কিতাব পূর্ব থেকে আছে তার সমর্থকরূপে আমি যা (কুরআন) এবার অবতীর্ণ করেছি, তোমরা তাতে ঈমান আন, এর আগে যে, আমি কতক চেহারাকে মিটিয়ে দিয়ে সেগুলোকে পশ্চাদ্দেশ-স্বরূপ বানিয়ে দেব অথবা শনিবারওয়ালাদের উপর যেমন লানত করেছিলাম, তাদের উপর তেমন লানত করব।[৩৪] আল্লাহর আদেশ সর্বদা কার্যকরী হয়েই থাকে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰۤى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿٤٨﴾

৪৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ এ বিষয়কে ক্ষমা করেন না যে, তার সঙ্গে কাউকে শরীক করা হবে। এর চেয়ে নিচের যে-কোন বিষয়ে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।[৩৫] যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে, সে এমন এক অপবাদ আরোপ করে, যা গুরুতর পাপ।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٤٩﴾

৪৯. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা নিজেরা নিজেদের বড় শুদ্ধ বলে প্রকাশ করে, অথচ আল্লাহই যাকে চান শুদ্ধতা দান করেন এবং (এ দানে) তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হয় না।[৩৬]

---

৩৪. 'সাবত' অর্থ শনিবার। তাওরাতে ইয়াহুদীদেরকে এ দিন কামাই-রোজগার করতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু একটি জনপদের লোক সে হুকুম অমান্য করেছিল। ফলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং তাদের আকৃতি বিকৃত করে ফেলা হয়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ১৬৩)।

৩৫. অর্থাৎ শিরক অপেক্ষা ছোট গুনাহ আল্লাহ তাআলা যখন চান তাওবা ছাড়াই কেবল নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু শিরকের অপরাধ কেবল তখনই ক্ষমা হতে পারে, যখন মুশরিক ব্যক্তি মৃত্যুর আগে খাঁটি মনে শিরক হতে তাওবা করবে এবং তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করবে।

৩৬. অর্থাৎ পবিত্রতা ও শুদ্ধতা আল্লাহ তাআলা কেবল তাকেই দান করেন, যে নিজের ইচ্ছাধীন কাজ-কর্ম দ্বারা তা অর্জন করতে চায়। পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা থেকে বঞ্চিত হয় কেবল এমন

৫০. দেখ, তারা আল্লাহর প্রতি কি রকমের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। প্রকাশ্য গুনাহের জন্য এটাই যথেষ্ট।

انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَكَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا ۟

[৮]

৫১. যাদেরকে কিতাবের একটা অংশ (অর্থাৎ তাওরাতের কিছু জ্ঞান) দেওয়া হয়েছিল, তুমি কি দেখনি তারা (কিভাবে) প্রতিমা ও শয়তানের সমর্থন করছে এবং তারা কাফিরদের (অর্থাৎ মূর্তিপূজকদের) সম্বন্ধে বলে, মুমিনদের অপেক্ষা তারাই বেশি সরল পথে আছে।[৩৭]

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَاۤءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ۟

৫২. এরাই তারা, যাদের প্রতি আল্লাহ লানত করেছেন। আল্লাহ যার প্রতি লানত করেন, তুমি তার কোন সাহায্যকারী পাবে না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ۟

সব লোক, যারা নিজেদের এখতিয়ারাধীন কার্যাবলী দ্বারা নিজেদেরকে অযোগ্য করে তোলে। সুতরাং এ অবস্থায় আল্লাহ তাআলা যদি তাকে পবিত্রতা দান না করেন, তবে তিনি তাতে তাদের প্রতি কোন জুলুম করেন না। কেননা তারা নিজেরাই তো স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে শুদ্ধতার অনুপযুক্ত করে ফেলেছে।

৩৭. মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাসকারী কিছু ইয়াহুদীর কথা বলা হচ্ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সকলের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করেছিলেন যে, তারা ও মুসলিমগণ পরস্পর শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বাস করবে। একে অন্যের বিরুদ্ধে কোন বহি:শত্রুর সহযোগিতা করবে না। কিন্তু তারা উপর্যুপরি এ চুক্তি লংঘন করে এবং পর্দার আড়ালে মুসলিমদের ঘোর শত্রু, মক্কার কাফিরদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকে। তাদের একজন বড় নেতা ছিল কাব ইবনে আশরাফ। উহুদ যুদ্ধের পর সে অপর এক ইয়াহুদী নেতা হুয়াঈ ইবনে আখতাবকে নিয়ে মক্কা মুকাররমায় গেল এবং কাফিরদের সাথে সাক্ষাত করে তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্যের আশ্বাস দিল। কাফিরদের তদানীন্তন নেতা আবু সুফিয়ান বলল, তোমরা যদি তোমাদের এ কথায় সত্যবাদী হও, তবে আমাদের দু'টি প্রতিমার সামনে সিজদা কর। কাব ইবনে আশরাফ আবু সুফিয়ানের দাবী মত তাই করল। তারপর আবু সুফিয়ান কাবকে জিজ্ঞেস করল, আমাদের ধর্ম ভালো না মুসলিমদের? এর জবাবে সে নিঃসঙ্কোচে বলে দিল, মুসলিমদের চেয়ে তোমাদের ধর্ম অনেক ভালো। অথচ সে জানত মক্কার এ লোকগুলো প্রতিমাপূজারী। তারা কোনও আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করে না। সুতরাং তাদের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলার অর্থ মূর্তিপূজাকেই সমর্থন করা। আয়াতে এ ঘটনার প্রতিই ইশারা করা হয়েছে।

৫৩. তবে কি (বিশ্ব-জগতের) সার্বভৌমত্বে তাদের কোন অংশ লাভ হয়েছে? যদি তাই হত, তবে তারা মানুষকে খেজুর-বীচির আবরণ পরিমাণও কিছু দিত না।[৩৮]

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾

৫৪. নাকি তারা এই কারণে মানুষের প্রতি ঈর্ষা করে যে, তিনি তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ দান করেন (কেন?)। আমি তো ইবরাহীমের বংশধরদিগকে কিতাব ও হিকমত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে বিরাট রাজত্ব দিয়েছিলাম।[৩৯]

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

৫৫. সুতরাং তাদের মধ্যে কতক তো ঈমান আনে এবং কতক তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (ওই কাফিরদের সাজা দেওয়ার জন্য) জ্বলন্ত আগুনরূপে জাহান্নামই যথেষ্ট।

فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾

---

৩৮. মুসলিমদের প্রতি ইয়াহূদীদের ঈর্ষা ও বিদ্বেষের কারণ কী? কুরআন মাজীদ এ সম্পর্কে বলছে যে, তাদের আশা ছিল পূর্বেকার বহু নবী-রাসূল যেমন বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে হয়েছেন, তেমনি সর্বশেষ নবীও তাদের খান্দানেই জন্ম নেবেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশে জন্ম নিলেন, তখন তারা ঈর্ষাতুর হয়ে পড়ল। অথচ নবুওয়াত, খিলাফত ও হুকুমত আল্লাহ তাআলার এক অনুগ্রহ। তিনি যখন যাকে সমীচীন মনে করেন এ অনুগ্রহে ভূষিত করেন। কোনও লোক এতে আপত্তি করলে সে যেন দাবী করছে, বিশ্ব-জগতের রাজত্ব তার হাতে। নিজ পসন্দ মত নবী মনোনীত করার এখতিয়ার তারই। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন, রাজত্ব যদি কখনও তার হাতে যেত, তবে সে এতটা কার্পণ্য করত যে, সে কাউকে অণু পরিমাণও কিছু দিত না।

৩৯. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নিজ হিকমত অনুসারে যাকে সমীচীন মনে করেন নবুওয়াত, খিলাফত ও হুকুমতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। সুতরাং তিনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নবুওয়াত ও হিকমত দান করেন এবং তার বংশধরদের মধ্যে এ ধারা জারি রাখেন। ফলে তাদের মধ্যে কেউ নবী হওয়ার সাথে রাষ্ট্রনায়কও হন (যেমন হযরত দাউদ ও সুলায়মান আলাইহিমাস সালাম)। এ যাবৎ তাঁর এক পুত্র (হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম)-এর বংশেই নবুওয়াত ও হিকমতের ধারা চালু ছিল। এখন যদি তাঁর অপর পুত্র (হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম)-এর বংশে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেই মর্যাদায় ভূষিত করা হয়, তবে তাতে আপত্তি ও ঈর্ষার কী কারণ থাকতে পারে?

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

৫৬. নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে আমি তাদেরকে জাহান্নামে ঢোকাব। যখনই তাদের চামড়া জ্বলে সিদ্ধ হয়ে যাবে, তখন আমি তার পরিবর্তে অন্য চামড়া দিয়ে দেব, যাতে তারা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতাবানও এবং হিকমতেরও মালিক।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

৫৭. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আমি তাদেরকে এমন সব উদ্যানে প্রবিষ্ট করব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। তাতে তাদের জন্য পুত:পবিত্র স্ত্রী থাকবে। আর আমি তাদেরকে দাখিল করব নিবিড় ছায়ায়।[৪০]

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

৫৮. (হে মুসলিমগণ!) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার হকদারকে আদায় করে দেবে এবং যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ইনসাফের সাথে বিচার করবে। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ তোমাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেন, তা অতি উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

৫৯. হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, তাঁর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখতিয়ারধারী তাদেরও।[৪১]

---

৪০. ইশারা করা হচ্ছে যে, জান্নাতে আলো থাকবে, কিন্তু রোদের তাপ থাকবে না।

৪১. 'এখতিয়ারধারী' দ্বারা অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে মুসলিম শাসককে বোঝানো হয়েছে। যাবতীয় বৈধ বিষয়ে তাদের হুকুম মানাও মুসলিমদের জন্য ফরয। শাসকের আনুগত্য করা এই শর্তে ফরয যে, সে এমন কোনও কাজের আদেশ করবে না, যা শরীয়তে অবৈধ। কুরআন মাজীদ এ বিষয়টিকে দু'ভাবে পরিষ্কার করেছে। এক তো এভাবে যে,

فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿۵۹﴾

অত:পর তোমাদের মধ্যে যদি কোনও বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে তোমরা আল্লাহ ও পরকালে সত্যিকারের বিশ্বাসী হয়ে থাকলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রাসূলের উপর ন্যস্ত কর। এটাই উৎকৃষ্টতর পন্থা এবং এর পরিণামও সর্বাপেক্ষা শুভ।

[৯]

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْۤا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَ قَدْ اُمِرُوْۤا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿۶۰﴾

৬০. (হে নবী!) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে, তারা তোমার প্রতি যে কালাম নাযিল করা হয়েছে তাতেও ঈমান এনেছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছিল তাতেও, (কিন্তু) তাদের অবস্থা এই যে, তারা ফায়সালার জন্য তাগূতের কাছে নিজেদের মোকদ্দমা নিয়ে যেতে চায়? অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল, যেন সুস্পষ্টভাবে তাকে অস্বীকার করে।[৪২] বস্তুত শয়তান তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে চরমভাবে গোমরাহ করতে চায়।

এখতিয়ারধারীদের আনুগত্য করার হুকুমকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার হুকুম দানের পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, শাসকদের আনুগত্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের অধীন। দ্বিতীয়ত পরবর্তী বাক্যে আরও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, শাসকদের দেওয়া আদেশ সঠিক ও পালনযোগ্য কি না সে বিষয়ে যদি মতভেদ দেখা দেয়, তবে সে বিষয়টিকে আল্লাহ ও রাসূলের উপর ন্যস্ত কর। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর কষ্টি দ্বারা তা যাচাই করে দেখ। যদি তা কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী হয়, তবে তার আনুগত্য করা যাবে না। শাসকদের জন্য অপরিহার্য হয়ে যাবে সে আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া। আর যদি তা কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট ও স্বীকৃত বিধানের পরিপন্থী না হয়, তবে তা মান্য করা মুসলিম সাধারণের জন্য ফরয।

৪২. এ স্থলে সেই সকল মুনাফিকের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে, যারা মনে-প্রাণে ইয়াহুদী ছিল, কিন্তু মুসলিমদেরকে দেখানোর জন্য নিজেদেরকে মুসলিমরূপে জাহির করত। তাদের অবস্থা ছিল এ রকম- যে বিষয়ে তাদের মনে হত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অনুকূলে রায় দেবেন, সে বিষয়ের মোকদ্দমা তাঁর কাছেই পেশ করত, কিন্তু যে বিষয়ে তাঁর রায় তাদের প্রতিকূলে যাবে বলে মনে করত, সে বিষয়ের মোকদ্দমা তাঁর পরিবর্তে কোন ইয়াহুদী নেতার কাছে নিয়ে যেত, যাকে আয়াতে 'তাগূত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। মুনাফিকদের তরফ থেকে এরূপ বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছিল, যা বিভিন্ন

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ اِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ﴿٦١﴾

৬১. যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো সেই ফায়সালার দিকে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং এসো রাসূলের দিকে, তখন মুনাফিকদেরকে দেখবে তোমার থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

فَكَيْفَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ۖۗ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّاۤ اِحْسَانًا وَّ تَوْفِيْقًا ﴿٦٢﴾

৬২. যখন তাদের উপর তাদের নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কোনও মসিবত এসে পড়ে তখন তাদের কী অবস্থা দাঁড়ায়? তখন তারা আপনার কাছে এসে আল্লাহর নামে কসম করতে থাকে যে, আমাদের উদ্দেশ্য কল্যাণ সাধন ও মীমাংসা করিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।[৪৩]

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَّهُمْ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًۢا بَلِيْغًا ﴿٦٣﴾

৬৩. তারা এমন লোক যে, আল্লাহ তাদের মনের যাবতীয় বিষয় জানেন। সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর, তাদেরকে উপদেশ দাও এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে তাদের সঙ্গে হৃদয়গ্রাহী কথা বল।

وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا

৬৪. আমি কোনও রাসূলকে এছাড়া অন্য কোনও লক্ষ্যে পাঠাইনি যে, আল্লাহর হুকুমে তাঁর আনুগত্য করা হবে। তারা

রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে। 'তাগূত'-এর শাব্দিক অর্থ 'ঘোর অবাধ্য'। কিন্তু এ শব্দটি শয়তানের জন্যও ব্যবহৃত হয় এবং বাতিল ও মিথ্যার জন্যও। এস্থলে শব্দটি দ্বারা এমন বিচারক ও শাসককে বোঝানো হয়েছে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানাবলীর বিপরীতে নিজ খেয়াল-খুশী মত ফায়সালা দেয়। আয়াতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কোনও ব্যক্তি যদি মুখে নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে, কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের বিধানাবলীর উপর অন্য কোনও বিধানকে প্রাধান্য দেয়, তবে সে মুসলিম থাকতে পারে না।

৪৩. অর্থাৎ তারা যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবর্তে বা তার বিরুদ্ধে অন্য কাউকে নিজের বিচারক বানাচ্ছে, এটা যখন মানুষের কাছে প্রকাশ পেয়ে যায় এবং এ কারণে তাদেরকে নিন্দা বা কোনও শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়, তখন মিথ্যা শপথ করে বলতে থাকে, আমরা ওই ব্যক্তির কাছে আদালতী রায়ের জন্য নয়, বরং আপোসরফার কোন পথ বের করার জন্য গিয়েছিলাম, যাতে ঝগড়া-বিবাদের পরিবর্তে পরস্পর মিলমিশের কোন উপায় তৈরি হয়ে যায়।

اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿٦٤﴾

যখন তাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল, তখন যদি তারা তোমার কাছে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করত, তবে তারা আল্লাহকে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুই পেত।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾

৬৫. না, (হে নবী!) তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক মানে, তারপর তুমি যে রায় দাও, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনওরূপ কুণ্ঠাবোধ না করে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে নেয়।

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ۭ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ﴿٦٦﴾

৬৬. আমি যদি তাদের উপর ফরয করে দিতাম যে, তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা কর অথবা নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও, তবে তারা তা করত না- অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া। তাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, তারা যদি তা পালন করত, তবে তাদের পক্ষে তা বড়ই কল্যাণকর হত এবং তা তাদের অন্তরে অবিচলতা সৃষ্টিতে অত্যন্ত সহায়ক হত।[৪৪]

---

৪৪. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে বিভিন্ন রকমের কঠিন বিধান দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে একটা ছিল তাওবা হিসেবে পরস্পরে একে অন্যকে হত্যা করা। সূরা বাকারার ৫৪ নং আয়াতে তার উল্লেখ রয়েছে। এখন যদি সে রকম কঠিন কোন হুকুম দেওয়া হত, তবে তাদের কেউ তা পালন করত না। এখন তো তাদেরকে অতি সহজ নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেওয়া বিধানাবলী মনে-প্রাণে স্বীকার করে নাও। সুতরাং তাঁর সত্যিকার অনুগত বনে যাওয়াই তাদের জন্য নিরাপদ রাস্তা। কোনও কোনও বর্ণনায় আছে, কতক ইয়াহুদী এই বলে বড়ত্ব দেখাত যে, আমরা তো আল্লাহর এমনই এক অনুগত জাতি, যাদের পূর্ব পুরুষদেরকে পরস্পর একে অন্যকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হলে তারা সেই কঠোর নির্দেশকেও মানতে বিলম্ব করেনি। এ আয়াত তাদের সেই কথার দিকে ইশারা করছে।

وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّاۤ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٦٧﴾

৬৭. এবং সে অবস্থায় অবশ্যই আমি নিজের পক্ষ হতে তাদেরকে মহা প্রতিদান দান করতাম।

وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٦٨﴾

৬৮. এবং অবশ্যই তাদেরকে সরল পথ পর্যন্ত পৌঁছে দিতাম।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿٦٩﴾

৬৯. যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা সেই সকল লোকের সঙ্গে থাকবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সালিহগণের সঙ্গে। কতই না উত্তম সঙ্গী তারা!

ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ﴿٧٠﴾

৭০. এটা আল্লাহর পক্ষ হতে দেওয়া শ্রেষ্ঠত্ব। আর (মানুষের অবস্থাদি সম্পর্কে) পরিপূর্ণ ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।[৪৫]

[১০]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ﴿٧١﴾

৭১. হে মুমিনগণ! তোমরা (শত্রুর সাথে লড়াই কালে) নিজেদের আত্মরক্ষার উপকরণ সঙ্গে রাখ। অত:পর পৃথক পৃথক বাহিনীরূপে (জিহাদের জন্য) বের হও কিংবা সকলে একই সঙ্গে বের হও।

وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ﴿٧٢﴾

৭২. নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে এমন কেউও থাকবে, যে (জিহাদে বের হতে) গড়িমসি করবে। তারপর (জিহাদ কালে) তোমাদের কোনও মসিবত দেখা দিলে বলবে, আল্লাহ আমার উপর বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না।

وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ

৭৩. আর আল্লাহর পক্ষ হতে তোমরা কোনও অনুগ্রহ (বিজয় ও গনীমতের মাল) লাভ করলে সে বলবে- যেন

---

৪৫. অর্থাৎ তিনি কাউকে না জেনে এ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন না। বরং প্রত্যেকের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থেকেই দান করেন।

تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧٣﴾

তোমাদের ও তার মধ্যে কখনও কোনও সম্প্রীতি ছিল না[৪৬]– 'হায় যদি আমিও তাদের সঙ্গে থাকতাম, তবে আমারও অনেক কিছু অর্জিত হত!

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٧٤﴾

৭৪. সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুক। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে, অত:পর নিহত হবে বা জয়যুক্ত হবে, (সর্বাবস্থায়) আমি তাদেরকে মহা পুরস্কার দান করব।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۙۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾

৭৫. (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের জন্য এর কী বৈধতা আছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সেই সকল অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য লড়াই করবে না, যারা দু'আ করছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে– যার অধিবাসীরা জালিম– অন্যত্র সরিয়ে নাও এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে একজন অভিভাবক বানিয়ে দাও এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে একজন সাহায্যকারী দাঁড় করিয়ে দাও?

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿٧٦﴾

৭৬. যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা যুদ্ধ করে তাগূতের পথে। সুতরাং (হে মুসলিমগণ!) তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। (স্মরণ রেখ) শয়তানের কৌশল অতি দুর্বল।

---

৪৬. অর্থাৎ মুখে তো তারা মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব আছে বলে প্রকাশ করে, কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তাদের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা ও সিদ্ধান্তাবলী তাদের নিজ স্বার্থকে সামনে রেখেই নিষ্পন্ন হয়। নিজেরা তো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেই না, তদুপরি যুদ্ধে মুসলিমদের যদি কোন বিপদ দেখা দেয়, তাতে সমবেদনা জানাবে কি, উল্টো এই বলে আনন্দিত হয় যে, আমরা এ বিপদ থেকে বেঁচে গেছি। আবার মুসলিমগণ বিজয় ও গনীমত লাভ করলে তখন আর খুশী হয় না; বরং আফসোস করে যে, আমরা গনীমতের মাল থেকে বঞ্চিত হলাম!

[১১]

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِیۡنَ قِیۡلَ لَهُمۡ كُفُّوۡۤا اَیۡدِیَكُمۡ وَ اَقِیۡمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیۡهِمُ الۡقِتَالُ اِذَا فَرِیۡقٌ مِّنۡهُمۡ یَخۡشَوۡنَ النَّاسَ كَخَشۡیَةِ اللّٰهِ اَوۡ اَشَدَّ خَشۡیَةً ۚ وَ قَالُوۡا رَبَّنَا لِمَ كَتَبۡتَ عَلَیۡنَا الۡقِتَالَ ۚ لَوۡ لَاۤ اَخَّرۡتَنَاۤ اِلٰۤی اَجَلٍ قَرِیۡبٍ ؕ قُلۡ مَتَاعُ الدُّنۡیَا قَلِیۡلٌ ۚ وَ الۡاٰخِرَةُ خَیۡرٌ لِّمَنِ اتَّقٰی ۟ وَ لَا تُظۡلَمُوۡنَ فَتِیۡلًا ﴿۷۷﴾

৭৭. তোমরা কি তাদেরকে দেখনি, (মক্কী জীবনে) যাদেরকে বলা হত, তোমরা নিজেদের হাত সংযত রাখ, সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও। অত:পর যখন তাদের প্রতি যুদ্ধ ফরয করা হল, তখন তাদের মধ্য হতে একটি দল মানুষকে (শত্রুদেরকে) এমন ভয় করতে লাগল, যেমন আল্লাহকে ভয় করা হয়ে থাকে, কিংবা তার চেয়েও বেশি ভয়। তারা বলতে লাগল, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের প্রতি যুদ্ধ কেন ফরয করলেন? অল্প কালের জন্য আমাদেরকে অবকাশ দিলেন না কেন? বলে দাও, পার্থিব ভোগ সামান্য। যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য আখিরাত উৎকৃষ্টতর।[৪৭] তোমাদের প্রতি সুতা পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

৪৭. মুসলিমগণ মক্কা মুকাররমায় যখন কাফিরদের পক্ষ হতে কঠিন জুলুম-নির্যাতন ভোগ করছিল, তখন অনেকেরই মনে স্পৃহা সৃষ্টি হয়েছিল কাফিরদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা যুদ্ধ করবে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে জিহাদের হুকুম আসেনি। তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে মুসলিমদের জন্য সবর ও আত্মসংবরণের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রাখা হয়েছিল, যাতে এর মাধ্যমে তারা উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করতে পারে। কেননা তারপর যুদ্ধ করলে সে যুদ্ধ কেবল ব্যক্তিগত প্রতিশোধ স্পৃহায় হবে না; বরং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে হবে। তাই তখন কোন মুসলিম জিহাদের আকাঙ্ক্ষা করলে তাকে এ কথাই বলা হত যে, এখন নিজের হাত সংবরণ কর এবং জিহাদের পরিবর্তে সালাত, যাকাত ইত্যাদি আহকাম পালনে যত্নবান থাক। অত:পর তারা যখন হিজরত করে মদীনায় আসলেন তখন জিহাদ ফরয করা হল। তখন যেহেতু তাদের পুরানো আকাঙ্ক্ষা পূরণ হল, তখন তাদের খুশী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে কতকের কাছে মনে হল, দীর্ঘ তের বছর পর্যন্ত কাফিরদের অত্যাচার-উৎপীড়ন দ্বারা তাদের ধৈর্যের যে পরীক্ষা চলছিল সবে তার অবসান হল। এখন একটু শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পাওয়া গেল। কাজেই জিহাদের নির্দেশ কিছু কাল পরে আসলেই ভালো হত। তাদের এ আকাঙ্ক্ষার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তাআলার আদেশের উপর তাদের কিছুমাত্রও আপত্তি ছিল; এটা ছিল কেবলই এক মানবীয় চাহিদা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান সাহাবীদের মর্যাদা বহু উর্ধ্বে। পার্থিব কোন আরাম ও স্বস্তিকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ۗ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

৭৮. তোমরা যেখানেই থাক (এক দিন না এক দিন) মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, চাই তোমরা সুরক্ষিত কোন দুর্গেই থাক না কেন। তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) যদি কোন কল্যাণ লাভ হয়, তবে বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে। পক্ষান্তরে যদি তাদের মন্দ কিছু ঘটে, তবে (হে নবী!) তারা তোমাকে বলে, এ মন্দ ব্যাপারটা আপনার কারণেই ঘটেছে। বলে দাও, সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে ঘটে। ওই সব লোকের হল কি যে, তারা কোনও কিছু বোঝার ধারে কাছেও যায় না?

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾

৭৯. তোমার যা-কিছু কল্যাণ লাভ হয়, তা কেবল আল্লাহরই পক্ষ হতে আর তোমার যা-কিছু অকল্যাণ ঘটে, তা তোমার নিজেরই কারণে। এবং (হে নবী!) আমি তোমাকে মানুষের কাছে রাসূল করে পাঠিয়েছি। আর (এ বিষয়ের) সাক্ষ্য দানের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।[৪৮]

যে, তার কারণে আখিরাতের উপকারিতাকে সামান্য কিছু কালের জন্য হলেও পিছিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা হবে, এটা অন্তত তাদের পক্ষে শোভা পায় না।

৪৮. এ আয়াতসমূহে দুটি সত্য তুলে ধরা হয়েছে। (এক) এ জগতে যা-কিছু হয়, তা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও হুকুমেই হয়। কারও কোনও উপকার লাভ হলে তাও আল্লাহর হুকুমেই হয় এবং কারও কোনও ক্ষতি হলে তাও আল্লাহর হুকুমেই হয়। (দুই) দ্বিতীয়ত জানানো হয়েছে কারও কোনও উপকার বা ক্ষতির হুকুম আল্লাহ তাআলা কখন দেন ও কিসের ভিত্তিতে দেন। এ সম্পর্কে ৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, কারও কোনও উপকার ও কল্যাণ লাভের যে ব্যাপারটা, তার প্রকৃত কারণ কেবলই আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। কেননা কোনও মাখলুকেরই আল্লাহ তাআলার কাছে কোনও পাওনা নেই যে, আল্লাহ তাআলার তাকে তা দিতেই হবে। মানুষের কোনও কর্মকে যদি আপাতদৃষ্টিতে তার কোনও কল্যাণের কারণ বলে মনেও হয়, তবে এটা তো সত্য যে, তার সে কর্ম আল্লাহ তাআলার দেওয়া তাওফীকেরই ফল। কাজেই সে কল্যাণ আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ছাড়া কিছু নয়। সেটা তার প্রাপ্য ও হক নয় কিছুতেই। অন্যদিকে মানুষের যদি কোন অকল্যাণ দেখা দেয়, তবে যদিও তা আল্লাহ তাআলার হুকুমেই হয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ হুকুম কেবল তখনই দেন, যখন সে ব্যক্তি নিজ এখতিয়ার ও ইচ্ছাক্রমে কোন অন্যায় বা ভুল করে থাকে। মুনাফিকদের চরিত্র ছিল যে, তাদের কোনও কল্যাণ লাভ হলে সেটাকে তো আল্লাহ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۟

৮০. যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহরই আনুগত্য করল আর যারা (তাঁর আনুগত্য হতে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি (হে নবী!) তোমাকে তাদের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে পাঠাইনি (যে, তাদের কাজের দায়-দায়িত্ব তোমার উপর বর্তাবে)।

وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۫ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ؕ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۟

৮১. আর তারা (ওই সকল মুনাফিক সামনে তো) আনুগত্যের কথা বলে, কিন্তু তারা যখন তোমার কাছ থেকে বাইরে চলে যায়, তখন তাদের একটা দল রাতের বেলা তোমার কথার বিপরীতে পরামর্শ করে। তারা রাতের বেলা যে পরামর্শ করে, আল্লাহ তা সব লিখে রাখছেন। সুতরাং তুমি তাদের কোন পরওয়া করো না এবং আল্লাহর উপর নির্ভর কর। তোমার সাহায্যের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ۟

৮২. তারা কি কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ হতে হত তবে এর মধ্যে বহু অসঙ্গতি পেত।[৪৯]

তাআলার সাথে সম্পৃক্ত করত, কিন্তু কোনও রকম ক্ষতি হয়ে গেলে তার দায়-দায়িত্ব চাপাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। এর দ্বারা যদি তাদের বোঝানো উদ্দেশ্য হয়, সে ক্ষতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমে হয়েছে, তবে তো এটা বিলকুল গলত। কেননা বিশ্ব জগতের সকল কাজ কেবল আল্লাহ তাআলার হুকুমেই হয়। অন্য কারও হুকুমে নয়। আর যদি বোঝানো উদ্দেশ্য হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনও ভুলের কারণে সে ক্ষতি হয়েছে, তবে নিঃসন্দেহে এটাও গলত কথা। কেননা প্রতিটি মানুষের যা-কিছু অকল্যাণ দেখা দেয়, তা তার নিজেরই কর্মফল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তো রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। কাজেই জগতে লাভ-লোকসান ও সৃষ্টি-লয় সংক্রান্ত যা-কিছু ঘটে তার দায়-দায়িত্ব যেমন তাঁর উপর বর্তায় না, তেমনি রিসালাতের দায়িত্ব পালনেও তাঁর দ্বারা কোনও ত্রুটি ঘটা সম্ভব নয়, যার খেসারত তাঁর উম্মতকে দিতে হবে।

৪৯. এমনিতে তো মানুষের কোনও প্রচেষ্টাই দুর্বলতামুক্ত নয় এবং সে কারণেই মানব-রচিত বই-পুস্তকে প্রচুর স্ববিরোধিতা ও অসঙ্গতি পাওয়া যায়। কিন্তু কোনও ব্যক্তি যদি নিজে কোনও পুস্তক রচনা করে দাবী করে এটা আল্লাহর কিতাব, তবে তাতে অবশ্যই প্রচুর

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

৮৩. তাদের কাছে যখন কোন সংবাদ আসে, তা শান্তির হোক বা ভীতির, তারা তা (যাচাই না করেই) প্রচার শুরু করে দেয়। তারা যদি তা রাসূল বা যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদের কাছে নিয়ে যেত, তবে তাদের মধ্যে যারা তার তথ্য অনুসন্ধানী তারা তার বাস্তবতা জেনে নিত।[৫০] এবং (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত না হত, তবে অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া বাকি সকলে শয়তানের অনুগামী হয়ে যেত।

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿٨٤﴾

৮৪. সুতরাং (হে নবী!) তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। তোমার উপর তোমার নিজের ছাড়া অন্য কারও দায়ভার নেই। অবশ্য মুমিনদেরকে উৎসাহ দিতে থাক। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ কাফিরদের যুদ্ধ ক্ষমতা চূর্ণ করে দেবেন। আল্লাহর শক্তি সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড এবং তাঁর শাস্তি অতি কঠোর।

مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ

৮৫. যে ব্যক্তি কোন ভালো সুপারিশ করে, সে তা থেকে অংশ পায় আর যে ব্যক্তি

গরমিল ও সাংঘর্ষিক কথাবার্তা থাকবে। যারা পূর্ববর্তী নবী-রাসূলের আনীত কিতাবে প্রক্ষেপণ ও বিকৃতি সাধন করেছে, তাদের সে দুষ্কর্মের কারণে সে সব কিতাবে নানা রকম গরমিল সৃষ্টি হয়ে গেছে। সেটাও এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, মানব রচনায়, বিশেষত তা যদি আল্লাহর নামে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তবে তাতে অসঙ্গতি থাকা অবধারিত। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানবী (রহ.) রচিত 'ইজহারুল হক' গ্রন্থখানি পড়ুন। তার উর্দূ তরজমাও হয়েছে, যা 'বাইবেল সে কুরআন তাক্' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

৫০. মদীনা মুনাওয়ারায় এক শ্রেণীর লোক সঠিকভাবে না জেনেই গুজব ছড়িয়ে দিত, যার দ্বারা সমাজের অনেক ক্ষতি হত। এ আয়াতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে, যেন সঠিকভাবে না জেনে কেউ কোন গুজবে বিশ্বাস না করে এবং তা অন্যদের কাছে না পৌঁছায়।

وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ﴿٨٥﴾

কোন মন্দ সুপারিশ করে, সেও সেই মন্দত্ব থেকে অংশ পায়, আল্লাহ সর্ববিষয়ে নজর রাখেন।[৫১]

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَاۤ اَوْ رُدُّوْهَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ﴿٨٦﴾

৮৬. যখন কেউ তোমাদেরকে সালাম করে, তখন তোমরা তাকে তদপেক্ষাও উত্তম পন্থায় সালাম দিও কিংবা (অন্ততপক্ষে) সেই শব্দেই তার জবাব দিও।[৫২] নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর হিসাব রাখেন।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ﴿٨٧﴾

৮৭. আল্লাহ– তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে অবশ্যই একত্র করবেন; যে দিনের আসার ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। এমন কে আছে, যে কথায় আল্লাহ অপেক্ষা বেশি সত্যবাদী?

[১২]

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ

৮৮. অত:পর তোমাদের কী হল যে, মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমরা দু'দল হয়ে গেলে?[৫৩] অথচ তারা যে কাজ করেছে

---

৫১. পূর্বের আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করা হয়েছিল, তিনি যেন মুসলিমদেরকে জিহাদ করতে উৎসাহ দেন। অত:পর এ আয়াতে ইশারা করে দেওয়া হয়েছে যে, আপনার উৎসাহ দানের ফলে যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করবে, তাদের সওয়াবে আপনিও শরীক থাকবেন। কেননা ভালো কাজে সুপারিশ করার ফলে কেউ যদি সেই ভালো কাজ করে, তবে তাতে সে যে সওয়াব পায়, সেই সওয়াবে সুপারিশকারীরও অংশ থাকে। এমনিভাবে মন্দ সুপারিশের ফলে যদি কোনও মন্দ কাজ হয়ে যায়, তবে সে কাজের কর্তার যে গুনাহ হবে, সুপারিশকারীও তাতে সমান অংশীদার হবে।

৫২. সালামও যেহেতু আল্লাহ তাআলার সমীপে এক সুপারিশ, তাই সুপারিশের বিধান বর্ণনা করার সাথে সালামের বিধানও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে সারকথা হল, কোনও ব্যক্তি যে শব্দে সালাম দিয়েছে, উত্তম হচ্ছে তাকে তদপেক্ষা আরও ভালো শব্দে জবাব দেওয়া, যেমন সে যদি বলে থাকে 'আস-সালামু আলাইকুম', তবে জবাবে বলা চাই 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'। সে যদি বলে, 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ', তবে উত্তরে বলা চাই 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ'। তবে হুবহু তারই শব্দে যদি জবাব দেওয়া হয়, সেটাও জায়েয। কোনও মুসলিম ব্যক্তি সালাম দিলে তার জবাব না দেওয়া গুনাহ।

৫৩. এসব আয়াতে চার প্রকার মুনাফিকের অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক প্রকার সম্পর্কে আলাদা-আলাদা নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। ৮৮নং আয়াতে মুনাফিকদের প্রথম প্রকার

بِمَا كَسَبُوْا ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿۸۸﴾

তার দরুণ আল্লাহ তাদেরকে উল্টিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে (তার ইচ্ছা অনুযায়ী) গোমরাহীতে লিপ্ত করেছেন, তোমরা কি তাকে হিদায়াতের উপর আনতে চাও? আল্লাহ যাকে গোমরাহীতে লিপ্ত করেন, তার জন্য তুমি কখনই কোন কল্যাণের পথ পাবে না।

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۪ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۸۹﴾

৮৯. তারা কামনা করে, তারা নিজেরা যেমন কুফর অবলম্বন করেছে, তেমনি তোমরাও কাফির হয়ে যাও। সুতরাং (হে মুসলিমগণ!) তোমরা তাদের মধ্য হতে কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর পথে হিজরত না করে। যদি তারা (হিজরত করাকে) উপেক্ষা করে, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং তাদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর আর তাদের কাউকেই নিজের বন্ধুরূপেও গ্রহণ করবে না এবং সাহায্যকারীরূপেও না।

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ

৯০. তবে ওই সকল লোক এ নির্দেশ থেকে ব্যতিক্রম, যারা এমন কোনও সম্প্রদায়ের সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে, যাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনও (শান্তি) চুক্তি আছে। অথবা যারা তোমাদের কাছে

সম্পর্কে আলোচনা। এরা ছিল মক্কা মুকাররমার কতিপয় লোক। তারা মদীনায় এসে বাহ্যত মুসলিম হয়ে গেল এবং মুসলিমদের সহানুভূতি লাভ করল। কিছু কাল পর তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে ব্যবসার ছলে মক্কায় যাওয়ার অনুমতি নিয়ে নিল এবং চলেও গেল। তাদের সম্পর্কে কতক মুসলিমের রায় ছিল যে, তারা খাঁটি মুসলিম আবার অন্যরা তাদের মুনাফিক মনে করত। কিন্তু তারা মক্কা মুকাররামা যাওয়ার পর যখন আর ফিরে আসল না, তখন তাদের কুফর জাহির হয়ে গেল। কেননা তখন মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেউ হিজরত না করলে তাকে মুসলিম গণ্য করা হত না। সুতরাং এ আয়াতের অর্থ এই যে, যখন তাদের মুনাফিকী উন্মোচিত হয়ে গেল, তখন তাদের সম্পর্কে মতভিন্নতার কোনও অবকাশ নেই।

عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ۝

এমন অবস্থায় আসে যখন তাদের মন তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অসম্মত থাকে এবং নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে অসম্মত থাকে।[৫৪] আল্লাহ চাইলে তাদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দান করতেন, ফলে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করত। সুতরাং তারা যদি তোমাদের থেকে পাশ কাটিয়ে চলে ও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে শান্তির প্রস্তাব দেয় তবে আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে কোনওরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার দেননি।

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ؕ كُلَّمَا رُدُّوْۤا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْۤا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْۤا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ

৯১. (মুনাফিকদের মধ্যে) অপর কিছু লোককে পাবে, যারা তোমাদের থেকেও নিরাপদ থাকতে চায় এবং তাদের সম্প্রদায় হতেও নিরাপদ থাকতে চায়। (কিন্তু) যখনই তাদেরকে ফিতনার দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য ডাকা হয়, অমনি তারা উল্টে গিয়ে তাতে পতিত হয়।[৫৫]

---

৫৪. যে সকল মুনাফিকের কুফর প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল, পূর্বের আয়াতে তাদের সাথে যুদ্ধ ও তাদেরকে হত্যা করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য দুই শ্রেণীর লোককে তা থেকে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছিল (ক) যারা এমন কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে গিয়ে মিলেছে যাদের সঙ্গে মুসলিমদের শান্তিচুক্তি ছিল আর (খ) সেই সকল লোক যারা যুদ্ধ করতে বিলকুল নারাজ ছিল, না মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক ছিল, না নিজেদের কওমের সাথে। মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ না করলে খোদ তাদের কওমই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে এই আশঙ্কা থাকার কারণেই কেবল তারা কওমের সাথে মিলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসত। এই শ্রেণীর লোক সম্পর্কেও মুসলিমদেরকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করে। এ পর্যন্ত মুনাফিকদের তিন শ্রেণী হল।

৫৫. পূর্বের আয়াতে মুনাফিকদের তৃতীয় শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা ছিল, যারা বাস্তবিকই যুদ্ধ করতে সম্মত ছিল না এবং মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোনও আগ্রহ রাখত না। এ আয়াতে মুনাফিকদের চতুর্থ প্রকারের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। তারা যুদ্ধে অসম্মত থাকার ব্যাপারেও কপটতার আশ্রয় নিত। প্রকাশ তো করত তারা কিছুতেই মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায় না, কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিল এর বিপরীত। তারা এরূপ প্রকাশ করত কেবল এ

ثَقِفْتُمُوْهُمْ ؕ وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿٩١﴾

সুতরাং এসব লোক যদি তোমাদের (সঙ্গে যুদ্ধ করা) থেকে সরে না যায়, শান্তি প্রস্তাব না দেয় এবং নিজেদের হাত সংযত না করে, তবে তাদেরকেও পাকড়াও কর এবং যেখানেই তাদেরকে পাও হত্যা কর। আল্লাহ্ এরূপ লোকদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সুস্পষ্ট এখতিয়ার দান করেছেন।

[১৩]

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ؕ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ؕ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ

৯২. এটা কোনও মুসলিমের কাজ হতে পারে না যে, সে ইচ্ছাকৃত কোনও মুসলিমকে হত্যা করবে। ভুলবশত এরূপ হয়ে গেলে সেটা ভিন্ন কথা।[৫৬] যে ব্যক্তি কোনও মুসলিমকে ভুলবশত হত্যা করবে, তার উপর ফরয একজন মুসলিম গোলামকে আযাদ করা এবং নিহতের ওয়ারিশদেরকে দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করা, অবশ্য তারা ক্ষমা করে দিলে ভিন্ন কথা। নিহত ব্যক্তি যদি এমন কোনও সম্প্রদায়ের লোক হয়, যারা তোমাদের শত্রু অথচ সে নিজে মুসলিম, তবে কেবল একজন মুসলিম গোলামকে আযাদ করা ফরয (দিয়াত বা রক্তপণ দিতে হবে না)।[৫৭] নিহত ব্যক্তি যদি

কারণে, যাতে মুসলিমগণ তাদেরকে হত্যা করা হতে বিরত তাকে। সুতরাং অন্যান্য কাফির যখন তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্তে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাত, তখন তারা পত্রপাঠ সে চক্রান্তে যোগ দিত।

৫৬. ভুলবশত হত্যার অর্থ হল, কাউকে হত্যা করা উদ্দেশ্য ছিল না; বরং বেখেয়ালে গুলি বের হয়ে গেছে অথবা উদ্দেশ্য ছিল কোনও জন্তুকে মারা, কিন্তু নিশানা ভুল হওয়ার কারণে গুলি লেগে গেছে কোনও মানুষের গায়ে– পরিভাষায় একে 'কাত্লুল খাতা' বা 'ভুলবশত হত্যা' বলে। আয়াতে এর বিধান বলা হয়েছে দু'টি। (ক) হত্যাকারীকে কাফফারা আদায় করতে হবে এবং (খ) দিয়াত দিতে হবে। কাফফারা হল একজন মুসলিম গোলামকে আযাদ করা আর গোলাম পাওয়া না গেলে একাধারে দু'মাস রোযা রাখা। দিয়াত অর্থাৎ রক্তপণ হল একশ' উট বা দশ হাজার দীনার, যেমন বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে।

৫৭. এর দ্বারা দারুল হারবে (অমুসলিম রাষ্ট্রে) অবস্থানকারী মুসলিমকে বোঝানো হয়েছে। তাকে ভুলবশত হত্যা করলে শুধু কাফফারা ওয়াজিব হয়, দিয়াত ওয়াজিব নয়।

وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۫ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۹۲﴾

এমন সম্প্রদায়ের লোক হয় (যারা মুসলিম নয় বটে, কিন্তু) যাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন চুক্তি সম্পাদিত রয়েছে, তবে (সেক্ষেত্রেও) তার ওয়ারিশদেরকে রক্তপণ দেওয়া ও একজন মুসলিম গোলাম আযাদ করা ফরয।[৫৮] অবশ্য কারও কাছে গোলাম না থাকলে সে অনবরত দু'মাস রোযা রাখবে। এটা তাওবার নিয়ম, যা আল্লাহ স্থির করে দিয়েছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿۹۳﴾

৯৩. যে ব্যক্তি কোনও মুসলিমকে জেনেশুনে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম, যাতে সে সর্বদা থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি গযব নাযিল করবেন ও তাকে লানত করবেন। আর আল্লাহ তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰۤى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ؕ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ

৯৪. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর করবে, তখন যাচাই-বাছাই করে দেখবে। কেউ তোমাদেরকে সালাম দিলে পার্থিব জীবনের উপকরণ লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাকে বলবে না যে, 'তুমি মুমিন নও'।[৫৯] কেননা আল্লাহর নিকট

---

৫৮. অর্থাৎ যেই অমুসলিম ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে নিরাপদে বসবাস করছে (পরিভাষায় যাকে যিম্মী বলে), তাকে হত্যা করা হলে, সে ক্ষেত্রে মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করার মত দিয়াত ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়।

৫৯. 'আল্লাহর পথে সফর করা' দ্বারা জিহাদে যাওয়া বোঝানো হয়েছে। একবার একটা ঘটনা ঘটে যে, এক জিহাদের সময় কিছু সংখ্যক অমুসলিম নিজেদের মুসলিম হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দানের লক্ষ্যে সাহাবায়ে কেরামকে সালাম দিল। সাহাবীগণ মনে করলেন, তারা কেবল নিজেদের প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যেই সালাম দিয়েছে; প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। সুতরাং তারা তাদেরকে হত্যা করে ফেললেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। এতে মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, কোনও ব্যক্তি যদি আমাদের সামনে ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের সমস্ত আকীদা-বিশ্বাস স্বীকার করে নেয় তবে আমরা তাকে মুসলিমই মনে করব আর তার মনের অবস্থা আল্লাহর কাছে ছেড়ে দেব। প্রকাশ

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۹۴﴾

প্রচুর গনীমতের সম্পদ রয়েছে। তোমরাও তো পূর্বে এ রকমই ছিলে। অত:পর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন।[৬০] সুতরাং যাচাই-বাছাই করে দেখবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত।

لَا يَسْتَوِی الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِی الضَّرَرِ وَ الْمُجٰهِدُوْنَ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ عَلَی الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَ كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰی ؕ وَ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَی الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۹۵﴾

৯৫. যে মুসলিমগণ কোনও ওযর না থাকা সত্ত্বেও (যুদ্ধে যোগদান না করে বরং ঘরে) বসে থাকে, তারা ও আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদকারীগণ সমান নয়। যারা নিজেদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে, যারা বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তবে আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[৬১] আর যারা ঘরে বসে থাকে আল্লাহ তাদের উপর মুজাহিদদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে মহা পুরস্কার দান করেছেন।

থাকে যে, আয়াতে আদৌ এরূপ বলা হয়নি যে, কোনও ব্যক্তি কুফরী আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করা সত্ত্বেও কেবল 'আস-সালামু আলাইকুম' বলে দেওয়ার কারণে তাকে মুসলিম গণ্য করতে হবে।

৬০. অর্থাৎ প্রথম দিকে তোমরাও অমুসলিম ছিলে। আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন বলেই তোমরা মুসলিম হতে পেরেছ। কিন্তু তোমরা যে খাঁটি মুসলিম, তার সপক্ষে তোমাদের মৌখিক স্বীকারোক্তি ছাড়া আর কোনও প্রমাণ নেই। তোমাদের মৌখিক স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই তোমাদের মুসলিম গণ্য করা হয়েছে।

৬১. জিহাদ যখন সকলের উপর ফরযে আইন থাকে না, এটা সেই অবস্থার কথা। সেক্ষেত্রে যারা জিহাদে না গিয়ে ঘরে বসে থাকে, যদিও তাদের কোনও গুনাহ নেই এবং ঈমান ও অন্যান্য সৎকর্মের কারণে আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদাও রয়েছে, কিন্তু তাদের চেয়ে যারা জিহাদে যোগদান করে তাদের মর্যাদা অনেক বেশি। তবে জিহাদ যখন 'ফরযে আইন' হয়ে যায় অর্থাৎ মুসলিমদের নেতা যখন সকল মুসলিমকে জিহাদে যোগদানের হুকুম দেয় কিংবা শত্রু বাহিনী যখন মুসলিমদের উপর চড়াও হয়, তখন ঘরে বসে থাকা হারাম হয়ে যায়।

দَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۹۶﴾

৯৬. অর্থাৎ বিশেষভাবে নিজের পক্ষ হতে উচ্চ মর্যাদা, মাগফিরাত ও রহমত। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[১৪]

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿۹۷﴾

৯৭. নিজ সত্তার উপর জুলুম রত থাকা অবস্থায়ই[৬২] ফিরিশতাগণ যাদের রূহ কব্জা করার জন্য আসে, তাদেরকে লক্ষ্য করে তারা বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, যমীনে আমাদেরকে অসহায় করে রাখা হয়েছিল। ফিরিশতাগণ বলে, আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে? সুতরাং এরূপ লোকদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং তা অতি মন্দ পরিণতি।

اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ﴿۹۸﴾

৯৮. তবে সেই সকল অসহায় নর, নারী ও শিশু (এই পরিণতি হতে ব্যতিক্রম), যারা (হিজরতের) কোনও উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং (বের হওয়ার) কোনও পথ পায় না।

فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿۹۹﴾

৯৯. পূর্ণ আশা রয়েছে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ বড় পাপমোচনকারী, অতি ক্ষমাশীল।

---

৬২. 'নিজ সত্তার উপর জুলুম করা' কুরআন মাজীদের একটি পরিভাষা। এর অর্থ কোনও গুনাহে লিপ্ত হওয়া। বস্তুত গুনাহ করার দ্বারা মানুষ নিজ সত্তারই ক্ষতি করে থাকে। এ আয়াতে নিজ সত্তার উপর জুলুমকারী বলে সেই সকল লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেনি। মুসলিমদের উপর যখন হিজরতের হুকুম আসে তখন মক্কায় অবস্থানকারী মুসলিমের জন্য মদীনায় হিজরত করা ফরয হয়ে গিয়েছিল; হিজরতকে তাদের ঈমানের অপরিহার্য দাবী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। কেউ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হিজরত না করলে তাকে মুসলিমই গণ্য করা হত না। এ রকমই কিছু লোকের কাছে যখন ফিরিশতাগণ প্রাণ-সংহারের জন্য এসেছিলেন, তখন কী কথোপকথন হয়েছিল এ আয়াতে সেটাই তুলে ধরা হয়েছে। হিজরতের হুকুম অমান্য করার কারণে তারা যেহেতু মুসলিমই থাকেনি, তাই তারা জাহান্নামী হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য যারা কোনও অপারগতার কারণে হিজরত করতে পারে না, একই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ওযরের কারণে তারা ক্ষমাযোগ্য।

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ؕ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۰۰﴾

১০০. যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে হিজরত করবে, সে যমীনে বহু জায়গা ও প্রশস্ততা পাবে। আর যে ব্যক্তি নিজ গৃহ থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করার জন্য বের হয়, অত:পর তার মৃত্যু এসে পড়ে, তারও সওয়াব আল্লাহর কাছে স্থিরীকৃত রয়েছে। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[১৫]

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿۱۰۱﴾

১০১. তোমরা যখন যমীনে সফর কর এবং তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদেরকে পেরেশান করবে তখন সালাত কসর করলে তাতে তোমাদের কোনও গুনাহ নেই।[৬৩] নিশ্চয়ই কাফিরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ ۫ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ۪ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ

১০২. এবং (হে নবী!) তুমি যখন তাদের মধ্যে উপস্থিত থাক ও তাদের নামায পড়াও, তখন (শত্রুর সাথে মুকাবিলার সময় তার নিয়ম এই যে,) মুসলিমদের একটি দল তোমার সাথে দাঁড়াবে এবং নিজের অস্ত্র সাথে রাখবে। অত:পর তারা যখন সিজদা করে নেবে তখন তারা তোমাদের পিছনে চলে যাবে এবং

৬৩. আল্লাহ তাআলা সফর অবস্থায় জোহর, আসর ও ইশার নামায অর্ধেক করে দিয়েছেন। একে কসর বলে। সাধারণ সফরে সর্বাবস্থায় কসর ওয়াজিব, তাতে শত্রুর ভয় থাকুক বা নাই থাকুক। কিন্তু এস্থলে এক বিশেষ ধরনের কসর সম্পর্কে আলোচনা করা উদ্দেশ্য, যা কেবল শত্রুর সাথে মুকাবিলা করার সময়ই প্রযোজ্য। তাতে এই সুবিধাও দেওয়া হয়েছে যে, মুসলিম সৈন্যগণ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে একই ইমামের পেছনে পালাক্রমে এক রাকাআত করে আদায় করবে এবং দ্বিতীয় রাকাআত পরে একাকী পূর্ণ করবে। পরবর্তী আয়াতে এর নিয়ম বলে দেওয়া হয়েছে। এটা যেহেতু বিশেষ ধরনের কসর, যাকে 'সালাতুল খাওফ' বলা হয় এবং শত্রুর সাথে মুকাবিলাকালেই প্রযোজ্য হয়, তাই এর জন্য শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, 'তোমাদের আশঙ্কা হয় কাফিরগণ তোমাদেরকে পেরেশান করবে' (ইবনে জারীর)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'যাতুর রিকা'-এর যুদ্ধকালে 'সালাতুল খাওফ' পড়েছিলেন। সালাতুল খাওফের বিস্তারিত নিয়ম হাদীস ও ফিকহের গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হয়েছে।

اَسۡلِحَتِكُمۡ وَ اَمۡتِعَتِكُمۡ فَيَمِيۡلُوۡنَ عَلَيۡكُمۡ مَّيۡلَةً وَّاحِدَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ اِنۡ كَانَ بِكُمۡ اَذًى مِّنۡ مَّطَرٍ اَوۡ كُنۡتُمۡ مَّرۡضٰۤى اَنۡ تَضَعُوۡۤا اَسۡلِحَتَكُمۡ‌ۚ وَخُذُوۡا حِذۡرَكُمۡ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلۡكٰفِرِيۡنَ عَذَابًا مُّهِيۡنًا ۝

অন্য দল, যারা এখনও নামায পড়েনি, সামনে এসে যাবে এবং তারা তোমার সাথে নামায পড়বে। তারাও নিজেদের সাথে আত্মরক্ষার উপকরণ ও অস্ত্র সাথে রাখবে। কাফিরগণ কামনা করে, তোমরা যেন তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও, যাতে তারা অতর্কিতে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা পীড়িত থাক, তবে অস্ত্র রেখে দিলেও তোমাদের কোনও গুনাহ নেই; কিন্তু আত্মরক্ষার সামগ্রী সাথে রাখবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

فَاِذَا قَضَيۡتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذۡكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوۡدًا وَّعَلٰى جُنُوۡبِكُمۡ‌ۚ فَاِذَا اطۡمَاۡنَنۡتُمۡ فَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ‌ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتۡ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ كِتٰبًا مَّوۡقُوۡتًا ۝

১০৩. যখন তোমরা সালাত আদায় করে ফেলবে, তখন আল্লাহকে (সর্বাবস্থায়) স্মরণ করতে থাকবে– দাঁড়িয়েও, বসেও এবং শোওয়া অবস্থায়ও।[৬৪] অত:পর যখন (শত্রুর দিক থেকে) নিরাপত্তা বোধ করবে, তখন সালাত যথারীতি আদায় করবে। নিশ্চয়ই সালাত মুসলিমদের উপর এমন এক অবশ্য পালনীয় কাজ যা সময়ের সাথে আবদ্ধ।

وَلَا تَهِنُوۡا فِى ابۡتِغَآءِ الۡقَوۡمِ‌ؕ اِنۡ تَكُوۡنُوۡا تَاۡلَمُوۡنَ فَاِنَّهُمۡ يَاۡلَمُوۡنَ كَمَا تَاۡلَمُوۡنَ‌ ۚ وَتَرۡجُوۡنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرۡجُوۡنَ‌ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيۡمًا حَكِيۡمًا ۝

১০৪. তোমরা ওই সব লোকের (অর্থাৎ কাফির দুশমনদের) অনুসন্ধানে দুর্বলতা দেখিও না। তোমাদের যদি কষ্ট হয়ে থাকে, তবে তাদেরও তো তোমাদেরই মত কষ্ট হয়েছে।[৬৫] আর তোমরা

---

৬৪. অর্থাৎ সফর বা ভীতি অবস্থায় নামায কসর (সংক্ষেপ) হয় বটে, কিন্তু আল্লাহর যিকির সর্বাবস্থায়ই চালু রাখা চাই। কেননা এর জন্য যেমন কোনও সময় নির্দিষ্ট নেই, তেমনি পদ্ধতিও। দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সর্বাবস্থায়ই যিকির করা যেতে পারে।

৬৫. যুদ্ধ শেষে মানুষ ক্লান্ত-শ্রান্ত থাকে এবং তখন শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করা কঠিন মনে হয়, কিন্তু তখনও যদি সামরিক দৃষ্টিতে সমীচীন মনে হয় এবং সেনাপতি হুকুম দেয় তবে পশ্চাদ্ধাবণ

আল্লাহর কাছে এমন জিনিসের আশা কর, যার আশা তারা করে না। আল্লাহ জ্ঞানেরও মালিক এবং হিকমতেরও মালিক।

[১৬]

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

১০৫. নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সত্য-সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আল্লাহ তোমাকে যে উপলব্ধি দিয়েছেন, সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে মীমাংসা করতে পার। আর তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষ অবলম্বন করো না।[৬৬]

করা অবশ্য কর্তব্য। বিষয়টি এভাবে চিন্তা করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যেমন ক্লান্ত তেমনি তো শত্রুও। আর মুসলিমদের তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সাহায্য ও সওয়াবের আশা আছে, যা শত্রুদের নেই।

৬৬. এ আয়াতসমূহ যদিও সাধারণ পথ-নির্দেশ সম্বলিত, কিন্তু নাযিল হয়েছে বিশেষ এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। বনু উবায়রিকের বিশর নামক এক ব্যক্তি, যে বাহ্যিকভাবে মুসলিম ছিল, হযরত রিফাআ নামক এক সাহাবীর ঘর থেকে কিছু খাদ্যশস্য ও হাতিয়ার চুরি করে নিয়ে যায়। আর নেওয়ার সময় সে এই চালাকি করে যে, খাদ্যশস্য যে বস্তায় ছিল তার মুখ কিছুটা আলগা করে রাখে। ফলে রাস্তায় অল্প-অল্প গম পড়তে থাকে। এভাবে যখন এক ইয়াহুদীর বাড়ির দরজায় পৌঁছায় তখন সে বস্তার মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। পরে আবার চোরাই হাতিয়ারও সেই ইয়াহুদীর বাড়িতে রেখে আসে, অত:পর যখন অনুসন্ধান করা হল, তখন একে তো ইয়াহুদীর বাড়ি পর্যন্ত খাদ্যশস্য পড়ে থাকতে দেখা গেল। দ্বিতীয়ত: হাতিয়ারও তার বাড়িতেই পাওয়া গেল। তাই প্রথম দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেয়াল এ দিকেই গেল যে, সেই ইয়াহুদীই চুরি করেছে। ইয়াহুদীকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল, হাতিয়ার তো বিশর নামক এক ব্যক্তি আমার কাছে রেখে গেছে। কিন্তু সে যেহেতু এর সপক্ষে কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারছিল না, তাই তাঁর ধারণা হল সে নিজের জান বাঁচানোর জন্যই বিশরের নাম নিচ্ছে। অপর দিকে বিশরের খান্দান বনু উবায়রিকের লোকজনও বিশরের পক্ষাবলম্বন করল এবং তারা জোর দিয়ে বলল, বিশরের নয়; বরং ওই ইয়াহুদীরই শাস্তি হওয়া উচিত। এ পরিস্থিতিতেই এ আয়াত নাযিল হয় এবং এর মাধ্যমে বিশরের ধোঁকাবাজীর মুখোশ খুলে দেওয়া হয়। আর ইয়াহুদীকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। বিশর যখন জানতে পারল গোমর ফাঁস হয়ে গেছে, তখন সে পালিয়ে মক্কায় চলে গেল এবং কাফিরদের সাথে মিলিত হল। সেখানেই কুফর অবস্থায় অত্যন্ত ঘৃণিত অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে। এ আয়াতসমূহের দ্বারা এক দিকে তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ঘটনার প্রকৃত অবস্থা উন্মোচন করে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমায় ফায়সালা দানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বাতলে দেওয়া হয়। প্রথম মূলনীতি হল, যে-কোনও ফায়সালা আল্লাহ তাআলার কিতাবে প্রদত্ত

وَّ اسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا ۚ﴿١٠٦﴾

১০৬. এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِیْنَ یَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِیْمًا ۚ﴿١٠٧﴾

১০৭. এবং কোনও বিবাদ-বিসংবাদে সেই সকল লোকের পক্ষপাতিত্ব করো না, যারা নিজেদের সঙ্গেই খেয়ানত করে। আল্লাহ কোনও খেয়ানতকারী পাপিষ্ঠকে পসন্দ করেন না।

یَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا یَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ یُبَیِّتُوْنَ مَا لَا یَرْضٰی مِنَ الْقَوْلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا یَعْمَلُوْنَ مُحِیْطًا ﴿١٠٨﴾

১০৮. তারা মানুষ থেকে তো লজ্জা করে কিন্তু আল্লাহ থেকে লজ্জা করে না, অথচ তারা রাতের বেলা যখন আল্লাহর অপসন্দীয় কথা বলে তখনও তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন। তারা যা-কিছু করছে তা সবই আল্লাহর আয়ত্তে।

هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ۫ فَمَنْ یُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ اَمْ مَّنْ یَّكُوْنُ عَلَیْهِمْ وَكِیْلًا ﴿١٠٩﴾

১০৯. তোমাদের দৌড় তো এতটুকুই যে, পার্থিব জীবনে মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করে তাদের (খেয়ানতকারীদের) সহায়তা দান করলে। কিন্তু পরবর্তীতে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সঙ্গে ঝগড়া করে কে তাদের সহায়তা দান করবে বা কে তাদের উকিল হবে?

বিধানাবলীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। দ্বিতীয় মূলনীতি এই যে, আল্লাহ তাআলা নিজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিভিন্ন সময়ে এমন বহু বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কুরআন মাজীদে সরাসরি যার উল্লেখ নেই। ফায়সালা দানের সময় বিচারককে তা থেকেই আলো নিতে হবে। এরই প্রতি ইঙ্গিত করে আয়াতে বলা হয়েছে, 'যাতে আল্লাহ তোমাকে যে উপলব্ধি দিয়েছেন, সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে ফায়সালা করতে পার।' এতদদ্বারা কুরআন মাজীদের বাইরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহও যে প্রামাণ্য মর্যাদা রাখে তার প্রতিও ইশারা করা হয়েছে। তৃতীয় মূলনীতি এই বলা হয়েছে যে, মামলা-মোকদ্দমায় যে ব্যক্তি সম্পর্কেই জানা যাবে সে ন্যায়ের উপরে নেই, তার পক্ষে অবস্থান নেওয়া ও তার উকিল হওয়া জায়েয নয়। বনু উবায়রিক বিশরের পক্ষে ওকালতি করলে তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, প্রথমত এ ওকালতিই জায়েয নয়। দ্বিতীয় অভিযুক্ত ব্যক্তি এর দ্বারা বড়জোর দুনিয়ার জীবনে উপকৃত হবে। আখিরাতে তোমাদের ওকালতি তাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না।

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۱۰﴾

১১০. যে ব্যক্তি কোনও মন্দ কাজ করে ফেলে বা নিজের প্রতি জুলুম করে বসে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে অবশ্যই আল্লাহকে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুই পাবে।

وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۱۱﴾

১১১. যে ব্যক্তি কোনও গুনাহ কামায়, সে তা দ্বারা তার নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। আল্লাহ পরিপূর্ণ জ্ঞানেরও অধিকারী এবং হিকমতেরও মালিক।

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓـَٔةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿۱۱۲﴾

১১২. যে ব্যক্তি কোনও দোষ বা পাপকর্মে লিপ্ত হয়, তারপর কোনও নির্দোষ ব্যক্তির উপর তার দায় চাপায়, সে নিজের উপর গুরুতর অপবাদ ও প্রকাশ্য গুনাহের ভার চাপিয়ে দেয়।

[১৭]

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿۱۱۳﴾

১১৩. এবং (হে নবী!) তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকলে তাদের একটি দল তো তোমাকে সরল পথ হতে বিচ্যুত করার ইচ্ছা করেই ফেলত।[৬৭] (প্রকৃতপক্ষে) তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করছে না। তারা তোমার কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং তোমাকে এমন সব বিষয়ে জ্ঞান দিয়েছেন, যা তুমি জানতে না। বস্তুত তোমার প্রতি সর্বদাই আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে।

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۭ بَيْنَ النَّاسِ ؕ

১১৪. মানুষের বহু গোপন পরামর্শে কোনও কল্যাণ নেই। তবে কোনও ব্যক্তি দান-সদকা বা কোনও সৎকাজের কিংবা

৬৭. এর দ্বারা বিশর ও তার সমর্থকদের বোঝানো হয়েছে। যারা নিরপরাধ ইয়াহুদীকে ফাঁসাতে চেয়েছিল।

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۱۱۴﴾

মানুষের মধ্যে মীমাংসার আদেশ করলে, সেটা ভিন্ন কথা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে এরূপ করবে, আমি তাকে মহা প্রতিদান দেব।

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿۱۱۵﴾

১১৫. আর যে ব্যক্তি তার সামনে হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে ও মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য কোনও পথ অনুসরণ করবে, আমি তাকে সেই পথেই ছেড়ে দেব, যা সে অবলম্বন করেছে। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, যা অতি মন্দ ঠিকানা।[৬৮]

[১৮]

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿۱۱۶﴾

১১৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এর নিচের যে-কোনও গুনাহ যার ক্ষেত্রে চান ক্ষমা করে দেন।[৬৯] যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে সে সঠিক পথ থেকে বহু দূরে সরে যায়।

اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿۱۱۷﴾

১১৭. তারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য যাদের কাছে প্রার্থনা জানায়, তারা কেবল কতিপয় নারী।[৭০] আর তারা যাকে ডাকে সে তো অবাধ্য শয়তান ছাড়া কেউ নয়–

---

৬৮. এ আয়াত দ্বারা উলামায়ে কিরাম বিশেষত ইমাম শাফিঈ (রহ.) প্রমাণ পেশ করেছেন যে, ইজমাও শরীয়তের একটি দলীল। অর্থাৎ গোটা উম্মত যে মাসআলা সম্পর্কে একমত হয়ে যায়, তা নিশ্চিতভাবে সঠিক এবং তার বিরুদ্ধাচরণ জায়েয নয়।

৬৯. অর্থাৎ শিরক অপেক্ষা নিচের গুনাহ আল্লাহ তাআলা যারটা চান বিনা তাওবায় কেবল নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু শিরকের গুনাহ এ ছাড়া ক্ষমা হতে পারে না যে, মুশরিক ব্যক্তি মৃত্যুর আগে খাঁটি মনে তাওবা করবে এবং ইসলাম ও তাওহীদ কবুল করে নেবে। পূর্বে ৪৮ নং আয়াতেও একথা বর্ণিত হয়েছে।

৭০. মক্কার কাফিরগণ যেই মনগড়া উপাস্যদের পূজা করত তাদেরকে নারী মনে করত, যেমন লাত, মানাত ও উয্যা। তাছাড়া ফিরিশতাগণকেও তারা আল্লাহর কন্যা বলত। আয়াতে ইশারা করা হয়েছে যে, এক দিকে তো তারা নারীদেরকে হীনতর সৃষ্টি মনে করে, অন্যদিকে যাদেরকে নিজেদের উপাস্য বানিয়ে রেখেছে তাদের ধারণা অনুযায়ী তারা সকলে নারী। কী হাস্যকর অসঙ্গতি!

لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿۱۱۸﴾

১১৮. যার প্রতি আল্লাহ লানত করেছেন। আর সে আল্লাহকে বলেছিল, আমি তোমার বান্দাদের মধ্য হতে নির্ধারিত এক অংশকে নিয়ে নেব।[৭১]

وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿۱۱۹﴾

১১৯. এবং আমি তাদেরকে সরল পথ হতে নিশ্চিতভাবে বিচ্যুত করব, তাদেরকে অনেক আশা-ভরসা দেব এবং তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা চতুষ্পদ জন্তুর কান চিরে ফেলবে এবং তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে।[৭২] যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে বন্ধু বানায়, সে সুস্পষ্ট লোকসানের মধ্যে পড়ে যায়।

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿۱۲۰﴾

১২০. সে তো তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশা-আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত করে। (প্রকৃতপক্ষে) শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতিই দেয়, তা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়।

اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ز وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ﴿۱۲۱﴾

১২১. তাদের সকলের ঠিকানা জাহান্নাম। তারা তা থেকে বাঁচার জন্য পালানোর কোনও পথ পাবে না।

---

৭১. অর্থাৎ বহু লোককে গোমরাহ করে নিজের দলভুক্ত করে নেব এবং অনেকের দ্বারা আমার ইচ্ছামত কাজ করাব।

৭২. আরব কাফিরগণ কোনও কোনও জন্তুর কান চিরে প্রতিমার নামে উৎসর্গ করত। এরূপ জন্তু ব্যবহার করাকে তারা জায়েয মনে করত না। তাদের এই ভ্রান্ত রীতির প্রতিই আয়াতে ইশারা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে এটা শয়তান করায়। আল্লাহর সৃষ্টিকে 'বিকৃত করা' বলতে এই কান চিরে ফেলাকেও বোঝানো হতে পারে। তাছাড়া হাদীসে আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও কিছু কাজকে 'সৃষ্টির বিকৃতি সাধন' সাব্যস্ত করত: হারাম ঘোষণা দিয়েছেন, যেমন সে কালে নারীগণ তাদের রূপচর্চার অংশ হিসেবে সুঁই ইত্যাদি দ্বারা খুঁচিয়ে শরীরে উল্কি আঁকত, চেহারার প্রাকৃতিক লোম (যা দূষনীয় পর্যায়ের বড় হত না) তুলে ফেলত এবং কৃত্রিমভাবে দন্তরাজিকে ফাঁকা-ফাকা করে ফেলত। এসবই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনের অন্তর্ভুক্ত যা সম্পূর্ণ নাজায়েয (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে মাআরিফুল কুরআনে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যে আলোচনা করা হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য)।

১২২. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি তাদেরকে এমন সব বাগানে দাখিল করব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে। এটা আল্লাহর ওয়াদা, যা সত্য। এবং কথায় আল্লাহ্ অপেক্ষা বেশি সত্যবাদী কে হতে পারে?

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿۱۲۲﴾

১২৩. (জান্নাতে যাওয়ার জন্য) না তোমাদের আকাঙ্ক্ষাসমূহ যথেষ্ট এবং না কিতাবীদের আকাঙ্ক্ষাসমূহ। যে-কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি ভোগ করবে এবং আল্লাহ্ ছাড়া তার কোনও বন্ধু ও সাহায্যকারী লাভ হবে না।

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَاۤ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۱۲۳﴾

১২৪. আর যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, যদি সে মুমিন হয়ে থাকে, তবে এরূপ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿۱۲۴﴾

১২৫. তার চেয়ে উত্তম দ্বীন আর কার হতে পারে, যে (তার গোটা অস্তিত্বসহ) নিজ চেহারাকে আল্লাহর সম্মুখে অবনত করেছে, সেই সঙ্গে সে সৎকর্মে অভ্যস্ত এবং একনিষ্ঠ ইবরাহীমের দ্বীন অনুসরণ করেছে। আর (এটা তো জানা কথা যে,) আল্লাহ্ ইবরাহীমকে নিজের বিশিষ্ট বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিলেন।

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿۱۲۵﴾

১২৬. আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই এবং আল্লাহ যাবতীয় জিনিসকে (নিজ ক্ষমতা দ্বারা) পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴿۱۲۶﴾

[১৯]

১২৭. এবং (হে নবী!) লোকে তোমার কাছে নারীদের সম্পর্কে শরীয়তের বিধান

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ

وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿۱۲۷﴾

জিজ্ঞেস করে।[৭৩] বলে দাও, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে বিধান জানাচ্ছেন এবং এই কিতাব (অর্থাৎ কুরআন)-এর যে সব আয়াত তোমাদেরকে পড়ে শোনানো হচ্ছে, তাও (তোমাদেরকে শরীয়তের বিধান জানায়) সেই ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে যাদেরকে তোমরা তাদের নির্ধারিত অধিকার প্রদান কর না, অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহও করতে চাও[৭৪] এবং অসহায় শিশুদের সম্পর্কেও (বিধান জানায়) এবং তোমাদেরকে জোর নির্দেশ দেয় যেন ইয়াতীমদের ব্যাপারে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর। তোমরা যা-কিছু সৎকাজ করবে, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত।

---

৭৩. ইসলামের আগে নারীদেরকে সমাজের এক নিকৃষ্ট জীব মনে করা হত। তাদের সামাজিক ও জৈবিক কোনও অধিকার ছিল না। যখন ইসলাম নারীদের হক আদায়ের জোর নির্দেশ দিল এবং উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে তাদেরকেও অংশ দিল, তখন আরবদের কাছে এটা এমনই এক অভাবিত বিষয় ছিল যে, তাদের কেউ কেউ মনে করছিল এটা হয়ত এক সাময়িক নির্দেশ, যা কিছুকাল পর রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে যখন রহিত হতে দেখা গেল না, তখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। এতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এটা সাময়িক কোনও বিধান নয়। বরং স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। আল্লাহ তাআলাই এ বিধান দিয়েছেন। কুরআন মাজীদে এর আগে যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে, তাতেও এ জাতীয় বহু বিধান রয়েছে। এ আয়াতে সেই সঙ্গে নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে আরও কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে।

৭৪. এর দ্বারা সূরা নিসার ৩নং আয়াতের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বুখারী শরীফের এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কখনও ইয়াতীম মেয়ে তার চাচাত ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে থাকত। সে হয়ত রূপসী হত এবং পিতার রেখে যাওয়া বিপুল সম্পত্তিরও মালিক হত। এ অবস্থায় চাচাত ভাই চাইত সে সাবালিকা হলে নিজেই তাকে বিবাহ করবে, যাতে তার সম্পদ নিজ দখলেই থেকে যায়। কিন্তু সে বিবাহে তাকে তার মত মেয়ের যে মোহর হওয়া উচিত তা দিত না। অপর দিকে মেয়েটি রূপসী না হলে সম্পত্তির লোভে তাকে বিবাহ করত ঠিকই, কিন্তু একদিকে তাকে মোহরও দিত অতি সামান্য, অন্যদিকে তার সাথে আচার-আচরণও প্রিয় ভার্যা-সুলভ করত না।

১২৮. কোনও নারী যদি তার স্বামীর পক্ষ হতে দুর্ব্যবহার বা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তবে তাদের জন্য এতে কোন অসুবিধা নেই যে, তারা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে কোনও রকমের আপোস-নিষ্পত্তি করবে।[৭৫] আর আপোস-নিষ্পত্তিই উত্তম। মানুষের অন্তরে (কিছু না কিছু) লালসার প্রবণতা তো নিহিত রাখাই হয়েছে।[৭৬] তোমরা যদি ইহসান ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তোমরা যা-কিছুই করবে, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন।

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

১২৯. তোমরা চাইলেও স্ত্রীদের মধ্যে সমান আচরণ করতে সক্ষম হবে না।[৭৭] তবে

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

৭৫. কখনও এমনও হত যে, কোনও স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীর দিল লাগছে না। তাই সে তার প্রতি অবহেলার পন্থা অবলম্বন করে এবং তাকে তালাক দিতে চায়। এ অবস্থায় স্ত্রী যদি তালাকে সম্মত না থাকে, তবে তার কিছু অধিকার ত্যাগ করে স্বামীর সাথে আপোস করতে পারে। অর্থাৎ বলতে পারে, আমি আমার অমুক অধিকার দাবী করব না, তবুও আমাকে নিজ বিবাহাধীন রেখে দাও। এরূপ ক্ষেত্রে স্বামীকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে– সে যেন আপোস করতে রাজি হয়ে যায় এবং তালাক দেওয়ার জন্য গোঁ না ধরে। কেননা আপোস-মীমাংসার পন্থাই উত্তম। পরের বাক্যে ইহসান করার উপদেশ দিয়ে স্বামীকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, মনের মিল না হওয়া সত্ত্বেও সে যেন স্ত্রীর সাথে মিটমাট করার চেষ্টা করে এবং অন্তরে আল্লাহর ভয় রেখে তার অধিকারসমূহ আদায় করতে থাকে। তা হলে সেটা তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানের জন্যই কল্যাণ বয়ে আনবে।

৭৬. বাহ্যত এর অর্থ হচ্ছে, পার্থিব লাভের প্রতি সব মানুষেরই স্বভাবগতভাবে কিছু না কিছু লোভ আছে। কাজেই স্ত্রী যদি তার পার্থিব কিছু স্বার্থ ত্যাগ করে তবে স্বামীর চিন্তা করা উচিত হয়ত তালাক দিলে তার কোন কঠিন কষ্ট-ক্লেশ বা অন্য কোন জটিল সমস্যা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে আর সে কারণেই সে তার পার্থিব স্বার্থ ত্যাগে রাজি হয়েছে। এরূপ অবস্থায় আপোস-মীমাংসা করে নেওয়াই ভালো। অপর দিকে স্ত্রীর চিন্তা করা উচিত, স্বামী পার্থিব কিছু উপকার লাভের উদ্দেশ্যেই বিবাহ করেছিল। এখন সে দেখছে আমার দ্বারা তার সে উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে না, যে কারণে আমার স্থানে অন্য কাউকে বিবাহ করতে চাচ্ছে, যাতে তার সে উদ্দেশ্য পূরণ হয়। এ অবস্থায় আমি যদি আমার কিছু হক ছেড়ে দেই এবং এভাবে তার অন্য রকম উপকার সাধন করি, তবে সে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা থেকে নিবৃত্ত হতে পারে।

৭৭. অর্থাৎ মহব্বত ও ভালোবাসায় স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা মানুষের সাধ্যাতীত বিষয়। কেননা মনের উপর কোনও মানুষের হাত থাকে না। কাজেই এক স্ত্রী অপেক্ষা অন্য স্ত্রীর

فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۭ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۲۹﴾

কোনও একজনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না, যার ফলে অন্যজনকে মাঝখানে ঝুলন্ত বস্তুর মত ফেলে রাখবে। তোমরা যদি সংশোধন কর ও তাকওয়া অবলম্বন করে চল, তবে নিশ্চিত জেন, আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴿۱۳۰﴾

১৩০. আর যদি উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে আল্লাহ নিজের (কুদরত ও রহমতের) প্রাচুর্য দ্বারা তাদের প্রত্যেককে (অপরের প্রয়োজন থেকে) বেনিয়ায করে দেবেন।[৭৮] আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রভূত হিকমতের অধিকারী।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ۭ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿۱۳۱﴾

১৩১. আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই। আমি তোমাদের আগে কিতাবীদেরকে এবং তোমাদেরকেও জোর নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যদি কুফর অবলম্বন কর, তবে (তাতে আল্লাহর কী ক্ষতি? কেননা) আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই। আল্লাহ সকলের থেকে বেনিয়ায এবং তিনি প্রশংসার্হ।

উপর যদি ভালোবাসা বেশি হয়, সে কারণে আল্লাহ তাআলা ধরবেন না। কিন্তু বাহ্যিক আচার-আচরণে সমতা রক্ষা করা জরুরী। অর্থাৎ একজনের কাছে যত রাত থাকবে, অন্যজনের কাছেও তত রাতই থাকতে হবে। একজনকে যে পরিমাণ খরচ দেবে অন্যজনকেও তাই দিতে হবে। এমনিভাবে একজনের প্রতি আচরণ এমন করবে না, যদ্দরুণ অন্যজনের মনে আঘাত লাগতে পারে এবং সে ধারণা করতে পারে, তাকে বুঝি মাঝখানে লটকে রাখা হয়েছে।

৭৮. মীমাংসার সব রকম চেষ্টা সত্ত্বেও এমন একটা পর্যায় আসতে পারে, যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক রাখা হলে উভয়ের জীবন বিষাদময় ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার আশংকা থাকে। এরূপ অবস্থায় তালাক ও বিচ্ছেদের পন্থা অবলম্বন করাও জায়েয। এ আয়াত আশ্বস্ত করছে যে, বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারটা যদি সৌজন্যমূলকভাবে সম্পন্ন করা হয়, তবে আল্লাহ তাআলা উভয়ের জন্য আরও উত্তম ব্যবস্থা করবেন, যার ফলে তাদের দু'জনই দুজন থেকে বেনিয়ায হয়ে যাবে।

১৩২. আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই[৭৯] আর কর্ম নির্বাহের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

১৩৩. হে মানুষ! তিনি চাইলে তোমাদের সকলকে (পৃথিবী হতে) নিয়ে যেতে পারেন এবং অন্যদেরকে (তোমাদের স্থানে) নিয়ে আসতে পারেন। আল্লাহ এ বিষয়ে পূর্ণ সক্ষম।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ۝

১৩৪. যে ব্যক্তি (কেবল) দুনিয়ার প্রতিদান চায়, (তার স্মরণ রাখা উচিত) আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের প্রতিদান রয়েছে।[৮০] আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝

[২০]

১৩৫. হে মুমিনগণ! তোমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে যাও আল্লাহর সাক্ষীরূপে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে কিংবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে ব্যক্তি (যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার আদেশ করা হচ্ছে) যদি ধনী বা গরীব হয়, তবে

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا

---

৭৯. 'আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই'– এ বাক্যটি এস্থলে পর পর তিনবার বলা হয়েছে। প্রথমবার উদ্দেশ্য ছিল স্বামী-স্ত্রীকে আশ্বস্ত করা যে, আল্লাহ তাআলার রহমতের ভাণ্ডার অতি বড়। তিনি তাদের প্রত্যেকের জন্য আরও উপযুক্ত কোনও ব্যবস্থা করতে পারেন। দ্বিতীয়বারের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তাআলার অমুখাপেক্ষিতা বর্ণনা করা যে, কারও কুফর দ্বারা তাঁর কোনও ক্ষতি হয় না। কেননা বিশ্বজগত তাঁর আজ্ঞাধীন। কারও কাছে তাঁর কোনও ঠেকা নেই। তৃতীয়বার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার রহমত ও কর্মবিধানের বিষয়টি বর্ণনা করা। আল্লাহ বলছেন যে, তোমরা যদি তাকওয়া ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন কর, তবে তিনি তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে দেবেন।

৮০. এ আয়াতে সাধারণ উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, একজন মুমিন কেবল পার্থিব উপকারকেই লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারে না। তার উচিত দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণ চাওয়া। পূর্বের আয়াতসমূহের সাথে এর যোগসূত্র এই যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মীমাংসা বা বিচ্ছেদ সাধনের সময় কেবল পার্থিব লাভ-লোকসানের প্রতি নজর রাখা উচিত নয়; বরং আখিরাতের কল্যাণের প্রতিও লক্ষ্য রাখা চাই। সুতরাং স্বামী বা স্ত্রী যদি দুনিয়াবী কিছু স্বার্থ ত্যাগ করেও অন্যের প্রতি সদাচরণ করে, তবে আখিরাতে মহা প্রতিদানের আশা থাকবে।

الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

আল্লাহ উভয় প্রকার লোকের ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে বেশি কল্যাণকামী। সুতরাং এমন খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, যা তোমাদের ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়। তোমরা যদি পেঁচাও (অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য দাও) অথবা (সঠিক সাক্ষ্য দেওয়া থেকে) পাশ কাটিয়ে যাও, তবে (জেনে রেখ) আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾

১৩৬. হে মুমিনগণ! ঈমান রাখ আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, যে কিতাব তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন তার প্রতি এবং যে কিতাব তার আগে নাযিল করেছেন তার প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহকে, তাঁর ফিরিশতাগণকে, তাঁর কিতাব-সমূহকে তাঁর রাসূলগণকে এবং পরকালকে অস্বীকার করে, সে সঠিক পথ থেকে সরে গিয়ে বহু দূরে নিপতিত হয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ﴿١٣٧﴾

১৩৭. যারা ঈমান এনেছে, তারপর কাফির হয়ে গেছে, তারপর ঈমান এনেছে তারপর আবার কাফির হয়ে গেছে, তারপর কুফরে অগ্রগামী হতে থেকেছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করার নন এবং তাদেরকে সঠিক পথে আনয়ন করারও নন।[৮১]

---

৮১. যে মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা চলছে এর দ্বারা তাদেরকেও বোঝানো হতে পারে। কেননা তারা মুসলিমদের কাছে এসে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করত। তারপর নিজেদের মধ্যে গিয়ে কুফরে ফিরে যেত। তারপর আবার কখনও মুসলিমদের সামনে পড়লে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিত। তারপর আবার নিজেদের লোকদের কাছে গিয়ে তাদেরকে নিজেদের কুফর সম্পর্কে আশ্বস্ত করত এবং নিজেদের কাজ-কর্ম দ্বারা উত্তরোত্তর কুফরের দিকে এগিয়ে যেত। তাছাড়া কোনও কোনও রিওয়ায়াতে এমন কিছু লোকেরও উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তারপর আবার তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পুনরায় মুরতাদ হয়ে

১৩৮. মুনাফিকদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ﴿۱۳۸﴾

১৩৯. যেই মুনাফিকরা মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে মর্যাদা খোঁজে? যাবতীয় মর্যাদা তো আল্লাহরই কাছে।

الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ؕ﴿۱۳۹﴾

১৪০. তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি এই নির্দেশ নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে ও তাকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কোনও প্রসঙ্গে লিপ্ত হবে। অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ সমস্ত মুনাফিক ও কাফিরকে জাহান্নামে একত্র করবেন।

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖۤ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۙ﴿۱۴۰﴾

১৪১. (হে মুসলিমগণ!) এরা সেই সব লোক, যারা তোমাদের (অশুভ পরিণামের) অপেক্ষায় বসে থাকে। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের যদি বিজয় অর্জিত হয়, তবে (তোমাদেরকে) বলে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না। আর যদি

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْۤا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْۤا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ

কুফর অবস্থায়ই মারা যায়। আয়াতের শব্দাবলীর ভেতর উভয় প্রকার লোকদেরই অবকাশ আছে। তাদের সম্পর্কে যে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে সঠিক পথে আনবেন না', তার অর্থ এই যে, তারা যখন স্বেচ্ছায় কুফর এবং তার পরিণাম হিসেবে জাহান্নামের পথই বেছে নিল, তখন আল্লাহ জবরদস্তিমূলকভাবে তাদেরকে ঈমান ও জান্নাতের পথে ফিরিয়ে আনবেন না। কেননা দুনিয়া হল পরীক্ষার স্থান। এখানে প্রত্যেকে নিজ এখতিয়ার ও ইচ্ছাক্রমে যে পথ অবলম্বন করবে সে অনুযায়ীই তার পরিণাম স্থির হবে। আল্লাহ তাআলা কাউকে যেমন জোর-জবরদস্তি করে মুসলিম বানান না, তেমনি সেভাবে কাউকে কাফিরও বানান না।

الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ﴿۱۴۱﴾

কাফিরদের (বিজয়) নসীব হয়, তবে (তাদেরকে) বলে, আমরা কি তোমাদেরকে বাগে পেয়েছিলাম না এবং (তা সত্ত্বেও) আমরা কি মুসলিমদের হাত থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করিনি?[৮২] সুতরাং আল্লাহই কিয়ামতের দিন তোমাদের ও তাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন এবং আল্লাহ মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য বিজয় অর্জনের কোনও পথ রাখবেন না।

[২১]

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُوْٓا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۴۲﴾

১৪২. এ মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজী করে, অথচ আল্লাহই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছেন।[৮৩] তারা যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। তারা মানুষকে দেখায় আর আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।

---

৮২. অর্থাৎ তাদের আসল উদ্দেশ্য হল পার্থিব সুযোগ-সুবিধা। যদি মুসলিমগণ জয়লাভ করে এবং গনীমতের মালামাল তাদের হস্তগত হয়, তবে নিজেদেরকে তাদের সাথী হিসেবে দাবী করে। এবং কিভাবে সে মালে ভাগ বসানো যায়, সেই ধান্ধায় থাকে। পক্ষান্তরে জয় যদি কাফিরদের হাতে চলে যায়, তবে এই বলে তাদেরকে খোঁটা দেয় যে, আমরা সাহায্য-সহযোগিতা না করলে তোমরা জয়লাভ করতে পারতে না। সুতরাং আমাদের সে অবদানের আর্থিক প্রতিদান দাও।

৮৩. এর এক অর্থ হতে পারে যে, তারা তো মনে করছে আল্লাহকে ধোঁকা দিয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাই ধোঁকায় পড়ে আছে। কেননা আল্লাহকে কেউ ধোঁকা দিতে পারে না। বরং তারা নিজেরা নিজেদেরকে আপন ইচ্ছা ও এখতিয়ারক্রমে যে ধোঁকার মধ্যে ফেলেছে, আল্লাহ তাআলা সেই ধোঁকার ভেতর তাদেরকে থাকতে দেন।

বাক্যটির আরেক অর্থ হতে পারে, 'আল্লাহ তাদেরকে ধোঁকায় নিক্ষেপ করবেন'। এ হিসেবে কোনও কোনও তাফসীরবিদ (যেমন হাসান বসরী [রহ.]) ব্যাখ্যা করেন যে, আখিরাতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এ ধোঁকার শাস্তি দেবেন এবং তা এভাবে যে, প্রথম দিকে তাদেরকেও মুসলিমদের সাথে কিছুদূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে এবং মুসলিমদেরকে যে নূর দেওয়া হবে, তার আলোতে তারাও কিছুদূর পর্যন্ত পথ চলবে। তখন তারা ভাবতে থাকবে, তাদের পরিণামও মুসলিমদের মতই শুভ হবে। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর তাদের আলো কেড়ে নেওয়া হবে। ফলে তারা পথ হারিয়ে ফেলবে এবং পরিশেষে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, যেমন সূরা হাদীদে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে (দ্র. ৫৭ : ১২–১৪)।

১৪৩. তারা ঈমান ও কুফরের মাঝখানে দোদুল্যমান, না সম্পূর্ণরূপে এদের (মুসলিমদের) দিকে, না তাদের (কাফিরদের) দিকে। বস্তুত আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্টতার ভেতর নিক্ষেপ করেন, তার জন্য তুমি কখনই হিদায়াতের কোনও পথ পাবে না।

مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلٰى
هٰٓؤُلَآءِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ
سَبِيْلًا ﴿١٤٣﴾

১৪৪. হে মুমিনগণ! মুসলিমদের ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু বানিও না। তোমরা কি আল্লাহর কাছে নিজেদের বিরুদ্ধে (অর্থাৎ নিজেদের শাস্তিযোগ্য হওয়া সম্পর্কে) সুস্পষ্ট প্রমাণ দাঁড় করাতে চাও?

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ
أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ أَتُرِيْدُوْنَ أَنْ
تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٤﴾

১৪৫. নিশ্চিত জেন, মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে এবং তুমি তাদের পক্ষে কোনও সাহায্যকারী পাবে না।

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ
وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿١٤٥﴾

১৪৬. তবে যারা তাওবা করবে, নিজেদেরকে সংশোধন করে ফেলবে, আল্লাহর আশ্রয়কে শক্তভাবে ধরে রাখবে এবং নিজেদের দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খালেস করে নেবে, তারা মুমিনদের সঙ্গে শামিল হয়ে যাবে। আল্লাহ অবশ্যই মুমিনদেরকে মহা প্রতিদান দান করবেন।

إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ
وَأَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ
وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٤٦﴾

১৪৭. তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হয়ে যাও এবং (সত্যিকারভাবে) ঈমান আন তবে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কী করবেন? আল্লাহ গুণগ্রাহী (এবং) তিনি সকলের অবস্থাদি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿١٤٧﴾

[ষষ্ঠ পারা]

১৪৮. প্রকাশ্যে কারও দোষ চর্চাকে আল্লাহ পসন্দ করেন না, তবে কারও প্রতি জুলুম

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ

إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿١٤٨﴾

হয়ে থাকলে[৮৪] আলাদা কথা। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

إِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوْهُ أَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿١٤٩﴾

১৪৯. তোমরা যদি কোনও সৎকাজ প্রকাশ্যে কর বা গোপনে কর কিংবা কোনও মন্দ আচরণ ক্ষমা কর, তবে (তা উত্তম। কেননা) আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (যদিও তিনি শাস্তিদানে) পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।[৮৫]

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١٥٠﴾

১৫০. যারা আল্লাহ ও তার রাসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় ও বলে, আমরা কতক (রাসূল)-এর প্রতি তো ঈমান রাখি এবং কতককে অস্বীকার করি। আর (এভাবে) তারা (কুফর ও ঈমানের মাঝখানে) মাঝামাঝি একটি পথ অবলম্বন করতে চায়।

أُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٥١﴾

১৫১. এরূপ লোকই সত্যিকারের কাফির। আর আমি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ أُجُوْرَهُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٥٢﴾

১৫২. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাদের কারও মধ্যে কোনও পার্থক্য করবে না, আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মফল দান করবেন। আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

৮৪. অর্থাৎ সাধারণ অবস্থায় কারও দোষ-ক্রটি প্রচার করা জায়েয নয়। হাঁ, যদি কারও উপর জুলুম হয়ে থাকে, তবে মানুষের কাছে সেই জুলুমের কথা বলতে পারে এবং তা বলতে গিয়ে জালিমের যে দোষ বর্ণনা করা হবে তার জন্য সে গুনাহগার হবে না।

৮৫. ইশারা করা হচ্ছে যে, যদিও শরীয়ত মজলুমকে জুলুম অনুপাতে জালিমের দোষ বর্ণনার অধিকার দিয়েছে, কিন্তু মজলুম হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি প্রকাশ্যে, গোপনে সর্বাবস্থায় মুখে শুধু ভালো কথাই উচ্চারণ করে এবং নিজের হক ছেড়ে দেয়, তবে এটা তার জন্য অতি বড় সওয়াবের কাজ হবে। কেননা আল্লাহ তাআলার গুণও এটাই যে, শাস্তি দানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি মানুষকে অত্যধিক পরিমাণে ক্ষমা করেন।

[২২]

১৫৩. (হে নবী!) কিতাবীগণ তোমার কাছে দাবী করে তুমি যেন তাদের প্রতি আসমান থেকে কোন কিতাব অবতীর্ণ করিয়ে দাও। (এটা কোনও নতুন কথা নয়। কেননা) তারা তো মূসার কাছে এর চেয়েও বড় দাবী জানিয়েছিল। তারা (তাকে) বলেছিল, 'আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ দেখাও'। সুতরাং তাদের অবাধ্যতার কারণে তাদের উপর বজ্র আঘাত হেনেছিল। অত:পর তাদের কাছে যে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এসেছিল, তারপরও তারা বাছুরকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছিল। তথাপি আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দেই। আর মূসাকে আমি দান করি স্পষ্ট ক্ষমতা।

يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا
مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰۤى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ
فَقَالُوْۤا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ
بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا
جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا
مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿۱۵۳﴾

১৫৪. আমি তূর পাহাড়কে তাদের উপর তুলে ধরে তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং আমি তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা (নগরের) দরজা দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর এবং তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা শনিবারে সীমালংঘন করো না।[৮৬] আর আমি তাদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ
ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِى
السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿۱۵۴﴾

১৫৫. অত:পর তাদের প্রতি যা-কিছু আচরণ করা হল, তা এজন্য যে, তারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে এবং এই বলে দিয়েছে যে, আমাদের

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا

---

৮৬. এসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সূরা বাকারার ৫১ থেকে ৬৬ নং আয়াত ও তার টীকায় গত হয়েছে।

غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۵۵﴾

অন্তরের উপর পর্দা লাগানো রয়েছে।[৮৭] অথচ বাস্তবতা হল, তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন। এ জন্যই তারা অল্প কিছু বিষয় ছাড়া (অধিকাংশ বিষয়েই) ঈমান আনে না।[৮৮]

وَّ بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ﴿۱۵۶﴾

১৫৬. এবং এজন্য যে, তারা কুফরের পথ অবলম্বন করেছে এবং মারইয়ামের প্রতি গুরুতর অপবাদ আরোপ করেছে।[৮৯]

وَّ قَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ

১৫৭. এবং তারা বলে, আমরা আল্লাহর রাসূল ঈসা ইবনে মারইয়ামকে হত্যা করেছি। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং শূলেও চড়াতে পারেনি; বরং তাদের বিভ্রম হয়েছিল।[৯০] প্রকৃতপক্ষে

---

৮৭. এর দ্বারা তারা বোঝাতে চাচ্ছিল যে, আমাদের অন্তর পুরোপুরি সংরক্ষিত। তাতে নিজেদের ধর্ম ছাড়া অন্য কোনও ধর্মের কথা প্রবেশ করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা তাদের জবাবে একটি অন্তবর্তী বাক্যস্বরূপ বলছেন, আসলে অন্তর সংরক্ষিত নয়; বরং তাদের হঠকারিতার কারণে আল্লাহ তাআলা তাতে মোহর করে দিয়েছেন এবং সেজন্যই তাতে কোনও সত্য-সঠিক কথা প্রবেশ করে না।

৮৮. 'অল্প কিছু বিষয়' দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, মূসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত। তারা তার উপর তো ঈমান রাখে, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতকে বিশ্বাস করে না।

৮৯. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কোনও পিতা ছিল না, কুমারী মাতা মারইয়াম আলাইহাস সালামের গর্ভে (আল্লাহর কুদরতে) জন্ম নিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াহুদীরা আল্লাহর কুদরত প্রসূত এ মুজিযা (অলৌকিকতা)কে স্বীকার তো করলই না, উল্টো তারা হযরত মারইয়াম (আ.)-এর মত পূত:পবিত্র, সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি ন্যাক্কারজনক অপবাদ আরোপ করেছিল।

৯০. কুরআন মাজীদ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে কেউ হত্যাও করেনি এবং তাকে শূলেও চড়াতে পারেনি; বরং তারা বিভ্রমে পড়ে গিয়েছিল। তারা অপর এক ব্যক্তিকে ঈসা মনে করে তাকেই শূলে ঝুলিয়েছিল। ওদিকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা উপরে তুলে নিয়েছিলেন। কুরআন মাজীদ সত্যের এই ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেনি। কোনও কোনও বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, যখন ঈসা আলাইহিস সালামকে ঘিরে ফেলা হয়, তখন তাঁর মহান সঙ্গীদের মধ্য থেকে একজন তাঁর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার লক্ষ্যে

شَكٍّ مِّنْهُ ۭ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۝

যারা এ সম্পর্কে মতভেদ করেছে, তারা এ বিষয়ে সংশয়ে নিপতিত এবং এ বিষয়ে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের প্রকৃত কোনও জ্ঞান ছিল না।[৯১] সত্য কথা হচ্ছে তারা ঈসা (আলাইহিস সালাম)কে হত্যা করেনি।

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

১৫৮. বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ মহা ক্ষমতার অধিকারী, অতি প্রজ্ঞাবান।

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ۝

১৫৯. কিতাবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে নিজ মৃত্যুর আগে ঈসার প্রতি ঈমান আনবে না।[৯২] আর কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

বাইরে চলে আসেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর আকৃতিকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মত করে দেন। শত্রুরা তাকেই ঈসা মনে করে নেয় এবং গ্রেফতার করে তাকেই শূলে চড়ায়। অপর দিকে ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা আসমানে উঠিয়ে নেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে গ্রেফতার করার জন্য গুপ্তচর হিসেবে ভিতরে প্রবেশ করেছিল আল্লাহ তাআলা তাকেই হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেন। সে যখন বাইরে বের হয়ে আসে তখন তার দলের লোকেরা ঈসা মনে করে তাকেই শূলে ঝোলায়।

৯১. অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকেই শূলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের কাছে যেহেতু এর স্বপক্ষে অকাট্য কোনও প্রমাণ নেই, তাই বাস্তব এটাই যে, তারা এ বিষয়ে সন্দেহে নিপতিত।

৯২. ইয়াহুদীরা তো হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে নবী বলেই স্বীকার করে না। অপর দিকে খ্রিস্টান জাতি তাকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করা সত্ত্বেও বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ইয়াহুদী হোক বা খ্রিস্টান সকল কিতাবী নিজ মৃত্যুর পূর্বক্ষণে যখন বরযখ (তথা দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী জগত)-এর দৃশ্যাবলী দেখবে, তখন ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কিত তাদের সব ধ্যান-ধারণা আপনা-আপনিই খতম হয়ে যাবে এবং তারা তাঁর প্রকৃত অবস্থা অনুসারেই ঈমান আনবে। এটা আয়াতের এক তাফসীর। বহু নির্ভরযোগ্য মুফাসসির এ তাফসীরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হযরত হাকীমুল উম্মাহ থানবী (রহ.) 'বয়ানুল কুরআন' গ্রন্থে এ তাফসীরকেই গ্রহণ করেছেন। তবে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে আয়াতের যে তাফসীর বর্ণিত আছে সে দৃষ্টিতে আয়াতের তরজমা হবে 'কিতাবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে ঈসার মৃত্যুর আগে তার প্রতি ঈমান আনবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে তখন তো আসমানে তুলে নিয়েছিলেন, কিন্তু যেমন বহু সহীহ হাদীসে বলা

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿١٦٠﴾

১৬০. মোটকথা ইয়াহুদীদের গুরুতর সীমালংঘনের কারণে আমি তাদের প্রতি এমন কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু হারাম করে দেই, যা পূর্বে তাদের পক্ষে হালাল করা হয়েছিল[৯৩] এবং এই কারণে যে, তারা মানুষকে আল্লাহর পথে অত্যধিক বাধা দিত।

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

১৬১. এবং তারা সুদ খেত, অথচ তাদেরকে তা খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং তারা মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করত। তাদের মধ্যে যারা কাফির আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰۤئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٦٢﴾

১৬২. অবশ্য তাদের (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের) মধ্যে যারা জ্ঞানে পরিপক্ক ও মুমিন, তারা তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতেও ঈমান রাখে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছিল তাতেও ঈমান রাখে। (সেই সকল লোক প্রশংসাযোগ্য,) যারা সালাত কায়েমকারী, যাকাতদাতা এবং আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে বিশ্বাসী। এরাই তারা, যাদেরকে আমি মহা প্রতিদান দেব।

[২৩]

اِنَّاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ كَمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ

১৬৩. (হে নবী!) আমি তোমার প্রতি ওহী নাযিল করেছি, সেইভাবে যেভাবে নাযিল করেছি নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি এবং আমি ওহী নাযিল করেছিলাম ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, তাদের বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ুব,

---

হয়েছে, আখেরী যামানায় তিনি পুনরায় এ জগতে আসবেন এবং তখন কিতাবীদের সকলেই তাঁর প্রতি তাঁর প্রকৃত অবস্থা অনুযায়ী ঈমান আনবে। কেননা তখন তাদের কাছে প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হয়ে যাবে।

৯৩. এ সম্পর্কে সূরা আনআমে বিস্তারিত বলা হয়েছে (দেখুন ৬ : ১৪৬)।

وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿١٦٣﴾

ইউনুস, হারূন ও সুলাইমানের প্রতি। আর দাউদকে দান করেছিলাম যাবূর।

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ؕ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ﴿١٦٤﴾

১৬৪. আর বহু রাসূল তো এমন, যাদের ঘটনাবলী আমি তোমাকে শুনিয়েছি এবং বহু রাসূল রয়েছে, যাদের ঘটনাবলী তোমাকে শুনাইনি। আর মুসার সঙ্গে তো আল্লাহ্ সরাসরি কথা বলেছেন।

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٦٥﴾

১৬৫. এ সকল রাসূল এমন, যাদেরকে (সওয়াবের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নাম সম্পর্কে) সতর্ককারীরূপে পাঠানো হয়েছিল, যাতে রাসূলগণের আগমনের পর আল্লাহর সামনে মানুষের কোন অজুহাত বাকি না থাকে। আর আল্লাহর ক্ষমতাও পরিপূর্ণ, হিকমতও পরিপূর্ণ।

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَاۤ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿١٦٦﴾

১৬৬. (কাফিরগণ স্বীকার করুক বা নাই করুক), কিন্তু আল্লাহ তোমার প্রতি যা নাযিল করেছেন, সে সম্পর্কে তিনি স্বয়ং সাক্ষ্য দেন যে, তিনি তা জেনেশুনে নাযিল করেছেন এবং ফিরিশতাগণও সাক্ষ্য দেয়। আর (এমনিতে তো) আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿١٦٧﴾

১৬৭. নিশ্চিত জেন, যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং মানুষকে আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছে, তারা রাস্তা হারিয়ে বিভ্রান্তিতে বহু দূর চলে গেছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ۙ ﴿١٦٨﴾

১৬৮. যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং (অন্যদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দিয়ে তাদের উপর) জুলুম করেছে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করার নন এবং তাদের কোনও পথ প্রদর্শকও নেই

اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٦٩﴾

১৬৯. জাহান্নামের পথ ছাড়া, যাতে তারা সর্বদা থাকবে। আর আল্লাহর পক্ষে এটা মামুলি ব্যাপার।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۷۰﴾

১৭০. হে মানুষ! এই রাসূল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছে। সুতরাং তোমরা (তার প্রতি) ঈমান আন। এরই মধ্যে তোমাদের কল্যাণ। আর (এরপরও) যদি তোমরা কুফরের পথ অবলম্বন কর, তবে (জেনে রেখ) আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই এবং আল্লাহ ইলম ও হিকমত উভয়ের মালিক।

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰهَاۤ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۫ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗۤ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۱۷۱﴾

১৭১. হে কিতাবীগণ! নিজেদের দ্বীনে সীমাংলঘন করো না এবং আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া অন্য কথা বলো না। মারইয়ামের পুত্র ঈসা মাসীহ তো আল্লাহর রাসূল মাত্র এবং আল্লাহর এক কালিমা ছিলেন, যা তিনি মারইয়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আর ছিলেন এক রূহ, যা তাঁরই পক্ষ হতে (সৃষ্টি হয়ে) ছিল।[৯৪] সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন এবং বলো না (আল্লাহ) 'তিন'। এর থেকে নিবৃত্ত হও। এরই মধ্যে তোমাদের কল্যাণ। আল্লাহ তো একই মাবুদ। তাঁর কোনও পুত্র থাকবে– এর থেকে তিনি সম্পূর্ণ

---

৯৪. ইয়াহুদীদের পর এবার এ আয়াতসমূহে খ্রিস্টানদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে। ইয়াহুদীরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জানের দুশমন হয়ে গিয়েছিল। অপর দিকে খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাঁর তাযীমের ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলতে শুরু করে এবং এই আকীদা পোষণ করতে থাকে যে, আল্লাহ তিনজন– পিতা, পুত্র এবং রুহুল কুদ্‌স। এ আয়াতে উভয় সম্প্রদায়কে সীমালংঘন করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এমন ভারসাম্যমান কথা বলা হয়েছে, যা দ্বারা তার সত্যিকারের অবস্থান পরিষ্কার হয়ে গেছে। অর্থাৎ তিনি ছিলেন আল্লাহ তাআলার বান্দা ও তাঁর একজন রাসূল। আল্লাহ তাকে নিজের 'কুন' কালিমা (শব্দ) দ্বারা বিনা বাপে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁর রূহ সরাসরি হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালামের গর্ভে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পবিত্র। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা তাঁরই। সকলের তত্ত্বাবধানের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

[২৪]

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿١٧٢﴾

১৭২. মাসীহ কখনও আল্লাহর বান্দা হওয়াকে লজ্জার বিষয় মনে করে না এবং নিকটতম ফিরিশতাগণও (এতে লজ্জাবোধ করে) না। যে-কেউ আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে লজ্জাবোধ করবে ও অহমিকা প্রদর্শন করবে (সে ভালো করে জেনে রাখুক) আল্লাহ তাদের সকলকে তাঁর নিকট একত্র করবেন।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٧٣﴾

১৭৩. অত:পর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদেরকে তাদের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তার থেকেও বেশি দেবেন। আর যারা (ইবাদত-বন্দেগীতে) লজ্জাবোধ করেছে ও অহমিকা প্রদর্শন করেছে তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি দেবেন। আর তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোনও অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿١٧٤﴾

১৭৪. হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে এবং আমি তোমাদের কাছে এমন এক আলো পাঠিয়ে দিয়েছি যা পথকে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে তোলে।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿١٧٥﴾

১৭৫. সুতরাং যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁরই আশ্রয় আকড়ে ধরেছে, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ ও রহমতের ভেতর দাখিল করবেন এবং নিজের কাছে পৌঁছানোর জন্য তাদেরকে সরল পথে আনয়ন করবেন।

يَسۡتَفۡتُوۡنَكَ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفۡتِيۡكُمۡ فِى الۡكَلٰلَةِ ؕ اِنِ امۡرُؤٌا هَلَكَ لَيۡسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗۤ اُخۡتٌ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَاۤ اِنۡ لَّمۡ يَكُنۡ لَّهَا وَلَدٌ ؕ فَاِنۡ كَانَتَا اثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ؕ وَاِنۡ كَانُوۡۤا اِخۡوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ الۡاُنۡثَيَيۡنِ ؕ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمۡ اَنۡ تَضِلُّوۡا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ ﴿۱۷۶﴾

১৭৬. (হে নবী!) লোকে তোমার কাছে ('কালালা'র)[৯৫] বিধান জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, আল্লাহ তোমাদেরকে কালালা'র বিধান জানাচ্ছেন– কেউ যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় আর তার এক বোন থাকে, তবে সে (বোন) তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেকের হকদার হবে। আর সেই বোনের যদি সন্তান-সন্ততি না থাকে, (আর সে মারা যায় এবং ভাই জীবিত থাকে) তবে সে তার (বোনের) ওয়ারিশ হবে। বোন যদি দু'জন থাকে, তবে ভাইয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তারা দুই-তৃতীয়াংশের হকদার হবে। আর (মৃত ব্যক্তির) যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে, তবে এক ভাই পাবে দু'বোনের অংশের সমান। আল্লাহ তোমাদের কাছে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করছেন, যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

---

৯৫. 'কালালা' বলে এমন ব্যক্তিকে, মৃত্যুকালে যার পিতা, দাদা, পুত্র ও পৌত্র থাকে না।

আল-হামদু লিল্লাহ, আজ শুক্রবার ৬ যু-কা'দা ১৪২৬ হিজরী মোতাবেক ৯ ডিসেম্বর ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ বাহরাইনে ইশার সময় (৬ : ৫৫) সূরা নিসার তরজমা ও টীকার কাজ সমাপ্ত হল [বাংলা অনুবাদ শেষ হল আজ রোববার ১২ যূ-কা'দা ১৪৩০ হিজরী মোতাবেক ১ নভেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ]। আল্লাহ তাআলা স্বীয় ফযল ও করমে বান্দার (এবং অনুবাদকেরও) গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং এই খিদমতকে কবুল করে নিন। বাকি সূরাগুলোর কাজও নিজ সন্তুষ্টি অনুযায়ী পূর্ণ করার তাওফীক দান করুন– আমীন, ছুম্মা আমীন।

সূরা মায়েদা

পরিচিতি

এ সূরাটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। আল্লামা আবু হায়্যান (রহ.) বলেন, এর কিছু অংশ নাযিল হয়েছে হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে, কিছু অংশ মক্কা বিজয়ের সময় এবং কিছু অংশ বিদায় হজ্জের সময়। ইতোমধ্যে ইসলামের দাওয়াত আরব উপদ্বীপের দৈর্ঘ-প্রস্থে ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিমদের হাতে মার খেয়ে খেয়ে ইসলামের শত্রুগণ অনেকখানি কাবু হয়ে পড়েছিল। মদীনা মুনাওয়ারায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র বেশ পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছিল। সুতরাং সময়ের তাকাযা হিসেবে এ সূরা মুসলিমদেরকে তাদের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দান করেছে। মুসলিমদেরকে তাদের সকল চুক্তি ও অঙ্গীকার রক্ষায় যত্নবান থাকতে হবে– এই বুনিয়াদী নীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে সূরাটির সূচনা হয়েছে। এ মূলনীতির ভেতর হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ তথা শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধানই মোটামুটিভাবে এসে গেছে। প্রসঙ্গক্রমে সর্বদা এই মূলনীতিটিও রক্ষা করে চলার জন্য জোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, শত্রু-মিত্র সকলের সাথেই সকল ব্যাপারে ইনসাফের পরিচয় দিতে হবে। সেই সঙ্গে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এখন আর শত্রুরা ইসলামের অগ্রযাত্রাকে রোধ করতে পারবে না। এ দিক থেকে তারা সম্পূর্ণরূপে হতাশ হয়ে গেছে।

এ সূরায় খাদ্যবস্তু সম্পর্কে জানানো হয়েছে কোন প্রকারের খাদ্য হালাল এবং কোন প্রকার হারাম। সেই প্রসঙ্গে শিকার করার বিধানও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আরও আছে কিতাবীদের যবাহকৃত পশু ও কিতাবী নারীদেরকে বিবাহ করা সংক্রান্ত বিধান, ডাকাতির শরয়ী শাস্তি, অন্যায় নরহত্যার গুনাহ ও তার শাস্তি সম্পর্কিত বিধানাবলী। শেষোক্ত বিষয়টি স্পষ্ট করার লক্ষ্যে হযরত আদম আলাইহিস সালামের পুত্র হাবীল ও কাবীলের ঘটনাও বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া এ সূরায় মদ ও জুয়াকে স্পষ্ট ভাষায় হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং অযু ও তায়াম্মুম করার নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত অঙ্গীকার কিভাবে ভঙ্গ করেছে এ সূরায় তাও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আরবীতে 'মায়িদা' বলা হয় দস্তরখানকে। এ সূরার ১১৪ নং আয়াতে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীরা ফরমায়েশ করেছিল, তিনি যেন আসমান থেকে একটি দস্তরখানে তাদের জন্য আসমানী খাদ্য অবতীর্ণ করার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেন। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে 'মায়িদা' অর্থাৎ 'দস্তরখান'।

৩– সূরা মায়িদা, মাদানী–১১২

এ সূরায় একশ বিশটি আয়াত ও ষোলটি রুকু আছে।

سُوْرَةُ الْمَآئِدَةِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١٢٠ رُكُوْعَاتُهَا ١٦

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূরণ করো। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সেই সকল চতুষ্পদ জন্তু, যা গৃহপালিত পশুর অন্তর্ভুক্ত[১] (বা তদ্‌সদৃশ), সেইগুলি ছাড়া, যা তোমাদেরকে পড়ে শোনানো হবে,[২] তবে তোমরা যখন ইহরাম অবস্থায় থাকবে, তখন শিকার করাকে বৈধ মনে করো না।[৩] আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন আদেশ দান করেন।[৪]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ①

২. হে মুমিনগণ! অবমাননা করো না আল্লাহর নিদর্শনাবলীর, না সম্মানিত মাসসমূহের, না সেই সকল প্রাণীর যাদেরকে কুরবানীর জন্য হরমে নিয়ে যাওয়া হয়, না তাদের গলায় পরানো মালার এবং না সেই সব লোকের যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ

---

১. 'বাহীমা' বলতে যে-কোনও চার পা বিশিষ্ট প্রাণীকে বোঝায়, কিন্তু তার মধ্যে হালাল কেবল গৃহপালিত (বা গবাদি) পশু, অর্থাৎ গরু, উট, ছাগল, ভেড়া অথবা যে-গুলো গবাদি পশুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যেমন হরিণ, নীল গাই ইত্যাদি।

২. সামনে ৩নং আয়াতে যে হারাম জিনিসসমূহের তালিকা দেওয়া হয়েছে, এটা তার প্রতি ইঙ্গিত।

৩. অর্থাৎ গবাদি পশু-সদৃশ জন্তু যদিও হালাল, কিন্তু কেউ হজ্জ বা উমরার ইহরাম বেঁধে ফেললে তার পক্ষে এসব পশু শিকার করা হারাম হয়ে যায়।

৪. মানুষ কেবল নিজ সীমিত বুদ্ধির উপর নির্ভর করে শরয়ী বিধানাবলী সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন তোলে এ বাক্যটি তার মূলোৎপাটন করেছে, যেমন এই প্রশ্ন যে, জীব-জন্তুর যখন প্রাণ আছে, তখন তাদেরকে যবাহ করে খাওয়া বৈধ করা হল কেন, বিশেষত যখন এর দ্বারা এক প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া হয়? কিংবা এই প্রশ্ন যে, কেন অমুক প্রাণীকে হালাল করা হল এবং

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ
قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۘ
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ②

উদ্দেশ্যে পবিত্র গৃহ অভিমুখে গমন করে। আর তোমরা যখন ইহরাম খুলে ফেল, তখন শিকার করতে পার। তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল, এই কারণে কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি তোমাদের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে (তাদের প্রতি) সীমালংঘন করতে প্ররোচিত না করে।[৫] তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অন্যকে সহযোগিতা করবে। গুনাহ ও জুলুমের কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি অতি কঠিন।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا
أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا

৩. তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত, সেই পশু, যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম উচ্চারিত হয়েছে, শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, উপর হতে পতনে মৃত জন্তু, অন্য কোনও পশুর শিংয়ের আঘাতে

অমুক প্রাণীকে হারাম? আয়াতের এ বাক্যটিতে অতি সংক্ষেপে, অথচ পূর্ণাঙ্গ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি নিজ হিকমত ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে যে জিনিসের ইচ্ছা করেন হুকুম দিয়ে দেন। সন্দেহ নেই যে, তার প্রতিটি হুকুমেই কোনও না কোনও হিকমত ও তাৎপর্য নিহিত থাকে, কিন্তু প্রতিটি হুকুমের হিকমত ও তাৎপর্য যে মানুষের বোধগম্য হতেই হবে এটা অনিবার্য নয়। সুতরাং মানুষের কাজ কেবল বিনা বাক্যে তার প্রতিটি হুকুম পালন করে যাওয়া।

৫. হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে মক্কা মুকাররমার কাফিরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সঙ্গীগণকে পবিত্র হরমে প্রবেশ করতে ও উমরা আদায়ে বাধা দিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই এ কারণে মুসলিমদের মনে প্রচণ্ড দুঃখ ও ক্ষোভ ছিল। সম্ভাবনা ছিল এ দুঃখ ও ক্ষোভের কারণে কোনও মুসলিম শত্রুর প্রতি এমন কোন আচরণ করে বসবে, যা শরীয়ত অনুমোদন করে না। এ আয়াত তাই সাবধান করে দিচ্ছে যে, ইসলামে সব জিনিসের জন্যই সীমারেখা স্থিরীকৃত রয়েছে। শত্রুর সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে সেই সীমারেখা লংঘন করা জায়েয নয়।

ذَكَّيْتُمْ ۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খেয়েছে এমন জন্তু, তবে (মরার আগে তোমরা) যা যবাহ করেছ, তা ছাড়া এবং সেই জন্তুও (হারাম), যাকে প্রতিমার জন্য নিবেদনস্থলে (বেদীতে) বলি দেওয়া হয়। এবং জুয়ার তীর দ্বারা (গোশত ইত্যাদি) বণ্টন[৬] করাও (তোমাদের জন্য হারাম)। এসব বিষয় কঠিন গুনাহের কাজ। আজ কাফিরগণ তোমাদের দ্বীনের (পরাস্ত হওয়ার) ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না। অন্তরে আমারই ভয় স্থান দিও। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে (চির দিনের জন্য) পসন্দ করে নিলাম।[৭] (সুতরাং এ দ্বীনের বিধানাবলী পরিপূর্ণভাবে পালন করো)। হাঁ, কেউ যদি ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়ে যায় (এবং সে কারণে কোনও হারাম বস্তু খেয়ে নেয়) আর গুনাহের প্রতি আকৃষ্ট

---

৬. এটা জাহেলী যুগের একটা রেওয়াজ। তারা যৌথভাবে উট যবাহের পর বিশেষ পন্থার লটারীর মাধ্যমে তার গোশত বণ্টন করত। তারা বিভিন্ন তীরে বিভিন্ন অংশের নাম লিখে তা একটা থলিতে রেখে দিত। তারপর যার নামে যেই অংশ বের হত তাকে সেই পরিমাণ গোশত দেওয়া হত। কোনও কোনও তীরে কিছুই লেখা থাকত না। সেই তীর যার নামে বের হত, সে গোশত থেকে বঞ্চিত হত। এভাবে আরও একটা রীতি ছিল যে, কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে তীর দ্বারা তা নির্ণয় করা হত। তীরে যা লেখা থাকত তা পালন করাকে অপরিহার্য মনে করা হত। কুরআন মাজীদের এ আয়াত এই যাবতীয় বিষয়কে অবৈধ ঘোষণা করছে। প্রথম পদ্ধতিটি তো জুয়া আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে গায়েবী ইলমের দাবী করা হয় কিংবা যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ ছাড়াই কোনও একটা বিষয়কে অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত করা হয়। কেউ কেউ পবিত্র এ আয়াতটির তরজমা করেছেন 'তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করাও (তোমাদের জন্য হারাম)'। এর দ্বারা দ্বিতীয় পন্থার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আয়াতের শব্দাবলীর ভেতর এ তরজমারও অবকাশ আছে।

৭. বিভিন্ন সহীহ হাদীসে আছে, এ আয়াত বিদায় হজ্জের সময় নাযিল হয়েছিল।

হয়ে তা না করে, তবে আল্লাহ নিশ্চয়ই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ؕ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۫ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ④

৪. লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তাদের জন্য কোন জিনিস হালাল। বলে দাও, তোমাদের জন্য সমস্ত উপাদেয় জিনিস হালাল করা হয়েছে। আর যেই শিকারী পশুকে তোমরা আল্লাহর শেখানো পন্থায় (শিকার করার জন্য) প্রশিক্ষিত করে তুলেছ, তারা যে জন্তু (শিকার করে) তোমাদের জন্য ধরে আনে, তা থেকে তোমরা খেতে পার। আর তাতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো[৮] এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۪ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫ وَالْمُحْصَنٰتُ

৫. আজ তোমাদের জন্য উপাদেয় বস্তুসমূহ হালাল করে দেওয়া হল এবং (তোমাদের পূর্বে) যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তাদের খাদ্যদ্রব্যও[৯] তোমাদের জন্য

---

৮. শিকারী কুকুর, বাজপাখি ইত্যাদির মাধ্যমে হালাল প্রাণী শিকার করে খাওয়া যে সকল শর্ত সাপেক্ষে হালাল, তা বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রথম শর্ত হল শিকারী প্রাণীটিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিতে হবে। তার প্রশিক্ষিত হওয়ার আলামত বলা হয়েছে এই যে, সে যে জন্তু শিকার করবে তা নিজে খাবে না; বরং মনিবের জন্য ধরে আনবে। দ্বিতীয় শর্ত হল, শিকারকারী ব্যক্তি শিকারী কুকুরকে কোনও জন্তুকে লক্ষ্য করে ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলবে।

৯. এ স্থলে 'খাদ্যদ্রব্য' দ্বারা তাদের যবাহকৃত পশু বোঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ 'আহলে কিতাব' তথা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ তাদের যবাহের ক্ষেত্রে যেহেতু ইসলামী শরীয়তে স্থিরীকৃত শর্তাবলীর অনুরূপ শর্ত রক্ষা করত এবং মোটামুটিভাবে আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে তারা অন্যান্য অমুসলিমদের থেকে স্বতন্ত্র ছিল, তাই তাদের যবাহকৃত পশু মুসলিমদের জন্য হালাল করা হয়েছিল। শর্ত ছিল, তারা শরীয়ত-সম্মত পন্থায় যবাহ করবে এবং যবাহকালে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম নেবে না। বর্তমান কালে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে একটা বড় অংশই নাস্তিক, যারা আল্লাহর অস্তিত্বই স্বীকার করে না। এরূপ লোকের যবাহ বিলকুল হালাল নয়। তাদের মধ্যে অনেক এমনও আছে, যারা নামমাত্র খ্রিস্টান বা ইয়াহুদী। তারা নিজ ধর্মও পালন করে না এবং যবাহের ক্ষেত্রে শরীয়তের শর্তাবলীও রক্ষা করে না। তাদের যবাহ কিছুতেই হালাল নয়। আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 'মাআরিফুল কুরআন' ও

مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَاۤ اٰتَیْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِیْنَ غَیْرَ مُسٰفِحِیْنَ وَلَا مُتَّخِذِیْۤ اَخْدَانٍ ؕ وَمَنْ یَّكْفُرْ بِالْاِیْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ؗ وَهُوَ فِی الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ۟

হালাল এবং তোমাদের খাদ্যদ্রব্যও তাদের জন্য হালাল। আর মুমিনদের মধ্যকার সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যকার সচ্চরিত্রা নারীও তোমাদের পক্ষে হালাল,[১০] যদি তোমরা তাদেরকে বিবাহের হেফাযতে আনার জন্য তাদের মোহর প্রদান কর, (বিবাহ ছাড়া) কেবল ইন্দ্রিয়-বাসনা চরিতার্থ করার বা গোপন প্রণয়িণী বানানোর ইচ্ছা না কর। যে-কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করবে, তার যাবতীয় কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে গণ্য হবে।

[২]

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَی الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَیْدِیَكُمْ اِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ

৬. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নামাযের জন্য উঠবে তখন নিজেদের চেহারা ও কনুই পর্যন্ত নিজেদের হাত ধুয়ে নিবে,

---

ফিকহী প্রবন্ধ-সংকলন 'জাওয়াহিরুল ফিকহ'-এ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাছাড়া এ সম্পর্কে 'আহকামুয যাবাইহ' নামে আমার একখানি আরবী পুস্তিকাও আছে, যার ইংরেজি সংস্করণও প্রকাশ করা হয়েছে।

১০. এটা কিতাবীদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। তাদের নারীদেরকে বিবাহ করা মুসলিমদের জন্য হালাল। তবে এক্ষেত্রে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণ রাখতে হবে। এক তো এই যে, এ বিধান কেবল সেই সকল ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান নারীদের বেলায়ই প্রযোজ্য, যারা সত্যিকারের ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান হবে। যেমন উপরে বলা হয়েছে, বর্তমান কালে পাশ্চাত্য দেশসমূহে বহু লোক এমন আছে, আদমশুমারীতে যাদেরকে ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তারা আল্লাহ, রাসূল মানে বা এবং কোনও আসমানী কিতাবেও বিশ্বাস রাখে না। এরূপ লোক 'কিতাবী' হিসেবে গণ্য হবে না। কাজেই তাদের যবাহও হালাল হবে না এবং এরূপ নারীদেরকে বিবাহ করাও জায়েয হবে না।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কোনও নারী যদি বাস্তবিকই ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রবল আশঙ্কা থাকে যে, সে তার স্বামী ও সন্তানের উপর প্রভাব বিস্তার করত: তাদেরকে দ্বীন-ইসলাম থেকে দূরে সরাবে, তবে এরূপ নারীকে বিবাহ করা উচিত হবে না। করলে গুনাহ হবে। বিবাহ করলে যে তা বৈধ হয়ে যাবে এবং সন্তানদেরকেও অবৈধ সাব্যস্ত করা হবে না, সেটা ভিন্ন কথা। বর্তমান কালে মুসলিম সাধারণের মধ্যে যেহেতু দ্বীনের জরুরী বিষয়াবলী সম্পর্কে জানা-শোনার বড় কমতি এবং আমলের কমতি ততোধিক, সেহেতু এ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ط وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ط وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ط مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝٦

নিজেদের মাথাসমূহ মাসেহ করবে এবং টাখনু পর্যন্ত নিজেদের পা (-ও ধুয়ে নেবে)। তোমরা যদি জানাবত অবস্থায় থাক তবে নিজেদের দেহ (গোসলের মাধ্যমে) ভালোভাবে পবিত্র করে নেবে। তোমরা যদি পীড়িত হও বা সফরে থাক কিংবা তোমাদের মধ্যে কেউ শৌচস্থান থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে দৈহিক মিলন করে থাক এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে[১১] এবং তা (মাটি) দ্বারা নিজেদের চেহারা ও হাত মাসেহ করবে। আল্লাহ তোমাদের উপর কোনও কষ্ট চাপাতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত পরিপূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা শুকরগোযার হয়ে যাও।

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ لا إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ز وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝٧

৭. আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন এবং তিনি তোমাদের থেকে যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন তা স্মরণ কর। যখন তোমরা বলেছিলে, আমরা (আল্লাহর আদেশসমূহ) ভালোভাবে শুনলাম ও আনুগত্য স্বীকার করলাম এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরের ভেদ সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত।

---

১১. 'শৌচস্থান হতে আসা' দ্বারা মূলত সেই ছোট নাপাকীর প্রতি ইশারা করা হয়েছে, নামায ইত্যাদি পড়ার জন্য যার কারণে কেবল অযু ওয়াজিব হয়। আর 'স্ত্রীদের সাথে দৈহিক মিলন' দ্বারা সেই বড় নাপাকীর প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যাকে জানাবাত বলে এবং যার কারণে গোসল ফরয হয়। বোঝানো উদ্দেশ্য যে, যখন পানি পাওয়া না যায় অথবা রোগ-ব্যাধির কারণে পানি ব্যবহার করা সম্ভব না হয়, তখন ছোট-বড় উভয় নাপাকীর ক্ষেত্রেই তায়াম্মুম করা জায়েয এবং উভয় অবস্থায় তায়াম্মুম করার নিয়ম একই।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۫ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝٨

৮. হে মুমিনগণ! তোমরা এমন হয়ে যাও যে, সর্বদা আল্লাহর (আদেশসমূহ পালনের) জন্য প্রস্তুত থাকবে (এবং) ইনসাফের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হবে এবং কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ পরিত্যাগে প্ররোচিত না করে। ইনসাফ অবলম্বন করো। এ পন্থাই তাকওয়ার বেশি নিকটবর্তী এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝٩

৯. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, (আখিরাতে) তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও মহা প্রতিদান।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝١٠

১০. আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে ও আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে তারা হবে জাহান্নামবাসী।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ

১১. হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ কর। যখন একদল লোক তোমাদের বিরুদ্ধে হাত বাড়াতে চেয়েছিল, তখন আল্লাহ তোমাদের ক্ষতিসাধন করা থেকে তাদের হাত নিবৃত্ত করেছিলেন[১২] এবং (তার

১২. এর দ্বারা সেই সকল ঘটনার প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যাতে কাফিরগণ মুসলিমদেরকে নির্মূল করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের সেসব পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। এরূপ ঘটনা বহু। মুফাসসিরগণ এ আয়াতের অধীনে সে রকম কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যেমন মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, এক যুদ্ধকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসফান নামক স্থানে সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে জোহরের সালাত আদায় করলেন। যখন মুশরিকগণ তা জানতে পারল, তাদের বড় আফসোস হল কেন তারা এই সুযোগ গ্রহণ করল না। তাহলে তো নামায অবস্থায় হামলা চালিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলা যেত। অত:পর তারা ঠিক করল, আসরের নামায আদায়কালে তারা অতর্কিত আক্রমণ চালাবে। কিন্তু আসরের ওয়াক্ত হলে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে তিনি সালাতুল খাওফ আদায় করলেন, যাতে মুসলিমগণ দু'দলে বিভক্ত

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١١

কৃতজ্ঞতা এই যে,) অন্তরে আল্লাহর ভয় রেখে আমলে লিপ্ত থাক আর মুমিনদের তো কেবল আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত।

[৩]

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ؕ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ؕ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝١٢

১২. নিশ্চয়ই আল্লাহ বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্য হতে বার জন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলাম।[১৩] আল্লাহ বলেছিলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, আমার নবীগণের প্রতি ঈমান আন, তাদের সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর,[১৪] তবে নিশ্চিত জেন, আমি তোমাদের পাপরাশি মোচন করব এবং তোমাদের এমন উদ্যানরাজিতে দাখিল করব, যার তলদেশে নহর প্রবহমান থাকবে। এরপরও তোমাদের মধ্য হতে কেউ কুফর অবলম্বন করলে প্রকৃতপক্ষে সে সরল পথই হারাবে।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا

১৩. অত:পর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণেই তো আমি তাদেরকে আমার রহমত থেকে বিতাড়িত করি ও তাদের অন্তর কঠিন করে দেই। তারা কথাসমূহকে তার আপন স্থান থেকে

হয়ে নামায পড়ে থাকে। একদল শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকে (পূর্বে সূরা নিসার ১০৪ নং আয়াতে এ নামাযের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে)। সুতরাং মুশরিকদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায় (রূহুল মাআনী)। আরও ঘটনা জানতে হলে মাআরিফুল কুরআন দেখুন।

১৩. বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্র ছিল। যখন তাদের থেকে এ প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়, তখন তাদের প্রত্যেক গোত্র-প্রধানকে নিজ-নিজ গোত্রের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়, যাতে তারা প্রতিশ্রুতি ঠিকভাবে রক্ষা করছে কিনা তার তত্ত্বাবধান করতে পারে।

১৪. উত্তম ঋণ বা 'কর্জে হাসানা' বলতে সেই ঋণকে বোঝায়, যা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাউকে দেওয়া হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলাকে উত্তম ঋণ দেওয়ার অর্থ হচ্ছে কোনও গরীবের সাহায্য করা বা কোনও নেক কাজে অর্থ ব্যয় করা।

حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳﴾

সরিয়ে দেয় এবং তাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তার একটি বড় অংশ ভুলে গিয়েছে। আগামীতে তুমি তাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলেরই কোনও না কোনও বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পারবে। সুতরাং (এখন) তাদেরকে ক্ষমা কর ও তাদেরকে পাশ কাটিয়ে চল।[১৫] নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীদের ভালোবাসেন।

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۪ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৪. যারা বলেছিল, আমরা নাসারা, তাদের থেকেও প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, অত:পর তাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তার একটি বড় অংশ তারা ভুলে গিয়েছে। ফলে আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছি।[১৬] অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যে, তারা কী সব কাজ করেছিল।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۬ؕ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۵﴾ۙ

১৫. হে কিতাবীগণ! তোমাদের নিকট আমার (এই) রাসূল এসে পড়েছে, যে (তাওরাত ও ইনজীল) গ্রন্থের এমন বহু কথা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে যা তোমরা গোপন কর এবং অনেক বিষয় এড়িয়ে যায়। আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের কাছে এক জ্যোতি এবং এমন এক কিতাব এসেছে, যা সত্যকে সুস্পষ্ট করে।[১৭]

---

১৫. অর্থাৎ এ রকম দুষ্কর্ম তো তাদের পুরানো চরিত্র। তবে এখনই তোমাকে এই অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না যে, সমস্ত বনী ইসরাঈলকে সমষ্টিগতভাবে কোনও শাস্তি দেবে। যখন সময় আসবে আল্লাহ তাআলা নিজেই তাদেরকে শাস্তি দেবেন।

১৬. খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক পর্যায়ে তাদের ধর্মীয় মতভেদ তাদের পারস্পরিক শত্রুতা ও গৃহযুদ্ধের রূপ নিয়েছিল। এটা তাদের সেই গৃহযুদ্ধের প্রতিই ইঙ্গিত।

১৭. ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদের আসমানী কিতাবে বর্ণিত অনেকগুলো বিষয় গোপন করে রেখেছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা থেকে কেবল সেগুলোই প্রকাশ

يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٦﴾

১৬. যার মাধ্যমে আল্লাহ যারা তাঁর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে, তাদেরকে শান্তির পথ দেখান এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল পথের দিশা দেন।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾

১৭. যারা বলে, মারয়াম তনয় মাসীহই আল্লাহ, তারা নিশ্চিত কাফির হয়ে গিয়েছে। (হে নবী!) তাদেরকে বলে দাও, মারয়াম তনয় মাসীহ, তার মা এবং পৃথিবীতে যারা আছে তাদের সকলকে যদি আল্লাহ ধ্বংস করতে চান, তবে কে আছে, যে আল্লাহর বিপরীতে কিছুমাত্র করার ক্ষমতা রাখে? আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মাঝখানে যা-কিছু আছে সে সমুদয়ের মালিকানা কেবল আল্লাহরই। তিনি যা-কিছু চান সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ

১৮. ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তার প্রিয়পাত্র। (তাদেরকে) বলে দাও, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পাপের কারণে শাস্তি দেন কেন?[১৮] না, বরং তোমরা

করে দিয়েছেন, যা দ্বীনী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ করা জরুরী ছিল। যেগুলো প্রকাশ না করলে কর্ম ও বিশ্বাসগত দিক থেকে দ্বীনী কোনও ক্ষতি ছিল না, অন্যদিকে প্রকাশ করলে তা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের জন্য বেজায় লাঞ্ছনার কারণ হত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জাতীয় বিষয়সমূহ এড়িয়ে গেছেন। তিনি সেগুলো প্রকাশ করার কোনও প্রয়োজন বোধ করেননি।

১৮. ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ নিজেরাও স্বীকার করত যে, তারা বিভিন্ন কারণে আল্লাহ তাআলার শাস্তির নিশানা হয়ে আছে। এমনকি আখেরাতেও যে তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে সেটাও তাদের অনেকে স্বীকার করত, হোক না তাদের ভাষায় তা অল্পকিছু কালের জন্য। সুতরাং এস্থলে বলা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষকে একই রকম বানিয়েছেন। তাদের মধ্যে বিশেষ কোনও জাতি সম্পর্কে এ দাবী করা যে, তারা আল্লাহর বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং তারা তাঁর সাধারণ নিয়মের বাইরে, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আল্লাহ

يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؗ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝

আল্লাহর সৃষ্ট অন্যান্য মানুষেরই মত মানুষ। তিনি যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মাঝখানে যা-কিছু আছে, সে সমুদয়ের মালিকানা কেবল আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে (সকলের) প্রত্যাবর্তন।

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ؗ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

১৯. হে কিতাবীগণ! তোমাদের নিকট এমন এক সময়ে আমার রাসূল দ্বীনের ব্যাখ্যা দানের জন্য এসেছে, যখন রাসূলগণের আগমন-ধারা বন্ধ ছিল, যাতে তোমরা বলতে না পার, আমাদের কাছে (জান্নাতের) কোনও সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নাম সম্পর্কে) সতর্ককারী আসেনি। এবার তোমাদের কাছে একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসে গেছে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।

[৪]

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝

২০. এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর সেই নিয়ামত স্মরণ কর, যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, তিনি তোমাদের মধ্যে নবী প্রেরণ করেছেন, তোমাদেরকে রাজক্ষমতার অধিকারী করেছেন এবং বিশ্ব জগতের কাউকে যা দেননি তোমাদেরকে তা দান করেছিলেন।

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ

২১. হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেই পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন,[১৯]

তাআলার বিধান সকলের জন্য সমান। তিনি নিজ রহমত বিতরণের জন্য বিশেষ কোনও গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট করে নেননি যে, তাদের বাইরে কেউ তা পাবে না। অবশ্য তিনি নিজ হিকমত অনুযায়ী যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন নিজের ইনসাফ ভিত্তিক বিধান অনুসারে শাস্তি দান করেন।

১৯. 'পবিত্র ভূমি' দ্বারা শাম ও ফিলিস্তিন অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূল পাঠানোর জন্য এ ভূমিকে বেছে নিয়েছিলেন। তাই একে 'পবিত্র ভূমি' বলা হয়েছে। এ

وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢١﴾

তাতে প্রবেশ কর এবং নিজেদের পশ্চাদ্দিকে ফিরে যেও না; তা হলে তোমরা উল্টে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. তারা বলল, হে মূসা! সেখানে তো অতি শক্তিমান এক সম্প্রদায় রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখান থেকে বের না হয়ে যায় আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করব না। হাঁ, তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে অবশ্যই আমরা সেখানে প্রবেশ করব।

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. যারা (আল্লাহকে) ভয় করত, তাদের মধ্যে দু'জন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন,[২০] বলল, তোমরা তাদের উপর চড়াও হয়ে (নগরের) দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। তোমরা যখন প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই বিজয়ী হবে। আল্লাহ তাআলার উপরই ভরসা রেখ, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও।

আয়াতে যে ঘটনার প্রতি ইশারা করা হয়েছে, সংক্ষেপে তা এইরূপ, বনী ইসরাঈলের মূল নিবাস ছিল শাম বিশেষত ফিলিস্তিন। মিসরে ফিরাউন তাদেরকে দাস বানিয়ে রেখেছিল। আল্লাহ তাআলার হুকুমে যখন ফিরাউন ও তার বাহিনী ডুবে মরে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ফিলিস্তিনে গিয়ে বসবাস করতে আদেশ করেন। এ ফিলিস্তিনে আমালিকা নামক এক কাফির জনগোষ্ঠী বাস করত। সুতরাং সে আদেশের অনিবার্য দাবী ছিল বনী ইসরাঈল ফিলিস্তিনে গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা ছিল সে যুদ্ধে বনী ইসরাঈলই জয়লাভ করবে। কেননা সে ভূখণ্ডটিকে তাদেরই ভাগ্যে লিখে দেওয়া হয়েছে। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সে আদেশ পালনার্থে ফিলিস্তিন অভিমুখে রওয়ানা হলেন। ফিলিস্তিনের কাছাকাছি পৌঁছতেই বনী ইসরাঈল উপলব্ধি করল আমালিকা গোষ্ঠীটি অতি শক্তিশালী। মূলত তারা ছিল আদ জাতির বংশধর। গায়ে-গতরে খুব বড়-বড়। বনী ইসরাঈল তাদের বিশাল-বিশাল দেহ দেখে ভয় পেয়ে গেল। তারা চিন্তা করল না যে, আল্লাহ তাআলার শক্তি আরও বড় এবং তিনি তাদের জয়লাভের ওয়াদাও করে রেখেছেন।

২০. এ দু'জন ছিলেন হযরত ইয়ূশা' (আ.) ও হযরত কালিব (আ.)। তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। পরবর্তী কালে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নবুওয়াতও দান করেছিলেন। তারা তাদের কওমকে বললেন, তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে অগ্রসর হও। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা অনুসারে তোমরাই জয়যুক্ত হবে।

قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَاۤ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৪. তারা বলতে লাগল, হে মূসা! তারা যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে (সেই দেশে) অবস্থানরত থাকবে, ততক্ষণ আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করব না। আর (তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হলে) তুমি ও তোমার রব চলে যাও এবং তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আমরা তো এখানেই বসে থাকব।

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ لَاۤ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِیْ وَاَخِیْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۲۵﴾

২৫. মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার নিজ সত্তা এবং আমার ভাই ছাড়া আর কারও উপর আমার কর্তৃত্ব নেই। সুতরাং আপনি আমাদের ও ওই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ফায়সালা করে দিন।

قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِی الْاَرْضِ ؕ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ

২৬. আল্লাহ বললেন, তবে সে ভূমি তাদের জন্য চল্লিশ বছর কাল নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। (এ সময়) তারা যমীনে দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকবে।[২১] সুতরাং

---

২১. বনী ইসরাঈলের সে অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই শাস্তি দিলেন যে, চল্লিশ বছরের জন্য ফিলিস্তিনে তাদের প্রবেশ রুদ্ধ করে দেওয়া হল। তারা সিনাই মরুভূমির ছোট্ট একটি এলাকার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকল; সামনে যাওয়ার কোনও পথও খুঁজে পাচ্ছিল না এবং মিসরেও ফিরে যেতে পারছিল না। হযরত মূসা (আ.), হযরত হারুন (আ.), হযরত ইউশা (আ.) ও হযরত কালিব (আ.)ও তাদের সঙ্গে ছিলেন। তাদেরই বরকত ও দোয়ায় আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি বিভিন্ন রকমের নিয়ামত অবতীর্ণ করতে থাকেন, যা সূরা বাকারায় (আয়াত ৫৭–৬০) বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। রোদ থেকে রক্ষা করার জন্য মেঘের ছায়া দেওয়া হয়, ক্ষুধা নিবারণের জন্য মান্ন ও সালওয়া নাযিল করা হয় এবং তৃষ্ণা মেটানোর জন্য পাথর থেকে বারটি ঝর্ণাধারা চালু হয়ে যায়। বনী ইসরাঈলের এই বাস্তুহারা জীবন ছিল তাদের উপর আল্লাহ তাআলার এক আযাব, কিন্তু এটাকেই আল্লাহ তাআলা উল্লিখিত মহা পুরুষদের পক্ষে আত্মিক প্রশান্তির উপকরণ বানিয়ে দেন। হযরত হারুন (আ.) ও মূসা (আ.) যথাক্রমে এ মরুভূমিতেই ইন্তিকাল করেন। তাদের পর হযরত ইউশা (আ.)কে নবী বানানো হয়। শামের কিছু এলাকা তাঁর নেতৃত্বে এবং কিছু এলাকা হযরত শামুয়েল আলাইহিস সালামের আমলে তালুতের নেতৃত্বে বিজিত হয়। সে ঘটনা সূরা বাকারায় (আয়াত ২৪৫–২৫২) বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এভাবে আল্লাহ তাআলা এ ভূখণ্ডটি বনী ইসরাঈলকে প্রদান করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূরণ করেন।

الْفٰسِقِيْنَ ۝٢٦

(হে মূসা!) তুমি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না।

[৫]

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۝٢٧

২৭. এবং (হে নবী!) তাদের সামনে আদমের দু' পুত্রের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে পড়ে শোনাও, যখন তাদের প্রত্যেকে একেকটি কুরবানী পেশ করেছিল এবং তাদের একজনের কুরবানী কবুল হয়েছিল, অন্যজনের কবুল হয়নি।[২২] সে (দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে) বলল, আমি তোমাকে হত্যা করে ফেলব। প্রথম জন বলল, আল্লাহ তো মুত্তাকীদের পক্ষ হতেই (কুরবানী) কবুল করেন।

---

২২. জিহাদের বিধান আসা সত্ত্বেও তা থেকে গা বাঁচানোর যে অপরাধে বনী ইসরাঈল লিপ্ত হয়েছিল পূর্বের আয়াতসমূহে ছিল তার বিবরণ। এবার বলা উদ্দেশ্য যে, কোনও মহৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত জিহাদে হত্যা করা কেবল বৈধই নয়; বরং ওয়াজিব, কিন্তু অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা গুরুতর পাপ। বনী ইসরাঈল জিহাদে যোগদান থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করেছে, অথচ বহু নিরপরাধ লোককে পর্যন্ত হত্যা করতে তাদের এতটুকু প্রাণ কাঁপেনি। প্রসঙ্গক্রমে দুনিয়ায় সর্বপ্রথম যে নরহত্যার ঘটনা ঘটেছিল, তা বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন মাজীদ সে সম্পর্কে কেবল এইটুকু জানিয়েছে যে, হযরত আদম আলাইহিস সালামের দুই পুত্র কিছু কুরবানী পেশ করেছিল। একজনের কুরবানী কবুল হয়, অন্যজনের কবুল হয়নি। এতে দ্বিতীয়জন ভীষণ ক্ষুব্ধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত সে তার ভাইকে হত্যা করে। কিন্তু এ কুরবানীর প্রেক্ষাপট কী ছিল, সে সম্পর্কে কুরআন মাজীদ কিছুই বলেনি। তবে মুফাসসিরগণ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) ও আরও কতিপয় সাহাবীর বরাতে সে ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তার সারমর্ম এই যে, হযরত আদম আলাইহিস সালামের দুই পুত্র ছিল। একজনের নাম হাবিল, অন্যজনের কাবীল। বলাবাহুল্য, তখন পৃথিবীতে মানব বসতি বলতে কেবল হযরত আদম আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গই ছিল। তার স্ত্রীর গর্ভে প্রতিবার দুটি জমজ সন্তানের জন্ম হত। একটি পুত্র ও একটি কন্যা। তাদের দু'জনের পরস্পরে বিবাহ তো জায়েয ছিল না, কিন্তু এক গর্ভের পুত্রের সাথে অপর গর্ভের কন্যার বিবাহ হালাল ছিল। কাবীলের সাথে যে কন্যার জন্ম হয় সে ছিল রূপসী। কিন্তু জমজ হওয়ার কারণে কাবীলের সাথে তার বিবাহ জায়েয ছিল না। তা সত্ত্বেও কাবীল গোঁ ধরে বসেছিল তাকেই বিবাহ করবে। হাবীলের পক্ষে সে মেয়ে হারাম ছিল না। তাই সে তাকে বিবাহ করতে চাচ্ছিল। এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা নিষ্পত্তির জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করবে। আল্লাহ তাআলা যার কুরবানী কবুল করবেন তার দাবী ন্যায্য মনে করা হবে। সুতরাং উভয়ে কুরবানী পেশ করল। বর্ণনায় আছে যে, হাবীল একটি দুম্বা কুরবানী দিয়েছিল আর কাবীল পেশ করেছিল কিছু কৃষিজাত ফসল। সেকালে কুরবানী কবুল হওয়ার আলামত ছিল এই

لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَیَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنِیْ مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ یَّدِیَ اِلَیْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّیْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۲۸﴾

২৮. তুমি যদি আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমার দিকে হাত বাড়াও, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তোমার দিকে হাত বাড়াব না। আমি তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করি।

اِنِّیْۤ اُرِیْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِیْ وَ اِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِیْنَ ﴿۲۹﴾

২৯. আমি চাই তুমি আমার ও তোমার উভয়ের পাপের কারণে ধরা পড়[২৩] এবং জাহান্নামীদের মধ্যে গণ্য হও। আর এটাই জালিমদের শাস্তি।

فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِیْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ﴿۳۰﴾

৩০. পরিশেষে তার মন তাকে ভ্রাতৃ-হত্যায় প্ররোচিত করল সুতরাং সে তার ভাইকে হত্যা করে ফেলল এবং অকৃতকার্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا یَّبْحَثُ فِی الْاَرْضِ لِیُرِیَهٗ كَیْفَ یُوَارِیْ سَوْءَةَ اَخِیْهِ ؕ قَالَ یٰوَیْلَتٰۤی اَعَجَزْتُ

৩১. অত:পর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, যে তার ভাইয়ের লাশ কিভাবে গোপন করবে তা তাকে দেখানোর লক্ষ্যে মাটি

যে, কুরবানী কবুল হলে আসমান থেকে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। সুতরাং আসমান থেকে আগুন আসল এবং হাবীলের কুরবানী জ্বালিয়ে দিল। এভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে, তার কুরবানী কবুল হয়েছে। কাবীলের কুরবানী যেমনটা তেমন পড়ে থাকল। তার মানে তার কুরবানী কবুল হয়নি। এ অবস্থায় কাবীলের তো উচিত ছিল সত্য মেনে নেওয়া, কিন্তু তার বিপরীতে সে ঈর্ষাকাতর হল এবং এক পর্যায়ে হাবীলকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়ে গেল।

২৩. যদিও আত্মরক্ষার কোনও উপায় পাওয়া না গেলে আক্রমণকারীকে হত্যা করা জায়েয, কিন্তু এক্ষেত্রে হাবীল পরহেজগারী তথা উচ্চতর নৈতিকতামূলক পন্থা অবলম্বন করলেন এবং নিজের যে অধিকার প্রয়োগ হতে বিরত থাকলেন। তিনি বোঝাচ্ছিলেন, আমি আত্মরক্ষার অন্য সব পন্থা অবলম্বন করব, কিন্তু তোমাকে হত্যা করতে কিছুতেই সচেষ্ট হব না। সেই সঙ্গে তাকে জানিয়ে দিলেন যে, তুমি যদি সত্যিই আমাকে হত্যা করে বস, তবে মজলুম হওয়ার কারণে আমার গুনাহসমূহ তো ক্ষমা করা হবে বলে আশা করতে পারি, কিন্তু তোমার উপর যে কেবল নিজের পাপের বোঝা চাপবে তাই নয়; বরং আমাকে হত্যা করার কারণে আমার কিছু পাপ-ভারও তোমার উপর চাপানো হতে পারে। কেননা আখিরাতে জালিমের পক্ষ হতে মজলুমের হক আদায়ের একটা পন্থা হাদীসে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, জালিমের পুণ্য মজলুমকে দেওয়া হবে। তারপরও যদি হক বাকি থেকে যায়, তবে মজলুমের পাপ জালিমের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে (তাফসীরে কাবীর)।

أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾

খনন করতে লাগল।[২৪] (এটা দেখে) সে বলে উঠল, হায় আফসোস! আমি কি এই কাকটির মতও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করতে পারি! এভাবে পরিশেষে সে অনুতপ্ত হল।

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

৩২. এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি ফরমান লিখে দিয়েছিলাম, কেউ যদি কাউকে হত্যা করে এবং তা অন্য কাউকে হত্যা করার কারণে কিংবা পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তারের কারণে না হয়, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল।[২৫] আর যে ব্যক্তি কারও প্রাণ রক্ষা করে, সে যেন সমস্ত মানুষের প্রাণরক্ষা করল। বস্তুত আমার রাসূলগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছে, কিন্তু তারপরও তাদের মধ্যে বহু লোক পৃথিবীতে সীমালংঘনই করে যেতে থাকে।

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ

৩৩. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে

---

২৪. কাবীলের দেখা এটাই যেহেতু ছিল মৃত্যুর প্রথম ঘটনা, তাই লাশ দাফনের নিয়ম তার জানা ছিল না। তাই আল্লাহ তাআলা একটি কাক পাঠিয়ে দিলেন। কাকটি মাটি খুঁড়ে একটা মৃত কাক দাফন করছিল। এটা দেখে কাবীল কেবল লাশ দাফনের নিয়মই শিখল না, নিজ অজ্ঞতার কারণে লজ্জিতও হল।

২৫. অর্থাৎ কোনও এক ব্যক্তিকে হত্যা করার অপরাধ দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করলে যে অপরাধ হয় তার সমতুল্য। কেননা কোনও ব্যক্তি অন্যায় নরহত্যায় কেবল তখনই লিপ্ত হয়, যখন তার অন্তর হতে মানুষের মর্যাদা সম্পর্কিত অনুভূতি লোপ পেয়ে যায়। আর এ অবস্থায় নিজ স্বার্থের খাতিরে সে আরেকজনকেও হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করবে না। এভাবে গোটা মানবতা তার অপরাধপ্রবণ মানসিকতার টার্গেট হয়ে থাকবে। তাছাড়া এ জাতীয় মানসিকতা ব্যাপক আকার ধারণ করলে সমস্ত মানুষই নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং অন্যায় হত্যার শিকার যে-ই হোক না কেন, দুনিয়ার সকল মানুষকে মনে করতে হবে এ অপরাধ আমাদের সকলেরই প্রতি করা হয়েছে।

خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۳۳﴾

তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া[২৬] হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে দূর করে দেওয়া[২৭] হবে। এটা তো তাদের পার্থিব লাঞ্ছনা। আর আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۴﴾

৩৪. তবে সেই সকল লোক ব্যতিক্রম, যারা তোমাদের আয়ত্তাধীন আসার আগেই তওবা করে।[২৮] এরূপ ক্ষেত্রে জেনে রেখ, আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

২৬. পূর্বে মানুষের প্রাণের মর্যাদা তুলে ধরার সাথে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছিল যে, যারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, এ মর্যাদা তাদের প্রাপ্য নয়। এবার তার বিস্তারিত বিধান বর্ণিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে মুফাসসির ও ফকীহগণ প্রায় সকলেই একমত যে, এ আয়াতে সেই সব দস্যু-ডাকাতদের কথা বলা হয়েছে, যারা অস্ত্রের জোরে মানুষের মাঝে লুটতরাজ চালায়। বলা হয়েছে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ ও রাসূল প্রদত্ত আইন-কানুনের অমর্যাদা করে। আর মানুষের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ যেন আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ। এ আয়াতে তাদের চার রকম শাস্তির কথা বলা হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সে শাস্তিসমূহের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই যে, তারা যদি কাউকে হত্যা করে, কিন্তু অর্থ-সম্পদ লুট করতে না পারে, তবে তাদেরকে হত্যা করা হবে। আর এ মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে শরয়ী শাস্তি (হুদুদ) হিসেবে, কিসাস হিসেবে নয়। সুতরাং নিহতের ওয়ারিশ ক্ষমা করলেও ঘাতক ক্ষমা পাবে না। ডাকাত যদি কাউকে হত্যা করার সাথে অর্থ-সম্পদ লুটও করে, তবে তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে। যদি সম্পদ লুট করে, কিন্তু কাউকে হত্যা না করে, তবে তাদের ডান হাত ও বাম পা কেটে দেওয়া হবে। যদি হত্যা ও লুট কোনটাই না করে, কিন্তু মানুষের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে, তবে তাদেরকে চতুর্থ শাস্তি দেওয়া হবে, যার বর্ণনা পরবর্তী টীকায় আসছে।

মনে রাখতে হবে, কুরআন মাজীদ এসব কঠোর শাস্তির কথা কেবল মূলনীতি আকারে বর্ণনা করেছে, কিন্তু এগুলো প্রয়োগ করার জন্য কি-কি শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। ফিকহী গ্রন্থাবলীতে সবিস্তারে তার উল্লেখ রয়েছে। সে সকল শর্ত এমনই কঠিন যে, কোনও মামলায় তা পূরণ হওয়া খুব সহজ নয়। কেননা উদ্দেশ্য তো হল এ সকল শাস্তি যত সম্ভব কম প্রয়োগ করা, কিন্তু শর্তাবলী পাওয়া গেলে মোটেই ছাড় না দেওয়া, যাতে এক অপরাধীর শাস্তি দেখে অন্যান্য অপরাধীগণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

২৭. এটা কুরআনী শব্দাবলীর তরজমা। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) 'দেশ থেকে দূর করে দেওয়া'-এর ব্যাখ্যা করেছেন 'কারাগারে আটকে রাখা'। হযরত উমর (রাযি.) থেকেও এরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। অন্যান্য ফকীহগণ এর অর্থ করেছেন দেশ থেকে বিতাড়িত ও নির্বাসিত করা হবে।

২৮. অর্থাৎ গ্রেফতার হওয়ার আগেই যদি তারা তওবা করে নেয় এবং সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তবে তাদের উপরিউক্ত শাস্তি মওকুফ হয়ে যাবে। অবশ্য মানুষের হক

[৬]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُوا فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর পর্যন্ত পৌঁছার জন্য অছিলা সন্ধান কর[২৯] এবং তাঁর পথে জিহাদ কর।[৩০] আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে।

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لِيَفْتَدُوا بِهِۦ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

৩৬. নিশ্চয়ই যারা কুফর অবলম্বন করেছে, পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই যদি তাদের থাকত এবং তার সমপরিমাণ আরও থাকত, যাতে কিয়ামতের দিন শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে তা পেশ করতে পারে, তবুও তাদের থেকে তা গৃহীত হত না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾

৩৭. তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে, অথচ তারা তা থেকে বের হতে পারবে না। তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

৩৮. যে পুরুষ ও যে নারী চুরি করে, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও, যাতে তারা নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিফল পায় এবং আল্লাহর পক্ষ হতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। আল্লাহ ক্ষমতাবানও, প্রজ্ঞাময়ও।

যেহেতু কেবল তওবা দ্বারা মাফ হয় না, তাই অর্থ-সম্পদ লুট করে থাকলে তা ফেরত দিতে হবে। যদি কাউকে হত্যা করে থাকে, তবে নিহতের ওয়ারিশগণ চাইলে কিসাস স্বরূপ হত্যার দাবী জানাতে পারবে। তবে তারাও যদি ক্ষমা করে দেয় অথবা কিসাসের পরিবর্তে রক্তপণ নিতে সম্মত হয়ে যায়, তবে তাদের মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হতে পারে।

২৯. এস্থলে 'অছিলা' দ্বারা 'সৎকর্ম' বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম হতে পারে। বোঝানো হচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের জন্য সৎকর্মকে অছিলা বানাও।

৩০. 'জিহাদ'-এর শাব্দিক অর্থ চেষ্টা ও পরিশ্রম করা। কুরআনী পরিভাষায় এর অর্থ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা; কিন্তু অনেক সময় দ্বীনের উপর চলার লক্ষ্যে যে-কোনও প্রকারের চেষ্টাকেই 'জিহাদ' বলা হয়। এখানে উভয় অর্থই বোঝানো উদ্দেশ্য হতে পারে।

فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۹﴾

৩৯. অত:পর যে ব্যক্তি নিজ সীমালংঘনমূলক কার্যক্রম থেকে তওবা করবে[৩১] এবং নিজেকে সংশোধন করে নেবে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۴۰﴾

৪০. তুমি কি জান না আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রাজত্ব কেবল আল্লাহরই? তিনি যাকে চান শাস্তি দেন এবং যাকে চান ক্ষমা করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ

৪১. হে রাসূল! যারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে তারা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়[৩২] অর্থাৎ সেই সব লোক, যারা মুখে তো বলে, ঈমান এনেছি, কিন্তু

---

৩১. পূর্বে ডাকাতির শাস্তির ক্ষেত্রেও তওবার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে তওবার ফল তো এই ছিল যে, গ্রেফতার হওয়ার আগে তওবা করলে হদ্দ (শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি) থেকে মুক্তি লাভ হয়, কিন্তু এখানে সে রকম কোনও কথা বলা হয়নি। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ব্যাখ্যা অনুসারে তওবা দ্বারা চুরির শাস্তি মওকুফ হয় না, চাই গ্রেফতার হওয়ার আগেই তওবা করুক না কেন! এখানে এতটুকুই বলা হয়েছে যে, এ তওবার আছর প্রকাশ পাবে কেবল আখেরাতে। অর্থাৎ তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। এর জন্যও আয়াতে দুটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। **ক.** আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করতে হবে এবং **খ.** নিজেকে সংশোধন করতে হবে। যার যার মাল চুরি করেছে, তাদেরকে তা ফেরত দেওয়াও জরুরী। অবশ্য তারা মাফ করলে ভিন্ন কথা।

৩২. এখান থেকে ৫০ নং পর্যন্ত আয়াতগুলি বিশেষ কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। ঘটনাগুলো ইয়াহুদীদের কিছু মামলা সংক্রান্ত। তারা তাদের কিছু কলহ-বিবাদ সংক্রান্ত মামলা এই আশায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদালতে রুজু করেছিল যে, তিনি তাদের পসন্দমত রায় প্রদান করবেন। একটি ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, খায়বারের দু'জন বিবাহিত নর-নারী, যারা ইয়াহুদী ছিল, ব্যভিচার করেছিল। তাওরাতে এর শাস্তি ছিল পাথর মেরে হত্যা করা। বর্তমানে প্রচলিত তাওরাতেও এ বিধানের উল্লেখ রয়েছে (দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ, ২২, ২৩, ২৪)। কিন্তু ইয়াহুদীরা সে শাস্তির পরিবর্তে নিজেদের পক্ষ হতে চাবুক মারা ও মুখে কালি মাখানোর শাস্তি স্থির করে নিয়েছিল। সম্ভবত সে শাস্তিকেও তারা আরও হালকা করতে চাচ্ছিল। তারা লক্ষ্য করেছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়তে প্রদত্ত বহু বিধান তাওরাতের বিধান অপেক্ষা সহজ। তাই তারা চিন্তা করেছিল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি সে ব্যভিচার সম্পর্কে ফায়সালা দান করেন, তবে তা সম্ভবত হালকা হবে এবং তাতে করে অপরাধীদ্বয় মৃত্যুদণ্ড থেকে

قُلُوْبُهُمْ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۚ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ؕ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ؕ

তাদের অন্তর ঈমান আনেনি এবং সেই সকল লোক, যারা (প্রকাশ্যে) ইয়াহুদী ধর্ম অবলম্বন করেছে। তারা অত্যাধিক মিথ্যা শ্রবণকারী[৩৩] (এবং তোমার কথাবার্তা), এমন এক দল লোকের পক্ষে শোনে, যারা তোমার কাছে আসেনি,[৩৪] যারা (আল্লাহর কিতাবের) শব্দাবলীর স্থান স্থির হয়ে যাওয়ার পরও তাতে বিকৃতি সাধন করে। তারা বলে, তোমাদেরকে এই হুকুম দেওয়া হলে

রেহাই পাবে। সেমতে খায়বারের ইয়াহুদীগণ মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাসকারী কিছু ইয়াহুদীকে, যাদের মধ্যে কতিপয় মুনাফিকও ছিল, সেই অপরাধীদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠালো। তবে সাবধান করে দিল, তিনি রজম (পাথর নিক্ষেপ হত্যা) ছাড়া অন্য কোনও ফায়সালা দিলে সেটাই গ্রহণ করবে। যদি রজমের ফায়সালা দেন তবে কিছুতেই গ্রহণ করবে না। সেমতে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হল। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, রজমই তাদের একমাত্র শাস্তি। এটা শুনে তারা হতভম্ব হয়ে গেল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তাওরাতে এ অপরাধের কী শাস্তি লেখা আছে? প্রথমে তারা লুকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যখন তাদের বড় আলেম ইবনে সূরিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, যিনি ইত:পূর্বে একজন বড় ইয়াহুদী আলেম ছিলেন এবং ইয়াহুদী ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের গোমর ফাঁক করে দিলেন, তখন তারা মানতে বাধ্য হল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.) তাওরাতের যে আয়াতে রজমের বিধান বর্ণিত হয়েছে তাও পড়ে শুনিয়ে দিলেন। তিনি আরও বললেন, তাওরাতের বিধান তো এটাই ছিল, কিন্তু এটা প্রয়োগ করা হত কেবল আমাদের মধ্যে যারা গরীব ছিল তাদের উপর। কোনও ধনী বা গণ্যমান্য লোক এ অপরাধ করলে তাকে কেবল চাবুক মারা হত। কালক্রমে সকলের ক্ষেত্রেই রজমের শাস্তি পরিত্যাগ করা হয়। এ রকমের আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল, যা সামনে ৪৫ নং টীকায় আসছে।

৩৩. অর্থাৎ ইয়াহুদীদের ধর্মগুরুগণ তাওরাতের নামে যেসব মিথ্যা কথা প্রচার করত এবং যা তাদের মনমতোও হত, সেগুলো আগ্রহ ভরে শুনত ও মানত, তা তাওরাতের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বিধানাবলীর বিপরীত হলেও এবং একথা জানা সত্ত্বেও যে, তাদের ধর্মগুরুগণ উৎকোচ নিয়েই এসব মনগড়া বিধান প্রচার করছে।

৩৪. এর দ্বারা সেই সকল ইয়াহুদীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা নিজেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে না এসে অন্য ইয়াহুদী ও মুনাফিকদেরকে পাঠিয়েছিল। আর যারা এসেছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শোনার ও তাঁর মনোভাব জানার পর যারা তাদেরকে পাঠিয়েছিল, ফিরে গিয়ে তাদেরকে তা অবহিত করা।

وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ؕ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ ۖۚ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٤١﴾

গ্রহণ করো আর যদি এটা দেওয়া না হয়, তবে বেঁচে থেক। আল্লাহ যাকে ফিতনায় ফেলার ইচ্ছা করেন, তাকে আল্লাহর থেকে বাঁচানোর জন্য তোমার কোনও ক্ষমতা কক্ষনো কাজে আসবে না। এরা তারা, (নাফরমানীর কারণে) আল্লাহ যাদের অন্তর পবিত্র করার ইচ্ছা করেননি।[৩৫] তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য আখিরাতে আছে মহা শাস্তি।

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. তারা অতি আগ্রহের সাথে মিথ্যা শোনে এবং প্রাণভরে হারাম খায়।[৩৬] সুতরাং যদি তোমার কাছে আসে, তবে চাইলে তাদের মধ্যে ফায়সালা কর কিংবা চাইলে তাদেরকে উপেক্ষা কর।[৩৭] তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে তারা তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি ফায়সালা কর, তবে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফায়সালা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।

---

৩৫. এ দুনিয়া যেহেতু বানানোই হয়েছে পরীক্ষার জন্য, তাই যারা মিথ্যাকেই আকড়ে থাকবে বলে গো ধরেছে, আল্লাহ তাদেরকে জোর করে সত্য-সঠিক পথে এনে তাদের অন্তর পবিত্র করেন না। এ পবিত্রতা কেবল তাদেরকেই দান করা হয়, যারা সত্যের সন্ধানী হয় এবং সত্যকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নেয়।

৩৬. এস্থলে হারাম দ্বারা সেই উৎকোচ বোঝানো হয়েছে, যার বিনিময়ে ইয়াহুদী ধর্মগুরুগণ তাওরাতের বিধান পরিবর্তন করে ফেলে।

৩৭. যে সকল ইয়াহুদী মীমাংসার জন্য এসেছিল, তাদের সঙ্গে যদিও শান্তি চুক্তি সম্পাদিত ছিল, কিন্তু তারা ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক নাগরিক ছিল না। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এখতিয়ার দেওয়া হয় যে, চাইলে তিনি তাদের মধ্যে মীমাংসা করতেও পারেন এবং নাও করতে পারেন। নয়ত যে সকল অমুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক নাগরিক, রাষ্ট্রের সাধারণ আইন-কানুনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যেও শরীয়ত অনুযায়ী মীমাংসা দান জরুরী, যেমন সামনে আসছে। অবশ্য তাদের বিশেষ ধর্মীয় বিষয়াবলী তথা বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে তাদের ধর্মীয় বিধান অনুসারে তাদের জজের দ্বারাই রায় দেওয়ানো চাই।

وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ط وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. তারা কিভাবে তোমার থেকে ফায়সালা নিতে চায়, যখন তাদের কাছে তাওরাত রয়েছে, যার ভেতর আল্লাহর ফায়সালা লিপিবদ্ধ আছে? অত:পর তারা (ফায়সালা হতে) মুখ ফিরিয়ে নেয়।[৩৮] প্রকৃতপক্ষে তারা মুমিন নয়।

[৭]

اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ج يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ج فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. নিশ্চয়ই আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম; তাতে ছিল হিদায়াত ও আলো। সমস্ত নবী, যারা ছিল আল্লাহর অনুগত, ইয়াহুদীদের বিষয়াবলীতে সেই অনুসারেই ফায়সালা দিত এবং সমস্ত আল্লাহওয়ালা ও আলেমগণও (তদানুসারেই কাজ করত)। কেননা তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক বানানো হয়েছিল এবং তারা ছিল তার সাক্ষী। সুতরাং (হে ইয়াহুদীগণ!) তোমরা মানুষকে ভয় করো না। আমাকেই ভয় করো এবং তুচ্ছ মূল্য গ্রহণের খাতিরে আমার আয়াতসমূহকে সওদা বানিও না। যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়সালা করে না, তারা কাফির।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ لا وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ لا وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ط فَمَنْ

৪৫. এবং আমি তাতে (তাওরাতে) তাদের জন্য বিধান লিখে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান ও দাঁতের বদলে দাঁত। আর জখমেও (অনুরূপ) বদলা নেওয়া হবে। অবশ্য যে

---

৩৮. এর এক অর্থ হতে পারে, তারা তাওরাতের বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিচারপ্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে রায় প্রদান করেন, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۴۵﴾

ব্যক্তি তা (অর্থাৎ বদল) ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে। যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার করে না, তারা জালিম।[৩৯]

وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۪ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۴۶﴾

৪৬. আমি তাদের (নবীগণের) পর মারয়ামের পুত্র ঈসাকে তার পূর্ববর্তী কিতাব অর্থাৎ তাওরাতের সমর্থকরূপে পাঠিয়েছিলাম এবং আমি তাকে ইনজিল দিয়েছিলাম, যাতে ছিল হিদায়াত ও আলো এবং যা তার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সমর্থক এবং মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশরূপে এসেছিল।

---

৩৯. আলোচ্য আয়াতসমূহ যে সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছিল, তার মধ্যে দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, মদীনা মুনাওয়ারায় ইয়াহুদীদের দু'টি গোত্র বাস করত- বনু নাযীর ও বনু কুরায়জা। বনু কুরায়জা অপেক্ষা বনু নাযীর বেশী ধনী ছিল। উভয় গোত্র ইয়াহুদী হওয়া সত্ত্বেও বনু নাযীর বনু কুরায়জার আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিল। তারা এই অন্যায় আইন তৈরি করেছিল যে, বনু নাযীরের কেউ যদি বনু কুরায়জার কাউকে হত্যা করে, তবে 'প্রাণের বদলে প্রাণ' -এই নিয়ম অনুযায়ী হত্যাকারী থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে না। বরং রক্তপণ স্বরূপ সে সত্তর ওয়াসাক খেজুর দেবে। (ওয়াসাক এক রকমের পরিমাপ। এক ওয়াসাকে প্রায় পাঁচ মণ দশ সের হয়।) পক্ষান্তরে বনু কুরায়জার কেউ বনু নাযীরের কাউকে হত্যা করলে, কিসাস স্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা তো করা হবেই, সেই সঙ্গে তার থেকে রক্তপণও নেওয়া হবে এবং তাও দ্বিগুণ। মদীনা মুনাওয়ারায় যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমন হয়, তখন এ জাতীয় একটি ঘটনা ঘটে। বনু কুরায়জার এক ব্যক্তি বনু নাযীরের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে বসল। পূর্ব নিয়ম অনুসারে যখন বনু নাযীর কিসাস ও রক্তপণ উভয়ের দাবী করল, তখন বনু কুরায়জার লোক সে অন্যায় নিয়মের প্রতিবাদ করল এবং তারা প্রস্তাব দিল এ বিষয়ে ফায়সালার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদালতে মামলা রুজু করা হোক। কেননা এতটুকু কথা তারাও জানত যে, তাঁর দ্বীন ন্যায়নীতির দ্বীন। বনু কুরায়জার পীড়াপীড়ির কারণে শেষ পর্যন্ত বনু নাযীর তাতে রাজি হল। তবে এ কাজে তারা কিছুসংখ্যক মুনাফিককে নিযুক্ত করল। তাদেরকে বলে দিল, তারা অনানুষ্ঠানিকভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতামত জানবে। যদি তাঁর রায় বনু নাযীরের অনুকূল হয়, তবে তাঁকে দিয়ে বিচার করাবে। অন্যথায় নয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, তাওরাতে তো স্পষ্টভাবে বিধান দেওয়া হয়েছে যে, প্রাণের বদলে প্রাণ নেওয়া হবে। এ হিসেবে বনু নাযীরের দাবী সম্পূর্ণ জুলুম ও তাওরাত বিরোধী।

وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

৪৭. ইনজীল-অনুসারীগণ যেন আল্লাহ তাতে যা নাযিল করেছেন, সে অনুসারে বিচার করে। যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার করে না, তারা ফাসিক।

وَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ

৪৮. এবং (হে রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি তোমার প্রতিও সত্য সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছি, তার পূর্বের কিতাবসমূহের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং তাদের মধ্যে সেই বিধান অনুসারেই বিচার কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। আর তোমার নিকট যে সত্য এসেছে তা ছেড়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক (উম্মত)-এর জন্য আমি এক (পৃথক) শরীয়ত ও পথ নির্ধারণ করেছি।[৪০] আল্লাহ চাইলে তোমাদের সকলকে একই উম্মত বানিয়ে দিতেন। কিন্তু (পৃথক শরীয়ত এজন্য

---

৪০. ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ যে সকল কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করত, তার একটি ছিল এই যে, ইসলামে ইবাদতের পদ্ধতি এবং অন্যান্য কিছু বিধান হযরত মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর শরীয়ত থেকে আলাদা ছিল। তাদের পক্ষে এই সকল নতুন বিধান অনুসারে কাজ করা কঠিন মনে হয়েছিল। এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা নিজ হিকমত অনুসারে নবীগণকে পৃথক-পৃথক শরীয়ত দিয়েছেন। তার এক কারণ তো এই যে, প্রত্যেক কালের চাহিদা ও দাবি আলাদা হয়ে থাকে। কিন্তু একটি কারণ এ-ও যে, এর দ্বারা পরিষ্কার করে দেওয়া উদ্দেশ্য– ইবাদতের বিশেষ কোনও পদ্ধতি ও কানুন সত্তাগতভাবে পবিত্রতা ও মর্যাদার অধিকারী নয়। তার যা-কিছু মর্যাদা, তা কেবল আল্লাহ তাআলার হুকুমেরই কারণে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা যে কালে যে বিধান দান করেন, সে কালে সেই বিধানই মর্যাদাপূর্ণ। অথচ বাস্তবে ঘটছে এই যে, যারা কোনও এক নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তারা সেই নিয়মকে সত্তাগতভাবেই পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ মনে করে বসে। অত:পর যখন কোনও নতুন নবী নতুন শরীয়ত নিয়ে আসেন, তখন তাদেরকে পরীক্ষা করা হয়, তারা পুরানো নিয়মকে সত্তাগতভাবে পবিত্র মনে করে নতুন নিয়মকে অস্বীকার করে, না মৌলিকভাবে আল্লাহ তাআলার হুকুমকেই পবিত্রতা ও মর্যাদার ধারক মনে করে নতুন বিধানকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নেয়। সামনে যে বলা হয়েছে, 'কিন্তু (তোমাদেরকে পৃথক শরীয়ত এই জন্য দিয়েছি) যাতে তিনি তোমাদেরকে যা-কিছু দিয়েছেন, তা দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন' তার মতলব এটাই।

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝٤٨

দিয়েছেন) যাঁতে তিনি তোমাদেরকে যা-কিছু দিয়েছেন, তা দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন। সুতরাং তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। তোমাদের সকলকে আল্লাহরই দিকে ফিরে যেতে হবে। অত:পর যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۝٤٩

৪৯. এবং (আমি আদেশ করছি যে,) তুমি মানুষের মধ্যে সেই বিধান অনুসারেই বিচার করবে,[৪১] যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তাদের ব্যাপারে সাবধান থেক, পাছে তারা তোমাকে ফিতনায় ফেলে এমন কোন বিধান থেকে বিচ্যুত করে, যা আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রেখ, আল্লাহ তাদের কোনও কোনও পাপের কারণে তাদেরকে বিপদাপন্ন করার ইচ্ছা করেছেন।[৪২] তাদের মধ্যে অনেকেই ফাসিক।

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ

৫০. তবে কি তারা জাহেলী যুগের ফায়সালা লাভ করতে চায়? যারা নিশ্চিত বিশ্বাস

---

৪১. এ বিধান সেই অমুসলিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে ইসলামী রাষ্ট্রের আইনসম্মত নাগরিক হয়ে যায়। ফিকহী পরিভাষায় তাকে 'যিম্মী' বলে। কিংবা কোনও অমুসলিম যদি স্বেচ্ছায় তার বিচার-নিষ্পত্তি মুসলিম কাযী (বিচারক) দ্বারা করাতে চায় তার ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। এ অবস্থায় মুসলিম বিচারক সাধারণ রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলীতে তো ইসলামী বিধান অনুসারেই রায় দেবে, কিন্তু তাদের একান্ত ধর্মীয় বিষয়াবলী, যথা ইবাদত-উপাসনা, বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকারে তারা নিজ ধর্ম অনুযায়ী বিচার-নিষ্পত্তি করতে পারবে। তবে সেটা করবে তাদেরই ধর্মের লোক।

৪২. 'কোনও কোনও পাপ' বলা হয়েছে এ কারণে যে, সাধারণভাবে সব গুনাহের শাস্তি তো আখেরাতেই দেওয়া হবে, কিন্তু আল্লাহ ও রাসূল হতে মুখ ফেরানোর শাস্তি দুনিয়াতেও দেওয়া হয়। সুতরাং অঙ্গীকার ভঙ্গ ও ষড়যন্ত্র করার কারণে তাদেরকে দুনিয়াতেই নির্বাসন ও মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে।

مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٥٠﴾

রাখে, তাদের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম ফায়সালা দানকারী কে হতে পারে?

[৮]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

৫১. হে মুমিনগণ! ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।[৪৩] তারা নিজেরাই একে অন্যের বন্ধু! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে হিদায়াত দান করেন না।

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. সুতরাং যাদের অন্তরে (মুনাফেকীর) ব্যাধি আছে, তুমি তাদেরকে দেখতে পাচ্ছ যে, তারা অতি দ্রুত তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। তারা বলছে, আমাদের আশঙ্কা হয় আমরা কোনও মুসিবতের পাকে পড়ে যাব।[৪৪] (কিন্তু) এটা দূরে নয় যে, আল্লাহ (মুসলিমদেরকে) বিজয় দান করবেন অথবা নিজের পক্ষ হতে অন্য কিছু ঘটাবেন,[৪৫] ফলে তখন তারা নিজেদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল, তজ্জন্য অনুতপ্ত হবে।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ

৫৩. এবং (তখন) মুমিনগণ (পরস্পরে) বলবে, এরাই কি তারা, যারা জোরদারভাবে কসম করে বলত যে, তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে। তাদের

---

৪৩. এ আয়াতের ব্যাখ্যা এবং অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের সীমারেখা সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানের (৩ : ২৮) টীকা দেখুন।

৪৪. এর দ্বারা মুনাফিকদের অবস্থা তুলে ধরা হচ্ছে যারা সর্বদা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে মেলামেশা করত এবং তাদের ষড়যন্ত্রে শরীক থাকত। এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুললে তারা বলত, তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখলে তারা আমাদেরকে সংকটে ফেলবে এবং আমরা মুসিবতে পড়ে যাব। আর তাদের মনের ভেতর থাকত যে, কখনও মুসলিমগণ তাদের কাছে পরাস্ত হলে তখন আমাদেরকে তাদের সঙ্গেই মিলে থাকতে হবে।

৪৫. 'অন্য কিছু ঘটানো' দ্বারা সম্ভবত ওহী দ্বারা তাদের গোমর ফাঁক করে দেওয়া এবং পরিণামে সর্বসমক্ষে তাদের লাঞ্ছিত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে।

أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿٥٣﴾

কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে এবং তারা অকৃতকার্য হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

৫৪. হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি নিজ দ্বীন থেকে ফিরে যায়, তবে আল্লাহ এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনও নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা করেন দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫. (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের বন্ধু তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা আল্লাহর সামনে বিনীত হয়ে সালাত আদায় করে ও যাকাত দেয়।

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

৫৬. কেউ আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণকে বন্ধু বানালে (সে আল্লাহর দলভুক্ত হয়ে যাবে) আল্লাহর দলই তো বিজয়ী হবে।

[৯]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

৫৭. হে মুমিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে কৌতুক ও ক্রীড়ার বস্তু বানায় তাদেরকে বন্ধু বানিও না। তোমরা প্রকৃত মুমিন হলে আল্লাহকেই ভয় করো।

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮. এবং তোমরা যখন (মানুষকে) নামাযের জন্য ডাক, তখন তারা তাকে (সে ডাককে) কৌতুক ও ক্রীড়ার লক্ষ্যবস্তু বানায়। এসব (আচরণ) এ কারণে যে, তারা এমন এক সম্প্রদায়, যাদের বোধশক্তি নেই।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٥٩﴾

৯. বল, হে কিতাবীগণ! তোমরা কি আমাদের কেবল এ বিষয়টাকেই খারাপ মনে করছ যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের উপর যা নাযিল করা হয়েছে এবং যা পূর্বে নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছি, যখন তোমাদের অধিকাংশই অবাধ্য?

قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ؕ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٦٠﴾

০. (হে নবী! তাদেরকে) বল, আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব (তোমরা যে বিষয়কে খারাপ মনে করছ) আল্লাহর কাছে তার চেয়ে মন্দ পরিণাম কার হবে? তারা ওই সকল লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি ক্রোধ বর্ষণ করেছেন, যাদের মধ্যে কতককে বানর ও শূকর বানিয়ে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের পূজা করেছে। তারাই নিকৃষ্ট ঠিকানার অধিকারী এবং তারা সরল পথ থেকে অত্যধিক বিচ্যুত।

وَاِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ﴿٦١﴾

১. তারা যখন তোমাদের কাছে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা কুফর নিয়েই এসেছিল এবং কুফর নিয়েই বের হয়ে গিয়েছে। তারা যা-কিছু গোপন করছে আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন।

وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٢﴾

২. তাদের অনেককেই তুমি দেখবে, তারা পাপ, জুলুম ও অবৈধ ভক্ষণের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। সত্যি কথা হচ্ছে, তারা যা-কিছু করছে তা অতি মন্দ।

لَوْلَا يَنْهٰىهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿٦٣﴾

৩. তাদের মাশায়েখ ও উলামা তাদেরকে গুনাহের কথা বলতে ও হারাম খেতে নিষেধ করছে না কেন? বস্তুত তাদের এ কর্মপন্থা অতি মন্দ!

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ كُلَّمَآ اَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾

৬৪. ইয়াহুদীগণ বলে, আল্লাহর হাত বাঁধা।[৪৬] হাত বাঁধা তো তাদেরই, তারা যে কথা বলেছে, সে কারণে তাদের উপর পৃথক লানত বর্ষিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর উভয় হাত প্রসারিত। তিনি যেভাবে চান ব্যয় করেন এবং (হে নবী!) তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যে ওহী নাযিল করা হয়েছে, তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরীতে বৃদ্ধি সাধন করবেই এবং আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছি। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন জ্বালায়, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন।[৪৭] তারা পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে বেড়ায়, অথচ আল্লাহ অশান্তি বিস্তারকারীদেরকে পসন্দ করেন না।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾

৬৫. কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই আমি তাদের পাপকর্মসমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে সুখ-শান্তির উদ্যানসমূহে প্রবেশ করাতাম।

---

৪৬. মদীনা মুনাওয়ারায় ইয়াহুদীগণ যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডাকে সাড়া দিল না, তখন আল্লাহ তাআলা সতর্ক করার জন্য কিছু কালের জন্য তাদেরকে অর্থ সংকটে নিক্ষেপ করলো। এ অবস্থায় তাদের তো উচিত ছিল সতর্ক হয়ে যাওয়া, কিন্তু তার পরিবর্তে তাদের নেতৃস্থানীয় কিছু লোক এই অশিষ্ট বাক্যটি পর্যন্ত উচ্চারণ করল। আরবীতে 'হাত বাঁধা' দ্বারা কৃপণতা বোঝানো হয়ে থাকে। তারা বোঝাতে চাচ্ছিল আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি কৃপণতা করছেন (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ ইয়াহুদী জাতি সেই প্রাচীন কাল থেকেই বখিল ও কৃপণ হিসেবে প্রসিদ্ধ। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলছেন, হাত বাঁধা তো তাদের নিজেদেরই।

৪৭. ইয়াহুদীরা ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুদের সাথে মিলিত হয়ে যে সকল ষড়যন্ত্র করত সে দিকে ইশারা করা হয়েছে। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে কখনও যুদ্ধ করবে না– এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল, তাই প্রকাশ্যে যুদ্ধ না করলেও পর্দার অন্তরালে চেষ্টা চালাত যাতে মুসলিমদের উপর শত্রুগণ আক্রমণ চালায় এবং তাতে মুসলিমগণ পরাস্ত হয়। তারা এভাবে একের পর এক ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রতিবারই আল্লাহ তাআলা সে ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিতে থাকেন।

৬৬. যদি তারা তাওরাত, ইনজীল এবং (এবার) তাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তার যথাযথ অনুসরণ করত, তবে তারা তাদের উপর ও তাদের নিচ, সকল দিক থেকে (আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক) খেতে পেত। (যদিও) তাদের মধ্যে একটি দল সরল পথের অনুসারী। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এমন, যাদের কার্যকলাপ মন্দ।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٦﴾

[১০]

৬৭. হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা প্রচার কর। যদি তা না কর, তবে (তার অর্থ হবে) তুমি আল্লাহর বার্তা পৌঁছালে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষের (ষড়যন্ত্র) থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮. বলে দাও, হে কিতাবীগণ! তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাওরাত ও ইনজীল এবং (এখনও) যে কিতাব তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে, তার যথাযথ অনুসরণ না করবে, ততক্ষণ তোমাদের কোনও ভিত্তি নেই, যার উপর তোমরা দাঁড়াতে পার এবং (হে রাসূল!) তোমার প্রতি যে ওহী নাযিল করা হয়েছে, তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও অবিশ্বাসই বৃদ্ধি করবে। সুতরাং তুমি কাফিরদের জন্য দুঃখ করো না।

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯. সত্য কথা হচ্ছে মুসলিম, ইয়াহুদী, সাবী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে যারাই আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান আনবে এবং

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ

صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝٦٩

সৎকর্ম করবে, তাদের কোনও ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[৪৮]

لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ؕ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ ۙ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ۝٧٠

৭০. আমি বনী ইসরাঈলের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম। যখনই কোনও রাসূল তাদের কাছে এমন কোনও বিষয় নিয়ে আসত, যা তাদের মনোপুত নয়, তখনই কতক (রাসূল)কে তারা মিথ্যাবাদী বলেছে এবং কতককে হত্যা করতে থেকেছে।

وَحَسِبُوْٓا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝٧١

৭১. তারা মনে করেছিল কোনও পাকড়াও হবে না। ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। অত:পর আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেছিলেন। পুনরায় তাদের অনেকে অন্ধ ও বধির হয়ে গেছে। আল্লাহ তাদের যাবতীয় কাজ ভালোভাবেই দেখছেন।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝٧٢

৭২. যারা বলে, মারইয়ামের পুত্র মাসীহই আল্লাহ; নিশ্চয়ই তারা কাফির হয়ে গিয়েছে। অথচ মাসীহ বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। নিশ্চিত জেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর যারা (এরূপ) জুলুম করে তাদের কোনও রকমের সাহায্যকারী লাভ হবে না।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ

৭৩. এবং তারাও নিশ্চয় কাফির হয়ে গিয়েছে, যারা বলে, 'আল্লাহ তিনজনের

---

৪৮. সূরা বাকারার ৬২ নং আয়াতে এই একই বিষয় গত হয়েছে। সেখানকার টীকা দ্রষ্টব্য।

ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّاۤ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

মধ্যে তৃতীয় জন।'[৪৯] অথচ এক ইলাহ ব্যতীত কোনও ইলাহ্ নেই। তারা যদি তাদের এ কথা থেকে বিরত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে।

اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৭৪. তারপরও কি তারা ক্ষমার জন্য আল্লাহর দিকে রুজু করবে না এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? অথচ আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ؕ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ

৭৫. মাসীহ্ ইবনে মারইয়াম তো একজন রাসূলই ছিলেন, তার বেশি কিছু নয়। তার পূর্বেও বহু রাসূল গত হয়েছে। তার মা ছিল সিদ্দীকা। তারা উভয়ে খাবার খেত।[৫০] দেখ, আমি তাদের সামনে

---

৪৯. এর দ্বারা খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। 'ত্রিত্ববাদ'-এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তিন উকনূম (Persons) অর্থাৎ পিতা, পুত্র (মাসীহ) ও পবিত্র আত্মা (রূহুল কুদস)-এর সমষ্টির নাম। তাদের এক দলের মতে তৃতীয়জন হলেন মারইয়াম আলাইহিস সালাম। তাদের বক্তব্য হল, এই তিনজন মিলে একজন। তিনের সমষ্টি 'এক' কিভাবে? এই হেয়ালীর কোনও যুক্তিসঙ্গত উত্তর কারও কাছে নেই। তাদের ধর্মতত্ত্ববিদ (Theologions) বিষয়টাকে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। কেউ বলেছেন, হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম কেবল খোদা ছিলেন, মানুষ ছিলেন না। ৭২ নং আয়াতে তাদের এ বিশ্বাসকে কুফুর সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, খোদা যেই তিন উকনূমের সমষ্টি তার একজন হলেন পিতা অর্থাৎ আল্লাহ, আর দ্বিতীয়জন পুত্র, যিনি মূলত আল্লাহ তাআলারই একটি গুণ, যা মানব অস্তিত্বে মিশে গিয়ে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং তিনি যেমন মানুষ ছিলেন, তেমনি মৌলিকত্বের দিক থেকে খোদাও ছিলেন। ৭৩ নং আয়াতে এ বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। খ্রিস্টানদের এসব 'আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাখ্যা এবং তার রদ ও জবাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এই লেখক (আল্লামা তাকী উসমানী)--এর রচিত 'ঈসাইয়্যাত কিয়া হ্যায়' শীর্ষক গ্রন্থখানি পড়া যেতে পারে।

৫০. 'সিদ্দীকা' শব্দটি 'সিদ্দীক'-এর স্ত্রী লিঙ্গ। আভিধানিক অর্থ সত্যনিষ্ঠ। পরিভাষায় সাধারণত সিদ্দীক বলা হয় নবীর সর্বোচ্চ স্তরের অনুসারীকে। নবুওয়াতের পর এটাই মানবীয় উৎকর্ষের সর্বোচ্চ স্তর। হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম ও তাঁর মা মারইয়াম আলাইহাস সালাম উভয় সম্পর্কে কুরআন মাজীদ এই বাস্তবতা তুলে ধরেছে যে, তারা খাবার খেতেন। এটা উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, তাদের 'খোদা' না হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট দলীলরূপে

ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٧٥﴾

নিদর্শনাবলী কেমন সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করছি। তারপর এটাও দেখ যে, তাদেরকে উল্টোমুখে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে![৫১]

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ؕ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٦﴾

৭৬. (হে নবী!) তাদেরকে বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন সৃষ্টির ইবাদত করছ, যা তোমাদের কোনও উপকার করার ক্ষমতা রাখে না এবং অপকার করারও না,[৫২] যখন আল্লাহই সবকিছুর শ্রোতা ও সকল বিষয়ের জ্ঞাতা?

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ

৭৭. (এবং তাদেরকে এটাও বলে দাও যে,) হে কিতাবীগণ! নিজেদের দ্বীন নিয়ে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না[৫৩] এবং এমন সব লোকের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, যারা নিজেরাও প্রথমে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অপর বহু লোককেও পথভ্রষ্ট

এটাই যথেষ্ট। একজন মামুলী জ্ঞানসম্পন্ন লোকও বুঝতে সক্ষম যে, খোদা কেবল এমন সত্তাই হতে পারেন, যিনি সব রকম মানবীয় প্রয়োজনের উর্ধ্বে থাকবেন। খোদার নিজেরও যদি খাবার খেতে হয়, তবে সে কেমন খোদা হল?

৫১. কুরআন মাজীদ এস্থলে কর্মবাচ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছে। তাই তরজমা এরূপ করা হয়নি যে, 'তারা উল্টোমুখে কোথায় যাচ্ছে ?' বরং অর্থ করা হয়েছে, 'তাদেরকে উল্টোমুখে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?' এর দ্বারা ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, তাদের ইন্দ্রিয় চাহিদা ও ব্যক্তিস্বার্থই তাদেরকে উল্টো দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

৫২. হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম যদিও আল্লাহ তাআলার মনোনীত নবী ছিলেন, কিন্তু কারও উপকার বা অপকার করার নিজস্ব শক্তি তাঁরও ছিল না। সে শক্তি আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারও নেই। তিনি কারও কোনও উপকার করে থাকলে তা কেবল আল্লাহ তাআলার হুকুম ও তাঁর ইচ্ছায় করতে পারতেন।

৫৩. 'গুলূ' (বাড়াবাড়ি) করার অর্থ কোনও কাজে তার যথাযথ মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া। খ্রিস্টানদের বাড়াবাড়ি তো এই যে, তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে মাত্রাতিরিক্ত সম্মান করে। এমনকি তারা তাকে খোদা সাব্যস্ত করেছে। আর ইয়াহুদীদের বাড়াবাড়ি হল, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি যে মহব্বত প্রকাশ করেছিলেন, তার ভিত্তিতে তারা মনে করে বসেছে, দুনিয়ায় অন্য সব মানুষ কিছুই নয়; কেবল তারাই আল্লাহর প্রিয়পাত্র। আর সে হিসেবে তাদের যা-ইচ্ছা তাই করার অধিকার আছে। তাতে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি নারাজ হবেন না। তাছাড়া তাদের একটি দল হযরত উজায়ের আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলার পুত্র সাব্যস্ত করেছিল।

السَّبِيْلِ ﴿٧٧﴾

করেছে এবং তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

[১১]

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফুরী করেছিল, তাদের প্রতি দাউদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের যবানীতে লানত বর্ষিত হয়েছিল।[৫৪] তা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করেছিল এবং তারা সীমালংঘন করত।

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯. তারা যেসব অসৎ কাজ করত, তাতে একে অন্যকে নিষেধ করত না। বস্তুত তাদের কর্মপন্থা ছিল অতি মন্দ।

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ فِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. তুমি তাদের অনেককেই দেখছ কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে।[৫৫] নিশ্চয়ই তারা নিজেদের জন্য যা সামনে পাঠিয়েছে, তা অতি মন্দ– কেননা (সে কারণে) আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তারা সর্বদা শাস্তির ভেতর থাকবে।

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১. তারা যদি আল্লাহ, নবী এবং তার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তাতে ঈমান রাখত তবে তাদেরকে (মূর্তিপূজারীদেরকে) বন্ধু বানাত না। কিন্তু (প্রকৃত ব্যাপার হল) তাদের অধিকাংশই অবাধ্য।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً

৮২. তুমি অবশ্যই উপলব্ধি করবে মুসলিমদের প্রতি সর্বাপেক্ষা কঠোর শত্রুতা পোষণকারী হচ্ছে ইয়াহুদীগণ

---

৫৪. অর্থাৎ যে লানতের উল্লেখ যবুর ও ইনজিল উভয় গ্রন্থে ছিল, যা যথাক্রমে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি নাযিল হয়েছিল।

৫৫. এর দ্বারা সেই সকল ইয়াহুদীর প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যারা মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাস করত এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চুক্তিবদ্ধও ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা পর্দার অন্তরালে মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলত এবং তাদের সাথে মিলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্র করত। এমনকি তাদের সহানুভূতি অর্জনের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত বলে দিত যে, মুসলিমদের ধর্ম অপেক্ষা তাদের ধর্মই উত্তম।

لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾

এবং সেই সমস্ত লোক, যারা (প্রকাশ্যে) শিরক করে এবং তুমি এটাও উপলব্ধি করবে যে, (অমুসলিমদের মধ্যে) মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্বে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী তারা, যারা নিজেদেরকে নাসারা বলে। এর কারণ এই যে, তাদের মধ্যে অনেক ইলম-অনুরাগী এবং সংসার-বিরাগী দরবেশ রয়েছে।[৫৬] আরও এক কারণ হল যে, তারা অহংকার করে না।

[সপ্তম পারা]

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ

৮৩. এবং রাসূলের প্রতি যে কালাম নাযিল হয়েছে তারা যখন তা শোনে, তখন তারা যেহেতু সত্য চিনে ফেলেছে, সেহেতু

---

৫৬. অর্থাৎ খ্রিস্টানদের মধ্যে বহু লোক দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত। তাই তাদের অন্তরে সত্য গ্রহণের মানসিকতা বেশি। অন্ততপক্ষে মুসলিমদের প্রতি তাদের শত্রুতা অতটা উগ্র পর্যায়ের নয়। কারণ দুনিয়ার মোহ এমনই এক জিনিস, যা মানুষকে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে। এর বিপরীতে ইয়াহুদী ও মুশরিকদের ভেতর দুনিয়ার মোহ বড় বেশি। তাই তারা প্রকৃত সত্য সন্ধানীর কর্মপন্থা অবলম্বন করে না। কুরআন মাজীদ খ্রিস্টানদের অপেক্ষাকৃত কোমলমনা হওয়ার আরও একটি কারণ বলেছে এই যে, তারা অহংকার করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের অহংবোধও সত্য গ্রহণের পথে বাধা হয়ে থাকে।

খ্রিস্টানগণকে যে বন্ধুত্বে মুসলিমদের নিকটবর্তী বলা হয়েছে, তারই একটা ফল ছিল এই যে, মক্কার মুশরিকদের সর্বাত্মক জুলুমে যখন মুসলিমদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তখন বহু মুসলিম হাবশায় চলে যায় এবং বাদশাহ নাজাশীর আশ্রয় গ্রহণ করে। নাজ্জাশী তো বটেই, হাবশার জনগণও তখন তাদের সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করেছিল। মক্কার মুশরিকগণ নাজাশীর কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে আবেদন জানিয়েছিল, তিনি যেন তাঁর দেশ থেকে মুসলিম শরণার্থীদেরকে বের করে দেন ও তাদেরকে মক্কা মুকাররমায় ফেরত পাঠান, যাতে মুশরিকগণ তাদের উপর আরও নির্যাতন চালাতে পারে। নাজাশী তখন মুসলিমদেরকে ডেকে তাদের বক্তব্য শুনেছিলেন। তাতে তাঁর কাছে ইসলামের সত্যতা পরিষ্কার হয়ে যায়। ফলে তিনি যে তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাই নয়; বরং তারা যে উপহার-উপঢৌকন পেশ করেছিল, তাও ফেরত দিয়েছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, এ স্থলে কেবল সেই সকল খ্রিস্টানদেরকেই মুসলিমদের বন্ধুমনস্ক বলা হয়েছে, যারা নিজ ধর্মের প্রকৃত অনুসারী এবং সেমতে দুনিয়ার মোহ থেকে দূরে থাকে আর অহংকার-অহমিকা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখে। বলাবাহুল্য এর অর্থ এ নয় যে, সব যুগের খ্রিস্টানরাই এ রকম হবে। সুতরাং ইতিহাসে এ রকম বহু উদাহরণ রয়েছে, যাতে খ্রিস্টান জাতি মুসলিম উম্মাহর সাথে নিকৃষ্টতম আচরণ করেছে।

يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨٣﴾

তাদের চোখসমূহকে দেখবে যে, তা থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে[৫৭] এবং তারা বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং সাক্ষ্যদাতাদের সাথে আমাদের নামও লিখে নিন।

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. আর আমরা আল্লাহ এবং যে সত্য আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে, তাতে কেন ঈমান আনব না, আবার আমরা প্রত্যাশাও রাখব যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের মধ্যে গণ্য করবেন?

فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. সুতরাং এ কথার কারণে আল্লাহ তাদেরকে এমন সব উদ্যান দান করবেন, যার তলদেশে নহর প্রবহমান থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٨٦﴾

৮৬. আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে ও আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে তারা জাহান্নামবাসী।

---

৫৭. হাবশা থেকে মুসলিম শরণার্থীদেরকে বহিষ্কারের দাবী জানানোর জন্য মক্কার মুশরিকগণ যখন নাজাশীর কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল, তখন বাদশাহ মুসলিমদেরকে তার দরবারে ডেকে তাদের বক্তব্য শুনতে চেয়েছিলেন। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত ভাই হযরত জাফর বিন আবু তালিব (রাযি.) এক হৃদয়গ্রাহী ও সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাতে বাদশাহর অন্তরে মুসলিমদের প্রতি মহব্বত ও মর্যাদাবোধ বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে তিনি বুঝে ফেলেন তাওরাত ও ইনজীলে যেই সর্বশেষ নবীর ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই সেই নবী। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনা মুনাওয়ারায় শুভাগমন করেন, তখন নাজাশী তার উলামা ও দরবেশদের একটি প্রতিনিধি দলকে তাঁর খেদমতে প্রেরণ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সামনে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করেন। তা শুনে তাদের চোখ থেকে অশ্রুধারা নেমে আসল। তারা বলে উঠল, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি যে কালাম নাযিল হয়েছিল, তার সাথে এ কালামের বড় মিল। অনন্তর প্রতিনিধি দলটির সকলেই ইসলাম গ্রহণ করল। তারা যখন নাজ্জাশীর কাছে ফিরে গেল, সব শুনে নাজ্জাশী নিজেও ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে সে ঘটনার দিকেই ইশারা করা হয়েছে।

[১২]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۸۷﴾

৮৭. হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সকল উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করেছেন তাকে হারাম সাব্যস্ত করো না এবং সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না।[৫৮]

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۠ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿۸۸﴾

৮৮. আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন, তা থেকে হালাল, উৎকৃষ্ট বস্তু খাও এবং যেই আল্লাহর প্রতি তোমরা ঈমান রাখ তাকে ভয় করে চলো।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ

৮৯. আল্লাহ তোমাদেরকে নিরর্থক শপথের জন্য পাকড়াও করবেন না।[৫৯] কিন্তু তোমরা যে শপথ পরিপক্কভাবে করে থাক,[৬০] সেজন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। সুতরাং তার কাফফারা হল দশজন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের খাবার দেবে, যা তোমরা

---

৫৮. যেমন হারাম বস্তুকে হালাল মনে করা গুনাহ, তেমনি আল্লাহ তাআলা যে সকল বস্তু হালাল করেছেন তাকে হারাম সাব্যস্ত করাও অতি বড় গুনাহ। মক্কার মুশরিকগণ ও ইয়াহুদীরা এ রকম বহু জিনিস নিজেদের প্রতি হারাম করে রেখেছিল। ইনশাআল্লাহ সূরা আনআমে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

৫৯. নিরর্থক (লাগ্‌ব্) শপথ বলতে এমন সব কসমকে বোঝানো হয়, যা কসমের উদ্দেশ্য ছাড়া কেবল কথার মুদ্রা বা বাকরীতি হিসেবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। এমনিভাবে অতীতের কোনও বিষয়কে সত্য মনে করে যে কসম করা হয় এবং পরে প্রকাশ পায়, আসলে তা সত্য ছিল না, তার ধারণা ভুল ছিল, সেটাও নিরর্থক শপথের অন্তর্ভুক্ত। এ জাতীয় কসমে কোনও গুনাহ হয় না এবং এর জন্যও কাফফারাও ওয়াজিব হয় না। তবে নিষ্প্রয়োজনে কসম করা কোন ভালো কাজ নয়। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

৬০. এর দ্বারা ভবিষ্যতে কোনও কাজ করা বা না করা সম্পর্কে যে শপথ করা হয় তাকে বোঝানো হয়েছে। সাধারণ অবস্থায় এরূপ শপথ ভাঙ্গা কঠিন গুনাহ। কেউ এরূপ শপথ ভেঙ্গে ফেললে তার কাফফারা দেওয়া ওয়াজিব। কাফফারা কিভাবে আদায় করতে হবে তাও আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে সেই কসম, যাতে অতীতের কোনও বিষয়ে জেনে-শুনে মিথ্যা বলা হয় এবং প্রতিপক্ষের অন্তরে বিশ্বাস জন্মানোর জন্য কসম করা হয়। এরূপ কসম করা কঠিন গুনাহ। তবে দুনিয়ায় এর জন্য কোনও কাফফারার বিধান নেই। কেবল তওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমার আশা রাখা যায়।

اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ؕ وَ احْفَظُوْۤا اَيْمَانَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۸۹﴾

তোমাদের পরিবারবর্গকে খাইয়ে থাক। অথবা তাদেরকে বস্ত্র দান করবে কিংবা একজন গোলাম আযাদ করবে। তবে কারও কাছে যদি (এসব জিনিসের মধ্য হতে) কিছুই না থাকে, সে তিন দিন রোযা রাখবে। এটা তোমাদের শপথের কাফফারা– যখন তোমরা শপথ করবে (এবং তারপর তা ভেঙ্গে ফেলবে)। তোমরা নিজেদের শপথকে রক্ষা করো।[৬১] এভাবেই আল্লাহ তোমাদের সামনে নিজ আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় কর।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۹۰﴾

৯০. হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমার বেদি[৬২] ও জুয়ার তীর এসবই অপবিত্র, শয়তানী কাজ। সুতরাং এসব পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন কর।

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿۹۱﴾

৯১. শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষের বীজই বপণ করতে চায় এবং চায় তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির ও নামায থেকে বিরত রাখতে। সুতরাং বল, তোমরা কি (ওসব জিনিস থেকে) নিবৃত্ত হবে?

---

৬১. অর্থাৎ কসম করা কোনও তামাশার বিষয় নয়। সুতরাং প্রথমত চেষ্টা থাকতে হবে কসম যত কম করা যায়। বিশেষ প্রয়োজনে যদি কসম করতেই হয়, তবে সাধ্যমত তা পূর্ণ করার চেষ্টা থাকা চাই। অবশ্য কেউ যদি কোনও নাজায়েয কাজ করার জন্য কসম করে ফেলে তবে তার জন্য অপরিহার্য হল সে কসম ভেঙ্গে ফেলা ও তার কাফফারা আদায় করা। এমনিভাবে কেউ যদি কোনও জায়েয কাজ করার জন্য কসম করে, তারপর উপলব্ধি হয় সে কাজ করা অপেক্ষা না করাই শ্রেয়, তখনও কসম ভেঙ্গে কাফফারা আদায় করাই উত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে এরূপ শিক্ষাই দান করেছেন।

৬২. প্রতিমার বেদি দ্বারা দেবতার উদ্দেশে পশু বলিদানের সেই স্থানকে বোঝানো হয়েছে, যা প্রতিমাদের সামনে তৈরি করা হত। পৌত্তলিকগণ প্রতিমাদের নামে সেখানে পশু ইত্যাদি উৎসর্গ করত। আর জুয়ার তীর বলতে কী বোঝানো হয়েছে, তা এ সূরারই শুরুতে ৩নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ৬নং টীকায় গত হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٩٢﴾

৯২. তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো ও রাসূলের আনুগত্য করো এবং (অবাধ্যতা) পরিহার করে চলো। তোমরা যদি (এ আদেশ থেকে) বিমুখ হও, তবে জেনে রেখ, আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টরূপে (আল্লাহর হুকুম) প্রচার করা।

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা পূর্বে যা-কিছু খেয়েছে তার কারণে তাদের কোনও গুনাহ নেই[৬৩]- যদি তারা আগামীতে গুনাহ হতে বেঁচে থাকে, ঈমান রাখে ও সৎকর্মে রত থাকে এবং (আগামীতে যেসব জিনিস নিষেধ করা হয় তা থেকে) বেঁচে থাকে ও ঈমানে প্রতিষ্ঠিত থাকে আর তারপরও তাকওয়া ও ইহসান অবলম্বন করে।[৬৪] আল্লাহ ইহসান অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন।

[১৩]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ

৯৪. হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের হাত ও বর্শার নাগালে আসা শিকারের কিছু প্রাণী দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করবেন,[৬৫] যাতে তিনি জেনে

---

৬৩. মদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হলে কোনও কোনও সাহাবীর মনে চিন্তা দেখা দেয় যে, নিষেধাজ্ঞার আগে যে মদ পান করা হয়েছে, পাছে তা গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ আয়াতে সে ভুল ধারণার অবসান ঘটানো হয়েছে এবং জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তখন যেহেতু আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট ভাষায় মদকে হারাম করেননি। তাই তখন যারা মদ পান করেছিল তাদেরকে সে কারণে পাকড়াও করা হবে না।

৬৪. 'ইহসান' –এর আভিধানিক অর্থ ভালো কাজ করা। সে হিসেবে শব্দটি যে-কোনও সৎকর্মকে বোঝায়। কিন্তু এক সহীহ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ইহসান'-এর ব্যাখ্যা দান করেছেন যে, মানুষ এভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন সে তাকে দেখছে অথবা অন্ততপক্ষে এই ভাবনার সাথে করবে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে দেখছেন। সারকথা মানুষ তার প্রতিটি কাজে আল্লাহ তাআলার সামনে থাকার ধারণাকে অন্তরে জাগ্রত রাখবে।

৬৫. যেমন সামনের আয়াতে আসছে, কেউ যখন হজ্জ বা উমরার ইহরাম বেঁধে নেয়, তখন তার জন্য স্থলের প্রাণী শিকার করা হারাম হয়ে যায়। আরবের মরুভূমিতে শিকার করার মত

يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٤﴾

নেন যে, কে তাকে না দেখেও ভয় করে। সুতরাং এরপরও কেউ সীমালংঘন করলে সে যন্ত্রণাময় শাস্তির উপযুক্ত হবে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ

৯৫. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন ইহরাম অবস্থায় থাক তখন কোনও শিকারকে হত্যা করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করলে তার বিনিময় দেওয়া ওয়াজিব হবে (যার নিয়ম এই যে,) সে যে প্রাণী হত্যা করেছে তার সমতুল্য গৃহপালিত কোনও জন্তুকে– যার ফায়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান অভিজ্ঞ লোক, কাবায় পৌঁছিয়ে কুরবানী করা হবে। অথবা (তার মূল্য পরিমাণ) কাফফারা আদায় করা হবে মিসকীনদেরকে খানা খাওয়ানোর দ্বারা অথবা তার সমসংখ্যক রোযা রাখতে হবে।[৬৬] যেন সে ব্যক্তি তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। পূর্বে

কোনও প্রাণী মিলে যাওয়া মুসাফিরদের পক্ষে এক বিরাট নিয়ামত ছিল। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা ইহরাম বাঁধে তাদের পরীক্ষার্থে আল্লাহ তাআলা কিছু প্রাণীকে তাদের খুব কাছে, একদম বর্শার নাগালের মধ্যে পৌঁছে দেবেন। এভাবে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে যে, তারা আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনার্থে এ নিয়ামত পরিহার করে কি না। এর দ্বারা জানা গেল মানুষের ঈমানের প্রকৃত যাচাই হয় তখনই, যখন তার অন্তর কোনও অবৈধ কাজের জন্য উদ্বেলিত হয়ে ওঠে; কিন্তু আল্লাহর ভয়ে সে নিজেকে তা থেকে নিবৃত্ত রাখে।

৬৬. কেউ যদি ইহরাম অবস্থায় শিকার করার গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তার কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) কী হবে এ আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। তার সারমর্ম এই যে, শিকারকৃত প্রাণীটি হালাল হলে সেই এলাকার দু'জন অভিজ্ঞ ও দ্বীনদার লোক দ্বারা তার মূল্য নিরূপণ করতে হবে। তারপর সেই মূল্যের কোনও গৃহপালিত পশু, যেমন গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি 'হরম' এলাকার ভেতর কুরবানী করা হবে। অথবা সেই মূল্য গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে। শিকারকৃত প্রাণীটি যদি হালাল না হয়, যেমন নেকড়ে ইত্যাদি, তবে তার মূল্য একটি ছাগলের মূল্য অপেক্ষা বেশি গণ্য হবে না। যদি কারও কুরবানী দেওয়ার বা তার মূল্য গরীবদের মধ্যে বণ্টন করার সামর্থ্য না থাকে, তবে সে রোযা রাখবে। রোযার হিসাব করা হবে এভাবে যে, একটি রোযাকে পৌনে দু'সের গমের মূল্য বরাবর ধরা হবে। সে হিসেবে শিকারকৃত পশুটির নিরূপিত মূল্যে যে-ক'টি রোযা আসে তাই রাখতে হবে। আয়াতের এ ব্যাখ্যা ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব অনুযায়ী। তাঁর মতে 'সে যে প্রাণী হত্যা

وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝٩٥

যা-কিছু হয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি পুনরায় তা করবে আল্লাহ তাকে শাস্তি দান করবেন। আল্লাহ ক্ষমতাবান, শাস্তিদাতা।

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝٩٦

৯৬. তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য হালাল করা হয়েছে, যাতে তা তোমাদের ও কাফেলার জন্য ভোগের উপকরণ হয়। আর তোমরা যতক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাক, তোমাদের জন্য স্থলের শিকার হারাম করা হয়েছে এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো, যার কাছে তোমাদের সকলকে একত্র করে নিয়ে যাওয়া হবে।

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ۗ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝٩٧

৯৭. আল্লাহ কাবাকে– যা অতি মর্যাদাপূর্ণ ঘর, মানুষের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম বানিয়েছেন। তাছাড়া মর্যাদাপূর্ণ মাসসমূহ, নজরানার পশু এবং তাদের গলার মালাসমূহকেও (নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম বানিয়েছেন),[৬৭] যাতে তোমরা জানতে পার আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

করেছে তার সমতুল্য গৃহপালিত কোনও জন্তু'-এর ব্যাখ্যা এই যে, প্রথমে শিকারকৃত প্রাণীটির মূল্য নিরূপণ করা হবে তারপর সেই মূল্যের কোনও গৃহপালিত পশু হরমের ভেতর নিয়ে যবাহ করতে হবে। এ মাসআলা বিস্তারিতভাবে ফিকহী গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত রয়েছে।

৬৭. কাবা শরীফ ও মর্যাদাপূর্ণ মাসসমূহ যে শান্তি ও নিরাপত্তার 'কারণ' সেটা স্পষ্ট। যেহেতু এর ভেতর যুদ্ধ করা হারাম। যে পশু নজরানা হিসেবে হরমে নিয়ে যাওয়া হত, তার গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া হত, যাতে দর্শক বুঝতে পারে এ পশু হরমে যাচ্ছে। ফলে কাফির, মুশরিক এমনকি দস্যুরাও তার পেছনে লাগত না। কাবা শরীফ যে নিরাপত্তার কারণ, মুফাসসিরগণ তার আরেকটি ব্যাখ্যা করেছেন এই যে, যত দিন কাবা শরীফ বিদ্যমান থাকবে, তত দিন কিয়ামত হবে না। এক সময় কাবা শরীফকে তুলে নেওয়া হবে এবং তারপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٨﴾

৯৮. জেনে রেখ, আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর এবং এটাও জেনে রেখ যে, তিনি অতি ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু।

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٩٩﴾

৯৯. তাবলীগ (প্রচার-কার্য) ছাড়া রাসূলের অন্য কোনও দায়িত্ব নেই। আর তোমরা যা-কিছু প্রকাশ্যে কর এবং যা-কিছু গোপন কর সবই আল্লাহ জানেন।

قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০. (হে রাসূল! মানুষকে) বলে দাও, অপবিত্র ও পবিত্র বস্তু সমান হয় না, যদিও অপবিত্র বস্তুর আধিক্য তোমাকে মুগ্ধ করে।[৬৮] সুতরাং হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ আল্লাহকে ভয় করে চলো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

[১৪]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾

১০১. হে মুমিনগণ! তোমরা এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশ করা হলে তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর মনে হবে। তোমরা যদি এমন সময়ে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, যখন কুরআন নাযিল হয়, তবে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে।[৬৯] (অবশ্য) আল্লাহ ইতঃপূর্বে যা হয়েছে তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

৬৮. এ আয়াত জানাচ্ছে, পৃথিবীতে অনেক সময় কোনও কোনও নাপাক বা হারাম বস্তু এতটা ব্যাপকভাবে চালু হয়ে যায় যে, সেটা সময়ের ফ্যাশনরূপে গণ্য হয় এবং ফ্যাশন-পূজারী মানুষের কাছে তার কদর হয়ে যায়। মুসলিমদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, কেবল সাধারণ রেওয়াজের কারণে যেন তারা কোনও জিনিস গ্রহণ না করে; বরং আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশনা অনুসারে সে জিনিস পবিত্র ও বৈধ কি না আগে যেন সেটা যাচাই করে দেখে।

৬৯. আয়াতের মর্ম এই যে, যেসব বিষয়ের বিশেষ কোনও প্রয়োজন নেই, প্রথমত তার অনুসন্ধানে লিপ্ত হওয়া একটা নিরর্থক কাজ। দ্বিতীয়ত আল্লাহ তাআলা অনেক সময় কোনও কোনও বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আদেশ দান করেন। সে আদেশ অনুসারে মোটামুটিভাবে কাজ করলেই যথেষ্ট হয়ে যায়। সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে কিছু জানানোর দরকার হলে খোদ কুরআন মাজীদ তা জানিয়ে দিত কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করা হত। তা যখন করা হয়নি তখন এর চুলচেরা বিশ্লেষণের পেছনে পড়ার কোনও দরকার নেই। সেই সঙ্গে এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, কুরআন নাযিলের

قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ﴿۱۰۲﴾

১০২. তোমাদের পূর্বে একটি জাতি এ জাতীয় প্রশ্ন করেছিল অতঃপর (তার যে উত্তর দেওয়া হয়েছে,) তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে।[৭০]

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۱۰۳﴾

১০৩. আল্লাহ কোনও প্রাণীকে না বাহীরা সাব্যস্ত করেছেন, না সাইবা, না ওয়াসীলা ও না হামী,[৭১] কিন্তু যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই সঠিক বুঝ নেই।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى

১০৪. যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যে বাণী নাযিল করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে চলে এসো। তখন তারা

সময় এ সম্পর্কে কোন কঠিন জবাব এসে গেলে তোমাদের নিজেদের পক্ষেই সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে একটা ঘটনা বর্ণিত আছে। তা এই যে, যখন হজ্জের বিধান আসল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা মানুষকে জানিয়ে দিলেন, তখন এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হজ্জ কি সারা জীবনে একবার ফরয না প্রতি বছর? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রশ্নে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। কেননা কোন বিধান সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বার বার পালনের স্পষ্ট নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত তা একবার করার দ্বারাই হুকুম তামিল হয়ে যায়। এটাই নিয়ম (নামায, রোযা ও যাকাত সম্পর্কে সে রকমের নির্দেশনা রয়েছে)। সে অনুযায়ী এ স্থলে প্রশ্নের কোনও দরকার ছিল না। সুতরাং তিনি সাহাবীকে বললেন, আমি যদি বলে দিতাম, হ্যাঁ প্রতি বছর আদায় করা ফরয, তবে বাস্তবিকই তা সকলের উপর প্রতি বছর ফরয হয়ে যেত।

৭০. খুব সম্ভব এর দ্বারা ইয়াহুদীদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। তারাই শরীয়তের বিধানে এরূপ অহেতুক খোড়াখুড়ি করত। তারপর তাদের সে কর্মপন্থার কারণে যখন নিয়মাবলী বেড়ে যেত তখন তা রক্ষা করতে অক্ষম হয়ে যেত এবং অনেক সময় সরাসরি তা পালন করতে অস্বীকৃতি জানাত।

৭১. এসব বিভিন্ন পশুর নাম, যা জাহিলী যুগের মুশরিকগণ স্থির করে নিয়েছিল। 'বাহীরা' বলত সেই পশুকে কান চিড়ে যাকে দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করত। 'সাইবা' সেই পশু, যাকে দেব-দেবীর নামে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিত। তারা এসব পশুকে কোনও রকমের কাজে লাগানো নাজায়েয মনে করত। 'ওয়াসীলা' বলা হত এমন উটনীকে, যা পর পর কয়েকটি মাদী বাচ্চা জন্ম দেয়, মাঝখানে কোনও নর বাচ্চা না জন্মায়। এমন উটনীকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেওয়া হত। আর হামী হল সেই নর উট, যা নির্দিষ্ট একটা সংখ্যা পরিমাণ পাল দেওয়ার কাজ করেছে। এরূপ উটকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেওয়া হত।

الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۱۰۴﴾

বলে, আমরা যার (অর্থাৎ যে দ্বীনের) উপর আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আচ্ছা! তাদের বাপ-দাদা যদি এমন হয় যে, তাদের কোনও জ্ঞানও নেই এবং হিদায়াতও নেই, তবুও (তারা তাদের অনুগমন করতে থাকবে)?

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۰۵﴾

১০৫. হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা সঠিক পথে থাকলে যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তারা তোমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।[৭২] আল্লাহরই কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন তোমরা কী কাজ করতে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ

১০৬. হে মুমিনগণ![৭৩] যখন তোমাদের কারও মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হয় তখন ওসিয়ত করার সময় পারস্পরিক বিষয়াদি

৭২. পূর্বে কাফিরদের যেসব ভ্রষ্টতা বর্ণিত হয়েছে, তার কারণে মুসলিমগণ এই ভেবে দুঃখবোধ করতেন যে, নিজেদের বিভ্রান্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এসে যাওয়া এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বারবার সমঝানোর পরও তারা তাদের পথভ্রষ্টতা পরিত্যাগ করছে না! এ আয়াত তাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে, তাবলীগের দায়িত্ব পালনের পর তাদের গোমরাহীর কারণে তোমাদের বেশি দুঃখিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এখন তোমাদের উচিত নিজেদের ইসলাহ ও সংশোধনের ফিকির করা। কুরআন মাজীদের এ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যারা সর্বদা অন্যের সমালোচনা করে এবং অতি আগ্রহে অন্যের ছিদ্রান্বেষণে লিপ্ত থাকে, অথচ নিজের দিকে ফিরে তাকানোর ফুরসত পায় না। অন্যের তুচ্ছ তুচ্ছ দোষও বড় করে দেখে, অথচ আপন বড়-বড় অন্যায়ের প্রতি নজর পড়ে না, তাদের জন্য এ আয়াতে অতি বড় উপদেশ রয়েছে। তাদের বলা হচ্ছে, তোমাদের সমালোচনা যদি সহীহও হয় এবং সত্যিই অন্য লোক গোমরাহীতে লিপ্ত থাকে, তবুও তোমাদের জবাব তো দিতে হবে নিজ আমলেরই। তাই আপনার চিন্তা কর; অন্যের সমালোচনা করার ধান্ধায় থেক না। তাছাড়া সমাজে যখন দুষ্কৃতি ব্যাপক হয়ে যায়, তখন সংশোধনের সর্বোত্তম দাওয়াই এটাই যে, প্রত্যেক অন্যের কাজের দিকে না তাকিয়ে আত্মসংশোধনের ফিকির করবে। ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আত্মসংশোধনের চিন্তা জাগ্রত হলে এক প্রদীপ থেকে আরেক প্রদীপ জ্বলতে থাকবে এবং পর্যায়ক্রমে গোটা সমাজের সংশোধন সূচিত হবে।

৭৩. একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। ঘটনাটি এই– বুদায়ল নামক এক মুসলিম ব্যবসায় উপলক্ষ্যে শাম গিয়েছিলেন। তার সঙ্গে ছিল তামীম ও আদী নামক

اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ؕ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾

নিষ্পত্তি করার জন্য সাক্ষী বানানোর নিয়ম এই যে, তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ লোক হবে (যারা ওসিয়ত সম্পর্কে সাক্ষী থাকবে) অথবা তোমরা যদি যমীনে সফরে থাক এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যুর মুসিবত এসে যায় তবে অন্যদের (অর্থাৎ অমুসলিমদের) মধ্য থেকে দু'জন হবে। অতঃপর তোমাদের কোনও সন্দেহ দেখা দিলে তোমরা সে দু'জনকে নামাযের পর আটকাতে পার। তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলবে, আমরা এই সাক্ষ্যের বিনিময়ে কোনও আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করতে চাই না, যদিও বিষয়টা

দু'জন খ্রিস্টান। সেখানে পৌঁছার পর বুদায়ল অসুস্থ হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে তাঁর অনুমান হয়ে যায় যে, তিনি আর বাঁচবেন না। সুতরাং তিনি সঙ্গীদ্বয়কে ওসিয়ত করলেন, তারা যেন তাঁর মালামাল তার ওয়ারিশদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে তিনি এই সতর্কতা অবলম্বন করলেন যে, মালামালের একটা তালিকা তৈরি করে গোপনে সেই মালের মধ্যেই রেখে দিলেন। সে তালিকা সম্পর্কে সঙ্গীদ্বয়ের কোনও খবর ছিল না। তারা বুদায়লের ওয়ারিশদের কাছে তার মালপত্র পৌঁছিয়ে দিল। তার ভেতর সোনার গিল্টি করা একটা রূপার পেয়ালা ছিল, যার মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম। সেই পেয়ালাটি বের করে তারা নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছিল। ওয়ারিশগণ যখন বুদায়লের লেখা তালিকাটি হাতে পেল তখন সেই পেয়ালাটির কথা জানতে পারল। সুতরাং তারা তামীম ও আদীর কাছে সেটি দাবী করল। তারা কসম খেয়ে বলল, মালামাল থেকে তারা কোনও জিনিস সরায়নি বা গোপন করেনি। কিন্তু কিছুদিন পর ওয়ারিশগণ জানতে পারল তারা মক্কা মুকাররমায় এক স্বর্ণকারের কাছে পেয়ালাটি বিক্রি করে দিয়েছে। এর ভিত্তিতে যখন তামীম ও আদীকে চাপ দেওয়া হল, তখন তারা কথা ঘুরিয়ে দিল। বলল, আমরা আসলে পেয়ালাটি তার কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলাম, কিন্তু ক্রয় সম্পর্কে যেহেতু আমাদের কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল না, তাই আমরা প্রথমে তার উল্লেখ সমীচীন মনে করিনি। এবার তারা যখন ক্রয় করার দাবীদার হল, তখন নিয়ম অনুসারে সাক্ষী পেশ করা তাদের জন্য অপরিহার্য ছিল, কিন্তু তারা তা পেশ করতে পারল না। ফলে বুদায়লের নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকে দু'জন কসম করল যে, বুদায়ল পেয়ালটির মালিক ছিল আর এ দুই খ্রিস্টান ক্রয়ের মিথ্যা দাবী করছে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়ারিশদের পক্ষে রায় দিলেন। সে অনুযায়ী তামীম ও আদী পেয়ালাটির মূল্য আদায় করতে বাধ্য হল। এ ফায়সালা ওই আয়াতের আলোকেই নিষ্পন্ন হয়েছে। আয়াতে এ রকম পরিস্থিতির জন্য একটা সাধারণ বিধানও বাতলে দেওয়া হয়েছে।

আমাদের কোনও আত্মীয়ের হয় এবং আল্লাহ আমাদের উপর যে সাক্ষ্যের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন আমরা তা গোপন করব না। করলে আমরা গুনাহগারদের মধ্যে গণ্য হব।

فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ إِثْمًا فَـَٔاخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَآ أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ ۖ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. তারপর যদি জানা যায় তারা (মিথ্যা বলে) নিজেদের উপর গুনাহের বোঝা চাপিয়েছে, তবে যাদের বিপরীতে এই প্রথম ব্যক্তিদ্বয় গুনাহের ভার বহন করেছে, তাদের মধ্য হতে দু' ব্যক্তি তাদের স্থানে (সাক্ষ্যদানের জন্য) দাড়াবে।[৭৪] তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, ওই প্রথম ব্যক্তিদ্বয় অপেক্ষা আমাদের সাক্ষ্যই বেশি সত্য এবং (এই সাক্ষ্যদানে) আমরা সীমালংঘন করিনি। তা করলে আমরা জালিমদের মধ্যে গণ্য হব।

ذٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَنْ يَّأْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوْٓا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌۢ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. এ পদ্ধতিতে বেশি আশা থাকে যে, লোকে (প্রথমেই) সঠিক সাক্ষ্য দেবে অথবা ভয় করবে যে, (মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে) তাদের শপথের পর পুনরায় অন্য শপথ নেওয়া হবে (যা আমাদের রদ করবে) এবং আল্লাহকে ভয় কর আর

---

৭৪. এ তরজমা করা হয়েছে ইমাম রাযী (রহ.)-এর গৃহীত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে। এ হিসেবে الاوليان -এর দ্বারা প্রথম দুই সাক্ষীকে বোঝানো হয়েছে, যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল। কিরাআত (অর্থাৎ কুরআনের পাঠরীতি)-এর ইমাম হাফস (রহ.)-এর পাঠ অনুসারে যদি আয়াতের গঠনপ্রণালী চিন্তা করা যায়, তবে এই ব্যাখ্যাই বেশি সঠিক মনে হয়। হাফস (রহ.) استحق ক্রিয়াপদটিকে কর্তৃবাচ্যরূপে পড়েছেন। অপর এক ব্যাখ্যায় الاوليان শব্দটিকে ওয়ারিশদের বিশেষণ ধরা হয়েছে, কিন্তু বাক্যের গঠন প্রণালী হিসেবে তার কারণ অতি অস্পষ্ট। কেননা তখন استحق ক্রিয়াপদটির 'কর্তা' খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। দেখুন রূহুল মাআনী; আল-বাহরুল মুহীত ও আত-তাফসীরুল কাবীর। অবশ্য استحق ক্রিয়াপদটিকে কর্মবাচ্যরূপে পড়া হলে সে তাফসীর সঠিক হয়।

(তার পক্ষ হতে যা-কিছু বলা হয়েছে, তা কবুল করার নিয়তে) শোন। আল্লাহ অবাধ্যদেরকে হিদায়াত দান করেন না।

[১৫]

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿۱۰۹﴾

১০৯. সেই দিনকে স্মরণ কর, যে দিন আল্লাহ রাসূলগণকে একত্র করবেন এবং বলবেন, তোমাদেরকে কী জবাব দেওয়া হয়েছিল? তারা বলবে, আমাদের কিছু জানা নেই। যাবতীয় গুপ্ত বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান তো আপনারই কাছে।[৭৫]

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۟ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ

১১০. (এটা ঘটবে সেই দিন) যখন আল্লাহ বলবেন, হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা! আমি তোমার ও তোমার মায়ের উপর যে অনুগ্রহ করেছিলাম তা স্মরণ কর– যখন আমি রূহুল কুদ্‌সের মাধ্যমে তোমার সাহায্য করেছিলাম।[৭৬] তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলতে এবং পরিণত বয়সেও এবং

---

৭৫. কুরআন মাজীদের এটা এক বিশেষ রীতি যে, সে যখন বিধি-বিধান বর্ণনা করে, তখন তার অনুসরণে উদ্বুদ্ধ ও আখেরাতের চিন্তা জাগ্রত করার লক্ষ্যে আখেরাতের কোনও বিষয়ও উল্লেখ করে দেয় কিংবা পূর্ববর্তী জাতিসমূহের আনুগত্য বা অবাধ্যতার বিষয়টা তুলে ধরে। সুতরাং এস্থলেও ওসিয়ত সম্পর্কিত উল্লিখিত বিধানাবলী বর্ণনা করার পর এবার আখেরাতের কিছু দৃশ্য তুলে ধরা হচ্ছে। আর একটু আগেই যেহেতু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তাই আখেরাতে খোদ ঈসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার যে কথোপকথন হবে বিশেষভাবে তা এস্থলে উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রথম আয়াতে সমস্ত নবীকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলার একটি প্রশ্নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করবেন তাদের উম্মতগণ তাদের দাওয়াতের কী জবাব দিয়েছিল? এর উত্তরে তারা যে নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তার অর্থ হল, আমরা দুনিয়ায় তো তাদের বাহ্য অবস্থার ভিত্তিতে ফায়সালা করতে আদিষ্ট ছিলাম। সুতরাং কেউ নিজের ঈমানের দাবী করলে আমরা তাকে মুমিন গণ্য করতাম। কিন্তু তাদের অন্তরে কী ছিল, তা জানার কোনও উপায় আমাদের ছিল না। আজ তো ফায়সালা হবে অন্তরের অবস্থা অনুযায়ী। কাজেই আজ আমরা কারও সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারব না। কেননা অন্তরের গুপ্ত অবস্থা সম্পর্কে কেবল আপনিই অবগত। অবশ্য নবীগণের থেকে যখন মানুষের বাহ্যিক কার্যকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য চাওয়া হবে, তখন তারা সে সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবেন, যা সূরা নিসা (৪ : ১৪), সূরা নাহল (১৬ : ৮৯) ইত্যাদিতে বর্ণিত হয়েছে।

৭৬. সূরা বাকারায় (২ : ৮৭) এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِيْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۱۰﴾

যখন আমি তোমাকে কিতাব ও হিকমত এবং তাওরাত ও ইনজীলের শিক্ষা দিয়েছিলাম এবং যখন আমার হুকুমে তুমি কাদা দ্বারা পাখির মত আকৃতি তৈরি করতে, তারপর তাতে ফুঁ দিতে, ফলে তা আমার হুকুমে (সত্যিকারের) পাখি হয়ে যেত এবং তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আমার হুকুমে নিরাময় করতে এবং যখন আমার হুকুমে তুমি মৃতকে (জীবিতরূপে) বের করে আনতে এবং যখন আমি বনী ইসরাঈলকে তোমার থেকে নিরস্ত করেছিলাম– যখন তুমি তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিলে আর তাদের মধ্যে যারা কাফির ছিল তারা বলেছিল– এটা স্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই নয়।

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ۚ قَالُوْۤا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۱۱﴾

১১১. যখন আমি হাওয়ারীদের অন্তরে সঞ্চারিত করি যে, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তখন তারা বলল, আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা অনুগত।

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۲﴾

১১২. (এবং তাদের এ ঘটনার বর্ণনাও শোন যে,) যখন হাওয়ারীগণ বলেছিল, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আপনার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আসমান থেকে (খাদ্যের) একটা খাঞ্চা অবতীর্ণ করতে সক্ষম? ঈসা বলল, আল্লাহকে ভয় কর– যদি তোমরা মুমিন হও।[৭৭]

---

৭৭. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কাছে কোনও রকম মুজিযার ফরমায়েশ করা একজন মুমিনের পক্ষে কিছুতেই সমীচীন নয়। কেননা সাধারণভাবে এরূপ ফরমায়েশ তো কাফিররাই করত। অবশ্য তারা যখন স্পষ্ট করে দিল সে ফরমায়েশের উদ্দেশ্য ঈমান হারানো নয়, বরং আল্লাহ তাআলার নেয়ামত দেখে পরিপূর্ণ প্রশান্তি লাভ ও তার শোকর আদায় করা, তখন ঈসা আলাইহিস সালাম দোয়া করলেন।

قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَىِٕنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿۱۱۳﴾

১১৩. তারা বলল, আমরা চাই যে, তা থেকে খাব এবং আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ প্রশান্তি লাভ করবে এবং আমরা (পূর্বাপেক্ষা অধিক প্রত্যয়ের সাথে) জানতে পারব যে, আপনি আমাদেরকে যা-কিছু বলেছেন, তা সত্য আর আমরা এ বিষয়ে সাক্ষ্যদাতাদের অন্তর্ভুক্ত হব।

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَاۤ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآىِٕدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿۱۱۴﴾

১১৪. (সুতরাং) ঈসা ইবনে মারইয়াম আবেদন করল, হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আসমান থেকে একটি খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন, যা হবে আমাদের এবং আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য আনন্দ উদযাপনের কারণ এবং আপনার পক্ষ হতে একটি নিদর্শন। আমাদেরকে এ নেয়ামত অবশ্যই প্রদান করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।

قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْۤ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّاۤ اُعَذِّبُهٗۤ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۱۵﴾

১১৫. আল্লাহ বললেন, আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি সে খাঞ্চা অবতীর্ণ করব, কিন্তু তারপর তোমাদের মধ্যে যে-কেউ কুফুরী করবে আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্ব জগতের অন্য কাউকে দেব না।[৭৮]

[১৬]

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ

১১৬. এবং (সেই সময়ের বর্ণনাও শোন,) যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমিই কি মানুষকে বলেছিলে

৭৮. অতঃপর আসমান থেকে সে রকম খাঞ্চা অবতীর্ণ করা হয়েছিল কি না সে সম্পর্কে কুরআন মাজীদে কিছুই বলা হয়নি। তিরমিযী শরীফে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযি.)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, খাঞ্চা অবতীর্ণ করা হয়েছিল। তারপর যারা নাফরমানী করেছিল তাদেরকে দুনিয়াতেই কঠিন শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

(তিরমিযী, তাফসীর অধ্যায়, হাদীস নং ৩০৬১)

قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ ۗ بِحَقٍّ ۭ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ۭ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ۭ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١١٦﴾

যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকে ও আমার মা'কে মাবুদরূপে গ্রহণ কর?[৭৯] সে বলবে, আমি তো আপনার সত্তাকে (শিরক থেকে) পবিত্র মনে করি। যে কথা বলার কোনও অধিকার নেই, সে কথা বলার সাধ্য আমার ছিল না। আমি এরূপ বলে থাকলে আপনি অবশ্যই তা জানতেন। আমার অন্তরে যা গোপন আছে আপনি তা জানেন, কিন্তু আপনার গুপ্ত বিষয় আমি জানি না। নিশ্চয়ই যাবতীয় গুপ্ত বিষয়ে আপনি সম্যক জ্ঞাত।

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِيْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ۭ وَاَنْتَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١١٧﴾

১১৭. আপনি আমাকে যে বিষয়ের আদেশ করেছিলেন তা ছাড়া অন্য কিছু আমি তাদেরকে বলিনি। তা এই যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরও প্রতিপালক এবং আমারও প্রতিপালক এবং যত দিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, তত দিন আমি তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলাম। তারপর আপনি যখন আমাকে তুলে নিয়েছেন তখন আপনি স্বয়ং তাদের তত্ত্বাবধায়ক থেকেছেন। বস্তুত আপনি সব কিছুর সাক্ষী।

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١١٨﴾

১১৮. যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনার ক্ষমতাও পরিপূর্ণ এবং হিকমতও পরিপূর্ণ।

---

৭৯. খ্রিস্টানদের মধ্যে একদল তো হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালামকে তিন খোদার একজন সাব্যস্ত করত: তাঁর পূজা করত, কিন্তু অন্যান্য দল তাকে তিন খোদার একজন না বললেও গির্জায় তার ছবি টানিয়ে যেভাবে তার পূজা করত, তা তাকে খোদা সাব্যস্ত করারই নামান্তর ছিল। সে কারণেই এ প্রশ্ন করা হয়েছে।

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۱۹﴾

১১৯. আল্লাহ বলবেন, এটা সেই দিন, যে দিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যতা উপকৃত করবে। তাদের জন্য রয়েছে এমন সব উদ্যান, যার তলদেশে নহর প্রবহমান। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটাই মহা সাফল্য।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ؕ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۲۰﴾

১২০. আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা-কিছু আছে, তার রাজত্ব কেবল আল্লাহরই। তিনি সবকিছুর উপর পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।

আল-হামদুলিল্লাহ আজ ২৩ মহররম ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ মঙ্গলবার ইশার সময় সূরা মায়েদার তরজমা ও টীকার কাজ সমাপ্ত হল (অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছে আজ ২৭ যুল-হিজ্জা ১৪৩০ হিজরী মোতাবেক ১৫ ডিসেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ মঙ্গলবার) আল্লাহ তাআলা কবুল করুন এবং বাকি সূরাসমূহের কাজও সমাপ্ত করার তাওফীক দান করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

সূরা আনআম

পরিচিতি

এ সূরাটি মক্কা মুকাররমায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতী কার্যক্রমের প্রাথমিক যুগে নাযিল হয়েছিল, যে কারণে এতে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতকে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং কাফিরদের পক্ষ হতে এসব আকীদা সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন উত্থাপিত হত তার জবাব দেওয়া হয়েছে। ইসলামী দাওয়াতের সে যুগে কাফিরগণ মুসলিমদের প্রতি নানা রকম জুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছিল। তাই এ সূরায় তাদেরকে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে। মক্কার কাফিরগণ নিজেদের মুশরিকী আকীদার ফলশ্রুতিতে যে সব বেহুদা রসম-রেওয়াজ ও ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণায় লিপ্ত ছিল এ সূরায় সে সব খণ্ডন করা হয়েছে।

আরবী ভাষায় 'আনআম' বলা হয় চতুষ্পদ জন্তুকে। আরব মুশরিকগণ এসব পশু সম্পর্কে নানা রকম ভ্রান্ত আকীদার শিকার ছিল। তারা মূর্তির নামে পশু ওয়াকফ করত অত:পর তাকে খাওয়া হারাম মনে করত। এ সূরায় যেহেতু তাদের সে সব রীতি-নীতির মূলোৎপাটন করা হয়েছে (আয়াত ১৩৬–১৪৬) তাই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে 'আনআম'। কোনও কোনও রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় মাত্র কয়েকটি ছাড়া বাকি সম্পূর্ণ সূরাটিই একবারে নাযিল হয়েছিল, কিন্তু আল্লামা আলুসী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 'রূহুল মাআনী'তে সে সব রিওয়ায়াতের সমীক্ষা করে তার বিভিন্ন ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

৬–সূরা আনআম–৫৫

سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١٦٥ رُكُوْعَاتُهَا ٢٠

এটি মক্কী সূরা। এতে ১৬৫ আয়াত ও ২০টি রুকু আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۬ؕ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ①

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলো বানিয়েছেন। তথাপি যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা অন্যকে নিজ প্রতিপালকের সমকক্ষ সাব্যস্ত করে।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰۤى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ②

২. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে নরম মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তারপর (তোমাদের জীবনের) একটি মেয়াদ স্থির করেছেন এবং (পুনরায় জীবিত হওয়ার) একটি নির্দিষ্ট কাল রয়েছে তারই নিকট।[১] তারপরও তোমরা সন্দেহে পড়ে রয়েছ।

وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ③

৩. আর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে তিনিই আল্লাহ। তিনি তোমাদের গুপ্ত বিষয়াদিও জানেন এবং প্রকাশ্য অবস্থাসমূহও। আর তোমরা যা-কিছু অর্জন করছ তাও তিনি অবগত।

وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ④

৪. (কাফিরদের অবস্থা এই যে,) তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী হতে যখনই কোনও নিদর্শন আসে, তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

---

১. অর্থাৎ প্রত্যেকের ব্যক্তি জীবনের একটা মেয়াদ রয়েছে, সেই মেয়াদ পর্যন্ত সে জীবিত থাকবে। প্রথমে সেটা কারও জানা থাকে না, কিন্তু কেউ যখন মারা যায়, তখন সকলের জানা হয়ে যায় যে, সে কত কাল জীবিত ছিল। কিন্তু মৃত্যুর পর আরও একটা জীবন রয়েছে, তা কখন আসবে তা কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন।

৫. সুতরাং যখন তাদের নিকট সত্য আসল তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। পরিণাম এই যে, তারা যে বিষয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে শীঘ্রই তাদের কাছে তার খবর পৌঁছে যাবে।[২]

فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ؕ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٥

৬. তারা কি দেখেনি, আমি তাদের পূর্বে কত জাতিকে ধ্বংস করেছি? তাদেরকে আমি পৃথিবীতে এমন ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে দেইনি। আমি তাদের প্রতি আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম এবং তাদের তলদেশে নদ-নদীকে প্রবহমান করেছিলাম। অত:পর তাদের পাপাচারের কারণে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দেই এবং তাদের পর অপর মানব গোষ্ঠীকে সৃষ্টি করি।

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۪ وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۝٦

৭. এবং (ওই কাফেরদের অবস্থা এই যে,) আমি যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কোনও কিতাব নাযিল করতাম অত:পর তারা তা নিজ হাতে স্পর্শ করে দেখত, তবুও তাদের মধ্যে যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা বলত, এটা স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧

৮. এবং তারা বলে, তার (অর্থাৎ নবীর) প্রতি কোনও ফিরিশতা অবতীর্ণ করা হল না কেন? অথচ আমি কোনও ফিরিশতা অবতীর্ণ করলে তো সব

وَقَالُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ؕ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ۝٨

---

২. কাফেরদেরকে বলে দেওয়া হয়েছিল, তারা যদি তাদের অন্যায় জেদ বলবৎ রাখে, তবে দুনিয়ায়ও তাদের পরিণাম অশুভ হবে এবং আখিরাতেও কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। কিন্তু কাফিরগণ এসব কথা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। এ আয়াত তাদেরকে সাবধান করছে যে, তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে শীঘ্রই তাদের সামনে তা বাস্তব সত্য হয়ে দেখা দেবে।

কাজই শেষ হয়ে যেত,[৩] তারপর আর তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হত না।

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّ لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ⑨

৯. আমি যদি ফিরিশতাকে নবী বানাতাম, তবে তাকেও তো কোনও পুরুষ (-এর আকৃতিতে)-ই বানাতাম আর তাদেরকে সেরূপ বিভ্রমেই ফেলতাম, যেরূপ বিভ্রমে তারা এখন পতিত রয়েছে।[৪]

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑩

১০. (হে নবী!) নিশ্চয়ই তোমার পূর্বেও বহু রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে, কিন্তু তার পরিণাম হয়েছে এই যে, তাদের মধ্যে যারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল তাদেরকে সেই জিনিসই পরিবেষ্টন করে ফেলেছে, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

[২]

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ⑪

১১. (কাফেরদেরকে) বল, পৃথিবীতে একটু ভ্রমণ কর, তারপর দেখ (নবীগণকে) অস্বীকারকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল।[৫]

---

৩. এ দুনিয়া যেহেতু মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, তাই মানুষের কাছে কামনা সে যেন নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার নীতি হল কোন গায়বী বিষয় চাক্ষুষ দেখিয়ে দেওয়া হলে তারপর আর ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না। এ কারণেই তো কোনও ব্যক্তি মৃত্যুর ফিরিশতাদেরকে দেখার পর ঈমান আনলে তার ঈমান কবুল হয় না। কাফিরদের দাবী ছিল, কোনও ফিরিশতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ওহী নিয়ে আসে সে যেন এমনভাবে আসে যাতে আমরা দেখতে পাই। কুরআন মাজীদ তার দুটি জবাব দিয়েছে। প্রথম জবাব এই যে, ফিরিশতাকে তারা চাক্ষুষ দেখে ফেললে উপরে বর্ণিত মূলনীতি মোতাবেক তাদের ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তারপর আর তারা এতটুকু অবকাশ পাবে না যখন তারা ঈমান আনতে সক্ষম হবে। দ্বিতীয় জবাব দেওয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

৪. অর্থাৎ কোনও ফিরিশতাকে নবী বানিয়ে অথবা নবীর সমর্থনকারী বানিয়ে মানুষের সামনে পাঠালে তাকেও মানবাকৃতিতেই পাঠাতে হত। কেননা কোনও ফিরিশতাকে তার আসল রূপে দেখা কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই এ অবস্থায় কাফিরগণ তো সেই একই আপত্তির পুনরাবৃত্তি করত যে, এতো আমাদেরই মত মানুষ। একে আমরা নবী মানব কী করে?

৫. আরব মুশরিকগণ শাম দেশের বাণিজ্যিক সফর কালে ছামুদ জাতি ও হযরত লুত আলাইহিস সালামের কওম যে এলাকায় বসবাস করত, তার উপর দিয়ে যাতায়াত করত, তখন সে জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ তাদের চোখে পড়ত। কুরআন মাজীদ তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছে, তারা যেন সে সব জাতির পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে।

১২. (তাদেরকে) জিজ্ঞেস কর, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা আছে, তা কার মালিকানাধীন? (তারপর তারা যদি উত্তর না দেয় তবে নিজেই) বলে দাও, আল্লাহরই মালিকানাধীন। তিনি রহমতকে নিজের প্রতি অবশ্য কর্তব্যরূপে স্থির করে নিয়েছেন (তাই তাওবা করলে অতীতের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন।) কিয়ামতের দিন তিনি অবশ্যই তোমাদের সকলকে একত্র করবেন, যে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। (কিন্তু) যারা নিজেদের জন্য লোকসানের বেসাতী পেতেছে তারা (এ সত্যের প্রতি) ঈমান আনে না।

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑫

১৩. রাত ও দিনে যত সৃষ্টি শান্তি লাভ করে, সবই তারই অধিকারভুক্ত।[৬] তিনি সব কিছু শোনেন ও সব কিছু জানেন।

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ⑬

১৪. বলে দাও, আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করব? যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যিনি সকলকে খাদ্য দান করেন, কারও থেকে খাদ্য গ্রহণ করেন না? বলে দাও, আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হই এবং তুমি কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ؕ قُلْ اِنِّيْۤ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ⑭

---

৬. খুব সম্ভব ইশারা করা হচ্ছে যে, রাত ও দিনে যখনই মানুষ নিদ্রা যায়, তখন নিদ্রা শেষে আবার জাগ্রতও হয়। এই নিদ্রাও এক রকমের মৃত্যু। তখন মানুষ দুনিয়া সম্পর্কে অচেতন হয়ে যায় ও ইচ্ছা রহিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সে যেহেতু আল্লাহ তাআলার অধিকারভুক্ত, তাই যখন চান তিনি তাকে চেতনার জগতে ফিরিয়ে আনেন। এভাবেই বড় ও প্রকৃত মৃত্যু আসার পরেও মানুষ আল্লাহ তাআলার কব্জাতেই থাকবে। সুতরাং তিনি যখন ইচ্ছা করবেন তাকে পুনরায় জীবন দিয়ে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিত করবেন।

قُلْ اِنِّیْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَیْتُ رَبِّیْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ﴿۱۵﴾

১৫. বলে দাও, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তবে আমার এক মহা দিবসের শাস্তির ভয় রয়েছে।

مَنْ یُّصْرَفْ عَنْهُ یَوْمَىِٕذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِیْنُ ﴿۱۶﴾

১৬. সে দিন যে ব্যক্তি হতেই সে শাস্তি দুরীভূত করা হবে তার প্রতি আল্লাহ বড়ই দয়া করলেন আর এটাই স্পষ্ট সফলতা।

وَ اِنْ یَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَ اِنْ یَّمْسَسْكَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۱۷﴾

১৭. আল্লাহ যদি তোমাকে কষ্ট দান করেন তবে স্বয়ং তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ করেন তবে তিনি সব বিষয়ে শক্তিমান।

وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَ هُوَ الْحَكِیْمُ الْخَبِیْرُ ﴿۱۸﴾

১৮. তিনি নিজ বান্দাদের প্রতি পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, পরিপূর্ণভাবে অবগত।

قُلْ اَیُّ شَیْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ۫ شَهِیْدٌۢ بَیْنِیْ وَ بَیْنَكُمْ ۫ وَ اُوْحِیَ اِلَیَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَ مَنْۢ بَلَغَ ؕ اَىِٕنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰی ؕ قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ اِنَّنِیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿۱۹﴾

১৯. বল, (কোনও বিষয়ে) সাক্ষ্য দানের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস কী? বল, আল্লাহ! (এবং তিনিই) আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আমার প্রতি ওহীরূপে এই কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকেও সতর্ক করি এবং যাদের নিকট এ কুরআন পৌঁছবে তাদেরকেও। সত্যিই কি তোমরা এই সাক্ষ্য দিতে পার যে, আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদও আছে? বলে দাও, আমি তো এরূপ সাক্ষ্য দেব না। বলে দাও, তিনি তো একই মাবুদ। তোমরা যে সকল জিনিসকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত কর আমি তাদের থেকে বিমুখ।

اَلَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ یَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا یَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِیْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ

২০. যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে (অর্থাৎ শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সেইরূপ চেনে, যেরূপ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

নিজেদের সন্তানদেরকে চেনে। (তথাপি) যারা নিজেদের জন্য লোকসানের বেসাতী পেতেছে তারা ঈমান আনে না।

[৩]

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾

২১. যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করে অথবা তার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে? নিশ্চিত জেন, জালিমগণ সফলতা লাভ করতে পারে না।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾

২২. সেই দিন (-কে স্মরণ কর), যখন আমি তাদের সকলকে একত্র করব, অত:পর যারা শিরক করেছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করব, তোমাদের সেই মাবুদগণ কোথায়, যাদের সম্পর্কে তোমরা দাবী করতে 'তারা আল্লাহর অংশীদার'।

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾

২৩. সে দিন তাদের এ ছাড়া কোনও অজুহাত থাকবে না যে, তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ, আমরা তো মুশরিক ছিলাম না।[৭]

انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. দেখ, তারা নিজেদের সম্পর্কে কিরূপ মিথ্যা বলে দেবে। আর তারা যে মিথ্যা (মাবুদ) উদ্ভাবন করেছিল তারা তার কোনও হদিস পাবে না।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ

২৫. তাদের মধ্যে কতক লোক এমন, যারা তোমার কথা কান পেতে শোনে, (কিন্তু সে শোনাটা যেহেতু সত্য-সন্ধানের জন্য নয়; বরং নিজেদের জেদ ধরে রাখার লক্ষ্যে হয়ে থাকে, তাই) আমি তাদের

---

৭. প্রথম দিকে ভীত-বিহ্বল অবস্থায় এরূপ মিথ্যা বলে দেবে, কিন্তু পরে যখন স্বয়ং তাদের হাত-পা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তখন সকল মিথ্যা উন্মোচিত হয়ে যাবে, যেমন সূরা ইয়াসীন (৩৬ : ৬৫) ও সূরা হা-মীম সাজদায় (৪১ : ২১) বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে সূরা নিসায় (৪ : ৪২) গত হয়েছে যে, তারা কোনও কথাই লুকাতে পারবে না। সামনে এ সূরারই ১৩০ নং আয়াতে আসছে যে, তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾

অন্তরে পর্দা ফেলে দিয়েছি। ফলে তারা তা বোঝে না; তাদের কানে বধিরতা সৃষ্টি করে দিয়েছি এবং এক-এক করে সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলেও তারা ঈমান আনবে না। এমনকি তারা যখন বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য তোমার কাছে আসে তখন কাফেরগণ বলে, এটা (কুরআন) পূর্ববর্তী লোকদের উপাখ্যান ছাড়া কিছুই নয়।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. তারা অন্যকেও এর (অর্থাৎ কুরআনের) থেকে বিরত রাখে এবং নিজেরাও এর থেকে দূরে থাকে এবং (এভাবে) তারা নিজেরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করছে না। কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

২৭. এবং (সেটা বড় ভয়ানক দৃশ্য হবে) যদি তুমি সেই সময় দেখতে পাও, যখন তাদেরকে জাহান্নামের পাশে দাঁড় করানো হবে এবং তারা বলবে, হায়! আমাদেরকে যদি (দুনিয়ায়) ফেরত পাঠানো হত, তবে আমরা এবার আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করতাম না এবং আমরা মুমিনদের মধ্যে গণ্য হতাম।

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. (অথচ তাদের এ আকাঙ্ক্ষাও পূরণ হবে না) বরং পূর্বে তারা যা গোপন করত তা তাদের সামনে প্রকাশ পেয়ে গেছে (তাই নিরুপায় হয়ে তারা এ দাবী করবে) নচেৎ সত্যিই যদি তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়, তবে পুনরায় তারা সে সবই করবে, যা থেকে তাদেরকে বারণ করা হয়েছে। নিশ্চয়ই তারা ঘোর মিথ্যাবাদী।

وَقَالُوْٓا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. তারা বলে, যা-কিছু আছে তা কেবল আমাদের এই পার্থিব জীবনই। মৃত্যুর পর আমরা পুনর্জীবিত হব না।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ؕ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. তুমি যদি সেই সময় দেখতে পাও, যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন, এটা (অর্থাৎ এই দ্বিতীয় জীবন) কি সত্য নয়? তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ নিশ্চয়ই! আল্লাহ বলবেন, তবে তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। যেহেতু তোমরা কুফর করতে।

[৪]

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১. যারা আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়াকে অস্বীকার করেছে নিশ্চয়ই তারা অতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমনকি কিয়ামত যখন অকস্মাৎ তাদের সামনে এসে পড়বে তখন তারা বলবে, হায় আফসোস! আমরা এ (কিয়ামত) সম্পর্কে বড় অবহেলা করছি এবং তারা (তখন) তাদের পিঠে নিজেদের পাপের বোঝা বহন করবে। সুতরাং সাবধান! তারা যা বহন করবে তা অতি নিকৃষ্ট ভার।

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া কিছু নয়।[৮] যারা তাকওয়া অবলম্বন করে আখিরাতের নিবাসই তাদের জন্য শ্রেয়। এতটুকু কথাও কি তোমরা বুঝতে পার না?

---

৮. 'পূর্বে ২৯ নং আয়াতে কাফেরদের এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, 'যা-কিছু আছে তা আমাদের এই পার্থিব জীবনই'। তার জবাবে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আখিরাতের অনন্ত-স্থায়ী জীবনের বিপরীতে দিন কতকের এই পার্থিব জীবন, যাকে তোমরা সবকিছু মনে করে বসে আছ, এটা ক্রীড়া-কৌতুকের বেশি মূল্য রাখে না। যারা আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে পার্থিব জীবনের রং-তামাশার ভেতর জীবন যাপন করছে, তারা যেই ভোগ-বিলাসিতাকে জীবনের লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছে আখিরাতে যাওয়ার পর তাদের বুঝে আসবে যে, এর মূল্য ক্রীড়া-কৌতুকের বেশি কিছু ছিল না। তবে যারা দুনিয়াকে আখিরাতের শস্যক্ষেত্র বানিয়ে জীবন অতিবাহিত করে, তাদের পক্ষে দুনিয়ার জীবনও অতি বড় নিয়ামত।

৩৩. (হে রাসূল!) আমি ভালো করেই জানি, তারা যা বলে তাতে তোমার কষ্ট হয়। কেননা তারা আসলে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছে না; বরং জালিমগণ আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করছে।[৯]

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪. বস্তুত তোমার পূর্বে বহু রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে যে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে ও কষ্ট দান করা হয়েছে, তাতে তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছেছে। এমন কেউ নেই, যে আল্লাহর কথা পরিবর্তন করতে পারে। (পূর্ববর্তী) রাসূলগণের কিছু ঘটনা আপনার কাছে তা পৌঁছেছেই।

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰۤى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫. যদি তাদের উপেক্ষা তোমার কাছে বেশি পীড়াদায়ক হয়, তবে পারলে তুমি ভূগর্ভে (যাওয়ার জন্য) কোনও সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে (ওঠার জন্য) কোনও সিঁড়ি সন্ধান কর, অত:পর তাদের কাছে (তাদের ফরমায়েশী) কোন নিদর্শন নিয়ে এসো। আল্লাহ চাইলে তাদের সকলকে হিদায়াতের উপর একত্র করতেন। সুতরাং তুমি কিছুতেই অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[১০]

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٣٥﴾

---

৯. অর্থাৎ তাঁর সত্তাকে অস্বীকার করত বলেই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেশি কষ্ট হত আসলে বিষয়টা তা নয়, তাঁর কষ্ট বেশি হত এ কারণে যে, তারা আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করত। আয়াতের এ অর্থ কুরআনের শব্দাবলীর সাথেও বেশি সঙ্গতিপূর্ণ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বভাব ও মেজাযের সাথেও।

১০. আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বহু মুজিযা (নিদর্শন) দান করেছিলে। সর্বাপেক্ষা বড় মুজিযা হল কুরআন মাজীদ। কেননা তিনি একজন উম্মী বা নিরক্ষর ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রতি এমন বিশুদ্ধ ও অলংকারময় বাণী নাযিল হয়, যার সামনে বড় বড় কবি-সাহিত্যিক নতি স্বীকারে বাধ্য হয়ে যায় এবং সূরা বাকারা (২ : ২৩) ও অন্যান্য সূরায় যে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে একজনও তা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। সূরা আনকাবুত (২৯ : ৫১) এরই দিকে ইশারা করে বলা হয়েছে যে, একজন সত্য

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. কথা তো কেবল তারাই মানতে পারে, যারা (সত্যের আকাঙ্ক্ষী হয়ে) শোনে। আর মৃতদের বিষয়টা এই যে, আল্লাহই তাদেরকে কবর থেকে উঠাবেন অত:পর তারই কাছে তারা প্রত্যানীত হবে।

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭. তারা বলে, (ইনি যদি নবী হন, তবে) তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোনও নিদর্শন অবতীর্ণ করা হল না কেন? তুমি (তাদেরকে) বল, নিশ্চয়ই আল্লাহ যে কোনও নিদর্শন অবতীর্ণ

সন্ধানীর জন্য কেবল এই এক মুজিযাই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু নিজেদের জেদ ও হঠকারিতার কারণে মক্কার কাফেরগণ নিত্য-নতুন মুজিযা দাবী করতে থাকে। এভাবে তারা যে সব বেহুদা ফরমায়েশ ও দাবী-দাওয়া করত সূরা বনী ইসরাঈলে (১৭ : ৮৯–৯৩) তার একটা তালিকাও উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে কখনও কখনও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও ধারণা হত তাদের ফরমায়েশী মুজিযাসমূহের থেকে কোনও মুজিযা দেখিয়ে দেওয়া হলে হয়ত তারা ঈমান আনত ও জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেত। এ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সদয় সম্বোধন করে বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তাদের এ দাবীর উদ্দেশ্য সত্য গ্রহণ নয়; বরং কেবল জেদ প্রকাশ এবং যেমন পূর্বে ২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, সব রকমের নিদর্শন দেখানো হলেও তারা ঈমান আনবে না। কাজেই তাদের ফরমায়েশ পূরণ করাটা কেবল নিষ্ফল কাজই নয়; বরং সামনে ৩৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলার যে হিকমতের কথা বর্ণিত হয়েছে তারও পরিপন্থী। হাঁ আপনি নিজে যদি তাদের দাবী-দাওয়া পূরণ করার জন্য তাদের কথা মত ভূগর্ভে ঢোকার কোনও সুড়ঙ্গ বানাতে বা আকাশে আরোহনের কোনও সিঁড়ি তৈরি করতে পারেন, তবে তাও করে দেখতে পারেন। বলা বাহুল্য আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছাড়া আপনি তা করতে সক্ষম হবেন না। সুতরাং তাদেরকে তাদের ইচ্ছানুরূপ মুজিযা দেখানোর চিন্তা ছেড়ে দিন। অত:পর আল্লাহ তাআলা এটাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি চাইলে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে জোরপূর্বক একই দ্বীনের অনুসারী বানাতে পারতেন। কিন্তু দুনিয়ায় মানব প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরীক্ষা করা আর পরীক্ষার দাবী হল মানুষ জবরদস্তিমূলক নয়, বরং সে তার নিজ বুদ্ধি-বিবেককে কাজে লাগিয়ে, নিখিল বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অগণিত নিদর্শনের ভেতর চিন্তা করে স্বেচ্ছায় খুশি মনে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের উপর ঈমান আনবে। বস্তুত নবী-রাসূলগণ মানুষকে তাদের ফরমায়েশ অনুসারে নিত্য-নতুন কারিশমা দেখানোর জন্য নয়; বরং মহা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই প্রেরিত হয়ে থাকেন। আসমানী কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের এ পরীক্ষাকে সহজ করে দেওয়া। তবে এসব দ্বারা উপকৃত হয় কেবল তারাই, যাদের অন্তরে সত্য জানার আগ্রহ আছে। যারা নিজেদের জেদ ধরে রাখার জন্য কসম করে নিয়েছে, তাদের জন্য না কোনও দলীল-প্রমাণ কাজে আসতে পারে, না কোনও মুজিযা।

করতে সক্ষম, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক (এর পরিণাম) জানে না।[১১]

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۭ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. ভূপৃষ্ঠে যত জীবন বিচরণ করে, যত পাখি তাদের ডানার সাহায্যে ওড়ে, তারা সকলে তোমাদেরই মত সৃষ্টির বিভিন্ন প্রকার। আমি কিতাব (লাওহে মাহফুজ)-এ কিছুমাত্র ত্রুটি রাখিনি। অত:পর তাদের সকলকে একত্র করে তাদের প্রতিপালকের নিকট নিয়ে যাওয়া হবে।[১২]

---

১১. এ আয়াতে ফরমায়েশী মুজিযা না দেখানোর আরেকটি কারণের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার শাশ্বত নীতি হল, যখনই কোনও জাতিকে তাদের ইচ্ছানুরূপ মুজিযা দেখানো হয়েছে, তখন তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, এর পরও তারা যদি ঈমান না আনে তবে তাদেরকে এ দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। সুতরাং ভূপৃষ্ঠ হতে এভাবে বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা জানেন মক্কার অধিকাংশ কাফের হঠকারী স্বভাবের। ফরমায়েশী মুজিযা দেখার পরও তারা ঈমান আনবে না। ফলে আল্লাহ তাআলার রীতি অনুসারে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপক শাস্তি দ্বারাই এখনই তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা নয়। এ কারণেই তিনি তাদেরকে তাদের ফরমায়েশী মুজিযা প্রদর্শন করেন না। যারা এরূপ মুজিযা দাবী করছে তারা এর পরিণাম জানে না। হাঁ যারা ঈমান আনবার, তারা এরূপ মুজিযা ছাড়াই অন্যান্য দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী দেখে স্বেচ্ছায় ঈমান আনবে।

১২. এ আয়াত জানাচ্ছে, মৃত্যুর পর মানুষই পুনরুজ্জীবিত হবে না; বরং কিয়ামতের পর অন্যান্য জীব-জন্তুকেও পুনরুজ্জীবিত করা হবে। 'তোমাদেরই মত সৃষ্টির বিভিন্ন প্রকার' বলে বোঝানো হয়েছে, তোমাদেরকে যেমন পুনরুত্থিত করা হবে, তেমনি তাদেরকেও তা করা হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে ইরশাদ করেন, জীব-জন্তুরা দুনিয়ায় একে অন্যের প্রতি যে জুলুম করে থাকে, তজ্জন্য হাশরের ময়দানে মজলুম জীবকে জালিমের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দেওয়া হবে। অত:পর দুনিয়ায় তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার হক সংক্রান্ত বিধি-বিধান না থাকায় পুনরায় তাদের মৃত্যু ঘটানো হবে। এ স্থলে এ বিষয়টা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য বাহ্যত এই যে, আরব অবিশ্বাসীগণ মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অসম্ভব মনে করত। তারা বলত, যে সকল মানুষ মরে মাটি হয়ে গেছে তাদেরকে পুনরায় একত্র করা কিভাবে সম্ভব? আল্লাহ তাআলা বলছেন, কেবল মানুষকেই কি, অন্যান্য জীব-জন্তুকেও জীবিত করা হবে, অথচ তাদের সংখ্যা মানুষের চেয়ে কত বেশি। বাকি থাকল এই প্রশ্ন যে, দুনিয়ার শুরু হতে শেষ পর্যন্তকার অসংখ্য মানুষ ও জীব-জন্তুর গলে-পচে যাওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সনাক্ত করা হবে কিভাবে? পরের বাক্যে এর জবাব দেওয়া হয়েছে যে, লাওহে মাহফুজে সবকিছু লিপিবদ্ধ আছে। তা এমনই এক রেকর্ড, যাতে কোনও রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই। সুতরাং আল্লাহ তাআলার পক্ষে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের কোনওটিকেই পুনরুজ্জীবিত করা কঠিন হবে না।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ؕ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۳۹﴾

৩৯. যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে তারা অন্ধকারে উদ্ভ্রান্ত থেকে বধির ও মূক হয়ে গেছে।[১৩] আল্লাহ যাকে চান (তাকে তার হঠকারিতার কারণে) গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেন আর যাকে চান সরল পথে স্থাপিত করেন।

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۴۰﴾

৪০. তাদেরকে (কাফেরদেরকে) বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে বল দেখি, তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আপতিত হলে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হলে তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে?

بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَ تَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ﴿۴۱﴾

৪১. বরং তাকেই ডাকবে। অত:পর যে দুর্দশার জন্য তাকে ডাক তিনি চাইলে তা দূর করবেন আর যাদেরকে (দেবতাদেরকে) তোমরা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করছ (তখন) তাদেরকে ভুলে যাবে।[১৪]

[৫]

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿۴۲﴾

৪২. (হে নবী!) তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট আমি রাসূল পাঠিয়েছি। অত:পর আমি (তাদের অবাধ্যতার কারণে) তাদেরকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্টে

---

১৩. অর্থাৎ তারা স্বেচ্ছায় গোমরাহী অবলম্বন করে সত্য শোনা ও বলার যোগ্যতাই খতম করে ফেলেছে। প্রকাশ থাকে যে, এ তরজমা করা হয়েছে فى الظلمات কে صم بكم -এর حال (অবস্থা নির্দেশক) ধরে নিয়ে, যাকে আল্লামা আলুসী (রহ.) প্রাধান্য দিয়েছেন।

১৪. আরব মুশরিকগণ আল্লাহ তাআলাকেই জগতের স্রষ্টা বলে স্বীকার করত, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের বিশ্বাস ছিল, বহু দেব-দেবী তাঁর সঙ্গে এভাবে শরীক যে, তাদের হাতেও অনেক কিছুর এখতিয়ার আছে। এ কারণেই তারা তাদেরকে খুশী রাখার জন্য তাদের পূজা-অর্চনা করত। কিন্তু আকস্মিক কোনও বিপদ এসে পড়লে সে সকল দেব-দেবীকে ছেড়ে আল্লাহ তাআলাকেই ডাকত, যেমন সামুদ্রিক সফরে যখন ঝড়ের কবলে পড়ে পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গ রাশির ভেতর পরিবেষ্টিত হয়ে যেত, তখন এ রকমই করত। এখানে তাদের সে কর্মপন্থার উল্লেখপূর্বক প্রশ্ন করা হচ্ছে যে, দুনিয়ার এসব বিপদ-আপদে যখন তোমরা আল্লাহ তাআলাকেই ডাক, তখন বড় কোন আযাব এসে পড়লে কিংবা কিয়ামত ঘটে গেলে যে আল্লাহ তাআলাকেই ডাকবে তাতে সন্দেহ কি?

আক্রান্ত করেছি, যাতে তারা অনুনয়-বিনয়ের নীতি অবলম্বন করে।

فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. অত:পর যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ হতে সংকট আসল তখন তারা কেন অনুনয়-বিনয়ের নীতি অবলম্বন করল না। বরং তাদের অন্তর আরও কঠিন হয়ে গেল এবং তারা যা করছিল শয়তান তাদেরকে বোঝাল যে, সেটাই উত্তম কাজ।

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ حَتّٰۤى اِذَا فَرِحُوْا بِمَاۤ اُوْتُوْۤا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন আমি তাদের জন্য সমস্ত নিয়ামতের দুয়ার খুলে দিলাম।[১৫] অবশেষে তাদেরকে যে নিয়ামত দেওয়া হয়েছিল যখন তাতে তারা অহমিকা দেখাতে লাগল তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে ধরলাম। ফলে তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেল।

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. এভাবে যারা জুলুম করেছিল তাদের মূলোচ্ছেদ করা হল এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ

৪৬. (হে নবী! তাদেরকে) বল, তোমরা আমাকে একটু বল তো, আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি এবং তোমাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরে মোহর করে দেন, তবে আল্লাহ ছাড়া কোন্ মাবুদ আছে, যে

---

১৫. পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সাথে আল্লাহ তাআলার নীতি ছিল এই যে, তাদেরকে সতর্ক করার জন্য কখনও কখনও দুঃখ-কষ্টে ফেলতেন, যাতে বিপদে পড়লে যাদের মন নরম হয়, তারা চিন্তা-ভাবনা করার প্রতি ঝোঁকে। তারপর আবার তাদেরকে সুখ-সাচ্ছন্দ্য দান করতেন, যাতে সুখ-সাচ্ছন্দ্যের সময় যারা সত্য গ্রহণের যোগ্যতা রাখে তারা কিছুটা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। যারা উভয় অবস্থায় গোমরাহীকেই আকড়ে ধরত, পরিশেষে তাদের উপর আযাব নাযিল করা হত। সূরা আরাফেও (৭ : ৯৪–৯৫) এ বিষয়টা বর্ণিত হয়েছে।

اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ﴿٤٦﴾

তোমাদেরকে এগুলো ফিরিয়ে দেবে? দেখ, আমি কিভাবে বিভিন্ন পন্থায় নিদর্শনাবলী বিবৃত করি। তা সত্ত্বেও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. বল, তোমরা আমাকে একটু বল তো, আল্লাহর শাস্তি যদি তোমাদের উপর অকস্মাৎ এসে পড়ে অথবা ঘোষণা দিয়ে, উভয় অবস্থায় জালিমদের ছাড়া অন্য কাউকে ধ্বংস করা হবে কি?[১৬]

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. আমি রাসূলগণকে তো কেবল এজন্যই পাঠাই যে, তারা (সৎ কর্মের ক্ষেত্রে) সুসংবাদ শোনাবে এবং (অবাধ্যতার ক্ষেত্রে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে) ভীতি প্রদর্শন করবে। যারা ঈমান আনে ও নিজেকে সংশোধন করে, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আর যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে, তাদের উপর অবশ্যই শাস্তি আপতিত হবে, যেহেতু তারা অবাধ্যতা করতে অভ্যস্ত ছিল।

قُلْ لَّاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا

৫০. (হে নবী!) তাদেরকে বল, আমি তোমাদেরকে এটা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন ভাণ্ডার আছে। অদৃশ্য সম্পর্কেও আমি (পরিপূর্ণ) জ্ঞান রাখি না এবং আমি তোমাদেরকে একথাও বলি

---

১৬. মক্কার কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলত, আপনি আমাদেরকে আল্লাহর যে শাস্তি সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন সে শাস্তি এখনও আসছে না কেন? হয়ত তাদের ধারণা ছিল শাস্তি আসলে তো মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তার উত্তরে এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, ধ্বংস তো কেবল তারাই হবে, যারা শিরক ও জুলুমে লিপ্ত থেকেছে।

مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٥٠﴾

না যে, আমি ফিরিশতা[১৭] আমি তো কেবল সেই ওহীরই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়। বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা কর না?

[৬]

وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১. এবং (হে নবী!) তুমি এই ওহীর দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করে দাও যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট এমন অবস্থায় সমবেত করা হবে যে, তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক থাকবে না এবং না কোনও সুপারিশকারী,[১৮] যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ

৫২. যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সকাল ও সন্ধ্যায় তাকে ডাকে তাদেরকে তুমি নিজের মজলিস থেকে বের করে দিও না।[১৯] তাদের হিসাবে যে সকল কর্ম আছে তার কোনওটির দায়-দায়িত্ব তোমার উপর

---

১৭. কাফিরগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দাবী জানাত, আপনি নবী হলে আপনার কাছে বিপুল অর্থ-সম্পদ থাকার কথা। সুতরাং এই-এই মুজিযা দেখান। তার উত্তরে বলা হচ্ছে যে, নবী হওয়ার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহর এখতিয়ার আমার হাতে আছে বা আমি পরিপূর্ণ অদৃশ্য-জ্ঞানের মালিক কিংবা আমি ফিরিশতা। নবী হওয়ার অর্থ কেবল এই যে, আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি ওহী নাযিল করেন এবং আমি তারই অনুসরণ করি।

১৮. মুশরিকদের বিশ্বাস ছিল তাদের দেবতাগণ তাদের জন্য সুপারিশকারী হবে। এ আয়াতে সেই বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। কাজেই এর দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই সুপারিশকে রদ করা হচ্ছে না, যা তিনি আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে মুমিনদের অনুকূলে করবেন। অন্যান্য আয়াতে আছে, আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে সুপারিশ সম্ভব (দেখুন বাকারা, আয়াত ২৫৫)।

১৯. মক্কার কতক কুরাইশী নেতা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলত, আপনার আশেপাশে গরীব ও নিম্ন স্তরের বহু লোক থাকে। তাদের সাথে আপনার মজলিসে বসা আমাদের পক্ষে শোভা পায় না। আপনি যদি তাদেরকে আপনার মজলিস থেকে বের করে দেন তবে আমরা আপনার কথা শোনার জন্য আসতে পারি। তারই উত্তরে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

নয় এবং তোমার হিসাবে যে সকল কর্ম আছে তার কোনওটিরও দায়-দায়িত্ব তাদের উপর নয়, যে কারণে তুমি তাদেরকে বের করে দেবে এবং জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. এভাবেই আমি তাদের কতক লোক দ্বারা কতককে পরীক্ষায় ফেলেছি,[২০] যাতে তারা (তাদের সম্পর্কে) বলে, এরাই কি সেই লোক, আমাদের সকলকে রেখে আল্লাহ্ যাদেরকে অনুগ্রহ করার জন্য বেছে নিয়েছেন?[২১] (যে সকল কাফের এ কথা বলছে, তাদের ধারণায়) আল্লাহ্ কি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের সম্পর্কে অন্যদের থেকে বেশি জানেন না?

وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًاۢ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ ۙ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥٤﴾

৫৪. যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান রাখে, তারা যখন তোমার কাছে আসে, তখন তাদেরকে বল, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের প্রতিপালক নিজের উপর রহমতের এই নীতি স্থির করে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অজ্ঞতাবশত কোনও মন্দ কাজ করে, তারপর তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে, তবে আল্লাহ্ তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ

৫৫. এভাবেই আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করি (যাতে সরল পথও স্পষ্ট হয়ে

---

২০. অর্থাৎ গরীব মুসলিমগণ এই হিসেবে ধনী কাফেরদের জন্য পরীক্ষার কারণ হয়ে গেছে যে, লক্ষ্য করা হবে তারা কি সত্য কথাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়, না সত্য কথাকে এই কারণে প্রত্যাখ্যান করে যে, তার অনুসারীরা সব গরীব লোক।

২১. এটা কাফেরদের উক্তি। গরীব মুসলিমদের সম্পর্কে তারা উপহাসমূলকভাবে এরূপ কথা বলত। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলা নিজ দয়া বিতরণের জন্য সারা দুনিয়ায় এই নিম্ন স্তরের লোকগুলোকেই খুঁজে পেলেন, যাদেরকে তিনি জান্নাতের উপযুক্ত বানাতে চান?

الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٥٥﴾

যায়) এবং এতে অপরাধীদের পথও পরিষ্কার হয়ে যায়।

[৭]

قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. (হে নবী! তাদেরকে) বল, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে (মিথ্যা উপাস্যদেরকে) ডাক, আমাকে তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে। বল, আমি তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করতে পারি না। করলে আমি বিপথগামী হয়ে যাব এবং আমি সৎপথ প্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হব না।

قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. বল, আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক স্পষ্ট প্রমাণ লাভ করেছি, যার উপর আমি প্রতিষ্ঠিত আছি, অথচ তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছ। তোমরা যা তাড়াতাড়ি চাচ্ছ তা আমার কাছে নেই।[২২] হুকুম আল্লাহ ছাড়া আর কারও চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী।

قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. বল, তোমরা যে জিনিস সত্বর চাচ্ছ তা যদি আমার কাছে থাকত, তবে আমার ও তোমাদের মধ্যে ফায়সালা হয়ে যেত। আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ

৫৯. আর তাঁরই কাছে আছে অদৃশ্যের কুঞ্জি। তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। স্থলে ও জলে যা-কিছু আছে সে সম্পর্কে তিনি অবহিত। কোনও গাছের এমন কোনও পাতা ঝরে না, যে সম্পর্কে

---

২২. কাফিরগণ বলত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছেন তা আমাদের উপর সত্বর কেন বর্ষণ হয় না? এ আয়াত তারই জবাবে নাযিল হয়েছে। জবাবের সারমর্ম হল– শাস্তি বর্ষণ করা এবং তার যথাযথ সময় ও উপযুক্ত পন্থা নির্ধারণের এখতিয়ার কেবল আল্লাহ তাআলারই হাতে। তিনি নিজ হিকমত অনুযায়ী তার ফায়সালা করেন।

وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٩﴾

তিনি জ্ঞাত নন। মাটির অন্ধকারে কোনও শস্যদানা অথবা আর্দ্র বা শুষ্ক এমন কোনও জিনিস নেই যা এক উন্মুক্ত কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই।

وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰۤى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. তিনিই সেই সত্তা, যিনি রাতের বেলা (ঘুমের ভেতর) তোমাদের আত্মা (মাত্রা বিশেষে) কব্জা করে নেন এবং দিনের বেলা তোমরা যা-কিছু কর তা তিনি জানেন। তারপর (নতুন) দিনে তোমাদেরকে নতুন জীবন দান করেন, যাতে (তোমাদের জীবনের) নির্ধারিত কাল পূর্ণ হতে পারে। অত:পর তার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

[৮]

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. তিনিই নিজ বান্দাদের উপর পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং তোমাদের জন্য রক্ষক (ফিরিশতা) প্রেরণ করেন।[২৩] অবশেষে যখন তোমাদের কারও মৃত্যুকাল এসে পড়ে, তখন আমার প্রেরিত ফিরিশতা তাকে পরিপূর্ণরূপে উসুল করে নেয় এবং তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না।

ثُمَّ رُدُّوْۤا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ؕ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۟ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. অত:পর তাদের সকলকে তাদের প্রকৃত মনিবের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। স্মরণ রেখ, হুকুম কেবল তারই চলে। তিনি সর্বাপেক্ষা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

---

২৩. 'রক্ষক ফিরিশতা' বলে যে সকল ফিরিশতা মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করেন, তাদেরকেও বোঝানো হতে পারে এবং সেই সকল ফিরিশতাকেও বোঝানো হতে পারে, যারা প্রতিটি লোকের দৈহিক হেফাজতের কাজে নিযুক্ত। সূরা রাদে (১৩ : ১১) তাদের কথা বর্ণিত হয়েছে।

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۶۳﴾

৬৩. বল, স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে সেই সময় কে তোমাদেরকে রক্ষা করেন, যখন তোমরা মিনতি সহকারে ও চুপিসারে তাকেই ডাক (এবং বল যে,) তিনি যদি এই মসিবত থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করেন, তবে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব?

قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿۶۴﴾

৬৪. বল, আল্লাহই তোমাদেরকে রক্ষা করেন, এই মসিবত থেকেও এবং অন্যান্য দুঃখ-কষ্ট হতেও। তা সত্ত্বেও তোমরা শিরক কর।

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿۶۵﴾

৬৫. বল, তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সক্ষম যে, তোমাদের প্রতি কোনও শাস্তি পাঠাবেন তোমাদের উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে এক দলকে অন্য দলের মুখোমুখি করে দেবেন এবং এক দলকে অপর দলের শক্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন। দেখ, আমি কিভাবে বিভিন্ন পন্থায় স্বীয় নিদর্শনাবলী বিবৃত করছি, যাতে তারা বুঝতে সক্ষম হয়।

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ؕ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ؕ ﴿۶۶﴾

৬৬. (হে নবী!) তোমার সম্প্রদায় একে (কুরআনকে) মিথ্যা বলেছে, অথচ এটা সম্পূর্ণ সত্য। তুমি বলে দাও, আমার উপর তোমাদের দায়িত্ব অর্পিত হয়নি।[২৪]

لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ۫ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۶۷﴾

৬৭. প্রত্যেক ঘটনার একটা সময় নির্ধারিত আছে এবং শীঘ্রই তোমরা সব জানতে পারবে।

---

২৪. অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকটি দাবী পূরণ করা আমার দায়িত্ব নয়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রতিটি কাজের একটা সময় নির্ধারিত আছে। তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়াও তার অন্তর্ভুক্ত। সময় আসলে তোমরা তা জানতে পারবে।

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾

৬৮. যারা আমার আয়াতের সমালোচনায় রত থাকে, তাদেরকে যখন দেখবে তখন তাদের থেকে দূরে সরে যাবে, যতক্ষণ না তারা অন্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। যদি শয়তান কখনও তোমাকে এটা ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর জালিম লোকদের সাথে বসবে না।

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. তাদের খাতায় যে সকল কর্ম আছে তার কোনও দায় মুত্তাকীদের উপর বর্তায় না। অবশ্য উপদেশ দেওয়া তাদের কাজ। হয়ত তারাও (এরূপ বিষয় থেকে) সাবধানতা অবলম্বন করবে।

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. যারা নিজেদের দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয় বানিয়েছে[২৫] এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকার মধ্যে ফেলেছে, তুমি তাদেরকে পরিত্যাগ কর এবং এর (অর্থাৎ কুরআনের) মাধ্যমে (মানুষকে) উপদেশ দিতে থাক, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের কারণে এভাবে গ্রেফতার না হয় যে, আল্লাহ (-এর শাস্তি) হতে বাঁচানোর জন্য তার কোনও অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না। আর সে যদি (নিজ মুক্তির জন্য) সব রকমের মুক্তিপণও পেশ করতে চায়, তবে তার পক্ষ হতে তা গৃহীত হবে না। এরাই (অর্থাৎ যারা দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয় বানিয়েছে, তারা) নিজেদের কৃতকর্মের কারণে ধরা পড়ে

---

২৫. এর এক অর্থ এই হতে পারে যে, যে দ্বীন অর্থাৎ ইসলামকে তাদের গ্রহণ করে নেওয়া উচিত ছিল, তারা তাকে নিয়ে উল্টো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা যে দ্বীন অবলম্বন করেছে তা ক্রীড়া-কৌতুকের মত বেহুদা রসম-রেওয়াজের সমষ্টি মাত্র। উভয় অবস্থায়ই তাদেরকে পরিত্যাগ করার যে আদেশ করা হয়েছে, তার অর্থ হচ্ছে, তারা যখন আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহকে লক্ষ্য করে ঠাট্টা-বিদ্রূপে রত হয়, তখন তাদের সঙ্গে বসবে না।

গেছে। যেহেতু তারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাই তাদের জন্য রয়েছে অতি গরম পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

[৯]

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰۤى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ص لَهٗۤ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗۤ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ط قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ط وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১. (হে নবী!) তাদেরকে বল, আমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে এমন সব জিনিসের ইবাদত করব, যারা আমাদের কোনও উপকারও করতে পারে না এবং কোনও অপকারও করতে পারে না? আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত দেওয়ার পর আমরা কি সেই ব্যক্তির মত উল্টো দিকে ফিরে যাব, যাকে শয়তান ধোঁকা দিয়ে মরুভূমিতে নিয়ে গেছে, ফলে সে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়? তার কিছু সঙ্গী আছে, যারা তাকে হিদায়াতের দিকে ডাক দেয় যে, আমাদের কাছে এসো। বল, আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতই সত্যিকারের হিদায়াত। আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমরা রাব্বুল আলামীনের সামনে নতি স্বীকার করি।

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ط وَهُوَ الَّذِىْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. এবং (এই হুকুমও দেওয়া হয়েছে যে,) সালাত কায়েম কর এবং তাকে ভয় করে চল। তিনিই সেই সত্তা, যার কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ط وَلَهُ الْمُلْكُ

৭৩. তিনিই সেই সত্তা, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন যথোচিত[২৬] এবং যে দিন তিনি (কিয়ামত দিবসকে) বলবেন, 'হয়ে যাও', তখন তা হয়ে

---

২৬. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি জগতকে এক সঠিক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। সে উদ্দেশ্য এই যে, যারা এখানে ভালো কাজ করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা এবং যারা অনাচারী ও অত্যাচারী হবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া। এ উদ্দেশ্য তখনই পূরণ হতে পারে, যখন পার্থিব জীবনের পর আরেকটি জীবন আসবে, যে জীবনে পুরস্কার ও শাস্তি দানের এ উদ্দেশ্য পূরণ করা হবে। সামনে বলা হয়েছে যে, এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিয়ামতে মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা আল্লাহ তাআলার পক্ষে কিছু কঠিন কাজ নয়। যখন তিনি ইচ্ছা করবেন

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ۖ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿٧٣﴾

যাবে। তার কথা সত্য। যে দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, সে দিন রাজত্ব হবে তারই।[২৭] তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছুই জানেন। তিনিই মহা প্রাজ্ঞ ও সর্ব বিষয়ে অবহিত।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٤﴾

৭৪. এবং (সেই সময়ের আলোচনা শোন) যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বলেছিল, আপনি কি মূর্তিদেরকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছেন? আমি তো দেখছি আপনি ও আপনার সম্প্রদায় স্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছেন।

وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. আর এভাবেই আমি ইবরাহীমকে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রাজত্ব প্রদর্শন করাই। উদ্দেশ্য ছিল, সে যেন পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. সুতরাং যখন তার উপর রাত ছেয়ে গেল, তখন সে একটি নক্ষত্র দেখে বলল, 'এই আমার প্রতিপালক'।[২৮]

কিয়ামতকে অস্তিত্বে আসার হুকুম দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে তা অস্তিত্বমান হয়ে যাবে। আর তিনি যেহেতু অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সব কিছুই জানেন তাই মৃত্যুর পর মানুষকে একত্র করাও তার পক্ষে কঠিন হবে না। অবশ্য হিকমতওয়ালা হওয়ার কারণে তিনি কিয়ামত সংঘটিত করবেন কেবল তখনই, যখন তাঁর হিকমত তা দাবী করবে।

২৭. দুনিয়ায়ও প্রকৃত রাজত্ব যদিও আল্লাহ তাআলার, কিন্তু এখানে বাহ্যিকভাবে বহু রাজা-বাদশাহ বিভিন্ন দেশ শাসন করছে। শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার পর এই বাহ্যিক রাজত্বও খতম হয়ে যাবে। তখন বাহ্যিক ও প্রকৃত উভয়বিধ রাজত্ব কেবল আল্লাহ তাআলারই থাকবে।

২৮. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম 'ইরাকের নীনাওয়া' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেখানকার লোকে মূর্তি ও নক্ষত্র পূজা করত। তার পিতা আযরও সেই বিশ্বাসেরই অনুসারী ছিল; বরং সে নিজে মূর্তি তৈরি করত। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম শুরু থেকেই তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি শিরককে ঘৃণা করতেন। তবে তিনি নিজ সম্প্রদায়কে চিন্তা-ভাবনার প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে এই সূক্ষ্ম পন্থা অবলম্বন করলেন যে, তিনি চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রকে দেখে প্রথমে নিজ কওমের ভাষায় কথা বললেন। উদ্দেশ্য ছিল একথা বোঝানো যে, তোমাদের ধারণায় তো এসব নক্ষত্র আমার রব্ব। তবে এসো, আমরা খতিয়ে দেখি একথা মেনে নেওয়ার উপযুক্ত কি না। সুতরাং যখন নক্ষত্র ও চন্দ্র ডুবে গেল

অত:পর সেটি যখন ডুবে গেল, তখন সে বলল, যা ডুবে যায় আমি তাকে পসন্দ করি না।

৭৭. অত:পর যখন সে চাঁদকে উজ্জ্বলরূপে উদিত হতে দেখল তখন বলল, 'এই আমার রব্ব'। কিন্তু যখন সেটিও ডুবে গেল, তখন বলতে লাগল, আমার রব্ব আমাকে হিদায়াত না দিলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ট লোকদের দলভুক্ত হয়ে যাব।

فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৮. তারপর যখন সে সূর্যকে সমুজ্জ্বলরূপে উদিত হতে দেখল, তখন বলল, এই আমার রব্ব। এটি বেশি বড়। তারপর যখন সেটিও ডুবে গেল, তখন সে বলল, হে আমার কওম! তোমরা যে সকল জিনিসকে আল্লাহর সঙ্গে শরীক কর, তাদের সাথে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।

فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَاۤ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯. আমি সম্পূর্ণ একনিষ্ঠভাবে সেই সত্তার দিকে নিজের মুখ ফেরালাম, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٧٩﴾

৮০. এবং (তারপর এই ঘটল যে,) তার সম্প্রদায় তার সাথে হুজ্জত শুরু করে দিল।[২৯] ইবরাহীম (তাদেরকে) বলল,

وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ

এবং শেষ পর্যন্ত সূর্যও, তখন প্রত্যেকবারই তিনি নিজ কওমকে স্মরণ করালেন যে, এসব তো অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল জিনিস। যে জিনিস নিজেই অস্থায়ী আবার তাতে ক্রমাগত পরিবর্তনও ঘটতে থাকে, সে সম্পর্কে এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, সে নিখিল বিশ্বকে প্রতিপালন করে এটা কতই না অযৌক্তিক ও নির্বুদ্ধিতা প্রসূত কথা। সুতরাং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র সম্পর্কে যে বলেছিলেন, এগুলো তাঁর প্রতিপালক, এটা তার বিশ্বাস ছিল না এবং সে হিসেবে তিনি একথা বলেননি; বরং নিজ সম্প্রদায় যে বিশ্বাস পোষণ করত তার অসারতা ও ভ্রান্তি তুলে ধরার লক্ষ্যেই তিনি এরূপ বলেছিলেন।

২৯. পূর্বাপর অবস্থা দ্বারা বোঝা যায়, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে দু'টি কথা বলেছিল। (এক) আমরা যুগ-যুগ ধরে আমাদের

هَدٰىنِ ؕ وَلَاۤ اَخَافُ مَا تُشۡرِكُوۡنَ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنۡ یَّشَآءَ رَبِّیۡ شَیۡـًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّیۡ كُلَّ شَیۡءٍ عِلۡمًا ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوۡنَ ﴿۸۰﴾

তোমরা কি আল্লাহ্ সম্পর্কে আমার সঙ্গে হুজ্জত করছ, অথচ তিনি আমাকে হিদায়াত দান করেছেন? তোমরা যে সকল জিনিসকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করছ (তারা আমার কোন ক্ষতি সাধন করবে বলে) আমি তাদেরকে ভয় করি না। অবশ্য আমার প্রতিপালক যদি (আমার) কোন (ক্ষতি সাধন) করতে চান (তবে সর্বাবস্থায়ই তা সাধিত হবে)। আমার প্রতিপালকের জ্ঞান সবকিছু পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এতদসত্ত্বেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

وَكَیۡفَ اَخَافُ مَاۤ اَشۡرَكۡتُمۡ وَلَا تَخَافُوۡنَ اَنَّكُمۡ اَشۡرَكۡتُمۡ بِاللّٰهِ مَا لَمۡ یُنَزِّلۡ بِهٖ عَلَیۡكُمۡ سُلۡطٰنًا ؕ فَاَیُّ الۡفَرِیۡقَیۡنِ اَحَقُّ بِالۡاَمۡنِ ۚ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۸۱﴾

৮১. তোমরা যে সকল জিনিসকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছ আমি কিভাবেই বা তাদেরকে ভয় করতে পারি, যখন তোমরা ওই সকল জিনিসকে আল্লাহর শরীক বানাতে ভয় করছ না, যাদের বিষয়ে তিনি তোমাদের প্রতি কোনও প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি? সুতরাং তোমাদের কাছে যদি কিছু জ্ঞান থাকে, তবে বল, দুই দলের মধ্যে কোন দল নির্ভয়ে থাকার বেশি উপযুক্ত?

বাপ-দাদাদেরকে এসব প্রতিমা ও নক্ষত্রের পূজা করতে দেখছি। তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট মনে করার সাধ্য আমাদের নেই। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রথম বাক্যে এর উত্তর দিয়েছেন যে, ওই বাপ-দাদাদের কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোন ওহী আসেনি। অথচ আমার কাছে উপরে বর্ণিত যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ওহীও এসেছে। সুতরাং আল্লাহ্ প্রদত্ত হিদায়াতের পর শিরককে কিভাবে সঠিক বলে স্বীকার করতে পারি? (দুই) তাঁর সম্প্রদায় সম্ভবত বলেছিল, তুমি যদি আমাদের প্রতিমাসমূহ ও নক্ষত্রদের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার কর, তবে তারা তোমাকে ধ্বংস করে দেবে। এর উত্তরে তিনি বলেন, আমি ওসব ভিত্তিহীন দেবতাদের ভয় করি না। বরং ভয় তো তোমাদেরই করা উচিত। কেননা তোমরা ওইসব ভিত্তিহীন দেবতাদেরকে আল্লাহ তাআলার শরীক সাব্যস্ত করছ। কারও ক্ষতিসাধন কেবল আল্লাহ তাআলাই করতে পারেন, অন্য কেউ নয়। যারা তাঁর তাওহীদে বিশ্বাস করে তিনি তাদেরকে স্বস্তি ও নিরাপত্তা দান করেন।

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝٨٢

৮২. (প্রকৃতপক্ষে) যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানের সাথে তারা কোনও জুলুমের আভাস মাত্র লাগতে দেয়নি,[৩০] নিরাপত্তা ও স্বস্তি তো কেবল তাদেরই অধিকার এবং তারাই সঠিক পথে পৌঁছে গেছে।

[১০]

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝٨٣

৮৩. এটা ছিল আমার ফলপ্রসূ দলীল, যা আমি ইবরাহীমকে তার কওমের বিপরীতে দান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা উচ্চ মর্যাদা দান করি। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের হিকমতও বড়, জ্ঞানও পরিপূর্ণ।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝٨٤

৮৪. আমি ইবররাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক (-এর মত পুত্র ও ইয়াকুব (-এর মত পৌত্র। তাদের) প্রত্যেককে আমি হিদায়াত দান করেছিলাম। আর নূহকে আমি আগেই হিদায়াত দিয়েছিলাম এবং তার বংশধরদের মধ্যে দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকেও। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝٨٥

৮৫. এবং যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইল্‌য়াসকেও (হিদায়াত দান করেছিলাম)। এরা সকলে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ؕ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝٨٦

৮৬. এবং ইসমাঈল, ইয়াসা, ইউনুস ও লুতকেও। তাদের সকলকে আমি বিশ্বের সকল মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

---

৩০. একটি সহীহ হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতের 'জুলুম' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন 'শিরক' দ্বারা। কেননা অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা শিরককে 'মহা জুলুম' সাব্যস্ত করেছেন।

৮৭. তাদের বাপ-দাদা, সন্তানবর্গ ও তাদের ভাইদের মধ্য হতেও বহু লোককে। আমি তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম ও তাদেরকে সরল পথ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম।

وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٨٧﴾

৮৮. এটা আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত, যার মাধ্যমে তিনি নিজ নিজ বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান সরল পথে পৌঁছিয়ে দেন। তারা যদি শিরক করত তবে তাদের সমস্ত (সৎ) কর্ম নিষ্ফল হয়ে যেত।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৯. তারা ছিল এমন লোক, যাদেরকে আমি কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করেছিলাম।[৩১] সুতরাং ওই সকল (আরব) লোক যদি এটা (নবুওয়াত) প্রত্যাখ্যান করে তবে (তার কোনও পরওয়া করো না। কেননা) এর অনুসরণের জন্য আমি এমন লোক নির্দিষ্ট করেছি, যারা এর অস্বীকারকারী নয়।[৩২]

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾

৯০. (উপরে যাদের কথা উল্লেখ করা হল) তারা ছিল এমন লোক, আল্লাহ যাদেরকে (বিরুদ্ধাচারীদের আচার-আচরণে সবর করার) হিদায়াত করেছিলেন। সুতরাং

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٠﴾

৩১. আরব মুশরিকগণ নবুওয়াত ও রিসালাতকে অস্বীকার করত, তাদের জবাবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তার আওলাদের মধ্যে যারা নবুওয়াত লাভ করেছিলেন তাদের বরাত দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তো আরবের পৌত্তলিকগণও স্বীকার করত। তাদেরকে বলা হচ্ছে, তিনি যদি নবী হতে পারেন এবং তাঁর বংশধরদের মধ্যে যদি নবুওয়াতের ধারা চালু থাকতে পারে, তবে নবুওয়াত কোনও জিনিসই নয়' -এরূপ মন্তব্য করা কিভাবে বৈধ হতে পারে? এবং কি করেই বা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল বানিয়ে পাঠানোটা আপত্তির বিষয় হতে পারে, বিশেষত যখন তার নবুওয়াতের দলীল-প্রমাণ দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে?

৩২. এর দ্বারা সাহাবায়ে কিরামের দিকে ইশারা করা হয়েছে।

(হে নবী!) তুমিও তাদের পথে চলো। (বিরুদ্ধবাদীদের) বলে দাও, আমি এর (অর্থাৎ দাওয়াতের) জন্য তোমাদের কাছে কোনও পারিশ্রমিক চাই না। এটা তো বিশ্বজগতের জন্য এক উপদেশ মাত্র।

[১১]

৯১. তারা (কাফিরগণ) আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি,[৩৩] যখন তারা বলেছে আল্লাহ কোনও মানুষের প্রতি কিছু নাযিল করেননি। তাদেরকে বল, মূসা যে কিতাব নিয়ে এসেছিল তা কে নাযিল করেছিল, যা মানুষের জন্য আলো ও হিদায়াত ছিল এবং যা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠা আকারে রেখে দিয়েছিলে,[৩৪] যার মধ্য হতে কিছু তোমরা প্রকাশ কর এবং যার অনেকাংশ তোমরা গোপন কর এবং (যার মাধ্যমে) তোমাদেরকে এমন সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, যা তোমরা জানতে না এবং তোমাদের বাপ-দাদাগণও নয়। (হে নবী! তুমি নিজেই এ প্রশ্নের উত্তরে) বলে দাও, সে কিতাব নাযিল করেছিলেন আল্লাহ। তারপর তাদেরকে তাদের হালে ছেড়ে দাও, তারা তাদের বেহুদা কথাবার্তায় লিপ্ত থেকে আনন্দ-ফূর্তি করতে থাকুক।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَیْءٍ ؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِیْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّ هُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِیْسَ تُبْدُوْنَهَا وَ تُخْفُوْنَ كَثِیْرًا ۚ وَ عُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنْتُمْ وَ لَاۤ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِیْ خَوْضِهِمْ یَلْعَبُوْنَ ﴿۹۱﴾

৯২. এবং এটা বড় বরকতময় কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি, যা পূর্ববর্তী

وَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِیْ بَیْنَ یَدَیْهِ

---

৩৩. এর দ্বারা এক শ্রেণীর ইয়াহুদীকে রদ করা উদ্দেশ্য। একবার মালিক ইবনে সায়ফ নামক তাদের এক নেতা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে এ পর্যন্ত বলে ফেলেছিল যে, আল্লাহ কোনও মানুষের প্রতি কিছু নাযিল করেননি।

৩৪. অর্থাৎ সম্পূর্ণ কিতাবকে প্রকাশ না করে তোমরা তাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে রেখেছিলে। যে অংশ তোমাদের মন মত হত, তা তো সাধারণের সামনে প্রকাশ করতে, কিন্তু যে অংশ তোমাদের স্বার্থের বিপরীত হত, তা গোপন করতে।

وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ۗ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٩٢﴾

আসমানী হিদায়াতসমূহের সমর্থক, যাতে তুমি এর মাধ্যমে জনপদসমূহের কেন্দ্র (মক্কা) ও তার আশপাশের লোকদেরকে সতর্ক কর। যারা আখিরাতে বিশ্বাস রাখে তারা এর প্রতিও বিশ্বাস রাখে এবং তারা তাদের নামাযের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ ۗ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْۤا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ۗ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে, আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে, অথচ তার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়নি এবং যে বলে, আল্লাহ যে কালাম নাযিল করেছেন, আমিও অনুরূপ নাযিল করব? তুমি যদি সেই সময় দেখ (তবে বড় ভয়াল দৃশ্য দেখতে পাবে) যখন জালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় আক্রান্ত হবে এবং ফিরিশতাগণ তাদের হাত বাড়িয়ে (বলতে থাকবে), নিজেদের প্রাণ বের কর, আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনাকর শাস্তি দেওয়া হবে, যেহেতু তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করতে এবং যেহেতু তোমরা তার নিদর্শনাবলীর বিপরীতে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করতে।

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ۗ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٩٤﴾ ع

৯৪. (কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলবেন,) তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ। যেমন আমি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আর আমি তোমাদেরকে যা-কিছু দান করেছিলাম, তা পেছনে ফেলে এসেছ। আমি তোমাদের সেই সুপারিশকারীগণকে কোথাও দেখছি না, যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবী ছিল, তারা তোমাদের ব্যাপারসমূহ সমাধা

করার জন্য আমার সাথে শরীক। প্রকৃতপক্ষে তাদের সাথে তোমাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং যাদের (অর্থাৎ যে দেবতাদের) সম্পর্কে তোমাদের অনেক বড় ধারণা ছিল তারা সকলে তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে।

[১২]

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫. নিশ্চয় আল্লাহই শস্য বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী। তিনি প্রাণহীন বস্তু হতে প্রাণবান বস্তু নির্গত করেন এবং তিনিই প্রাণবান বস্তু হতে নিষ্প্রাণ বস্তুর নির্গতকারী।[৩৫] হে মানুষ! তিনিই আল্লাহ। সুতরাং তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করে কোন অজ্ঞাত দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?[৩৬]

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾

৯৬. তিনিই সেই সত্তা, যার হুকুমে ভোর হয়। তিনিই রাতকে বানিয়েছেন বিশ্রামের সময় এবং সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন এক হিসাবের অনুবর্তী। এ সমস্ত সেই সত্তার পরিকল্পনা, যার ক্ষমতাও পরিপূর্ণ, জ্ঞানও পরিপূর্ণ।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾

৯৭. তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন, যাতে তার মাধ্যমে তোমরা স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ জানতে

---

৩৫. প্রাণহীন থেকে প্রাণবান বস্তু বের করার দৃষ্টান্ত হল ডিম হতে ছানা বের করা আর প্রাণবান হতে নিষ্প্রাণ বস্তু বের করার উদাহরণ মুরগী হতে ডিম বের করা।

৩৬. এ তরজমার মধ্যে দু'টো বিষয় উল্লেখযোগ্য। (এক) বাহ্যত কুরআন মাজীদে 'হে মানুষ!' শব্দ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ذلكم -এর মধ্যম পুরুষ বহুবচন সর্বনামের অর্থ। আরবী নিয়ম অনুযায়ী বহুবচনের সর্বনাম مشار اليه (নির্দেশিত বস্তু)-এর বহুবচন হয় না; বরং مخاطب (মধ্যম পুরুষ) তথা যাকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়, তার বহুবচন হয়ে থাকে। (দুই) 'তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করে কোন অজ্ঞাত দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে' –এ তরজমায় تؤفكون ক্রিয়াপদটির مجهول (কর্মবাচ্যতা)-এর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এতে ইশারা করা হয়েছে যে, তাদের কুপ্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীই তাদেরকে বিভ্রান্ত করছে।

পার। আমি একেক করে সমস্ত নিদর্শন স্পষ্ট করে দিয়েছি সেই সকল লোকের জন্য, যারা জ্ঞানকে কাজে লাগায়।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ﴿۹۸﴾

৯৮. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সকলকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর প্রত্যেকের রয়েছে এক অবস্থানস্থল ও এক আমানত রাখার স্থান।[৩৭] আমি একেক করে সমস্ত নিদর্শন স্পষ্ট করে দিয়েছি, সেই সকল লোকের জন্য, যারা বুঝ-সমঝকে কাজে লাগায়।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ

৯৯. আর আল্লাহ তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর আমি তা দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদগত করেছি, তারপর তা থেকে সবুজ গাছপালা জন্মিয়েছি, যা থেকে আমি থরে থরে বিন্যস্ত শস্যদানা উৎপন্ন করি এবং খেজুর গাছের চুম্‌রি থেকে (ফল-ভারে) ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করি এবং আমি আঙ্গুর বাগান উদগত করেছি এবং যায়তুন ও আনারও। তার

---

৩৭. مستقر (অবস্থানস্থল) বলে সেই জায়গাকে, যাকে মানুষ যথারীতি ঠিকানা বানিয়ে নেয়। পক্ষান্তরে আমানত রাখার স্থানে সাময়িক অবস্থান হয়ে থাকে। তাই সেখানে বসবাসের যথারীতি ব্যবস্থা করা হয় না। এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে এ আয়াতের বিভিন্ন তাফসীর করা হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, مستقر দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য দুনিয়া, যেখানে মানুষ দস্তুরমত তার বসবাসের ঠিকানা বানিয়ে নেয়। আর আমানত রাখার স্থান দ্বারা বোঝানো হয়েছে কবর, যেখানে মানুষ মৃত্যুর পর সাময়িকভাবে অবস্থান করে। অত:পর তাকে সেখান থেকে জান্নাত বা জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, مستقر হলো মায়ের গর্ভ, যেখানে বাচ্চা কয়েক মাস অবস্থান করে। আর مستودع হল পিতার ঔরস, যেখানে শুক্রবিন্দু সাময়িকভাবে অবস্থান করে, তারপর মাতৃগর্ভে স্থানান্তরিত হয়। কতক মুফাসসির এর বিপরীতে مستقر অর্থ বলেছেন পিতার ঔরস ও مستودع অর্থ করেছেন মাতৃগর্ভ, যেহেতু বাচ্চা সেখানে সাময়িকভাবে থাকে (রুহুল মাআনী)।

مُتَشَابِهٍ ۭ اُنْظُرُوْۤا اِلٰى ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٩٩﴾

একটি অন্যটির সদৃশ ও বিসদৃশও।[৩৮] যখন সে বৃক্ষ ফল দেয়, তখন তার ফলের প্রতি ও তার পাকার অবস্থার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য কর। এসবের মধ্যে সেই সকল লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা ঈমান আনে।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۭ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০. লোকে জিন্নদেরকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছে,[৩৯] অথচ আল্লাহই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারা অজ্ঞতাবশত তাঁর জন্য পুত্র-কন্যা গড়ে নিয়েছে,[৪০] অথচ তারা আল্লাহর সম্পর্কে যা-কিছু বলে, তিনি তা থেকে পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে।

[১৩]

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ۭ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ

১০১. তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা। তার কোনও সন্তান হবে কি করে, যখন তার কোনও স্ত্রী নেই? তিনিই সকল বস্তু সৃষ্টি

৩৮. এর এক অর্থ তো এই যে, কতক ফল দেখতে একটা অন্যটার মত এবং কতক স্বাদ ও আকৃতিতে একটা অন্যটা হতে ভিন্ন। আরেক অর্থ এও হতে পারে যে, যে সব ফল দেখতে একটা অন্যটার মত, তার মধ্যেও আবার বৈশিষ্ট্যের প্রভেদ রয়েছে।

৩৯. জিন্ন দ্বারা শয়তান বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা সেই সকল লোকের আকীদার প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যারা বলত, সকল উপকারী জীব-জন্তু তো আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সাপ, বিচ্ছু ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রাণী বরং সমস্ত মন্দ জিনিস শয়তানের সৃষ্টি; সেই তাদের স্রষ্টা। তারা তো বাহ্যত এসব মন্দ জিনিসের সৃষ্টিকার্য হতে আল্লাহ তাআলাকে মুক্ত ঘোষণা করল, কিন্তু এতটুকু বুঝতে পারল না যে, যেই শয়তান সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর জিনিস তাকেও তো আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। মন্দ জিনিস যদি শয়তানের সৃষ্টি হয়, তবে খোদ যে শয়তান সর্বাপেক্ষা মন্দ তাকে কে সৃষ্টি করল? তাছাড়া আপাতদৃষ্টিতে যে সকল জিনিসকে আমরা মন্দ মনে করছি তার সৃজনের মধ্যে আল্লাহ তাআলার বহু হিকমত ও রহস্য নিহিত আছে। কাজেই তার সৃজনকে মন্দ বলা যেতে পারে না। মহাকবি ইকবাল বলেন,

نہیں ہے چیز نکمّی کوئی زمانے میں
کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

'কোনও বস্তুই কোনও কালে নিরর্থক নয়, স্রষ্টার কারখানায় কোনও জিনিসই মন্দ নয়।'

৪০. খ্রিস্টান সম্প্রদায় হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলে থাকে আর আরব মুশরিকগণ ফিরিশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলত।

عَلِيْمٌ ۝١٠١

করেছেন। তিনি সকল বস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ وَّكِیْلٌ ۝١٠٢

১০২. তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোনও মাবুদ নেই। তিনি যাবতীয় বস্তুর স্রষ্টা। সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর। তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ؗ وَهُوَ یُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِیْفُ الْخَبِیْرُ ۝١٠٣

১০৩. দৃষ্টিসমূহ তাঁকে ধরতে পারে না, কিন্তু দৃষ্টিসমূহ তার আয়ত্তাধীন। তাঁর সত্তা অতি সূক্ষ্ম এবং তিনি সর্ব বিষয়ে অবগত।[৪১]

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآىِٕرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِیَ فَعَلَیْهَا ؕ وَمَاۤ اَنَا عَلَیْكُمْ بِحَفِیْظٍ ۝١٠٤

১০৪. (হে নবী! তাদেরকে বল,) তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে পর্যবেক্ষণের উপকরণ এসে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি চোখ খুলে দেখবে সে নিজেরই কল্যাণ করবে আর যে ব্যক্তি অন্ধ হয়ে থাকবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আর আমার প্রতি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হয়নি।[৪২]

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰیٰتِ وَلِیَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَیِّنَهٗ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ۝١٠٥

১০৫. এভাবেই আমি নিদর্শনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বার বার স্পষ্ট করে থাকি (যাতে তুমি তা মানুষের কাছে পৌঁছাও) এবং

---

৪১. অর্থাৎ তাঁর সত্তা এতই সূক্ষ্ম যে, কোনও দৃষ্টি তাকে ধরতে পারে না এবং তিনি এত বেশি ওয়াকিফহাল যে, সকল দৃষ্টিই তাঁর আয়ত্তাধীন এবং সকলের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞাত। আল্লামা আলূসী (রহ.) একাধিক তাফসীরবিদের বরাতে এ বাক্যের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এবং পূর্বাপর লক্ষ্য করলে এ ব্যাখ্যা খুবই সঙ্গত মনে হয়। প্রকাশ থাকে যে, সাধারণ কথাবার্তায় সূক্ষ্মতা বলতে শারীরিক সূক্ষ্মতা বোঝায়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা শরীর থেকে মুক্ত। সুতরাং এ স্থলে সে সূক্ষ্মতা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে সর্বোচ্চ স্তরের সূক্ষ্মতা সেটাই যাতে শরীরত্বের আভাস মাত্র থাকে না। আল্লাহ তাআলার সত্তাকে সূক্ষ্ম বলা হয়েছে এ অর্থেই।

৪২. অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেককে জোরপূর্বক মুসলিম বানিয়ে কুফরের ক্ষতি হতে বাঁচানোর দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়নি। আমার কাজ কেবল বুঝিয়ে দেওয়া। মানা না মানা তোমাদের কাজ।

পরিশেষে তারা বলবে, তুমি কারও কাছে শিক্ষা লাভ করেছ।[৪৩] আর যারা জ্ঞানকে কাজে লাগায় তাদের জন্য আমি সত্যকে সুস্পষ্ট করে দেই।

اِتَّبِعْ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِیْنَ ۝۱۰۶

১০৬. (হে নবী!) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমার প্রতি যে ওহী পাঠানো হয়েছে, তুমি তারই অনুসরণ কর। তিনি ছাড়া কোনও মাবুদ নেই। যারা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে তাদের থেকে বেপরোয়া হয়ে যাও।

وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَاۤ اَشْرَكُوْا ؕ وَ مَا جَعَلْنٰكَ عَلَیْهِمْ حَفِیْظًا ۚ وَ مَاۤ اَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیْلٍ ۝۱۰۷

১০৭. আল্লাহ চাইলে তারা শিরক করত না।[৪৪] আমি তোমাকে তাদের রক্ষক নিযুক্ত করিনি এবং তুমি তাদের কাজ-কর্মের যিম্মাদারও নও।[৪৫]

---

৪৩. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ কালাম রচনা করেছেন- এরূপ কথা হঠকারী স্বভাবের কাফিররা পর্যন্ত বলতে লজ্জাবোধ করত। কেননা তারা তাঁর রীতি-নীতি সম্পর্কে ভালোভাবে জানত এবং এটাও জানত যে, তিনি উম্মী ছিলেন, তাঁর পক্ষে নিজে কোনও বই-পুস্তক পড়ে এরূপ কালাম রচনা করা সম্ভব নয়। তাই তারা বলত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা কারও থেকে শিক্ষা করেছেন এবং একে আল্লাহর কালাম নামে অভিহিত করে মানুষের সামনে পেশ করছেন। কিন্তু কার কাছে শিক্ষা করেছেন, তা তারা বলতে পারত না। কখনও তারা এক 'কর্মকার'-এর নাম বলত। সূরা নাহলে তা রদ করা হয়েছে।

৪৪. পূর্বে ৩৪ নং আয়াতেও একথা বলা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে জোরপূর্বক একই দ্বীনের অনুসারী বানিয়ে দিতেন, কিন্তু দুনিয়ায় যেহেতু মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য তাদেরকে পরীক্ষা করা, তাই এরূপ জবরদস্তি করা হয় না। কেননা পরীক্ষার দাবী হল মানুষকে দিয়ে জোরপূর্বক কিছু না করানো। বরং সে স্বেচ্ছায় নিজ বোধ-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে নিখিল বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনাবলীর মধ্যে চিন্তা করবে এবং তার ফলশ্রুতিতে খুশী মনে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনবে। নবীগণকে পাঠানো হয় সে সব নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এবং আসমানী কিতাব নাযিল করা হয় সে পরীক্ষাকে সহজ করার লক্ষ্যে। কিন্তু এর দ্বারা উপকৃত হয় কেবল তারাই যাদের অন্তরে সত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা আছে।

৪৫. কাফেরদের আচার-আচরণে যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে কষ্ট পেতেন, তাই তাকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন তারা কি করবে না করবে তার যিম্মাদারী আপনার প্রতি ন্যস্ত করা হয়নি।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۪ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. (হে মুসলিমগণ!) তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে (ভ্রান্ত মাবুদদেরকে) ডাকে, তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো না। কেননা পরিণামে তারা অজ্ঞাতবশত সীমালংঘন করে আল্লাহকেও গালমন্দ করবে।[৪৬] (এ দুনিয়ায় তো) আমি এভাবেই প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে সুশোভন করে দিয়েছি।[৪৭] অত:পর তাদেরকে নিজ প্রতিপালকের কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে তারা যা-কিছু করত সে সম্বন্ধে অবহিত করবেন।

---

৪৬. কাফের ও মুশরিকগণ যেই দেবতাদেরকে খোদা বলে বিশ্বাস করে, যদিও তাদের কোনও বাস্তবতা নেই, তথাপি এ আয়াতে মুসলিমদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তারা যেন কাফেরদের সামনে তাদের সম্পর্কে অশোভন শব্দ ব্যবহার না করে। এর কারণ বলা হয়েছে এই যে, কাফেরগণ প্রতিউত্তরে আল্লাহ তাআলার সাথে বেয়াদবী করতে পারে। আর তারা যদি তা করে, তবে তোমরাই তার 'কারণ' হবে। আল্লাহ তাআলার শানে নিজে যেমন বেয়াদবী করা হারাম, তেমনি বেয়াদবীর 'কারণ' হওয়াও হারাম। ফুকাহায়ে কিরাম এ আয়াত থেকে মূলনীতি বের করেছেন যে, এমনিতে কোনও কাজ যদি জায়েয বা মুস্তাহাব হয়, কিন্তু তার ফলে অন্য কারও গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে সে ক্ষেত্রে সেই জায়েয বা মুস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেওয়া উচিত। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে কোনও ফরয বা ওয়াজিব কাজ ত্যাগ করা জায়েয হবে না। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে হলে 'মাআরিফুল কুরআন' গ্রন্থের এই আয়াত সম্পর্কিত তাফসীর দেখা যেতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, আরববাসী যদিও আল্লাহ তাআলাকে মানত এবং মৌলিকভাবে তারাও আল্লাহ তাআলার সাথে বেয়াদবী করাকে জায়েয মনে করত না, কিন্তু জেদের বশবর্তীতে তাদের দ্বারা এরূপ কোনও কাজ হয়ে যাওয়া কিছু অসম্ভব ছিল না। সুতরাং কোনও কোনও রিওয়ায়াতে আছে, তাদের কিছু লোক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুমকি দিয়েছিল, আপনি যদি আমাদের দেব-দেবীদের মন্দ বলেন, তবে আমরাও আপনার রব্বকে মন্দ বলব।

৪৭. মূলত এটা একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি এই যে, কাফেরগণ আল্লাহ তাআলার শানে বেয়াদবী করলে দুনিয়াতেই তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয় না কেন? উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, তাদের জেদ ও হঠকারিতার কারণে আমি তাদেরকে তাদের আপন হালে ছেড়ে দিয়েছি। ফলে তারা মনে করছে তাদের কাজ-কর্ম বড় ভালো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সকলকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। সে দিন তারা টের পাবে তারা যা-কিছু করত প্রকৃতপক্ষে তা কেমন ছিল।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ اَنَّهَآ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. তারা অতি জোরালো কসম খেয়ে বলে, তাদের কাছে যদি সত্যই কোন নিদর্শন (অর্থাৎ তাদের কাঙ্ক্ষিত মুজিযা) আসে তবে তারা অবশ্যই ঈমান আনবে। (তাদেরকে) বলে দাও, সমস্ত নিদর্শন আল্লাহর হাতে[৪৮] এবং (হে মুসলিমগণ!) তোমরা কিভাবে জানবে, প্রকৃতপক্ষে তা (মুজিযা) আসলেও তারা ঈমান আনবে না।

وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖٓ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١١٠﴾

১১০. তারা যেমন প্রথমবার এর (অর্থাৎ কুরআনের মত মুজিযার) প্রতি ঈমান আনেনি, তেমনি আমিও (তার প্রতিফল স্বরূপ) তাদের অন্তর ও দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে দেব এবং তাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে রাখব যে, তারা তাদের অবাধ্যতার মধ্যে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকবে।

[অষ্টম পারা] [১৪]

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ﴿١١١﴾

১১১. আমি যদি তাদের কাছে ফিরিশতা পাঠিয়েও দিতাম এবং মৃত ব্যক্তিরা তাদের সাথে কথাও বলত এবং (তাদের ফরমায়েশী) সকল জিনিস তাদের চোখের সামনে হাজির করেও দিতাম,[৪৯] তবুও তারা ঈমান আনবার ছিল না। অবশ্য আল্লাহ যদি চাইতেন (যে, তাদেরকে জোরপূর্বক ঈমান আনতে বাধ্য করবেন, তবে সেটা ছিল ভিন্ন কথা, কিন্তু এরূপ ঈমান কাম্য ও ধর্তব্য

---

৪৮. এর ব্যাখ্যার জন্য এ সূরারই ৩৪ নং আয়াতের টীকা দেখুন।

৪৯. কাফেরগণ এ সকল জিনিসের ফরমায়েশ করত। সূরা ফুরকানে (আয়াত ২১) তাদের দাবী বর্ণিত হয়েছে যে, তারা বলত, আমাদের কাছে ফিরিশতা পাঠানো হল না কেন? সূরা দুখানে বলা হয়েছে (আয়াত ৩৬), তারা দাবী করত, আমাদের বাপ-দাদাদেরকে জীবিত করে আমাদের সামনে উপস্থিত কর।

নয়)। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক অজ্ঞতাসুলভ কথা বলে।[৫০]

১১২. এবং (তারা যেমন আমার নবীর সাথে শত্রুতা করছে) এভাবেই আমি (পূর্ববর্তী) প্রত্যেক নবীর জন্য কোনও না কোনও শত্রুর জন্ম দিয়েছি অর্থাৎ মানব ও জিন্নদের মধ্য হতে শয়তান কিসিমের লোকদেরকে, যারা ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একে অন্যকে বড় চমৎকার কথা শেখাত। আল্লাহ চাইলে তারা এরূপ করতে পারত না।[৫১] সুতরাং তাদেরকে তাদের মিথ্যা রচনার কাজে পড়ে থাকতে দাও।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿۱۱۲﴾

১১৩. এবং (নবীদের শত্রুরা চমৎকার-চমৎকার কথা বলে এজন্য) যাতে আখিরাতে যারা ঈমান রাখে না তাদের অন্তর সে দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তারা তাতে মগ্ন থাকে আর তারা যে সব অপকর্ম করার তা করতে থাকে।

وَلِتَصْغٰۤى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

১১৪. (হে নবী! তাদেরকে বল,) আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সালিস বানাব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন, যার ভেতর যাবতীয় (বিতর্ক) বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে? পূর্বে যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা নিশ্চিতভাবে জানত, এটা তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে সত্য নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ؕ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿۱۱۴﴾

৫০. অর্থাৎ সত্যি কথা হচ্ছে সব রকমের মুজিযা দেখলেও এসব লোক ঈমান আনবে না। তথাপি যে এসব দাবী করছে, এটা কেবল তাদের মূর্খতারই বহিঃপ্রকাশ।

৫১. এ স্থলে পুনরায় সেই কথাই বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা চাইলে শয়তানদেরকে এ ক্ষমতা নাও দিতে পারতেন এবং মানুষকে জোরপূর্বক ঈমান আনতে বাধ্য করতেন, কিন্তু উদ্দেশ্য যেহেতু পরীক্ষা করা, তাই তিনি এরূপ করছেন না।

সুতরাং কিছুতেই তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

১১৫. তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে পরিপূর্ণ। তাঁর কথার কোনও পরিবর্তনকারী নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۱۵﴾

১১৬. তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ বাসিন্দার পেছনে চল, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো ধারণা ও অনুমান ছাড়া অন্য কিছুর অনুগমন করে না। তাদের কাজই হল কেবল অনুমান ভিত্তিক কথা বলা।

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿۱۱۶﴾

১১৭. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালো করে জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং তিনিই ভালো করে জানেন, কারা সৎপথে আছে।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿۱۱۷﴾

১১৮. সুতরাং এমন সব (হালাল) পশু থেকে খাও, যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে– যদি তোমরা সত্যিই তার নিদর্শনাবলীতে ঈমান রাখ।[৫২]

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۸﴾

---

৫২. যারা কেবল অনুমান ভিত্তিক ধর্মের অনুসরণ করে, এতক্ষণ তাদের সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। তারা তাদের সে সব পথভ্রষ্টতার কারণেই আল্লাহ তাআলার হালাল কৃত বস্তুকে হারাম বলত এবং আল্লাহ তাআলা যে জিনিসকে হারাম করেছেন তাকে হালাল মনে করত। এমনকি একবার কতিপয় কাফের মুসলিমদের প্রতি প্রশ্ন তুলেছিল যে, যে পশুকে আল্লাহ তাআলা হত্যা করেন, অর্থাৎ যা স্বাভাবিকভাবে মারা যায়, তোমরা তাকে মৃত ও হারাম সাব্যস্ত করে থাক আর যে পশুকে তোমরা নিজেরা হত্যা কর তাকে হালাল মনে কর। তারই উত্তরে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, হালাল ও হারাম করার এখতিয়ার সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, যে পশু আল্লাহর নামে যবাহ করা হয় তা খাওয়া হালাল আর যে পশু যবাহ ছাড়াই মারা যায় কিংবা যা যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয় না তা হারাম। যারা আল্লাহর আয়াতে বিশ্বাস রাখে আল্লাহর এ ফায়সালার পর তাদের পক্ষে নিজেদের মনগড়া ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে কোন কিছুকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করা সাজে না।

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿۱۱۹﴾

১১৯. তোমাদের জন্য এমন কী বাধা আছে, যদ্দরুন তোমরা যে সকল পশুতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে তা থেকে খাও না? অথচ তিনি তোমাদের জন্য (সাধারণ অবস্থায়) যা-কিছু হারাম করেছেন তা তিনি তোমাদেরকে বিশদভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তবে তোমরা যা খেতে বাধ্য হয়ে যাও (তার কথা ভিন্ন। হারাম হওয়া সত্ত্বেও তখন তা খাওয়ার অনুমতি থাকে)। বহু লোক কোনও রকমের জ্ঞান ছাড়া (কেবল) নিজেদের খেয়াল-খুশীর ভিত্তিতে অন্যদেরকে বিপথগামী করে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ﴿۱۲۰﴾

১২০. তোমরা প্রকাশ্য ও গুপ্ত উভয় প্রকার পাপ ছেড়ে দাও।[৫৩] নিশ্চয়ই যারা পাপ কামাই করে তাদেরকে শীঘ্রই সেই

চিন্তা করার বিষয় হচ্ছে যে, কাফেরদের উপরে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তরে এই যুক্তিও পেশ করা যেত যে, যে পশুকে যথারীতি যবাহ করা হয়, তার রক্ত ভালোভাবে বের হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে পশু এমনিতেই মারা যায়, তার রক্ত তার শরীরেই থেকে যায়, ফলে তার গোশত নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এর তাৎপর্য বর্ণনা করেননি; বরং কেবল এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন যে, যা-কিছু হারাম তা আল্লাহ নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন। কাজেই তাঁর বিধানাবলীর বিপরীতে নিজের কাল্পনিক ঘোড়া হাঁকানো কোনও মুমিনের কাজ হতে পারে না। এভাবে আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, যদিও আল্লাহ তাআলার প্রতিটি হুকুমের মধ্যে কোনও না কোনও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, কিন্তু নিজ আনুগত্যকে সেই তাৎপর্য বোঝার উপর মওকুফ রাখা মুসলিম ব্যক্তির কাজ নয়। তার কর্তব্য আল্লাহ তাআলার কোনও আদেশ এসে গেলে বিনা বাক্যে তা পালন করে যাওয়া, তাতে সে আদেশের তাৎপর্য বুঝে আসুক বা নাই আসুক।

৫৩. প্রকাশ্য গুনাহ হল সেইগুলো যা মানুষ তার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা করে, যেমন মিথ্যা বলা, গীবত করা, ধোঁকা দেওয়া, ঘুষ খাওয়া, মদ পান করা, ব্যভিচার করা ইত্যাদি। আর গোপন গুনাহ হল সেইগুলো যা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত, যেমন হিংসা, বিদ্বেষ, রিয়া, অহংকার, অন্যের অনিষ্ট কামনা ইত্যাদি। প্রথম প্রকার গুনাহের আলোচনা হয় ফিকহের কিতাবে এবং ফুকাহায়ে কিরাম থেকে তার শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করতে হয়। আর দ্বিতীয় প্রকার গুনাহ সম্পর্কে আলোচনা হয় তাসাওউফ ও ইহসানের কিতাবে এবং তার

সমস্ত অপরাধের শাস্তি দেওয়া হবে, যাতে তারা লিপ্ত হয়।

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ؕ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓـِٕهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ﴿۱۲۱﴾

১২১. যে পশুতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তা থেকে খেও না। এরূপ করা কঠিন গুনাহ। (হে মুসলিমগণ!) শয়তান তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিতর্ক করার জন্য প্ররোচণা দিতে থাকে। তোমরা যদি তাদের কথা মত চল তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে।

[১৫]

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۲﴾

১২২. একটু বল তো, যে ব্যক্তি ছিল মৃত, অতঃপর আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তার জন্য এক আলোর ব্যবস্থা করেছি, যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে,[৫৪] সে কি ওই ব্যক্তির মত হতে পারে, যার অবস্থা এই যে, সে অন্ধকার দ্বারা পরিবেষ্টিত, যা থেকে সে কখনও বের হতে পারবে না? এভাবেই কাফেরদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যা-কিছু করছে তা বড়ই চমৎকার কাজ।

শিক্ষা-দীক্ষার জন্য মাশায়েখে কিরামের শরণাপন্ন হতে হয়। নিজের অন্তর্জগতকে গুপ্ত গুনাহ হতে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে কোন দিশারীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনই হল তাসাওউফের মূল কথা। কিন্তু আফসোস! বহু লোক তাসাওউফের এই হাকীকত ভুলে গিয়ে একরাশ বিদআত ও বেহুদা কাজের নাম রেখে দিয়েছে তাসাওউফ। হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) তার বিভিন্ন রচনায় এ বিষয়টা পরিষ্কার করেছেন। তাসাওউফ কী ও কেন তা সহজে বোঝার জন্য হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) রচিত 'দিল কী দুনয়া' পুস্তিকাখানি পড়ুন। [এর বঙ্গানুবাদ "আত্মশুদ্ধি" নামে মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।]

৫৪. এখানে আলো দ্বারা ইসলামের আলো বোঝানো হয়েছে। 'মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে' বলে ইশারা করা হয়েছে যে, 'মানুষ দুনিয়ার কাজ-কর্ম ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে এবং লোকের সঙ্গে মেলামেশা বাদ দিয়ে এক কোণায় ইবাদত-বন্দেগীতে বসে থাকবে' –এটা ইসলামের শিক্ষা নয়। ইসলামের দাবী তো এই যে, সে মানব সাধারণের একজন হয়েই থাকবে, তাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম করবে এবং তাদের হক আদায় করবে; কিন্তু সে যেখানেই যাবে ইসলামের আলো সঙ্গে নিয়ে যাবে অর্থাৎ এ সবকিছুই করবে ইসলামী বিধান অনুযায়ী।

১২৩. এভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের প্রধানদেরকে (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) চক্রান্ত করার অবকাশ দিয়েছি।[৫৫] তারা যে চক্রান্ত করে (প্রকৃতপক্ষে) তা অন্য কারও নয়; বরং তাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে যায়, কিন্তু তাদের তা উপলব্ধি হয় না।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ؕ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۱۲۳﴾

১২৪. যখন তাদের (অর্থাৎ মক্কাবাসীদের) কাছে (কুরআনের) কোন আয়াত আসে, তখন বলে, আল্লাহর রাসূলগণকে যা দেওয়া হয়েছিল, সে রকম জিনিস আমাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত না দেওয়া হবে,[৫৬] ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিছুতেই ঈমান আনব না। অথচ আল্লাহই ভালো জানেন। তিনি তাঁর রিসালাত কার উপর ন্যস্ত করবেন। যারা এ জাতীয় অন্যায় উক্তি করেছে, তাদেরকে তাদের ষড়যন্ত্রের প্রতিফল হিসেবে আল্লাহর কাছে গিয়ে লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَاۤ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ؔؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ﴿۱۲۴﴾

১২৫. আল্লাহ যাকে হিদায়াত দানের ইচ্ছা করেন, তার বক্ষ ইসলামের জন্য খুলে দেন আর যাকে (তার হঠকারিতার কারণে) পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষ অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ

৫৫. এর দ্বারা মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কাফেরগণ তাদের বিরুদ্ধে যে সব চক্রান্ত করে তারা যেন তাতে উদ্বিগ্ন না হয়। এ জাতীয় চক্রান্ত সব যুগেই নবীগণ ও তাদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে হয়ে আসছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুমিনগণই কৃতকার্য হয়েছে আর তাদের শত্রুগণ যে চক্রান্ত করেছে তা দ্বারা তারা নিজেরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কখনও তো এ দুনিয়াতেই তাদের সে ক্ষতি প্রকাশ পেয়েছে আবার কখনও তা দুনিয়ায় গুপ্ত রাখা হয়েছে, কিন্তু তারা আখিরাতে টের পাবে যে, আসলে তারা কাঁটা পুতেছিল নিজেদেরই বিরুদ্ধে।

৫৬. অর্থাৎ নবীগণের প্রতি যেমন ওহী নাযিল করা হয়েছিল যতক্ষণ পর্যন্ত তেমনি ওহী আমাদের উপর নাযিল না করা হবে এবং তাদেরকে যেমন মুজিযা দেওয়া হয়েছিল সে রকম মুজিযা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে না দেওয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঈমান আনব না। সারকথা এই যে, তাদের দাবী ছিল, তাদের প্রত্যেককে পরিপূর্ণ নবুওয়াত দান করতে হবে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এর উত্তর দিয়েছেন যে, নবুওয়াত কাকে দান করা হবে তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ۭ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٥﴾

(ফলে ঈমান আনয়ন তার পক্ষে এমন কঠিন হয়ে যায়), যেন তাকে জবরদস্তিমূলকভাবে আকাশে চড়তে হচ্ছে। যারা ঈমান আনে না আল্লাহ এভাবেই তাদের উপর (কুফরের) কালিমা লেপন করেন।

وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ۭ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৬. এবং এটা (অর্থাৎ ইসলাম) তোমার প্রতিপালকের (দেওয়া) সরল পথ। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, আমি তাদের জন্য (এ পথের) নিদর্শনাবলী স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছি।

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. তাদের জন্যই তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে সুখ-শান্তির নিবাস। আর তারা যা-কিছু করে তার দরুণ তিনিই তাদের রক্ষাকর্তা।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا

১২৮. (সেই দিনের কথা মনে রেখ) যে দিন আল্লাহ তাদের সকলকে একত্র করবেন (এবং শয়তান জিন্নদেরকে বলবেন) হে জিন্ন সম্প্রদায়! তোমরা বিপুল সংখ্যক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছ। মানুষের মধ্যে যারা তাদের বন্ধু, তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একে অন্যের দ্বারা আনন্দ উপভোগ করেছি[৫৭] এবং এখন আমরা আমাদের সেই সময়ে উপনীত হয়েছি, যা আপনি

---

৫৭. মানুষ তো শয়তানের দ্বারা এভাবে আনন্দ উপভোগ করেছে যে, তাদের প্ররোচনায় পড়ে নিজ খেয়াল-খুশী মত চলেছে ও কুপ্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করেছে। এভাবে মানুষ এমন সব গুনাহে লিপ্ত থেকেছে, যা দ্বারা বাহ্যিকভাবে আনন্দ-ফূর্তি লাভ হয়। অপর দিকে শয়তানেরা মানুষের দ্বারা আনন্দ উপভোগ করেছে এভাবে যে, তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পেরে তাদের মন ভরেছে এবং বিভ্রান্ত মানুষ তাদের মর্জিমত কাজ করায় তারা হর্ষবোধ করেছে। বস্তুত তারা একথা বলে নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করবে এবং খুব সম্ভব এর পর ক্ষমাও প্রার্থনা করত, কিন্তু এর বেশি কিছু বলার হয়ত সাহসই হবে না অথবা ক্ষমার সময় গত হয়ে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের কথা শেষ করতে দেবেন না; বরং তার আগেই বলবেন, এখন ক্ষমা ও প্রতিকারের সময় নয়। এখন তোমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তিই ভোগ করতে হবে।

الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ؕ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۲۸﴾

আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। আল্লাহ বলবেন, (এখন) আগুনই তোমাদের ঠিকানা, যাতে তোমরা সর্বদা থাকবে– যদি না আল্লাহ অন্য রকম ইচ্ছা করেন।[৫৮] নিশ্চিত জেনে রেখ, তোমাদের প্রতিপালকের হিকমতও পরিপূর্ণ, জ্ঞানও পরিপূর্ণ।

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۱۲۹﴾

১২৯. এভাবেই আমি জালেমদের কতককে কতকের উপর তাদের কৃতকর্মের কারণে আধিপত্য দান করে থাকি।[৫৯]

[১৬]

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ

১৩০. হে জিন্ন ও মানব জাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে এমন রাসূল আসেনি, যারা তোমাদেরকে

---

৫৮. এ কথার যথাযথ মতলব তো আল্লাহ তাআলাই জানেন। বাহ্যত বোঝা যায় এই ব্যত্যয়মূলক বাক্য দ্বারা দু'টি বিষয়ের প্রতি ইশারা করা উদ্দেশ্য।

(এক) কাফেরদের শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়ার যে ফায়সালা আল্লাহ তাআলা নেবেন, কোনও সুপারিশ বা কারও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে তার কোনও পরিবর্তন সম্ভব হবে না। কেননা এ বিষয়ের যাবতীয় সিদ্ধান্ত আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অনুযায়ী স্থিরীকৃত হবে আর তাঁর সে ইচ্ছা হবে তাঁর হিকমত ও জ্ঞান অনুসারে, যা পরের বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে।

(দুই) কাফেরদেরকে স্থায়ীভাবে জাহান্নামে রাখতে আল্লাহ তাআলা বাধ্য নন। সুতরাং ধরে নেওয়া যাক, তাঁর ইচ্ছা হল কোনও কাফেরকে তা থেকে বের করে আনবেন, সেমতে তিনি যদি তা করেন, তবে যৌক্তিকভাবে সেটা অসম্ভব কিছু নয়। কেননা এই ইচ্ছার বিপরীতে তাকে বাধ্য করার সাধ্য কারও নেই। এটা ভিন্ন কথা যে, নিজ জ্ঞান ও হিকমত অনুযায়ী কাফেরকে স্থায়ীভাবে জাহান্নামে রাখাই তাঁর ইচ্ছা।

৫৯. অর্থাৎ কাফেরদের উপর তাদের জেদ ও হঠকারিতার কারণে যেমন শয়তানদেরকে আধিপত্য দেওয়া হয়েছে, যারা তাদেরকে বিপথে চালাতে তৎপর থাকে, তেমনিভাবে জালেমদের দুষ্কর্মের কারণে আমি তাদের উপর অন্য জালেমদেরকে আধিপত্য দিয়ে থাকি। সুতরাং এক হাদীসে আছে, যখন কোনও দেশের মানুষ ব্যাপকভাবে মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন তাদের উপর জালেম শাসক চাপিয়ে দেওয়া হয়। অপর এক হাদীসে আছে, কোনও ব্যক্তি কোনও জালেমকে তার জুলুমের কাজে সাহায্য করলে আল্লাহ তাআলা ওই জালেমকেই সেই সাহায্যকারীর উপর চাপিয়ে দেন। (ইবনে কাসীর)

এ আয়াতের আরও এক তরজমা করা সম্ভব। তা এই যে, 'এভাবেই আমি জালেমদের কতককে কতকের সঙ্গী বানিয়ে দেব'। এ হিসেবে আয়াতের মতলব হবে এই যে, শয়তানগণও জালেম এবং তাদের অনুসারীগণও। সুতরাং আখিরাতেও আমি তাদের একজনকে অন্যজনের সাথী বানিয়ে দেব। বহু মুফাসসির আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰۤى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿۱۳۰﴾

আমার আয়াত পড়ে শোনাত[৬০] এবং তোমাদেরকে এ দিনের সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করত, যে দিনে আজ তোমরা উপনীত হয়েছ? তারা বলবে, (আজ) আমরা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম (যে, সত্যিই আমাদের কাছে নবী-রাসূল এসেছিলেন, কিন্তু আমরা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম)।[৬১] (প্রকৃতপক্ষে) পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকায় নিক্ষেপ করেছিল। আর আজ তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল যে, তারা কাফের ছিল।

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ﴿۱۳۱﴾

১৩১. এটা (নবী প্রেরণের ধারা) ছিল এজন্য যে, কোনও জনপদকে সীমালংঘনের কারণে এ অবস্থায় ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের পসন্দ ছিল না যে, তার অধিবাসীগণ অনবহিত থাকবে।[৬২]

---

৬০. মানুষের মধ্যে নবী-রাসূলের আগমনের বিষয়টা তো সুস্পষ্ট। এ আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে কতক আলেম বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগে জিন্ন জাতির মধ্যেও নবী-রাসূলের আগমন হত। অন্যদের মতে জিন্নদের মধ্যে স্বতন্ত্র কোনও নবীর আগমন হয়নি; বরং মানুষের মধ্যে যে সকল নবী পাঠানো হত, তারা জিন্নদেরকেও দ্বীনের পথে ডাকতেন। তাদের ডাকে যে সকল জিন্ন ইসলাম গ্রহণ করত, তারা নবীদের প্রতিনিধি স্বরূপ অন্যান্য জিন্নদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাত। সূরা জিন্নে এটা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে উভয় মতের অবকাশ আছে। কেননা আয়াতে বোঝানো উদ্দেশ্য যে, জিন্ন ও মানব উভয় জাতির মধ্যে যথাযথভাবে প্রচারকার্য চালানো হয়েছিল আর এটা উভয়ভাবেই সম্ভব।

৬১. পূর্বে ২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, প্রথম দিকে তারা মিথ্যা বলার চেষ্টা করবে, কিন্তু যখন তাদের নিজেদের হাত-পা'ই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তখন তারাও সত্য বলতে বাধ্য হয়ে যাবে। বিস্তারিত জানার জন্য ২৩ নং আয়াতের টীকা দেখুন।

৬২. এর দুই অর্থ হতে পারে– (এক) জনপদবাসীদেরকে কোনও সীমালংঘনের কারণে ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস করা আল্লাহ তাআলার পসন্দ ছিল না, যতক্ষণ না নবীগণের মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করা হয়। (দুই) আল্লাহ তাআলা মানুষকে সতর্ক না করেই ধ্বংস করার মত বাড়াবাড়ি করতে পারেন না।

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۲﴾

১৩২. সব ধরনের লোকের জন্য তাদের কৃতকর্ম অনুসারে বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তারা যা-কিছুই করে সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক উদাসীন নন।

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ﴿۱۳۳﴾

১৩৩. তোমার প্রতিপালক এমন বেনিয়ায, যিনি দয়াশীলও বটে।[৬৩] তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে (পৃথিবী থেকে) অপসারণ করতে এবং তোমাদের পরে তোমাদের স্থানে অন্য কোনও সম্প্রদায়কে আনয়ন করতে পারেন– যেমন তোমাদেরকে তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হতে সৃষ্টি করেছেন।[৬৪]

اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۱۳۴﴾

১৩৪. নিশ্চিত বিশ্বাস রেখ, তোমাদেরকে যে জিনিসের ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে তার আগমন অবধারিত[৬৫] এবং তোমরা (আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে না।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۱۳۵﴾

১৩৫. (হে নবী! ওই সকল লোককে) বল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আপন স্থানে (নিজেদের নিয়ম অনুসারে) কাজ করতে থাক, আমিও (নিজ নিয়ম অনুসারে) কাজ করছি। শীঘ্রই জানতে পারবে, এ দুনিয়ার পরিণাম কার

---

৬৩. অর্থাৎ তিনি যে নবী-রাসূল প্রেরণের ধারা চালু করেছিলেন, সেটা এ কারণে নয় যে, তিনি তোমাদের ইবাদতের মুখাপেক্ষী। তিনি তো মাখলুকের ইবাদত-বন্দেগী থেকে বেনিয়ায। আসলে তিনি যেহেতু বেনিয়ায হওয়ার সাথে সাথে দয়াময়ও, তাই তিনি মানুষকে সঠিক কর্মপন্থার দিশা দেওয়ার জন্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, যার অনুসরণ দ্বারা তারা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করতে পারে।

৬৪. আজকের সমস্ত মানুষ যেমন অতীতের সেই সকল লোকের বংশধর, যাদের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। তেমনি আল্লাহ তাআলার এ ক্ষমতাও আছে যে, তিনি আজকের সমস্ত লোককে একই সঙ্গে ধ্বংস করে দিয়ে অপর এক জাতির অস্তিত্ব দান করবেন, কিন্তু নিজ রহমতের কারণে এরূপ করছেন না।

৬৫. এর দ্বারা আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম বোঝানো হয়েছে।

অনুকূলে যায়। (আপন স্থানে) এটা নিশ্চিত সত্য যে, জালেমগণ কৃতকার্য হয় না।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿۱۳۶﴾

১৩৬. আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা তার মধ্যে আল্লাহর জন্য একটি অংশ নির্দিষ্ট করেছে।[৬৬] সুতরাং তারা নিজ ধারণা অনুযায়ী বলে এ অংশ আল্লাহর এবং এটা আমাদের সেই মাবুদদের যাদেরকে আমরা আল্লাহর শরীক মনে করি। অতঃপর যে অংশ তাদের শরীকদের জন্য থাকে, তা (কখনও) আল্লাহর কাছে পৌঁছে না আর যে অংশ আল্লাহর হয়ে থাকে, তা তাদের মনগড়া শরীকদের কাছে পৌঁছে, তারা যা স্থির করে নিয়েছে তা এমনই নিকৃষ্ট!

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ

১৩৭. এমনিভাবে তাদের শরীকগণ বহু মুশরিককে বুঝিয়ে রেখেছিল যে, নিজ সন্তানকে হত্যা করা বড় ভালো কাজ,

---

৬৬. এখান থেকে ১৪৪ নং আয়াত পর্যন্ত আরব মুশরিকদের কতগুলো ভিত্তিহীন রসম-রেওয়াজ বর্ণনা করা হচ্ছে। তারা যৌক্তিক ও জ্ঞানগত কোনও ভিত্তি ছাড়াই বিভিন্ন কাজকে নানা রকম মনগড়া কারণে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করেছিল, যেমন নিষ্ঠুরভাবে সন্তান হত্যা। তাদের কারও কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তাকে নিজের জন্য লজ্জার বিষয় মনে করত। তাই তাকে মাটির নিচে জ্যান্ত পুঁতে রাখত। অনেকে কন্যা সন্তান জীবিত কবর দিত এ কারণে যে, তাদের বিশ্বাস ছিল ফিরিশতাগণ আল্লাহর কন্যা। তাই মানুষের জন্য কন্যা সন্তান রাখা সমীচীন নয়। অনেক সময় পুত্র সন্তানকেও খাদ্যাভাবের ভয়ে হত্যা করত। অনেকে মান্নত করত আমার দশম সন্তান পুত্র হলে তাকে দেবতা বা আল্লাহর নামে বলি দেব। এছাড়া তারা তাদের শস্য ও গবাদি পশুর ক্ষেত্রেও আজব-আজব বিশ্বাস তৈরি করে নিয়েছিল। তার একটি এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তারা তাদের ক্ষেতের ফসল ও গবাদি পশুর দুধ বা গোশতের একটা অংশ আল্লাহর জন্য ধার্য করত (বা মেহমান ও গরীবদের পেছনে খরচ করা হত) এবং একটা অংশ দেব-দেবীর নামে ধার্য করত, যা দেব-মন্দিরে নিবেদন করা হত এবং তা মন্দির কর্তৃপক্ষ ভোগ করত। প্রথমত আল্লাহর সঙ্গে দেব-দেবীদেরকে শরীক করে তাদের জন্য ফসলাদির অংশ নির্ধারণ করাটাই একটা বেহুদা কাজ ছিল। তার উপর অতিরিক্ত নষ্টামি ছিল এই যে, আল্লাহর নামে যে অংশ রাখত, তা থেকে কিছু দেবতাদের অংশে চলে গেলে সেটাকে দূষণীয় মনে করত না। পক্ষান্তরে দেবতাদের অংশ থেকে কোনও জিনিস আল্লাহর নামের অংশে চলে গেলে সঙ্গে-সঙ্গে তা ওয়াপস নিয়ে আসত।

শُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾

যাতে তারা তাদেরকে (অর্থাৎ মুশরিকদেরকে) সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারে এবং তাদের কাছে তাদের দ্বীনকে বিভ্রান্তিপূর্ণ করে দিতে পারে। আল্লাহ চাইলে তারা এরূপ করতে পারত না।[৬৭] সুতরাং তাদেরকে তাদের মিথ্যাচারের মধ্যে পড়ে থাকতে দাও।

وَقَالُوا هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ۖ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮. তারা বলে, এই সব গবাদি পশু ও শস্যতে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত আছে। তাদের ধারণা এই যে, আমরা যাদেরকে ইচ্ছা করব তারা ছাড়া অন্য কেউ এসব খেতে পারবে না[৬৮] এবং কতক গবাদি পশু এমন, যাদের পিঠকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে[৬৯] এবং কিছু পশু এমন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তার যবাহকালে আল্লাহর নাম নেয় না।[৭০] তারা যে মিথ্যাচার করছে, আল্লাহ শীঘ্রই তার পরিপূর্ণ প্রতিফল তাদেরকে দেবেন।

وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰٓى اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ۖ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ۖ اِنَّهٗ

১৩৯. তারা আরও বলে, এই বিশেষ গবাদি পশুর গর্ভে যে বাচ্চা আছে, তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের নারীদের জন্য হারাম। আর তা যদি মৃত হয়, তবে তাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে (নারী-পুরুষ) সকলে অংশীদার

---

৬৭. এর ব্যাখ্যার জন্য এ সূরারই ১১২ নং আয়াতের টীকা দেখুন।

৬৮. এটা আরেকটি রসমের বর্ণনা। তারা তাদের মনগড়া দেবতাদের খুশী করার জন্য বিশেষ কোনও ফসল বা পশুর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করত যে, তা কেউ ভোগ করতে পারবে না। অবশ্য তারা যাকে ইচ্ছা সেই নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখত।

৬৯. এটা ছিল আরেকটি রেওয়াজ। তারা বিশেষ কোন পশুকে দেবতার নামে উৎসর্গ করত এবং বলত এর পিঠে চড়া সকলের জন্য হারাম।

৭০. কোনও কোনও পশুর ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত স্থির করে রেখেছিল যে, তাতে আল্লাহর নাম নেওয়া যাবে না– যবাহকালেও নয়, আরোহনকালেও নয়, এমনকি তার গোশত খাওয়ার সময়ও নয়। সুতরাং তারা এ রকম পশুতে সওয়ার হয়ে হজ্জ করাকে অবৈধ মনে করত।

حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٣٩﴾

হত।[৭১] তারা যে সব কথা তৈরি করছে শীঘ্রই আল্লাহ তাদেরকে তার প্রতিফল দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ হিকমতেরও মালিক, জ্ঞানেরও মালিক।

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ؕ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٤٠﴾

১৪০. প্রকৃতপক্ষে যারা কোন জ্ঞানগত ভিত্তি ছাড়া নিছক নির্বুদ্ধিতাবশত নিজেদের সন্তান হত্যা করেছে এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিযিককে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করতঃ হারাম সাব্যস্ত করেছে তারা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা নিকৃষ্ট রকম গোমরাহ হয়েছে এবং তারা কখনও হিদায়াতের উপর আসেইনি।

[১৭]

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٤١﴾

১৪১. আল্লাহ তিনি, যিনি উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যার মধ্যে কতক (লতাযুক্ত, যা) মাচার সাহায্যে উপরে ওঠানো হয় এবং কতক মাচার সাহায্য ছাড়াই উঁচু হয়ে যায় এবং খেজুর গাছ, বিভিন্ন স্বাদের খাদ্যশস্য, যায়তুন ও আনার সৃষ্টি করেছেন। এর একটি অন্যটির মতও এবং একটি অন্যটি থেকে ভিন্ন রকমেরও।[৭২] যখন এসব গাছ ফল দেয় তখন তার ফল থেকে খাবে এবং যখন ফল কাটার দিন আসবে তখন আল্লাহর হক আদায় করবে[৭৩] এবং অপচয় করবে

---

৭১. অর্থাৎ বাচ্চা যদি জীবিত জন্ম নেয়, তবে তা কেবল পুরুষদের জন্য হালাল হবে, নারীদের জন্য থাকবে হারাম। আর যদি মরা বাচ্চা জন্ম নেয়, তবে তা নারী-পুরুষ সকলের জন্যই হালাল হবে।

৭২. এর ব্যাখ্যার জন্য পেছনে ৯৯ নং আয়াতের টীকা দেখুন।

৭৩. এর দ্বারা উশর বোঝানো হয়েছে, যা শস্যাদিতে ওয়াজিব হয়। মক্কী জীবনে এর নির্দিষ্ট কোনও পরিমাণ স্থিরীকৃত ছিল না; বরং ফসল কাটার দিন মালিকের উপর ফরয ছিল যে, সে নিজ বিবেচনা অনুযায়ী তা থেকে উপস্থিত গরীব-মিসকীনদেরকে কিছু দেবে। মদীনায় হিজরতের পর এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধান আসে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

না। মনে রেখ, তিনি অপচয়কারীদের পসন্দ করেন না।

১৪২. আল্লাহ গবাদি পশুর মধ্যে কতক এমনও সৃষ্টি করেছেন, যা ভার বহন করে এবং কতক এমনও, যা মাটির সাথে মিশে থাকে।[৭৪] আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন, তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চিত জেন, সে তোমাদের এক প্রকাশ্য শত্রু।

وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ؕ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۴۲﴾

১৪৩. আল্লাহ (গবাদি পশুর) মোট আট জোড়া সৃষ্টি করেছেন। দু' প্রকার (নর ও মাদী) ভেড়ার বংশ থেকে ও দু' প্রকার ছাগলের বংশ থেকে। তাদেরকে জিজ্ঞেস কর তো, নর দু'টোকেই কি আল্লাহ হারাম করেছেন, না মাদী দু'টোকে? না কি এমন প্রত্যেক বাচ্চাকে, যা উভয় শ্রেণীর মাদী দু'টির গর্ভে আছে? তোমরা সত্যবাদী হলে কোনও জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাকে উত্তর দাও।[৭৫]

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ نَبِّـُٔوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۴۳﴾

এর তফসীল বর্ণনা করেন যে, যে ফসল বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন হয় তার এক-দশমাংশ এবং যা সেচের পানিতে উৎপন্ন হয়, তার বিশের একাংশ গরীবদের হক। আয়াতে বলা হয়েছে ফসল কাটার দিনই এ হক আদায় করা চাই।

৭৪. 'মাটির সাথে মিশে থাকে' বলে বোঝানো হয়েছে যে, তা খুব ক্ষুদ্রাকৃতির, যেমন ভেড়া ও ছাগল। এর অপর অর্থ এমনও হতে পারে যে, তার চামড়া মাটিতে বিছানো হয়ে থাকে।

৭৫. অর্থাৎ তোমরা কখনও নরপশুকে হারাম সাব্যস্ত কর, কখনও মাদী পশুকে, অথচ আল্লাহ তাআলা এসব জোড়া সৃষ্টিকালে না নর পশুকে হারাম করেছেন, না মাদীকে। সুতরাং তোমরাই বল, নর হওয়ার কারণে যদি কোনও পশু হারাম হয়ে যায়, তবে তো সর্বদা নর পশুই হারাম থাকা উচিত। আবার যদি মাদী হওয়ার কারণে কোনও পশু হারাম হয়, তবে তো সর্বদা মাদী পশুই হারাম থাকা উচিত। আর যদি মাদী পশুর গর্ভে থাকার কারণে হারাম সাব্যস্ত হয়, তবে তো নর হোক আর মাদী হোক সর্বদা সকল বাচ্চাই হারাম থাকা উচিত। কিন্তু তোমরা তো একেকবার একেকটাকে হারাম বলছ। সুতরাং তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে যেসব বিধান তৈরি করেছ তার কোনও জ্ঞান বা যুক্তিগত ভিত্তি নেই এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এমন নির্দেশ আসেওনি।

১৪৪. এমনিভাবে উটেরও দু'টি প্রকার (নর ও মাদী) সৃষ্টি করেছেন এবং গরুরও দু'টি। তাদেরকে বল, নর দু'টোকেই কি আল্লাহ হারাম করেছেন, না মাদী দু'টিকে? না কি এমন প্রত্যেক বাচ্চাকে, যা উভয় শ্রেণীর মাদী দু'টির গর্ভে আছে। আল্লাহ যখন এসব নির্দেশ দান করেন তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে? (যদি তা না থাক এবং নিশ্চয়ই ছিলে না,) তবে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হবে, যে কোনও রকমের জ্ঞানের ভিত্তি ছাড়াই মানুষকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ জালেম লোকদেরকে সৎপথে পৌঁছান না।

وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۴﴾

[১৮]

১৪৫. (হে নবী! তাদেরকে) বল, আমার প্রতি যে ওহী নাযিল করা হয়েছে তাতে 'আমি এমন কোনও জিনিস পাই না, যা কোনও আহারকারীর জন্য হারাম,[৭৬] যদি না তা মৃত জন্তু বা বহমান রক্ত কিংবা শূকরের গোশত হয়। কেননা তা নাপাক। অথবা যদি হয় এমন গুনাহের পশু, যাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে যবাহ করা হয়েছে। হ্যাঁ যে ব্যক্তি (এসব বস্তুর মধ্যে কোনওটি খেতে) বাধ্য হয়ে যায়,[৭৭] আর তার উদ্দেশ্য

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴۵﴾

---

৭৬. অর্থাৎ মূর্তিপূজকগণ যেসব পশুকে হারাম সাব্যস্ত করেছিল তার কোনওটিরই নিষিদ্ধতা সম্পর্কে আমার প্রতি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে কোন ওহী আসেনি। ব্যতিক্রম এই চারটি। তবে এর অর্থ এই নয় যে, অন্য সব পশুর মধ্যে কোনওটি হারাম নয়। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রকার হিংস্র পশুকে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন।

৭৭. অর্থাৎ কেউ যদি ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পড়ে এবং খাওয়ার মত কোন হালাল বস্তু না পায়, তবে প্রাণ রক্ষার্থে প্রয়োজন পরিমাণে হারাম বস্তু খাওয়া জায়েয হয়ে যায়। এ আয়াতে বর্ণিত হারাম বস্তুসমূহের বর্ণনা পূর্বে সূরা বাকারার ১৭৩ নং আয়াত ও সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াতেও গত হয়েছে। সামনে সূরা নাহলের ১১৫ নং আয়াতেও আসবে।

মজা লোটা না হয় এবং প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম না করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৪৬. আমি ইয়াহুদীদের জন্য নখর বিশিষ্ট সকল জন্তু হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগল থেকে তাদের জন্য হারাম করেছিলাম তাদের চর্বি, তবে যে চর্বি তাদের পিঠ বা অন্ত্রে লেগে থাকে বা যা কোন অস্থিতে থাকে তা ব্যতিক্রম ছিল। এই শাস্তি আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম তাদের অবাধ্যতার কারণে। তোমরা এই প্রত্যয় রেখ যে, আমি সত্যবাদী।

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤٦﴾

১৪৭. তারপরও যদি তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) তোমাকে অস্বীকার করে, তবে বলে দাও, তোমাদের প্রতিপালক সর্বব্যাপী দয়ার মালিক এবং অপরাধীদের থেকে তার শাস্তি টলানো যায় না।[৭৮]

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾

১৪৮. যারা শিরক অবলম্বন করেছে, তারা বলবে, আল্লাহ চাইলে আমরা শিরক করতাম না এবং আমাদের বাপ-দাদারাও না আর না আমরা কোনও বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করতাম।[৭৯] তাদের পূর্ববর্তী

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ

---

৭৮. অস্বীকারকারী বলে এখানে সরাসরিভাবে ইয়াহুদীদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা উপরে বর্ণিত জিনিসসমূহকে যে তাদের প্রতি তাদের অবাধ্যতার কারণে হারাম করা হয়েছিল তারা এটা অস্বীকার করত। অবশ্য আরব মুশরিকগণও এর অন্তর্ভুক্ত। তারা কুরআন মাজীদের সব কথাই অস্বীকার করত, এটাও তার একটা। উভয় সম্প্রদায়কে বলা হচ্ছে, কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও যে তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না, উপরন্তু তাদের পার্থিব সুখ-সাচ্ছন্দ্য লাভ হচ্ছে, এটা এ কারণে নয় যে, আল্লাহ তাআলা তাদের কাজে খুশী। আসল কথা হচ্ছে, দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার দয়া সর্বব্যাপী। এখানে তিনি তাঁর বিদ্রোহীদেরকেও জীবিকার সম্পন্নতা দান করেন। তবে এটা নিশ্চিত যে, এ অপরাধীদেরকে এক না একদিন অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং তা কেউ টলাতে পারবে না।

৭৯. এটা তাদের সেই একই অসার যুক্তি, যার উত্তর একাধিকবার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ যদি শিরককে অপসন্দই করেন, তবে আমাদেরকে শিরক করার ক্ষমতা দেন কেন? উত্তর

عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ؕ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ﴿۱۴۸﴾

লোকেও (রাসূলগণকে) এভাবেই অস্বীকার করেছিল, পরিশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল। তুমি তাদেরকে বল, তোমাদের কাছে কি এমন কোনও জ্ঞান আছে, যা আমার সামনে বের করতে পার? তোমরা যে জিনিসের পিছনে চলছ তা ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। তোমাদের কাজই কেবল আনুমানিক কথা বলা।

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۴۹﴾

১৪৯. (হে নবী! তাদেরকে) বল, এমন প্রমাণ তো আল্লাহরই আছে, যা (অন্তরে) পৌঁছে যায়। সুতরাং তিনি চাইলে তোমাদের সকলকে (জোরপূর্বক) হিদায়াতের উপর নিয়ে আসতেন।[৮০]

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ﴿۱۵۰﴾

১৫০. তাদেরকে বল, তোমরা তোমাদের সেই সকল সাক্ষীকে উপস্থিত কর, যারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ এ জিনিসসমূহ হারাম করেছেন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়ও, তবুও তুমি সে সাক্ষ্যতে তাদের সঙ্গে শরীক থেক না। আর তুমি সেই সকল লোকের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, যারা আমার আয়াতসমূহ

দেওয়া হয়েছে এই যে, আল্লাহ যদি দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে জোরপূর্বক ঈমান আনতে বাধ্য করেন, তবে পরীক্ষা হল কোথায়? অথচ দুনিয়াকে সৃষ্টিই করা হয়েছে এই পরীক্ষার জন্য যে, কে নিজ বুদ্ধি খাঁটিয়ে স্বেচ্ছায় সরল-সঠিক পথ অবলম্বন করে, যা আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষের স্বভাবের ভেতরও নিহিত রেখেছেন এবং যার পথ-নির্দেশ করার জন্য তিনি নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন।

৮০. অর্থাৎ তোমরা তো কাল্পনিক প্রমাণ পেশ করছ, কিন্তু আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে নিজ প্রমাণ চূড়ান্ত করে দিয়েছেন এবং তাঁদের বর্ণিত সে সকল প্রমাণ এমনই বস্তুনিষ্ঠ, যা হৃদয় পর্যন্ত পৌছে যায়। যারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে তারা আল্লাহ তাআলার আযাবে নিপতিত হয়েছে। এটা সে সকল প্রমাণের সত্যতারই সাক্ষ্য বহন করে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা চাইলে সকলকে জোরপূর্বক হিদায়াত দিতে পারতেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তাতে নবীগণ আনীত অনস্বীকার্য প্রমাণসমূহকে গ্রহণ করে নিয়ে স্বেচ্ছায় ঈমান আনার যে দায়িত্ব তোমাদের উপর রয়েছে, তা আদায় হত না।

প্রত্যাখ্যান করেছে, যারা আখিরাতের উপর ঈমান রাখে না এবং যারা অন্যদেরকে তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করে।

[১৯]

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٥١﴾

১৫১. (তাদেরকে) বল, এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি যা-কিছু হারাম করেছেন, আমি তা তোমাদেরকে পড়ে শোনাই। তা এই যে, তোমরা তার সঙ্গে কাউকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো, দারিদ্রের কারণে তোমরা নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকেও রিযিক দেব এবং তাদেরকেও আর তোমরা প্রকাশ্য হোক বা গোপন কোনও রকম অশ্লীল কাজের নিকটেও যেও না[৮১] আর আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন তাকে যথার্থ কারণ ছাড়া হত্যা করো না। হে মানুষ! এই হচ্ছে সেই সব বিষয়, যার প্রতি আল্লাহ গুরুত্বারোপ করেছেন, যাতে তোমরা উপলব্ধি কর।

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا

১৫২. ইয়াতীম পরিপক্ক বয়সে না পৌঁছা পর্যন্ত তার সম্পদের নিকটেও যেও না, তবে এমন পন্থায় (যাবে তার পক্ষে) যা উত্তম হয় এবং পরিমাপ ও ওজন পরিপূর্ণ করবে। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট দেন না।[৮২] এবং যখন কোনও কথা বলবে, তখন ন্যায্য বলবে, যদিও নিকটাত্মীয়ের বিষয়েও হয়। আর

---

৮১. অর্থাৎ অশ্লীল কাজ যেমন প্রকাশ্যে করা নিষেধ তেমনি লুকাছাপা করেও নিষেধ।

৮২. বেচাকেনার সময় পরিমাপ ও ওজন যাতে ঠিক ঠিক হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা অবশ্য কর্তব্য, তবে আল্লাহ তাআলা এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এ ব্যাপারে সাধ্যের বাইরে কিছু করার প্রয়োজন নেই। চেষ্টা থাকা চাই যাতে মাপ ঠিক-ঠিক হয়, কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও সামান্য কিছু পার্থক্য থেকে গেলে তাতে দোষ নেই।

قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٢﴾

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে।[৮৩] হে মানুষ! আল্লাহ্ এসব বিষয়ে তোমাদেরকে গুরুত্বের সাথে আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٥٣﴾

১৫৩. (হে নবী! তাদেরকে) আরও বল, এটা আমার সরল-সঠিক পথ। সুতরাং এর অনুসরণ কর, অন্য কোনও পথের অনুসরণ করো না, অন্যথায় তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। হে মানুষ! এসব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে গুরুত্বের সাথে আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪. এবং মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এই লক্ষ্যে, যাতে সৎকর্মশীলদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত পূর্ণ হয় এবং সব কিছুর বিশদ বিবরণ দিয়ে দেওয়া হয় এবং তা (মানুষের জন্য) পথ প্রদর্শন ও রহমতের কারণ হয়, ফলে তারা (আখিরাতে) তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্পর্কে ঈমান আনে।

[২০]

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٥٥﴾

১৫৫. (এমনিভাবে) এটা এক বরকতপূর্ণ কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি। সুতরাং এর অনুসরণ কর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ হয়।

اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۪ وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿١٥٦﴾

১৫৬. (আমি এ কিতাব নাযিল করেছি এজন্য) পাছে তোমরা কখনও বল, কিতাব তো নাযিল করা হয়েছিল আমাদের পূর্বের দু'টি সম্প্রদায় (ইয়াহুদী

---

৮৩. সরাসরি যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে করা হয়েছে কিংবা যা মানুষের সাথে করা হয়েছে, কিন্তু তা করা হয়েছে আল্লাহর নামে কসম করে বা তাকে সাক্ষী রেখে উভয় প্রকার প্রতিশ্রুতিই এর অন্তর্ভুক্ত।

ও খ্রিস্টান)-এর প্রতি। তারা যা-কিছু পড়ত ও পড়াত আমরা সে সম্পর্কে বিলকুল অজ্ঞাত ছিলাম।

أَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ أَنَّآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ أَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭. কিংবা তোমরা বল, আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হলে আমরা অবশ্যই তাদের (অর্থাৎ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের) চেয়ে বেশি হিদায়াতপ্রাপ্ত হতাম। কাজেই তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক উজ্জ্বল প্রমাণ এবং হিদায়াত ও রহমতের আয়োজন এসে গেছে। অতঃপর যে-কেউ আল্লাহর আয়াতমূহ অস্বীকার করবে ও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে? যারা আমার আয়াতসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, আমি তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দেব, যেহেতু তারা উপর্যুপরি সত্যবিমুখ থাকছে।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّآ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ إِيْمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَظِرُوْٓا إِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮. তারা (ঈমান আনার জন্য) এ ছাড়া আর কোন জিনিসের অপেক্ষা করে যে, তাদের কাছে ফিরিশতা আসবে বা তোমার প্রতিপালক নিজে আসবেন অথবা তোমার প্রতিপালকের কিছু নিদর্শন আসবে? (অথচ) যে দিন তোমার প্রতিপালকের কোনও নিদর্শন এসে যাবে, সে দিন এমন ব্যক্তির ঈমান তার কোনও কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি কিংবা নিজ ঈমানের সাথে কোনও সৎকর্ম অর্জন করেনি।[৮৪] (সুতরাং তাদেরকে) বলে দাও, তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষায় আছি।

---

৮৪. এর দ্বারা কিয়ামতের সর্বশেষ নিদর্শনকে বোঝানো হয়েছে, যার পর ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা গ্রহণযোগ্য কেবল সেই ঈমানই, যা ঈমান বিল-গায়ব হয়, অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়ে কেবল দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে বিশ্বাস করা হয়। কোনও জিনিস চোখে দেখে ঈমান আনলে পরীক্ষার সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না, যার জন্য দুনিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. (হে নবী!) নিশ্চিত জেন, যারা নিজেদের দ্বীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় আল্লাহর উপর ন্যস্ত। তারা যা-কিছু করছে তিনি তাদেরকে তা জানাবেন।

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

১৬০. যে ব্যক্তি কোনও পুণ্য নিয়ে আসবে, তার জন্য অনুরূপ দশটি পুণ্যের সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি কোনও অসৎকর্ম নিয়ে আসবে, তাকে কেবল সেই একটি অসৎ কর্মেরই শাস্তি দেওয়া হবে। তার প্রতি কোনও জুলুম করা হবে না।

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾

১৬১. (হে নবী!) বলে দাও, আমার প্রতিপালক আমাকে একটি সরল পথে লাগিয়ে দিয়েছেন, যা বক্রতা হতে মুক্ত দ্বীন; ইবরাহীমের দ্বীন, যে একনিষ্ঠভাবে নিজেকে আল্লাহ অভিমুখী করে রেখেছিল আর সে ছিল না শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

১৬২. বলে দাও, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার ইবাদত ও আমার জীবন-মরণ সবই আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. তাঁর কোনও শরীক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং আমি তাঁর সম্মুখে সর্বপ্রথম মাথা নতকারী।

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ

১৬৪. বলে দাও, আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও প্রতিপালক সন্ধান করব, অথচ তিনি প্রতিটি জিনিসের মালিক? প্রত্যেক ব্যক্তি যা-কিছু করে, তার

وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٦٤﴾

লাভ-ক্ষতি অন্য কারও উপর নয়, স্বয়ং তার উপরই বর্তায় এবং কোনও ভার-বহনকারী অন্য কারও ভার বহন করবে না।[৮৫] পরিশেষে তোমার প্রতিপালকের কাছেই তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। তোমরা যে সব বিষয়ে মতভেদ করতে তখন তিনি সে সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَاۤ اٰتٰىكُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ٘ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٥﴾

১৬৫. এবং তিনিই সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীতে তোমাদের একজনকে অন্যজনের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যে নিয়ামত দিয়েছেন সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন। এটা বাস্তব সত্য যে, তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং এটাও বাস্তব সত্য যে, তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

৮৫. কাফেরগণ কখনও কখনও মুসলিমদেরকে বলত, তোমরা আমাদের ধর্ম গ্রহণ করে নাও। তাতে যদি কোনও শাস্তি হয়, তবে তোমাদের শাস্তিও আমরা মাথা পেতে নেব, যেমন সূরা আনকাবূতে (২৯ : ১২) তাদের সে কথা বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াত তাদের সে কথার উত্তরেই নাযিল হয়েছে। এর ভেতর এই মহা মূল্যবান শিক্ষা রয়েছে যে, প্রত্যেকের উচিত নিজের পরিণাম চিন্তা করা। অন্য কেউ তাকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না। এই একই বিষয় সূরা বনী ইসরাঈল (১৭ : ১৫), সূরা ফাতির (৩৫ : ১৮), সূরা যুমার (৩৯ : ১৭) ও সূরা নাজম (৫৩ : ৩৮)-এও বর্ণিত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ সূরা নাজমে এটা আরও বিস্তারিতভাবে আসবে।

আল-হামদুলিল্লাহি তাআলা। আজ ২৬ সফর, ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২৭ মার্চ, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ, করাচিতে সূরা আনআমের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৩ মহররম, ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমত কবুল করে নিন ও মানুষের জন্য একে উপকারী বানিয়ে দিন এবং বাকি সূরাসমূহের কাজও নিজ সন্তুষ্টি অনুসারে সমাপ্ত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সূরা আ'রাফ

পরিচিতি

এ সূরাটিও মক্কী। এর মূল আলোচ্য বিষয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত ও আখিরাতকে সপ্রমাণ করা। এর সাথে তাওহীদের দলীল-প্রমাণও বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া কয়েকজন নবীর ঘটনাও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষত হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা। তূর পাহাড়ে তাঁর গমনের ঘটনাটি সর্বাপেক্ষা বিস্তারিতভাবে এ সূরায়ই পাওয়া যায়।

আরাফ (اعراف)-এর শাব্দিক অর্থ উচ্চ স্থান। পরিভাষায় আরাফ বলা হয় সেই স্থানকে, যা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে অবস্থিত। যে সকল লোকের পুণ্য ও পাপ সমান-সমান হবে তাদেরকে কিছু কালের জন্য সেখানে রাখা হবে। অতঃপর ঈমানের কারণে তারাও জান্নাতে প্রবেশ করবে। আরাফ ও তাতে অবস্থানকারীদের অবস্থা যেহেতু এ সূরায়ই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে 'আরাফ'।

৭–সূরা আ'রাফ–৩৯

سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٢٠٦ رُكُوْعَاتُهَا ٢٤

এটি একটি মক্কী সূরা। এতে দু'শ ছয়টি আয়াত ও চব্বিশটি রুকু আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

الٓمّٓصٓ ۚ ①

১. আলিফ-লাম-মীম-সাদ।[১]

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ②

২. (হে নবী!) এটি একখানি কিতাব, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে তুমি এর দ্বারা মানুষকে সতর্ক কর। সুতরাং এর কারণে তোমার অন্তরে যেন কোনও দুশ্চিন্তা না জাগে[২] এবং এটা মুমিনদের জন্য এক উপদেশবাণী।

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ③

৩. (হে মানুষ!) তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তার অনুসরণ কর এবং নিজেদের প্রতিপালককে ছেড়ে অন্য (মনগড়া) অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। (কিন্তু) তোমরা উপদেশ কমই গ্রহণ কর।

وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ④

৪. কত জনপদকেই আমি ধ্বংস করেছি। আমার শাস্তি তাদের কাছে এসে পড়েছিল রাতের বেলা অথবা দুপুরে যখন তারা বিশ্রাম করছিল।

فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ⑤

৫. যখন আমার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল, তখন তাদের তো বলার আর কিছুই ছিল না। কেবল বলে

---

১. সূরা বাকারার শুরুতে বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন সূরার প্রথমে এভাবে যে বিচ্ছিন্ন হরফসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে, একে 'আল-হুরূফুল মুকাত্তাআত' বলে। এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আর এর অর্থ বোঝার উপর দ্বীনের কোনও বিষয় নির্ভরশীলও নয়।

২. অর্থাৎ কুরআনে বর্ণিত বিষয়াবলীকে আপনি মানুষের দ্বারা কিভাবে মানাবেন এবং তারা না মানলে তখন কী হবে এসব নিয়ে আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। কেননা আপনার দায়িত্ব কেবল তাদেরকে সতর্ক করা। তাদের মানা-না মানার যিম্মাদারী আপনার উপর নয়।

উঠেছিল, বাস্তবিকই আমরা জালেম ছিলাম।

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

৬. অতঃপর যাদের নিকট রাসূল পাঠানো হয়েছিল, আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করব এবং আমি রাসূলগণকেও জিজ্ঞেস করব (যে, তারা কি বার্তা পৌছিয়েছিল এবং তারা কী জবাব পেয়েছিল?)।

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ۝

৭. অতঃপর আমি স্বয়ং তাদের সামনে নিজ জ্ঞানের ভিত্তিতে যাবতীয় ঘটনা বর্ণনা করব। (কেননা) আমি তো (সে সব ঘটনাকালে) অনুপস্থিত ছিলাম না।

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

৮. এবং সে দিন (আমলসমূহের) ওজন (করার বিষয়টি) একটি অকাট্য সত্য। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে কৃতকার্য।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ۝

৯. আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই তো সেই সব লোক, যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে সীমালংঘন করে নিজেদেরকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝

১০. স্পষ্ট কথা যে, আমি পৃথিবীতে তোমাদেরকে থাকার জায়গা দিয়েছি এবং তাতে তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি। তথাপি তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা আদায় কর।

[২]

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ۝

১১. এবং আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তারপর তোমাদের আকৃতি গঠন করেছি, তারপর ফিরিশতাদেরকে বলেছি, আদমকে সিজদা কর। সুতরাং সকলে সিজদা করল, ইবলীস ছাড়া। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল না।[৩]

---

৩. এ ঘটনার কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ সূরা বাকারায় (২ : ৩৪–৩৯) গত হয়েছে। সেসব আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি যে টীকা লিখেছি, তাতে এ ঘটনা সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরও দেওয়া হয়েছে। সম্মানিত পাঠক তা দেখে নিতে পারেন।

১২. আল্লাহ বললেন, আমি যখন তোকে আদেশ করলাম তখন কিসে তোকে সিজদা করা হতে বিরত রাখল? সে বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম। তুমি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছ, আর তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি দ্বারা।

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿۱۲﴾

১৩. আল্লাহ বললেন, তাহলে তুই এখান থেকে নেমে যা। কেননা তোর এই অধিকার নেই যে, এখানে অহংকার করবি। সুতরাং বের হয়ে যা। তুই হীনদের অন্তর্ভুক্ত।

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿۱۳﴾

১৪. সে বলল, যে দিন মানুষকে কবর থেকে জীবিত করে তোলা হবে, সেই দিন পর্যন্ত আমাকে (জীবিত থাকার) সুযোগ দাও।

قَالَ اَنْظِرْنِيْۤ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৫. আল্লাহ বললেন, তোকে সুযোগ দেওয়া হল।[৪]

قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿۱۵﴾

১৬. সে বলল, তুমি যেহেতু আমাকে পথভ্রষ্ট করেছ,[৫] তাই আমি (-ও) শপথ করছি যে, আমি তাদের (মানুষের) জন্য

قَالَ فَبِمَاۤ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿۱۶﴾

---

৪. শয়তান আবেদন করেছিল, যে দিন হাশর হবে এবং মানুষকে কবর থেকে জীবিত করে উঠানো হবে সেই দিন পর্যন্ত যেন তাকে অবকাশ দেওয়া হয়। এখানে সেই আবেদনের উত্তরে অবকাশ দেওয়ার কথা তো বলা হয়েছে, কিন্তু এ অবকাশ কোন পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, এ আয়াতে স্পষ্ট করে তা বর্ণনা করা হয়নি। এ ঘটনা সূরা হিজর (২৬ : ৩৮) ও সূরা সোয়াদ (৩৮ : ৮১)-এও বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, "এক নির্দিষ্ট কাল" পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হল। তা দ্বারা বোঝা যায় তার আবেদন মত হাশরের দিন পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়ার ওয়াদা করা হয়নি; বরং বলা হয়েছে, এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হল, যা আল্লাহ তাআলার জ্ঞানে আছে। অন্যান্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা জানা যায়, শয়তান কিয়ামতের প্রথম ফুঁৎকার পর্যন্ত জীবিত থাকবে। শিঙ্গার সেই প্রথম ফুঁৎকারে যেমন অন্য মাখলুকসমূহের মৃত্যু ঘটবে, তেমনি তারও মৃত্যু ঘটবে। অতঃপর যখন সকলকে জীবিত করা হবে, তখন তাকেও জীবিত করা হবে।

৫. শয়তান তার দুষ্কর্মের দায় নিজে স্বীকার না করে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তাআলার উপর চাপানোর চেষ্টা করল। অথচ আল্লাহ তাআলার স্থিরীকৃত তাকদীরের কারণে কারও এখতিয়ার বা ইচ্ছাশক্তি কেড়ে নেওয়া হয় না। তাকদীরের অর্থই হল এই যে, অমুক ব্যক্তি

তোমার সরল পথে ওঁৎ পেতে বসে থাকব।

১৭. তারপর আমি (চারও দিক থেকে) তাদের উপর হামলা করব, তাদের সম্মুখ থেকেও, তাদের পিছন থেকেও, তাদের ডান দিক থেকেও এবং তাদের বাম দিক থেকেও। আর তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবে না।

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ﴿١٧﴾

১৮. আল্লাহ বললেন, এখান থেকে ধিকৃত ও বিতাড়িত হয়ে বের হয়ে যা। তাদের মধ্যে যারা তোর পিছনে চলবে (তারাও তোর সঙ্গী হবে), আমি তোদের সকলকে দিয়ে জাহান্নাম ভরব।

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ؕ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٨﴾

১৯. এবং হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী– উভয়ে জান্নাতে বাস কর এবং যেখান থেকে যে বস্তু ইচ্ছা হয় খাও, তবে এই (বিশেষ) গাছটির কাছেও যেও না। অন্যথায় তোমরা (দু'জন) সীমালংঘন-কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَيٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾

২০. অতঃপর এই ঘটল যে, শয়তান তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিল, যাতে তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের থেকে গোপন রাখা হয়েছিল, তাদের পরস্পরের সামনে প্রকাশ করতে পারে।[৬] সে বলতে লাগল, তোমাদের প্রতিপালক

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ

নিজ ইচ্ছাক্রমে অমুক কাজ করবে। তাছাড়া শয়তানের এ কথার অর্থ এও হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে এমন আদেশ করলেনই বা কেন, যা তার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই পরোক্ষভাবে তার পথভ্রষ্টতার কারণ তো আল্লাহ তাআলার এই আদেশই হল (নাউযুবিল্লাহ)।

৬. বাহ্যত বোঝা যায়, সে গাছের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তার ফল খেলে জান্নাতের পোশাক খুলে যেত এবং একথা ইবলীসের জানা ছিল। সুতরাং যখন হযরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম সে ফল খেলেন, তখন তাদের শরীর থেকে জান্নাতী পোশাক খুলে গেল।

أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ۝٢٠

অন্য কোনও কারণে নয়; বরং কেবল এ কারণেই এই গাছ থেকে তোমাদেরকে বারণ করেছিলেন, পাছে তোমরা ফিরিশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী জীবন লাভ কর।[৭]

وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّیْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِیْنَ ۝٢١

২১. সে তাদের সামনে কসম খেয়ে বলল, বিশ্বাস কর, আমি তোমাদের কল্যাণকামীদের একজন।

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝٢٢

২২. এভাবে সে উভয়কে ধোঁকা দিয়ে নিচে নামিয়ে দিল।[৮] সুতরাং যখন তারা সে গাছের স্বাদ গ্রহণ করল, তখন তাদের উভয়ের লজ্জাস্থান উভয়ের কাছে প্রকাশ হয়ে গেল। অনন্তর তারা জান্নাতের কিছু পাতা জোড়া দিয়ে নিজেদের শরীরে জড়াতে লাগল।[৯] তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ গাছ থেকে বারণ করিনি এবং তোমাদেরকে বলিনি, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ٚ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝٢٣

২৩. তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজ সত্তার উপর জুলুম করে ফেলেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন ও আমাদের প্রতি রহম না

---

৭. ইবলীস বোঝাতে চাচ্ছিল যে, এ গাছের একটা বৈশিষ্ট্য হল, কেউ এর ফল খেলে সে ফিরিশতা হয়ে যায় অথবা তাকে স্থায়ী জীবন দান করা হয়। তাই এ ফল খাওয়ার জন্য বিশেষ শক্তি দরকার হয়। প্রথম দিকে আপনাদের সে শক্তি ছিল না। তাই নিষেধ করা হয়েছিল। যেহেতু জান্নাতের পরিবেশে আপনারা বেশ কিছু দিন যাবৎ থাকছেন, তাই ইতোমধ্যে আপনাদের সে শক্তি অর্জন হয়ে গেছে। সুতরাং এখন এ ফল খেলে কোন অসুবিধা নেই।

৮. নিচে নামানোর এক অর্থ হতে পারে, তারা আনুগত্যের যে উচ্চ স্তরে ছিলেন, তা থেকে নিচে নামিয়ে দিল। আর এ অর্থও হতে পারে যে, তাদেরকে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় নামিয়ে দিল।

৯. এর দ্বারা বোঝা গেল, উলঙ্গ না থাকা ও সতর ঢাকা মানুষের স্বভাব-ধর্ম। এ কারণেই জান্নাতী পোশাক অপসৃত হওয়া মাত্রই তারা সম্ভাব্য যে-কোনও উপায়ে সতর ঢাকতে চেষ্টা করলেন।

করেন, তবে আমরা অবশ্যই অকৃতকার্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।[১০]

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٢٤﴾

২৪. আল্লাহ (আদম, তার স্ত্রী ও ইবলীসকে) বললেন, তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও, তোমরা একে অন্যের শত্রু হয়ে থাকবে। আর পৃথিবীতে তোমাদের জন্য রয়েছে একটা কাল পর্যন্ত অবস্থান ও ক্ষাণিকটা ফায়দা ভোগ।

قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. তিনি বললেন, সেখানেই (পৃথিবীতে) জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং সেখান থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করে ওঠানো হবে।

[৩]

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ؕ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. হে আদমের সন্তান-সন্ততি! আমি তোমাদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করেছি, তোমাদের দেহের যে অংশ প্রকাশ করা দূষনীয় তা ঢাকার জন্য এবং তা সৌন্দর্যেরও[১১] উপকরণ। বস্তুত

---

১০. এটাই ইসতিগফার ও ক্ষমাপ্রার্থনার সেই শব্দমালা, যে সম্পর্কে সূরা বাকারায় (২ : ৩৭) বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলাই তাদেরকে এটা শিক্ষা দিয়েছিলেন। কেননা তখনও পর্যন্ত তাওবা করার নিয়ম তাদের জানা ছিল না। এর দ্বারা বোঝা যায়, তাওবা করার জন্য এই শব্দসমূহ অত্যন্ত ফলপ্রসূ। এর মাধ্যমে তাওবা করলে তা কবুল হওয়ার বেশি আশা করা যায়, যেহেতু এটা স্বয়ং আল্লাহ তাআলারই শেখানো। এভাবে আল্লাহ তাআলা এক দিকে যেমন শয়তানকে অবকাশ দিয়ে মানুষকে গোমরাহ করার যোগ্যতা দান করেছেন, যা মানুষের জন্য বিষতুল্য। অপর দিকে মানুষকে তাওবা ও ইসতিগফারও শিক্ষা দিয়েছেন, যা সেই বিষের প্রতিষেধক তুল্য। কাজেই শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কেউ কোনও গুনাহ করে ফেললে তার উচিত সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে ফেলা। অর্থাৎ সে তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে, ভবিষ্যতে আর না করার অঙ্গীকার করবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এর ক্রিয়ায় শয়তান যে বিষ প্রয়োগ করেছিল তা নেমে যাবে।

১১. ২৬ থেকে ৩২ পর্যন্ত আয়াতসমূহ আরবদের একটা অদ্ভুত রেওয়াজের প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে। রেওয়াজটি নিম্নরূপ, কুরাইশ গোত্র এবং মক্কা মুকাররমার আশপাশের আরও কিছু গোত্র হুম্‌স (কঠোর ধর্মপরায়ণ) নামে পরিচিত ছিল। হরম শরীফের সেবায়েত হওয়ার কারণে আরবের অন্যান্য গোত্র তাদেরকে বড় সম্মান করত। এক্ষেত্রে আরবদের বাড়াবাড়ি এই পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তাদের বিশ্বাস ছিল কাপড় পরে তাওয়াফ করার অধিকার

তাকওয়ার যে পোশাক, সেটাই সর্বোত্তম। এসব আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম।[১২] এর উদ্দেশ্য- মানুষ যাতে উপদেশ গ্রহণ করে।[১৩]

২৭. হে আদমের সন্তান-সন্ততিগণ! শয়তানকে কিছুতেই এমন সুযোগ দিও না, যাতে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে যেভাবে জান্নাত থেকে বের করেছিল, তেমনিভাবে তোমাদেরকেও ফিতনায় ফেলতে সক্ষম হয়। সে তাদেরকে তাদের পরস্পরের লজ্জাস্থান দেখানোর উদ্দেশ্যে তাদের দেহ থেকে তাদের পোশাক অপসারণ করিয়েছিল। সে ও তার দল এমন স্থান থেকে তোমাদেরকে দেখে যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। যারা ঈমান আনে না, আমি শয়তানকে তাদের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছি।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ؕ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾

কেবল তাদেরই জন্য সংরক্ষিত। তারা বলত, আমরা যে কাপড় পরে গুনাহও করে থাকি, তা নিয়ে কাবা ঘরের তাওয়াফ করতে পারি না। সুতরাং তারা যখন তাওয়াফ করতে আসত, তখন 'হুম্‌স'-এর কোনও লোকের কাছে কাপড় চাইত, তার কাছে কাপড় পাওয়া গেলে তাই পরে বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করত। যদি কোনও হুমসের কাছে কাপড় পাওয়া না যেত, তবে তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়েই তাওয়াফ করত। তাদের এই বেহুদা রসমের মূলোৎপাটনের জন্যই এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে। এর ভেতর মানুষের জন্য পোশাক যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাও তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, পোশাকের মূল উদ্দেশ্য দেহ আবৃত করা। সেই সঙ্গে পোশাক মানব দেহের ভূষণ ও সৌন্দর্যের উপকরণও বটে। যে পোশাকের ভেতর এই উভয়বিধ গুণ পাওয়া যায়, সেটাই উৎকৃষ্ট পোশাক। আর যে পোশাক দ্বারা মানব দেহ যথাযথভাবে আবৃত হয় না, তা মানব-স্বভাবেরই পরিপন্থী।

১২. পোশাকের আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, পোশাক যেমন মানুষের বহিরাঙ্গকে ঢেকে দেয়, তেমনি তাকওয়া মানুষকে গুনাহ থেকে পবিত্র রেখে তার ভিতর ও বাহির উভয় দিকের হেফাজত করে। এ হিসেবে তাকওয়া-রূপ পোশাকই উৎকৃষ্টতম পোশাক। সুতরাং বাহ্যিক পোশাক পরিধানের সাথে সাথে মানুষের এই ফিকিরও থাকা উচিত, যাতে সে তাকওয়ার পোশাক দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করতে পারবে।

১৩. অর্থাৎ পোশাক সৃষ্টি করা আল্লাহ তাআলার কুদরত ও হিকমতের এক অন্যতম নিদর্শন।

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) যখন কোন অশ্লীল কাজ করে, তখন বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এরূপই করতে দেখেছি এবং আল্লাহ আমাদেরকে এরই আদেশ করেছেন।[১৪] (তুমি তাদেরকে) বল, আল্লাহ অশ্লীলতার আদেশ করেন না। তোমরা কি আল্লাহর নামে এমন কথা লাগাচ্ছ, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নেই?

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

২৯. বল, আমার প্রতিপালক তো ইনসাফ করার হুকুম দিয়েছেন[১৫] এবং (আরও আদেশ করেছেন যে,) যখন কোথাও সিজদা করবে, তখন নিজ রোখ ঠিক রাখবে এবং এই বিশ্বাসের সাথে তাঁকে ডাকবে যে, আনুগত্য কেবল তাঁরই প্রাপ্য। তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, পুনরায় তোমাদেরকে সেভাবেই সৃষ্টি করা হবে।

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۗ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾

৩০. (তোমাদের মধ্যে) একটি দলকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন এবং একটি দল এমন, যাদের প্রতি পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। কেননা তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে আর তারা মনে করছে যে, তারা সরল পথে প্রতিষ্ঠিত আছে।

---

১৪. তারা যে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করত, এর দ্বারা তাদের সেই রসমের দিকেই ইশারা করা হয়েছে। রসমটি প্রাচীন হওয়ার কারণে তাদের দলীল ছিল যে, এটা পুরুষানুক্রমে চলে আসছে, যা দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা এ রকমই আদেশ করে থাকবেন।

১৫. উপরিউক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে 'ইনসাফ'-এর বিষয়টা উল্লেখ করার এক কারণ এই যে, 'হুম্স'-ভুক্ত লোকেরা যে নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম চালু করেছিল, তার কোনও-কোনওটি ইসনাফেরও পরিপন্থী ছিল। যেমন তাওয়াফকালে এই কাপড় পরার বিষয়টিই। কেবল হুম্সের লোকেরা পোশাক পরিহিত অবস্থায় তাওয়াফ করতে পারবে, অন্যরা নয়– এটা কেমন ইনসাফের কথা? অথচ গুনাহই যদি কারণ হয়, তবে অন্যান্য লোক গুনাহ করে থাকলে হুম্সের লোকও তো নিষ্পাপ ছিল না!

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. হে আদমের সন্তান-সন্ততিগণ! যখনই তোমরা কোনও মসজিদে আসবে তখন নিজেদের শোভার বস্তু (অর্থাৎ শরীরের পোশাক) নিয়ে আসবে এবং আহার করবে ও পান করবে, কিন্তু অপব্যয় করবে না। আল্লাহ অপব্যয়কারীদেরকে পসন্দ করেন না।

[৪]

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. বল, আল্লাহ নিজ বান্দাদের জন্য যে শোভার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, কে তা হারাম করেছে? এবং (এমনিভাবে) উৎকৃষ্ট জীবিকার বস্তুসমূহ?[১৬] বল, যারা ঈমান রাখে তারা পার্থিব জীবনে এই যে নিয়ামতসমূহ লাভ করেছে, কিয়ামতের দিন তা বিশেষভাবে তাদেরই জন্য থাকবে।[১৭] যারা জ্ঞানকে কাজে লাগায়, তাদের জন্য এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি।

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا

৩৩. বলে দাও, আমার প্রতিপালক তো অশ্লীল কাজসমূহ হারাম করেছেন, তা সে অশ্লীলতা প্রকাশ্য হোক বা গোপন। তাছাড়া সর্বপ্রকার গুনাহ, অন্যায়ভাবে কারও প্রতি সীমালংঘন এবং আল্লাহ যে সম্পর্কে কোনও প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি,

---

১৬. আরবের অন্যান্য গোত্র তাওয়াফকালে কাপড় পরিধানকে যেমন হারাম মনে করত, তেমনি জাহিলী যুগের লোকে বিভিন্ন রকমের পানাহার সামগ্রীকেও অকারণে হারাম সাব্যস্ত করেছিল, সূরা আনআমে যা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া হুম্‌সের গোত্রসমূহ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার্থে গোশতের কোনও কোনও অংশকে নিজেদের জন্য হারাম করেছিল, অথচ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন কোন নির্দেশ আসেনি।

১৭. এটা মূলত মক্কার কাফেরদের একটা কথার উত্তর। তারা বলত, আমাদের প্রচলিত নিয়ম যদি আল্লাহ তাআলার অপসন্দ হয়, তবে তিনি আমাদেরকে রিযিক দিচ্ছেন কেন? উত্তর দেওয়া হয়েছে, এ দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার রিযিকের দস্তরখান সকলের জন্য অবারিত। এতে মুমিন-কাফিরের কোনও ভেদাভেদ নেই। কিন্তু আখিরাতে এসব নিয়ামত কেবল মুমিনগণই ভোগ করবে। সুতরাং দুনিয়ায় কারও প্রাচুর্য দেখে মনে করা উচিত নয় যে, এটা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির নির্দেশক এবং সে আখিরাতেও এ রকম প্রাচুর্য লাভ করবে।

بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۳﴾

এমন জিনিসকে আল্লাহর শরীক স্থির করাকেও। তাছাড়া এ বিষয়কেও যে, তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলবে, যে সম্পর্কে তোমাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই।[১৮]

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿۳۴﴾

৩৪. প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য এক নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন সেই নির্দিষ্ট সময় এসে পড়ে, তখন তারা এক মুহূর্তও তার সামনে বা পেছনে যেতে পারে না।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۳۵﴾

৩৫. (মানুষকে সৃষ্টি করার সময়ই আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে,) হে বনী আদম! তোমাদের কাছে যদি তোমাদেরই মধ্য হতে কোন রাসূল এসে আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে পড়ে শোনায়, তবে তখন যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে ও নিজেদেরকে সংশোধন করবে, তাদের কোনও ভয় দেখা দেবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۳۶﴾

৩৬. আর যারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে ও অহংকারবশে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারা হবে জাহান্নামবাসী। তারা তাতে সর্বদা থাকবে।

---

১৮. এমনিতে তো যে কারও নামেই কোন অসত্য কথা চালানো সর্ব বিচারে একটি অন্যায় ও অনৈতিক কাজ, কিন্তু এ অপরাধ যদি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে করা হয়, তবে তা এতই গুরুতর হয় যে, তা মানুষকে কুফর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলার বরাতে কোনও কথা বলার সময়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনও বিষয় নিশ্চিতভাবে জানা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে বিষয়কে আল্লাহর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করা উচিত নয়। আরবের মূর্তিপূজারীগণ নিজেদের পক্ষ হতে বিভিন্ন কথা তৈরি করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়েছিল। সে সব কথার কোন জ্ঞানগত ভিত্তি ছিল না; বরং কেবলই আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে তা রচনা করত। নিজেরাও জানত না তা কতটুকু বাস্তব।

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭. সুতরাং বল, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে? এরূপ লোকদের ভাগ্যে (রিযিকের) যতটুকু অংশ লেখা আছে তা তাদের নিকট (দুনিয়ার জীবনে) পৌঁছবেই।[১৯] অবশেষে যখন আমার প্রেরিত ফিরিশতাগণ তাদের রূহ কবজ করার জন্য তাদের নিকট আসবে তখন তারা বলবে, তারা (অর্থাৎ তোমাদের মাবুদগণ) কোথায়, আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে তোমরা ডাকতে? তারা বলবে, তারা আমাদের থেকে অন্তর্হিত হয়েছে এবং তারা নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, আমরা কাফের ছিলাম।

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ

৩৮. আল্লাহ বলবেন, যাও, তোমাদের পূর্বে জিন্ন ও মানুষদের যেসব দল গত হয়েছে, তাদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর। (এভাবে) যখনই কোনও দল জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তারা অপর দলকে অভিসম্পাত করবে।[২০] এমনকি যখন একের পর এক সকলে তাতে গিয়ে একত্র হবে, তখন তাদের পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীদের

---

১৯. এখানে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়ায় রিযিক দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা মুমিন ও কাফেরের মধ্যে কোনও প্রভেদ করেননি। বরং প্রত্যেকের জন্য রিযিকের একটা অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা সর্বাবস্থায়ই তার কাছে পৌঁছবে, সে ঘোরতর কাফেরই হোক না কেন। সুতরাং দুনিয়ায় যদি কারও জীবিকার প্রাচুর্য লাভ হয়, তবে সে যেন মনে না করে, তার কর্মপন্থা আল্লাহ তাআলার পসন্দ, যেমন ওই কাফেরগণ মনে করছে। যখন মৃত্যু এসে উপস্থিত হবে, তখনই তারা প্রকৃত সত্য টের পাবে।

২০. অর্থাৎ যারা নেতৃবর্গের অধীনে ছিল তারা তাদের সেই নেতাদের প্রতি লানত করবে, যারা তাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। অপর দিকে নেতৃবর্গ তাদের অধীনস্থদেরকে এ কারণে লানত করবে যে, তারা তাদেরকে সীমাতিরিক্ত সম্মান দেখিয়ে তাদের গোমরাহীকে আরও পাকাপোক্ত করেছিল।

عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٨﴾

সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেছিল। সুতরাং এদেরকে আগুন দ্বারা দ্বিগুণ শাস্তি দাও। আল্লাহ বলবেন, প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে।[২১] কিন্তু তোমরা (এখনও পর্যন্ত) জান না।

وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. আর পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীগণকে বলবে, আমাদের উপর তোমাদের কোনও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সুতরাং তোমরা তোমাদের নিজ কৃতকর্মের কারণে শাস্তি ভোগ কর।

[৫]

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪০. (হে মানুষ!) নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, যারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অহংকারের সাথে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না– যতক্ষণ না সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে।[২২] এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে তাদের কৃতকর্মের বদলা দেই।

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤١﴾

৪১. তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামেরই বিছানা এবং উপর দিক থেকে তারই আচ্ছাদন। এভাবেই আমি জালেমদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দিয়ে থাকি।

---

২১. অর্থাৎ প্রত্যেকের শাস্তিই পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সুতরাং নেতৃবর্গকে যে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে তার অর্থ এ নয় যে, তোমরা নিজেরা সে রকম কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে; বরং একটা সময় আসবে, যখন তোমাদের শাস্তি বৃদ্ধি পেতে পেতে তাদের বর্তমান শাস্তির মতই কঠিন হয়ে যাবে– হোক না তাদের শাস্তি তখন আরও অনেক বেড়ে যাবে।

২২. এটা এক আরবী প্রবচন। এর অর্থ, যেমন সুঁইয়ের ছেঁদা দিয়ে কখনও উট প্রবেশ করতে পারে না, তেমনি তারাও কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۤ ۫ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۴۲﴾

৪২. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে– আর (মনে রাখতে হবে) আমি কারও প্রতি সাধ্যের বেশি ভার অর্পণ করি না,[২৩] তারাই হবে জান্নাতবাসী। তারা তাতে সর্বদা থাকবে।

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۟ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَاۤ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ؕ وَنُوْدُوْۤا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۴۳﴾

৪৩. আর (ইহজীবনে) তাদের বুকের ভেতর (পারস্পরিক) কোন কষ্ট থাকলে আমি তা বের করে দেব।[২৪] তাদের তলদেশে নহর বহমান থাকবে। আর তারা বলবে, সমস্ত শোকর আল্লাহর যিনি আমাদেরকে এই স্থানে পৌঁছিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে না পৌঁছালে আমরা কখনই এ স্থলে পৌঁছতে পারতাম না। বাস্তবিকই আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ সত্য কথাই নিয়ে এসেছিলেন। আর তাদেরকে ডেকে বলা হবে, হে মানুষ! এই হল জান্নাত, তোমরা যে আমল করতে তারই ভিত্তিতে তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

وَنَادٰۤى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا

৪৪. আর জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমরা তো তা সম্পূর্ণ সত্য পেয়েছি।

---

২৩. এখানে সৎকর্মের উল্লেখের সাথে একটি অন্তর্বর্তী বাক্য হিসেবে একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সৎকর্ম এমন কোনও বিষয় নয়, যা মানুষের সাধ্যের বাইরে। কেননা আমি মানুষকে এমন কোনও হুকুম দেইনি, যা করার ক্ষমতা তাদের নেই। তাছাড়া এ দিকেও ইশারা করা হয়ে থাকবে যে, কেউ যদি তার সাধ্যানুযায়ী সৎকর্ম করার চেষ্টা করে আর তারপরও তার দ্বারা কোনও ভুল-চুক্ হয়ে যায় তবে আল্লাহ তাআলা সেজন্য তাকে ধরবেন না।

২৪. জান্নাত যেহেতু সব রকম কষ্ট থেকে মুক্ত থাকবে, তাই সেখানে পারস্পরিক দুঃখ-কষ্টও জায়গা পাবে না। এমনকি দুনিয়ায় পরস্পরের মধ্যে যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়ে থাকে, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তা সম্পূর্ণরূপে দূর করে দেবেন। ফলে সমস্ত জান্নাতবাসী সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করবে।

وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؕ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۴﴾

এবার তোমরা বল, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তোমরাও কি তাকে সত্য পেয়েছ? তারা উত্তরে বলবে, হ্যাঁ। এমনই সময় তাদের মধ্যে এক ঘোষক ঘোষণা করবে, আল্লাহর লানত জালেমদের প্রতি–

الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫. যারা আল্লাহর পথে মানুষকে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা সন্ধান করত এবং যারা আখিরাতকে বিলকুল অস্বীকার করত।

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمٰىهُمْ ۚ وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۟ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ﴿۴۶﴾

৪৬. এবং (জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসী– এই) উভয় দলের মধ্যে– একটি আড়াল থাকবে। আর আরাফ-এ (অর্থাৎ সেই আড়ালের উচ্চতায়) কিছু লোক থাকবে, যারা প্রত্যেক দলের লোককে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে।[২৫] তারা জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম। তারা (অর্থাৎ আরাফবাসী) তখনও পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু তারা সাগ্রহে তার আশাবাদী হবে।

وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۷﴾

৪৭. আর যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামবাসীদের প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের

---

২৫. এমনিতে তো আরাফের লোক জান্নাতবাসী ও জাহান্নামী উভয় শ্রেণীর লোকদেরকেই সরাসরি দেখতে পাবে। তাই কোনও দলের লোকদেরকেই চেনার জন্য তাদের কোন আলামতের দরকার হবে না। তারপরও যে এখানে আলামতের কথা বলা হয়েছে, এর দ্বারা ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, তারা জান্নাত ও জাহান্নামবাসীদেরকে দুনিয়ায়ও তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনত। আর তারা যেহেতু ঈমানদার ছিল তাই দুনিয়ায়ও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এতটুকু অনুভূতি দিয়েছিলেন, যা দ্বারা তারা চেহারা দেখেই বুঝতে পারত যে, এরা মুত্তাকী-পরহেজগার ও নেককার লোক। এমনিভাবে তারা কাফেরদের চেহারা দেখেও চিনে ফেলত যে, এরা কাফের (ইমাম রাযী, তাফসীরে কাবীর)।

প্রতিপালক! আমাদেরকে ওই জালেমদের সঙ্গে রেখ না।

[৬]

وَنَادٰۤى اَصۡحٰبُ الۡاَعۡرَافِ رِجَالًا يَّعۡرِفُوۡنَهُمۡ بِسِيۡمٰهُمۡ قَالُوۡا مَاۤ اَغۡنٰى عَنۡكُمۡ جَمۡعُكُمۡ وَمَا كُنۡتُمۡ تَسۡتَكۡبِرُوۡنَ ﴿۴۸﴾

৪৮. আরাফবাসীগণ যেসব লোককে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে, তাদেরকে ডাক দিয়ে বলবে, তোমাদের সংগৃহীত সঞ্চয় তোমাদের কোনও কাজে আসল না এবং তোমরা যাদেরকে বড় মনে করতে তারাও না।[২৬]

اَهٰۤؤُلَاۤءِ الَّذِيۡنَ اَقۡسَمۡتُمۡ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحۡمَةٍ ؕ اُدۡخُلُوا الۡجَنَّةَ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡكُمۡ وَلَاۤ اَنۡتُمۡ تَحۡزَنُوۡنَ ﴿۴۹﴾

৪৯. (অতঃপর জান্নাতবাসীদের প্রতি ইশারা করে বলবে,) এরাই কি তারা, যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে, আল্লাহ তাদেরকে নিজ রহমতের কোনও অংশ দেবেন না? (তাদেরকে তো বলে দেওয়া হয়েছে,) তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদের কোনও কিছুর ভয় নেই এবং তোমরা কখনও কোনও দুঃখেরও সম্মুখীন হবে না।

وَنَادٰۤى اَصۡحٰبُ النَّارِ اَصۡحٰبَ الۡجَنَّةِ اَنۡ اَفِيۡضُوۡا عَلَيۡنَا مِنَ الۡمَآءِ اَوۡ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ قَالُوۡۤا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الۡكٰفِرِيۡنَ ﴿۵۰﴾

৫০. আর জাহান্নামবাসীগণ জান্নাতবাসীদেরকে বলবে, আমাদের উপর সামান্য কিছু পানিই ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে যে নিয়ামত দিয়েছেন তার কিছু অংশ (আমাদের কাছে পৌঁছতে দাও)। তারা উত্তর দেবে, আল্লাহ এ দু'টো জিনিস ওই কাফেরদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন-

الَّذِيۡنَ اتَّخَذُوۡا دِيۡنَهُمۡ لَهۡوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتۡهُمُ الۡحَيٰوةُ الدُّنۡيَا ۚ فَالۡيَوۡمَ نَنۡسٰهُمۡ كَمَا نَسُوۡا لِقَآءَ

৫১. যারা নিজেদের দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকের বস্তুতে পরিণত করেছিল এবং যাদেরকে পার্থিব জীবন ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। সুতরাং আজ আমি তাদেরকে বিস্মৃত

---

২৬. এর দ্বারা তাদের সেই দেবতাদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যাদেরকে তারা আল্লাহ তাআলার শরীক সাব্যস্ত করত। এমনিভাবে এটা সেই সর্দার ও নেতাদের প্রতিও ইঙ্গিত, যাদেরকে তারা বড় মনে করে অন্ধের মত অনুসরণ করত ও মনে করত তারা তাদেরকে আল্লাহ তাআলার ক্রোধ থেকে বাঁচাবে।

يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٥١﴾

হব, যেভাবে তারা ভুলে গিয়েছিল যে, তাদেরকে এই দিনের সম্মুখীন হতে হবে এবং যেভাবে তারা আমার আয়াত সমূহকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করত।

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. বস্তুত আমি তাদের কাছে এমন এক কিতাব উপস্থিত করেছি, যার ভেতর আমি আমার জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিটি বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা করেছি। যারা ঈমান আনে তাদের পক্ষে এটা হিদায়াত ও রহমত।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. কাফিরগণ এই কিতাবে যে শেষ পরিণামের কথা বর্ণিত আছে, তা ছাড়া আর কোন জিনিসের অপেক্ষা করছে?[২৭] (অথচ) এই কিতাবের বর্ণিত শেষ পরিণাম যে দিন আসবে সে দিন, যারা পূর্বে সে পরিণামের কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে, বাস্তবিকই আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ সত্যবাণী নিয়েই এসেছিলেন। এখন আমাদের কি এমন কোন সুপারিশকারী লাভ হবে, যে আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে? অথবা এমন কি হতে পারে যে, আমাদেরকে পুনরায় (দুনিয়ায়) ফেরত পাঠানো হবে, যাতে আমরা যে (মন্দ) কাজ করতাম তার বিপরীত কাজ করতে পারি? বস্তুত এসব লোক নিজেদের ব্যাপারে অতি লোকসানের বাণিজ্য করেছে এবং তারা যা-কিছু গড়ে রেখেছিল (অর্থাৎ তাদের

২৭. 'শেষ পরিণাম' দ্বারা কিয়ামত দিবসকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ঈমান আনার জন্য তারা কি কিয়ামত দিবসের অপেক্ষা করছে, অথচ সে দিন ঈমান আনলেও তা গৃহীত হবে না। আর যখন কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে, তখন আক্ষেপ করা ছাড়া তাদের আর কিছু করার থাকবে না।

দেবতাগণ) তারা (সে দিন) তাদের কোথাও খুঁজে পাবে না।

[৭]

৫৪. নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক সেই আল্লাহ, যিনি সমস্ত আসমান ও যমীন ছয় দিনে[২৮] সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি আরশে ইস্তিওয়া[২৯] গ্রহণ করেন। তিনি দিনকে রাতের চাদরে আবৃত করেন, যা দ্রুতগতিতে ধাবিত হয়ে তাকে এসে ধরে ফেলে। তিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন, যা সবই তাঁর আজ্ঞাধীন। স্মরণ রেখ, সৃষ্টি ও আদেশ দান তাঁরই কাজ। আল্লাহ অতি বরকতময়, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾

---

২৮. এটা সেই সময়ের কথা, যখন দিনের হিসাব বর্তমানকার সূর্যের উদয়-অস্ত দ্বারা করা হত না; বরং তখন অন্য কোনও কিছুর ভিত্তিতে এটা স্থির করা হয়ে থাকবে, যার হাকীকত আল্লাহ তাআলাই জানেন।

এমনিতে তো আল্লাহ তাআলার এ ক্ষমতাও ছিল যে, তিনি নিমিষের মধ্যে এ মহা বিশ্বকে সৃষ্টি করে ফেলবেন, কিন্তু তা না করে এ কাজে ছয় দিন সময় লাগানোর দ্বারা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, তারা যেন কোনও কাজে তাড়াহুড়া না করে, বরং ধীর-স্থিরতার সাথে তা সমাধা করে।

২৯. ইসতিওয়া (استواء) আরবী শব্দ। এর অর্থ সোজা হওয়া, কায়েম হওয়া, আয়ত্তাধীন করা ইত্যাদি। কখনও এ শব্দটি বসা ও সমাসীন হওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা যেহেতু শরীর ও স্থান থেকে মুক্ত ও পবিত্র, তাই তাঁর ক্ষেত্রে শব্দটি দ্বারা এরূপ অর্থ গ্রহণ সঠিক নয় যে, মানুষ যেভাবে কোনও আসনে সমাসীন হয়, তেমনিভাবে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তাআলাও আরশে উপবিষ্ট ও সমাসীন হন। প্রকৃতপক্ষে 'ইস্তিওয়া' আল্লাহ তাআলার একটি গুণ। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরামের মতে এর প্রকৃত ধরণ-ধারণ আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তাদের মতে এটা মুতাশাবিহাত (দ্ব্যর্থবোধক) বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত যার খোড়াখুড়িতে লিপ্ত হওয়া ঠিক নয়। সূরা আলে ইমরানের শুরুভাগে আল্লাহ তাআলা এরূপ মুতাশাবিহ বিষয়ের অনুসন্ধানে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। সে হিসেবে এর কোনও তরজমা করাও সমীচীন মনে হয় না। কেননা এর যে-কোনও তরজমাতেই বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ আছে। এ কারণেই আমরা এস্থলে এর তরজমা করিনি। তাছাড়া এর উপর কর্মগত কোনও মাসআলাও নির্ভরশীল নয়। এতটুকু বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা নিজ শান অনুযায়ী 'ইসতিওয়া' গ্রহণ করেছেন, যার স্বরূপ ও প্রকৃতি উপলব্ধি করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি মানুষের নেই।

ادْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. তোমরা বিনীতভাবে ও চুপিসারে নিজেদের প্রতিপালককে ডাক। নিশ্চয়ই তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে পসন্দ করেন না।[৩০]

وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর তাতে অশান্তি বিস্তার করো না[৩১] এবং অন্তরে তাঁর ভয় ও আশা রেখে তাঁর ইবাদত কর।[৩২] নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।

وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ حَتّٰى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۚ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. এবং তিনিই (আল্লাহ), যিনি নিজ রহমতের (অর্থাৎ বৃষ্টির) পূর্বক্ষণে (বৃষ্টির) সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন। যখন তা ভারী মেঘমালাকে বয়ে নিয়ে যায়, তখন আমি তাকে কোন মৃত ভূখণ্ডের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাই, তারপর সেখানে পানি বর্ষণ করি এবং তা দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপন্ন করি।

---

৩০. সীমালংঘন বিভিন্ন রকম হতে পারে, যেমন অতি উচ্চ স্বরে দোয়া করা কিংবা কোন নাজায়েয বা অসম্ভব বস্তু প্রার্থনা করা, যদ্দরুন দোয়া তামাশায় পরিণত হয়, যথা এই দোয়া করা যে, আমি যেন এখনই আকাশে পৌঁছে যাই। কাফেরগণ অনেক সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ জাতীয় দোয়া করতে বলত।

৩১. আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে যখন মানুষকে পাঠান, তখন প্রথম দিকে নাফরমানীর কোনও ধারণা ছিল না। তখন পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত ছিল। পরবর্তীতে যারা নাফরমানীর বীজ বপন করেছে, তারাই সেই শান্তি স্থাপনের পর অশান্তি বিস্তার করেছে।

৩২. এ আয়াতে যে দোয়া শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এর দ্বারা ইবাদত বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই আমরা এর তরজমা করেছি ইবাদত। আয়াতে প্রকৃত ইবাদতের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে যে, ইবাদতকারীর অন্তরে ইবাদতের কারণে অহংকার সৃষ্টি তো হবেই না; বরং এই ভয় জাগ্রত হবে যে, জানি না আমি ইবাদতের হক আদায় করতে পেরেছি কি না এবং আমার এ ইবাদত আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হওয়ার উপযুক্ত কি না! অপর দিকে ইবাদতের ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য করে তার অন্তরে হতাশাও সৃষ্টি হবে না; বরং আল্লাহ তাআলার রহমতের প্রতি লক্ষ্য করে আশা সঞ্চার হবে যে, তিনি নিজ দয়ায় এটা কবুল করে নেবেন। অর্থাৎ নিজ ত্রুটিজনিত ভয় ও আল্লাহ তাআলার রহমতপ্রসূত আশা- এ উভয় গুণের সম্মিলন দ্বারাই ইবাদত যথার্থ রূপ লাভ করে।

এভাবেই আমি মৃতদেরকেও জীবিত করে তুলব। হয়ত (এসব বিষয়ে চিন্তা করে) তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে।[৩৩]

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِيْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ؕ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ﴿۵۸﴾

৫৮. আর যে ভূমি উৎকৃষ্ট তার ফসল তার প্রতিপালকের হুকুমে উৎপন্ন হয় এবং যে ভূমি নষ্ট হয়ে গেছে, তাতে মন্দ ফসল ছাড়া কিছুই উৎপন্ন হয় না।[৩৪] এভাবেই আমি নিদর্শনসমূহের বিভিন্ন দিক তুলে ধরি, সেই সব লোকের জন্য যারা মূল্য দেয়।

[৮]

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۵۹﴾

৫৯. আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম।[৩৫] সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়ের লোক! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই। নিশ্চয়ই আমি আশংকা করি তোমাদের উপর এক মহা দিনের শাস্তি আপতিত হবে।

---

৩৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেভাবে মৃত ভূমিতে প্রাণ সঞ্চার করেন, তেমনিভাবে তিনি মৃত মানুষের মধ্যেও প্রাণ দিতে সক্ষম। মৃত ভূমির সঞ্জীবিত হওয়ার বিষয়টা তোমরা দৈনন্দিন জীবনে লক্ষ্য করে থাক এবং এটাও স্বীকার কর যে, এসব আল্লাহ তাআলার কুদরতেই হয়। এর থেকে তোমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত যে, মানুষকে পুনর্জীবিত করার ক্ষমতাও আল্লাহর আছে। এটাকে তার ক্ষমতা-বহির্ভূত কাজ মনে করা এক চরম মূর্খতা।

৩৪. এর ভেতর সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, উৎকৃষ্ট জমির ফসলও যেমন উৎকৃষ্ট হয়, তেমনি যে সকল লোকের অন্তর উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ তাতে সত্যের অনুসন্ধিৎসা আছে, তারা আল্লাহ তাআলার কালাম দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে উপকৃত হয়। অপর দিকে নিকৃষ্ট জমিতে বৃষ্টি পড়া সত্ত্বেও যেমন তা থেকে বিশেষ উপকারী ফসল লাভ করা যায় না, তেমনি যাদের অন্তর জেদ ও হঠকারিতার দোষে দূষিত হয়ে গেছে, আল্লাহ তাআলার কালাম দ্বারা তারা উপকার লাভ করতে পারে না।

৩৫. ইসরাঈলী বর্ণনা অনুযায়ী হযরত নূহ আলাইহিস সালাম হযরত আদম আলাইহিস সালামের ওফাতের এক হাজার বছরেরও কিছু বেশি কাল পর জন্মগ্রহণ করেন। বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরাম এ সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন না। তাদের দু'জনের মধ্যে ঠিক কত কালের ব্যবধান ছিল তা নিশ্চিতভাবে জানার কোনও উপায় নেই। কুরআন মাজীদ দ্বারা জানা যায় এ দীর্ঘ কাল পরিক্রমায় মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কওমও বিভিন্ন রকম মূর্তি গড়ে নিয়েছিল। সূরা নূহে তাদের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আনকাবুতে (২৯ : ১৪) আছে, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে সাড়ে নয়শ' বছর পর্যন্ত সত্যের পথে ডেকেছিলেন। তিনি সর্বপ্রকারেই

৬০. তার সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ বলল, আমরা তো নিশ্চিতরূপেই দেখছি তুমি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে।

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۶۰﴾

৬১. নূহ উত্তর দিল, হে আমার সম্প্রদায়! কোনও বিভ্রান্তি আমাকে স্পর্শ করেনি। প্রকৃতপক্ষে আমি রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত রাসূল।

قَالَ یٰقَوْمِ لَیْسَ بِیْ ضَلٰلَةٌ وَّ لٰكِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۶۱﴾

৬২. আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছাই ও তোমাদের কল্যাণ কামনা করি। আল্লাহর পক্ষ হতে আমি এমন বিষয় জানি যে সম্পর্কে তোমরা জ্ঞাত নও।

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّیْ وَ اَنْصَحُ لَكُمْ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۶۲﴾

৬৩. তবে কি তোমরা এই কারণে বিস্ময়বোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের উপদেশ পৌঁছেছে। তোমাদেরই মধ্যকার একজন লোকের মাধ্যমে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে এবং তোমরা মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাক আর যাতে তোমাদের প্রতি (আল্লাহর) রহমত হয়?

اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِیُنْذِرَكُمْ وَ لِتَتَّقُوْا وَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۶۳﴾

৬৪. তথাপি তারা নূহকে মিথ্যাবাদী বলল। সুতরাং আমি তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল তাদেরকে রক্ষা[৩৬] করি

فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَیْنٰهُ وَ الَّذِیْنَ مَعَهٗ فِی الْفُلْكِ وَ اَغْرَقْنَا الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا

তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। সামান্য সংখ্যক ভাগ্যবান সাথী তাঁর কথায় ঈমান এনেছিল, যাদের অধিকাংশই ছিল গরীব শ্রেণীর লোক। কওমের বেশির ভাগ লোকই কুফরের পথ ধরে রাখে। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম অবিরত তাদেরকে আল্লাহ তাআলার আযাব সম্পর্কে ভয় দেখাতে থাকেন, কিন্তু কোনও মতেই যখন তারা মানল না, পরিশেষে তিনি বদদোয়া করলেন। ফলে তাদেরকে এক ভয়াল বন্যায় নিমজ্জিত করা হয়। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা ও তার কওমের উপর আপতিত বন্যা সম্পর্কে সূরা হুদ (১১ : ২৫-৪৩) ও সূরা নূহে (সূরা নং ৭১) বিস্তারিত বিবরণ আসবে। তাছাড়া সূরা মুমিনুন (২৩ : ২৩), সূরা শুআরা (২৬ : ১০৫) ও সূরা কামারেও (৫৪ : ৯) তাদের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য স্থানে তাদের কেবল বরাত দেওয়া হয়েছে।

৩৬. নৌকা ও বন্যার পূর্ণ ঘটনা ইনশাআল্লাহ সূরা হুদে আসবে।

قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿٦٤﴾

আর যারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করি। নিশ্চয়ই তারা ছিল অন্ধ লোক।

[৯]

وَ اِلٰی عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. আদ জাতির নিকট আমি তাদের ভাই হুদকে পাঠাই।[৩৭] সে বলল, হে আমার কওম! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই। তবুও কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না?

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِیْ سَفَاهَةٍ وَّ اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِیْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. তার সম্প্রদায়ের যে সর্দারগণ কুফর অবলম্বন করেছিল, তারা বলল, আমরা তো নিশ্চিতভাবে দেখছি, তুমি নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত রয়েছ এবং নিশ্চয়ই আমাদের ধারণা তুমি একজন মিথ্যুক লোক।

---

৩৭. আদ ছিল আরবদের প্রাথমিক যুগের একটি জাতি। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আনুমানিক দু' হাজার বছর পূর্বে ইয়ামানের হাজরামাওত অঞ্চলে তাদের বসবাস ছিল। দৈহিক শক্তি ও পাথর-ছেদন শিল্পে তাদের বিশেষ খ্যাতি ছিল। কালক্রমে তারা মূর্তি বানিয়ে তার পূজা শুরু করে দেয়। দৈহিক শক্তির কারণেও তারা মদমত্ত হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে হযরত হুদ আলাইহিস সালামকে তাদের কাছে নবী বানিয়ে পাঠানো হল। তিনি অত্যন্ত দরদের সাথে নিজ কওমকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন এবং তাদের সামনে তাওহীদের শিক্ষা পেশ করে আল্লাহ তাআলার শোকর গোজার বান্দা হওয়ার আহ্বান জানালেন। কিন্তু সৎ স্বভাবের সামান্য কিছু লোক ছাড়া বাকি সকলে তার কথা প্রত্যাখ্যান করল। এ অবস্থায় প্রথমে তাদেরকে খরায় আক্রান্ত করা হল। হযরত হুদ আলাইহিস সালাম তাদেরকে বললেন, এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তোমাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে। এখনও যদি তোমরা তোমাদের অসৎ কর্ম ছেড়ে দাও, তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন (১১ : ৫২)। কিন্তু কওমের উপর এ কথার কোন আছর হল না। উত্তরোত্তর তারা কুফর ও শিরকের পথেই এগিয়ে চলল। পরিশেষে তাদের প্রতি প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝা পাঠানো হল। এ আযাব একাধারে আট দিন তাদের উপর প্রবাহিত থাকল এবং এভাবে গোটা কওম ধ্বংস হয়ে গেল। এ জাতির ঘটনা আলোচ্য সূরা ছাড়াও সূরা হুদ (১১ : ৫০-৮৯), সূরা মুমিনুন (২৩ : ৩২), সূরা শুআরা (২৬ : ১২৪), সূরা হা-মীম-সাজদা (৪১ : ১৫), সূরা আহকাফ (৪৬ : ২১), সূরা কামার (৫৪ : ১৮), সূরা হাক্কা (৬৯ : ৬) ও সূরা ফাজরে (৮৯ : ৬) বর্ণিত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ এসব সূরায় তাদের ঘটনার বিভিন্ন দিক বিস্তারিত আসবে।

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. হুদ বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার কোনও নির্বুদ্ধিতা দেখা দেয়নি। বরং আমি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল।

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ﴿٦٨﴾

৬৮. আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বার্তাসমূহ পৌঁছিয়ে থাকি এবং আমি তোমাদের এমন এক কল্যাণকামী, যার প্রতি তোমরা আস্থা রাখতে পার।

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ؕ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. তবে কি তোমরা এ কারণে বিস্ময়বোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের উপদেশ পৌঁছেছে তোমাদেরই মধ্যকার একজন লোকের মাধ্যমে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে? তোমরা সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন তিনি নূহের সম্প্রদায়ের পর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং শারীরিক আকার-আকৃতিতে তোমাদেরকে অন্যদের অপেক্ষা বাড়-বাড়ন্ত রেখেছেন।[৩৮] সুতরাং তোমরা তাঁর নিয়ামতসমূহ স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলতা লাভ কর।

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. তারা বলল, তুমি কি এজন্যই আমাদের কাছে এসেছ যে, আমরা যেন শুধু আল্লাহরই ইবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদাগণ যাদের (যে মূর্তিদের) ইবাদত করত, তাদেরকে ত্যাগ করি? ঠিক আছে, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে তুমি আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ, তা আমাদের সামনে উপস্থিত কর।

---

৩৮. তারা এত লম্বা-চওড়া দেহের অধিকারী ছিল যে, সূরা ফাজরে (৮৯ : ৬) আল্লাহ তাআলা বলেন, তাদের মত জাতি কখনও কোনও দেশে জন্ম নেয়নি।

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ۭ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَاۗءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَاۗؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۭ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝

৭১. হূদ বলল, তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে শাস্তি ও ক্রোধের আপতন স্থির হয়ে গেছে। তোমরা কি আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছ এমন কতগুলো (মূর্তির) নাম সম্বন্ধে, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদাগণ রেখে দিয়েছ, যার সমর্থনে আল্লাহ কোনও প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি? সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝

৭২. সুতরাং আমি তাকে (হুদ আলাইহিস সালামকে) ও তার সঙ্গীদেরকে নিজ দয়ায় রক্ষা করলাম আর যারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল ও যারা মুমিন ছিল না তাদেরকে নির্মূল করলাম।

[১০]

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۭ قَدْ جَاۗءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ

৭৩. আর ছামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালিহকে[৩৯] পাঠাই। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনও মাবুদ

---

৩৯. ছামুদও ছিল আদ জাতিরই বংশধর। দৃশ্যত হযরত হুদ আলাইহিস সালাম ও তাঁর যে সকল সঙ্গী আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছিল, এরা তাদেরই আওলাদ ছিল। ছামুদ তাদের উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষের নাম। তাই এ জাতিকে দ্বিতীয় আদও বলা হয়ে থাকে। আরব ও শামের মধ্যবর্তী যে অঞ্চলকে তখন 'হিজর' বলা হত এবং বর্তমানে 'মাদাইনে সালিহ' বলা হয়, এ সম্প্রদায় সেখানেই বাস করত। এখনও সে অঞ্চলে তাদের ঘর-বাড়ির ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। ৭৪ নং আয়াতে তাদের পাহাড় কেটে নির্মিত যে ইমারতের কথা বর্ণিত হয়েছে আজও তার ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। আরবের মুশরিকগণ বাণিজ্য উপলক্ষে যখন সিরিয়া অঞ্চলে যেত এই উপদেশমূলক ধ্বংসাবশেষ তখন তাদের পথে পড়ত। কুরআন মাজীদের কয়েক স্থানে সেদিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এ সম্প্রদায়ের ভেতর কালক্রমে মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটেছিল এবং এর ফলে তাদের সমাজে নানা রকম অন্যায়-অপরাধ বিস্তার লাভ করেছিল। হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম ছিলেন এ জাতিরই একজন লোক। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর লক্ষ্যে তাকে নবী করে পাঠান। কিন্তু এক্ষেত্রেও সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটল। কওমের অধিকাংশ লোকই তার কথা প্রত্যাখ্যান করল। হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম যৌবন থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত ক্রমাগত তাদের মধ্যে তাবলীগের কাজ করে যেতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তারা দাবী করল, আপনি যদি সত্যিই নবী হয়ে থাকেন, তবে আপনি এই পাহাড় থেকে

مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۷۳﴾

নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক উজ্জ্বল প্রমাণ এসে গেছে। এটা আল্লাহর উটনী, যা তোমাদের কাছে একটি নিদর্শনরূপে এসেছে। সুতরাং তোমরা এটিকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও, যাতে আল্লাহর জমিতে চরে খেতে পারে এবং একে কোন মন্দ ইচ্ছায় স্পর্শ করো না। পাছে কোনও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদের পাকড়াও করে।

কোনও উটনী বের করে আমাদের সামনে উপস্থিত করুন। এটা করতে পারলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম দোয়া করলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়ায় পাহাড় থেকে একটি উটনী বের করে দেখালেন। তা দেখে কিছু লোক তো ঈমান আনল, কিন্তু তাদের বড় বড় সর্দার কথা রাখল না। তারা যে তাদের জেদ বজায় রাখল তাই নয়, বরং অন্য যে সব লোক ঈমান আনতে ইচ্ছুক ছিল তাদেরকেও নিবৃত্ত করল। হযরত সালিহ আলাইহিস সালামের আশংকা হল ওয়াদা ভঙ্গের কারণে তাদের উপর আল্লাহ তাআলার কোন আযাব এসে যেতে পারে। তাই তাদেরকে বললেন, তোমরা অন্ততপক্ষে এই উটনীটির কোনও ক্ষতি করো না। তাকে স্বাধীনভাবে চলে-ফিরে খেতে দাও। উটনীটির পূর্ণ এক কুয়া পানি দরকার হত। তাই তিনি পালা বণ্টন করে দিলেন যে, একদিন উটনীটি পানি পান করবে এবং একদিন এলাকার লোকে। কিন্তু কওমের লোক গোপনে চক্রান্ত করল। তারা ঠিক করল উটনীটিকে হত্যা করবে। পরিশেষে 'কুযার' নামক এক ব্যক্তি সেটিকে হত্যা করল। এ অবস্থায় হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন যে, এখন শাস্তি আসতে মাত্র তিন দিন বাকি আছে। অতঃপর তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। কোনও কোনও রিওয়ায়াতে আরও আছে, তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এই তিন দিনের প্রতিদিন তাদের চেহারার রং পরিবর্তন হতে থাকবে। প্রথম দিন চেহারার রং হবে হলুদ, দ্বিতীয় দিন লাল এবং তৃতীয় দিন সম্পূর্ণ কালো হয়ে যাবে। এতদসত্ত্বেও জেদী সম্প্রদায়টি তাওবা ও ইস্তিগফারে রত হল না; বরং তারা হযরত সালিহ আলাইহিস সালামকেই হত্যা করার ষড়যন্ত্র আঁটল, যা সূরা নামলে (২৭ : ৪৮) বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পথেই ধ্বংস করে দেন। ফলে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। অন্য দিকে হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম যেমন বলেছিলেন, সেভাবেই তাদের তিন দিন কাটে। এ অবস্থায়ই প্রচণ্ড ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায়। সেই সাথে আসমান থেকে এক ভয়াল শব্দ আসতে থাকে এবং তাতে গোটা সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম ও তার সম্প্রদায়ের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদ (১১ : ৬১), সূরা শুআরা (২৬ : ১৪১), সূরা নামল (২৭ : ৪৫) ও সূরা কামারে (৫৪ : ২৩) বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া সূরা হিজর, সূরা যারিয়াত, সূরা নাজম, সূরা হাক্কা ও সূরা শামসেও তাদের অবস্থা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেন এবং যমীনে তোমাদেরকে এভাবে প্রতিষ্ঠা দান করেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ করছ ও পাহাড় কেটে গৃহের মত তৈরি করছ। সুতরাং আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে বেড়িও না।

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক নেতৃবর্গ, যে সকল দুর্বল লোক ঈমান এনেছিল, তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি এটা বিশ্বাস কর যে, সালিহ নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল? তারা বলল, নিশ্চয়ই আমরা তো তাঁর মাধ্যমে প্রেরিত বাণীতে ঈমান রাখি।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. সেই দাম্ভিক লোকেরা বলল, তোমরা যে বাণীতে ঈমান এনেছ আমরা তো তা প্রত্যাখ্যান করি।

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. সুতরাং তারা উটনীটি মেরে ফেলল ও তাদের প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল এবং বলল, সালিহ! সত্যিই তুমি নবী হয়ে থাকলে আমাদেরকে যার (যে শাস্তির) ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো।

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. পরিণাম এই হল যে, তারা ভূমিকম্পে আক্রান্ত হল এবং তারা নিজ-নিজ বাড়িতে অধঃমুখে পড়ে থাকল।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯. অতঃপর সালিহ তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল এবং বলতে লাগল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছিয়েছিলাম এবং তোমাদের কল্যাণ

কামনা করেছিলাম, কিন্তু (আফসোস!) তোমরা কল্যাণকামীদেরকে পসন্দ করো না।

৮০. এবং লুতকে পাঠালাম।[৪০] যখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের আগে সারা বিশ্বে কেউ করেনি?

وَلُوۡطًا اِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهٖۤ اَتَاۡتُوۡنَ الۡفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمۡ بِهَا مِنۡ اَحَدٍ مِّنَ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۸۰﴾

৮১. তোমরা কামেচ্ছা পূরণের জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষের কাছে যাও (আর এটা তো কোনও আকস্মিক ব্যাপার নয়;) বরং তোমরা এমন লোক যে, (সভ্যতার) সীমা চরমভাবে লংঘন করেছ।

اِنَّكُمۡ لَتَاۡتُوۡنَ الرِّجَالَ شَهۡوَةً مِّنۡ دُوۡنِ النِّسَآءِ ؕ بَلۡ اَنۡتُمۡ قَوۡمٌ مُّسۡرِفُوۡنَ ﴿۸۱﴾

---

৪০. হযরত লুত আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভাতিজা। মহান চাচার মত তিনিও ইরাকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন ইরাক থেকে হিজরত করেন, তখন তিনিও তাঁর সাথে দেশ ত্যাগ করেছিলেন। অতঃপর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তো ফিলিস্তিন অঞ্চলে বসত গ্রহণ করেছিলেন। আর আল্লাহ তাআলা হযরত লুত আলাইহিস সালামকে জর্ডানের সাদূম (Sodom) এলাকায় নবী করে পাঠান। সাদূম ছিল একটি কেন্দ্রীয় নগর। আমূরা প্রভৃতি জনপদ তার আওতাধীন ছিল। এসব জনপদের লোকজন একটি নির্লজ্জ কুকর্মে লিপ্ত ছিল। তারা সমকাম (Homsexuality) করত। কুরআন মাজীদের বর্ণনা অনুযায়ী এ রকম অভিশপ্ত কাজ তাদের আগে দুনিয়ায় আর কেউ কখনও করেনি। হযরত লুত আলাইহিস সালাম তাদের কাছে আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী পৌঁছালেন এবং তাঁর শাস্তি সম্পর্কেও সতর্ক করলেন, কিন্তু তারা কিছুতেই নিজেদের নির্লজ্জতা পরিত্যাগ করতে রাজি হল না। পরিশেষে তাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হল এবং গোটা জনপদটিকে উল্টিয়ে দেওয়া হল। বর্তমানে মৃত সাগর (Dead Sea) নামে যে প্রসিদ্ধ সাগর আছে, বলা হয়ে থাকে সে জনপদটি এর ভেতর তলিয়ে গেছে অথবা তা এর আশপাশেই ছিল, কিন্তু তার কোনও চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। এ সম্প্রদায়ের সাথে হযরত লুত আলাইহিস সালামের কোন বংশীয় সম্পর্ক ছিল না। তবুও এ আয়াতে তাদেরকে তার কওম বলা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা ছিল তার উম্মত এবং তাদের কাছে তাঁকে নবী করে পাঠানো হয়েছিল। তাদের ঘটনা সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত পাওয়া যায় সূরা হুদে (১১ : ৬৯-৮৩)। তাছাড়া সূরা হিজর (১৫ : ৫২-৮৪), শুআরা (২৬ : ১৬০-১৭৪) ও আনকাবূতেও (২৯ : ২৬-৩৫) তাদের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। সূরা যারিয়াত (৫১ : ২৪-৩৭) ও সূরা তাহরীমেও (৬৬ : ১০) তাদের বরাত দেওয়া হয়েছে।

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. তার সম্প্রদায়ের উত্তর ছিল কেবল এই যে, 'এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক, যারা বড় পবিত্র থাকতে চায়।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. অতঃপর এই ঘটল যে, আমি তাকে (অর্থাৎ লুত আলাইহিস সালামকে) ও তার পরিবারবর্গকে (জনপদ থেকে বের করে) রক্ষা করলাম, তবে তার স্ত্রী ছাড়া। সে অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে শামিল থাকল (যারা আযাবের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়)।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. আমি তাদের উপর (পাথরের) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। সুতরাং দেখ, সে অপরাধীদের পরিণাম কেমন (ভয়াবহ) হয়েছিল।

[১১]

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا

৮৫. আর মাদয়ানের কাছে তাদের ভাই শুআইবকে[৪১] পাঠালাম। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর

---

৪১. মাদয়ান একটি গোত্রের নাম। এ নামে একটি জনপদও ছিল, যেখানে হযরত শুআইব আলাইহিস সালামকে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছিল। তাঁর আমল ছিল হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সামান্য আগে। কোনও কোনও বর্ণনা দ্বারা জানা যায় তিনিই হযরত মূসা আলাইহিস সালামের শ্বশুর ছিলেন। মাদয়ান ছিল একটি সবুজ-শ্যামল এলাকা। লোকজন বড় সচ্ছল ও সমৃদ্ধশালী ছিল। কালক্রমে তাদের মধ্যে কুফর ও শিরকসহ বহু দুষ্কর্ম চালু হয়ে যায়। তারা মাপজোখে হেরফের করত। তাদের মধ্যে যাদের পেশিশক্তি ছিল, তারা পথে-পথে টোল বসিয়ে পথচারীদের থেকে জোরপূর্বক কর আদায় করত। অনেকে ডাকাতিও করত। তাছাড়া যাদেরকে দেখত হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের কাছে যাওয়া আসা করে তাদেরকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করত ও তাদের প্রতি জুলুম-নির্যাতন করত। সামনে দুই আয়াতে তাদের দুষ্কর্মের বর্ণনা আসছে। হযরত শুআইব আলাইহিস সালামকে তাদের কাছে নবী করে পাঠান হল। তিনি বিভিন্ন পন্থায় তাদেরকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে বক্তৃতা-বিবৃতির বিশেষ যোগ্যতা দান করেছিলেন, এ কারণেই তিনি খাতীবুল আম্বিয়া (নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বাগ্মী) উপাধিতে খ্যাত। কিন্তু নিজ কওমের উপর তার হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার কোনও আছর হল না। পরিশেষে তারা আল্লাহ তাআলার আযাবের নিশানা হয়ে গেল। হযরত শুআইব

اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ﴿۸۵﴾

ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে স্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। সুতরাং মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে ও মানুষের মালিকানাধীন বস্তুসমূহে তাদের অধিকার খর্ব করবে না[৪২] আর দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর অশান্তি বিস্তার করবে না।[৪৩] এটাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর পথ– যদি তোমরা আমার কথা মেনে নাও।

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۪ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۸۶﴾

৮৬. মানুষকে ধমকানোর জন্য এবং যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দান ও তাতে বক্রতা সন্ধানের উদ্দেশ্যে পথে-ঘাটে বসে থাকবে না। সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন তোমরা অল্প ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে বৃদ্ধি করে দিলেন[৪৪] এবং লক্ষ্য কর অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হয়েছে।

আলাইহিস সালাম ও তার সম্প্রদায়ের ঘটনা সর্বাপেক্ষা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদে (১১ : ৮৪–৯৫) বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া সূরা শুআরা (২৬ : ১৭৭) ও সূরা আনকাবুতে (২৯ : ৩৬) তাদের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। সূরা হিজরে (১৫ : ৭৮) সংক্ষেপে তাদের বরাত দেওয়া হয়েছে।

৪২. এর দ্বারা বোঝা যায় মাপে হেরফের করা ছাড়াও তারা অন্যান্য পন্থায় মানুষের হক নষ্ট করত। এ আয়াতে بخس শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ কম করা। কিন্তু সাধারণত শব্দটি অন্যের হক মেরে দেওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদে এ বাক্যটির তিন জায়গায় অত্যন্ত জোরদার ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং এতে অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখানোর তাকীদ করা হয়েছে। যে সকল কাজে এ সম্মান বিনষ্ট হয় তা সবই পরিত্যাজ্য, যথা অন্যের সম্পদ বা জায়েদাদ তার সম্মতি ছাড়া দখল করা, কারও কোনও জিনিস তার মনের সন্তুষ্টি ছাড়া ব্যবহার করা ইত্যাদি।

৪৩. এর ব্যাখ্যার জন্য পেছনে ৫৬.নং আয়াতের টীকা দেখুন।

৪৪. এর দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য উভয়ই বোঝানো হয়েছে।

৮৭. আমার মাধ্যমে যা পাঠানো হয়েছে, তাতে যদি তোমাদের এক দল ঈমান আনে এবং অন্য দল ঈমান না আনে, তবে সেই সময় পর্যন্ত একটু সবর কর, যখন আল্লাহ আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন।[৪৫] আর তিনিই শ্রেষ্ঠতম ফায়সালাকারী।

وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

[নবম পারা]

৮৮. তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দারগণ বলল, হে শুআয়ব! আমরা পাকাপাকিভাবে ইচ্ছা করেছি, তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের সকলকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব, অন্যথায় তোমাদের সকলকে আমাদের দ্বীনে ফিরে আসতে হবে। শুআইব বলল, আমরা যদি (তোমাদের দ্বীনকে) ঘৃণা করি তবুও কি?

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ۭ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৯. আমরা যদি তোমাদের দ্বীনে ফিরে যাই, যখন আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তবে তো আমরা আল্লাহর প্রতি অতি বড় মিথ্যারোপ করব।[৪৬] বস্তুত তাতে ফিরে যাওয়া

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ۭ وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ

৪৫. প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের একটি কথার উত্তর। তারা বলত, আমরা তো মুমিন ও কাফেরদের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না। যারা ঈমান আনেনি, তারাও সুখ-সাচ্ছন্দ্যের ভেতর জীবন যাপন করছে। তাদের পথ যদি আল্লাহর পসন্দ না হত, তবে তাদেরকে তিনি এমন সুখের জীবন দেবেন কেন? উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, বর্তমানের সুখ-সমৃদ্ধি দেখে এই ধোঁকায় পড়া উচিত নয় যে, অবস্থা সর্বদা এমনই থাকবে। আগামীতে আল্লাহ তাআলার ফায়সালা কী হয় সেই অপেক্ষা কর।

৪৬. হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের সঙ্গীগণ পূর্বে তো তাদের কওমের ধর্মেই ছিল। পরে তারা ঈমান এনেছে। কাজেই তাদের সম্পর্কে 'পুরানো ধর্মে ফিরে যাওয়া' শব্দের ব্যবহার ঠিকই আছে, কিন্তু হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম তো কখনও তাদের ধর্মে ছিলেন না। তাঁর সম্পর্কে এ শব্দ ব্যবহারের কারণ কী? এর উত্তর এই যে, নবুওয়াতের আগে তাঁর কওমের লোক মনে করত তিনি তাদেরই ধর্মের অনুসারী। এ কারণেই তারা তাঁর জন্যও এ শব্দ ব্যবহার করেছিল। হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম উত্তরও দিয়েছেন তাদেরই শব্দে।

فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَٰتِحِينَ ﴿٨٩﴾

আমাদের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়- হাঁ আমাদের প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সেটা ভিন্ন কথা।[৪৭] আমাদের প্রতিপালক নিজ জ্ঞান দ্বারা সবকিছু বেষ্টন করে রেখেছেন। আমরা আল্লাহরই প্রতি নির্ভর করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে ফায়সালা করে দিন। আপনিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী।

وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ لَئِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ ﴿٩٠﴾

৯০. তার সম্প্রদায়ের সর্দারগণ যারা কুফরকেই ধরে রেখেছিল, (সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকদেরকে) বলল, তোমরা যদি শুআইবের অনুসরণ কর, তবে মনে রেখ তোমরা তখন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ ﴿٩١﴾

৯১. অতঃপর তারা ভূমিকম্পে আক্রান্ত হল[৪৮] এবং তারা নিজেদের বাড়িতে অধঃমুখে পড়ে থাকল।

---

৪৭. এটা উচ্চ স্তরের আবদিয়াত (দাসত্ব)-এর অভিব্যক্তিমূলক বাক্য। এর অর্থ এই যে, কোনও ব্যক্তিই নিজ সংকল্প দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে কোনও বিষয়ে বাধ্য করতে পারে না। আমরা নিজেদের পক্ষ হতে তো স্থিরসংকল্প রয়েছে যে, কখনও তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করব না, কিন্তু নিজেদের এ সংকল্প অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব কেবল আল্লাহ তাআলার তাওফীক দ্বারাই। তিনি চাইলে তো আমাদের অন্তর ঘুরিয়েও দিতে পারেন। এটা ভিন্ন কথা যে, কোন বান্দা ইখলাসের সাথে সঠিক পথে থাকার ইচ্ছা করলে তার অন্তর গোমরাহীর দিকে ঝোঁকে না। কার ইখলাস কেমন তার পূর্ণ জ্ঞান তাঁর রয়েছে। সুতরাং ইখলাসের সাথে কোন কাজের পরিপক্ক ইচ্ছা করার পর আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করা উচিত, যাতে তিনি সে ইচ্ছা পূরণ করেন। এভাবে হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম এ বাক্য দ্বারা শিক্ষা দিচ্ছেন যে, যে কোনও নেক কাজ করার সময় নিজ সংকল্প ও চেষ্টার উপর ভরসা না করে আল্লাহ তাআলার উপরই ভরসা করা চাই।

৪৮. সে জাতির উপর যে আযাব এসেছিল তা বোঝানোর জন্য কুরআন মাজীদ এখানে الرجفة (ভূমিকম্প) শব্দ ব্যবহার করেছে। সূরা হুদে বলা হয়েছে صيحة (প্রচণ্ড শব্দ) আর সূরা শুআরায় বলা হয়েছে عذاب يوم الظلة (মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি)। হযরত আবদুল্লাহ

ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا۟ فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ شُعَيْبًا كَانُوا۟ هُمُ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٩٢﴾

৯২. যারা শুআইবকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা এমন হয়ে গেল, যেন তারা সেখানে কখনও বসবাসই করেনি। যারা শুআইবকে প্রত্যাখ্যান করেছিল শেষ পর্যন্ত তারা ক্ষতিগ্রস্তই হল।

فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَٰفِرِينَ ﴿٩٣﴾

৯৩. সুতরাং সে (শুআইব আলাইহিস সালাম) তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল এবং বলতে লাগল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের কাছে আমার রব্বের বাণীসমূহ পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছিলাম। (কিন্তু) যে সম্প্রদায় ছিল অকৃতজ্ঞ আমি তাদের জন্য কিভাবে আক্ষেপ করি!

[১২]

وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّبِىٍّ إِلَّآ أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٩٤﴾

৯৪. আমি যে-কোনও জনপদে নবী পাঠিয়েছি, তার অধিবাসীদেরকে অবশ্যই অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত করেছি, যাতে তারা বিনয় অবলম্বন করে।[৪৯]

ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর একটি বর্ণনায় আছে, তাদের উপর প্রথমে প্রচণ্ড গরম পড়ে, যাতে অস্থির হয়ে তারা চিৎকার করতে থাকে। তারপর নগরের বাইরে মেঘ দেখা দেয়। সেখানে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। তারা সব শহর ছেড়ে সেখানে গিয়ে জড়ো হয়। সহসা সেই মেঘ থেকে অগ্নি বর্ষণ শুরু হল। একেই মেঘাচ্ছন্ন দিবস শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। তারপর আসল ভূমিকম্প (রূহুল মাআনী)। ভূমিকম্পের সাথে সাধারণত আওয়াজও থাকে। তাই এ শাস্তিকে صيحة অর্থাৎ প্রচণ্ড শব্দ বলা হয়েছে।

৪৯. বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করেছেন, তাদেরকে যে আকস্মিক রাগের বশে ধ্বংস করেছেন এমন নয়। বরং তাদেরকে সঠিক পথে আসার জন্য বছরের পর বছর সুযোগ দিয়েছেন এবং সব রকমের ব্যবস্থা করেছেন। প্রথমত তাদের কাছে নবী পাঠিয়েছেন, যে নবী তাদেরকে বছরের পর বছর সাবধান করতে থেকেছেন। তারপর তাদেরকে আর্থিক কষ্ট ও বিভিন্ন রকমের বালা-মুসিবতে ফেলেছেন, যাতে তাদের মন কিছুটা নরম হয়। কেননা বহু লোক এ রকম অবস্থায় আল্লাহর দিকে রুজু হয় এবং কষ্ট-ক্লেশের ভেতর অনেক সময় সত্য গ্রহণের যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। এরূপ ক্ষেত্রে যখন নবী তাদেরকে এই বলে সতর্ক করেন যে, এখনও সময় আছে তোমরা শুধরে যাও, আল্লাহ তাআলা এ মুসিবত দ্বারা একটা সংকেত দিয়েছেন মাত্র, এটা যে কোনও সময় মহা শাস্তির রূপও নিতে পারে, তখন কোনও কোনও লোকের মন ঠিকই নরম হয়। অপর দিকে কিছু লোক এমনও থাকে, সুখ-সাচ্ছন্দ্য লাভ হলে যাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার দয়া ও কৃপার

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝٩٥

৯৫. তারপর আমি অবস্থা পরিবর্তন করেছি। দূরাবস্থার স্থানে সুখ-সাচ্ছন্দ্য দিয়েছি, এমনকি তারা সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে এবং বলতে শুরু করে, দুঃখ ও সুখ তো আমাদের বাপ-দাদাগণও ভোগ করেছে। অতঃপর আমি অকস্মাৎ তাদেরকে এভাবে পাকড়াও করি যে, তারা (আগে থেকে) কিছুই টের করতে পারেনি।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝٩٦

৯৬. যদি সে সকল জনপদবাসী ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত তবে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী উভয় দিক থেকে বরকতের দরজাসমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা (সত্য) প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং তাদের ক্রমাগত অসৎ কর্মের পরিণামে আমি তাদেরকে পাকড়াও করি।

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ۝٩٧

৯৭. এবার বল, (অন্যান্য) জনপদবাসীরা কি এ বিষয় হতে সম্পূর্ণ নির্ভয় হয়ে গেছে যে, কোনও রাতে তাদের উপর আমার শাস্তি এ অবস্থায় আপতিত হবে, যখন তারা থাকবে ঘুমন্ত?[৫০]

অনুভূতি জাগ্রত হয় এবং তখন সত্য গ্রহণের জন্য তারা অপেক্ষাকৃত বেশি আগ্রহী হয়। সুতরাং তাদেরকে দুঃখ-দৈন্যের পর সুখ-সাচ্ছন্দ্যও দান করা হয়ে থাকে, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পায়। অবস্থার এ পরিবর্তন দ্বারা কিছু লোক তো অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সঠিক পথে চলে আসে, কিন্তু জেদী চরিত্রের কিছু এমন লোকও থাকে, যারা এসব দ্বারা কোনও শিক্ষা গ্রহণ করে না। বরং তারা বলে, এরূপ সুখ-দুঃখ ও ঠাণ্ডা-গরমের পালা বদল আমাদের বাপ-দাদাদের জীবনেও দেখা দিয়েছে। কাজেই এসবকে অহেতুকভাবে আল্লাহ তাআলার কোনও সংকেত সাব্যস্ত করার দরকার কী? এভাবে যখন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার সব রকমের প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে যায়, তখন এক সময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে আযাব এসে পড়ে। তখন তাদেরকে এমন আকস্মিকভাবে ধরা হয় যে, তারা আগে থেকে কিছুই টের করতে পারে না।

৫০. এসব ঘটনার বরাত দিয়ে মক্কার কাফেরদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলার গযব ও ক্রোধ সম্বন্ধে কারওই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা উচিত নয়। আসলে এটা কেবল মক্কার কাফেরদের জন্যই নয়; বরং যে ব্যক্তিই কোনও রকমের গুনাহ, মন্দ কাজ বা জুলুমে লিপ্ত থাকে, তার উচিত সদা-সর্বদা এসব আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর প্রতি খেয়াল রাখা।

أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾

৯৮. এসব জনপদবাসীর কি এ বিষয়ের (-ও) কোনও ভয় নেই যে, তাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হবে পূর্বাহ্নে, যখন তারা খেলাধুলায় মেতে থাকবে?

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾

৯৯. তবে কি এসব লোক আল্লাহ প্রদত্ত অবকাশ (-এর পরিণাম) সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে?[৫১] (যদি তাই হয়) তবে (তারা যেন স্মরণ রাখে) আল্লাহ প্রদত্ত অবকাশ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে কেবল তারাই বসে থাকে, যারা শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

[১৩]

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

১০০. যারা কোন ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের (ধ্বংসপ্রাপ্তির) পর তার উত্তরাধিকারী হয় তারা কি এই শিক্ষা লাভ করেনি যে, আমি চাইলে তাদেরকেও তাদের কোনও গুনাহের কারণে কোন মুসিবতে আক্রান্ত করতে পারি? এবং (যারা হঠকারিতাবশত এ শিক্ষা গ্রহণ করে না) আমি তাদের অন্তরে মোহর করে দেই, ফলে তারা কোনও কথা শুনতে পায় না।

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۚ فَمَا كَانُوا

১০১. এই হচ্ছে সেই সব জনপদ, যার ঘটনাবলী তোমাকে শোনাচ্ছি। বস্তুত তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট

---

৫১. এখানে মূল শব্দ হচ্ছে مكر এর অর্থ এমন গুপ্ত কৌশল, যার উদ্দেশ্য যার বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করা হয় সে বুঝতে পারে না। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এমন কৌশলের অর্থ হচ্ছে, তিনি মানুষকে তাদের পাপাচার সত্ত্বেও দুনিয়ায় বাহ্যিক সুখ-সাচ্ছন্দ্য দিয়ে থাকেন, যার উদ্দেশ্য হয় তাদেরকে ঢিল ও অবকাশ দেওয়া। তারা যখন সেই অবকাশের ভেতর উপর্যুপরি পাপাচার করেই যেতে থাকে, তখন এক পর্যায়ে আকস্মিকভাবে তাদেরকে পাকড়াও করা হয়। সুতরাং সুখ-সাচ্ছন্দ্যের ভেতরও নিজ আমল সম্পর্কে মানুষের গাফেল থাকা উচিত নয়। বরং সর্বদা আত্মসংশোধনে যত্নবান থাকা চাই। অন্তরে এই ভীতি জাগরুক রাখা চাই যে, সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হলে এই সুখ-সাচ্ছন্দ্য আমার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রদত্ত ঢিল ও অবকাশও হতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে নিজ আশ্রয়ে রাখুন।

لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾

প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা পূর্বে যা প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাতে ঈমান আনার জন্য কখনও প্রস্তুত ছিল না। যারা কুফর অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের অন্তরে এভাবেই মোহর করে দেন।

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۖ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾

১০২. আমি তাদের অধিকাংশের ভেতরই অঙ্গীকার রক্ষার মানসিকতা দেখতে পাইনি। প্রকৃতপক্ষে আমি তাদের অধিকাংশকেই পেয়েছি অবাধ্য।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. অতঃপর আমি তাদের সকলের পর মূসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে পাঠালাম।[৫২] তারাও এর (অর্থাৎ নিদর্শনাবলীর) প্রতি জালিম সুলভ আচরণ করল। সুতরাং দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে।

---

৫২. এখান থেকে ১৬২ নং আয়াত পর্যন্ত হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে ফিরাউনের সাথে তার কথোপকথন ও উভয়ের পারস্পরিক মুকাবিলা, ফিরাউনের নিমজ্জন ও হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি তাওরাত নাযিলের ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের চতুর্থ অধঃস্তন পুরুষ। সূরা ইউসুফে আছে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যখন মিসরের অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়, তখন তিনি নিজ পিতা-মাতা ও ভাইদেরকে ফিলিস্তিন থেকে মিসরে আনিয়ে নিয়েছিলেন। ইসরাঈলী বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধরগণ, যারা বনী ইসরাঈল নামে পরিচিত, মিসরেরই বাসিন্দা হয়ে যায়। মিসরের বাদশাহ তাদের জন্য নগরের বাইরে পৃথক একটি জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল। মিসরের প্রত্যেক বাদশাকে ফিরাউন বলা হত। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ইন্তিকালের পর মিসরের বাদশাহের কাছে বনী ইসরাঈল নিজেদের মর্যাদা হারাতে শুরু করে, এমনকি এক পর্যায়ে বাদশাহগণ তাদেরকে নিজেদের দাস বানিয়ে নেয়। অপর দিকে তাদের মধ্যকার এক ফিরাউন (আধুনিক গবেষণা অনুযায়ী যার নাম মিনিফ্‌তাহ) ক্ষমতার মদমত্ততায় এসে নিজেকে খোদা দাবী করে বসে। এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে তার কাছে নবী বানিয়ে পাঠালেন। তাঁর জন্ম, মাদয়ান অভিমুখে হিজরত, অতঃপর নবুওয়াত লাভ ইত্যাদি ঘটনাবলী ইনশাআল্লাহ সূরা তোয়াহা (সূরা নং ২০) ও সূরা কাসাসে (সূরা নং ২৮) আসবে। এছাড়া আরও ৩৫টি সূরায় তার ঘটনার বিভিন্ন দিক বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ফিরাউনের সাথে তাঁর যেসব ঘটনা ঘটেছিল, এস্থলে তা বিবৃত হচ্ছে।

১০৪. মূসা বলেছিল, হে ফিরাউন! নিশ্চয়ই আমি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে নবী হয়ে এসেছি।

وَقَالَ مُوسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৫. এটা আমার জন্য ফরয যে, আমি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে সত্য ছাড়া অন্য কোন কথা বলব না। আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি। অতএব বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে যেতে দাও।

حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٠٥﴾

১০৬. সে বলল, তুমি যদি কোন নিদর্শন এনে থাক তবে তা পেশ কর- যদি তুমি সত্যবাদী হও।

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৭. ফলে মূসা নিজ লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তৎক্ষণাৎ তা এক সাক্ষাৎ অজগরে পরিণত হল।

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٠٧﴾

১০৮. এবং নিজ হাত (বগল থেকে) বের করল, সহসা তা দর্শকদের সামনে চমকাতে লাগল।[৫৩]

وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿١٠٨﴾

[১৪]

১০৯. ফিরাউনের কওমের সর্দারগণ (একে অন্যকে) বলতে লাগল, নিশ্চয়ই এ একজন দক্ষ যাদুকর।

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٩﴾

১১০. সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এখন বল, তোমাদের পরামর্শ কী?

يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿١١٠﴾

১১১. তাবা বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও এবং সবগুলো নগরে বার্তাবাহকদের পাঠাও।

قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿١١١﴾

---

৫৩. এ দু'টি ছিল মুজিযা, যা আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দান করেছিলেন। কথিত আছে, সে যুগে যাদুর ব্যাপক প্রচলন ছিল। তাই তাঁকে এমন মুজিযা দেওয়া হল, যা যাদুকরদেরকেও হার মানিয়ে দেয় এবং সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলের কাছে তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা স্পষ্ট হয়ে যায়।

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾

১১২. যাতে তারা সকল দক্ষ যাদুকরকে তোমার কাছে নিয়ে আসে।[৫৪]

وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِينَ ﴿١١٣﴾

১১৩. (সুতরাং তাই করা হল) এবং যাদুকরগণ ফিরাউনের কাছে চলে আসল (এবং) তারা বলল, আমরা যদি (মূসার বিরুদ্ধে) বিজয়ী হই, তবে আমরা অবশ্যই পুরস্কার লাভ করব তো?

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾

১১৪. ফিরাউন বলল, হাঁ এবং তোমরা আমার ঘনিষ্ঠ লোকদের মধ্যে গণ্য হবে।

قَالُوا يٰمُوسٰٓى إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾

১১৫. তারা (মূসা আলাইহিস সালামকে) বলল, হে মূসা! চাইলে তুমি (যা নিক্ষেপের ইচ্ছা রাখ তা) নিক্ষেপ কর নয়ত আমরা (আমাদের যাদুর বস্তু) নিক্ষেপ করি?

قَالَ أَلْقُوا ۚ فَلَمَّآ أَلْقَوْا سَحَرُوٓا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾

১১৬. মূসা বলল, তোমরাই নিক্ষেপ কর। সুতরাং তারা যখন (তাদের রশি ও লাঠি) নিক্ষেপ করল, তখন তারা লোকের চোখে যাদু করল, তাদেরকে আতঙ্কিত করল এবং বিরাট যাদু প্রদর্শন করল।

وَأَوْحَيْنَآ إِلٰى مُوسٰٓى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾

১১৭. আর আমি ওহীর মাধ্যমে মূসাকে আদেশ করলাম, তুমি নিজ লাঠি নিক্ষেপ কর। তারপর তো এই হল যে, সেটি সহসা সেই জিনিসগুলো গ্রাস করতে লাগল যা তারা ভেল্কি দিয়ে তৈরি করেছিল।

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾

১১৮. এভাবে সত্য সকলের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল এবং তারা যা-কিছু করছিল তা মিথ্যা সাব্যস্ত হল।

---

৫৪. যাদুকরদেরকে একত্র করার উদ্দেশ্য ছিল তাদের দ্বারা মুকাবিলা করিয়ে মূসা আলাইহিস সালামকে হার মানানো।

فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾

১১৯. সেখানে তারা পরাজিত হল ও (প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে) লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে গেল।

وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২০. আর এ ঘটনা যাদুকরগণকে অপ্রত্যাশিতভাবে সিজদায়[৫৫] পতিত করল।

قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢١﴾

১২১. তারা বলে উঠল, আমরা সেই রাব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান এনেছি,

رَبِّ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

১২২. যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক।

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. ফিরাউন বলল, আমি অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা এই ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই এটা কোন চক্রান্ত। তোমরা এই শহরে পারস্পরিক যোগসাজশে এই চক্রান্ত করেছ, যাতে তোমরা এর বাসিন্দাদেরকে এখান থেকে বহিষ্কার করতে পার। আচ্ছা, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে।

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. আমি চূড়ান্ত ইচ্ছা করেছি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব তারপর তোমাদের সকলকে একত্রে শূলে চড়াব।

قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. তারা বলল, নিশ্চিত জেনে রেখ, (মৃত্যুর পর) আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছেই ফিরে যাব।

---

৫৫. এখানে কুরআন মাজীদে কর্মবাচ্য ক্রিয়াপদ اُلْقِىَ ব্যবহার করা হয়েছে, যার আক্ষরিক অর্থ 'ফেলে দেওয়া হল'। এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়াল যে, তাদের অন্তকরণ তাদেরকে সিজদায় পড়ে যেতে বাধ্য করল। আয়াতের তরজমায় এ দিকটা রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ স্থলে ঈমানের শক্তি লক্ষ্য করুন, নিজ ধর্মের পক্ষে লড়াই করার জন্য যে যাদুকরগণ ক্ষণিক পূর্বে ফিরাউনের কাছে পুরস্কার লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল, আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনামাত্র তাদের বুকে এমনই সাহস দেখা দিল যে, ফিরাউনের মত স্বৈরাচারী শাসকের হুমকিকে তারা একটুও পাত্তা দিল না। আল্লাহ তাআলার কাছে চলে যাওয়ার অদম্য আগ্রহে তার সম্মুখে কেমন বেপরোয়া হয়ে উঠল!

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿۱۲۶﴾

১২৬. তুমি আমাদের পক্ষ হতে কেবল এ কাজের দরুণই তো ক্ষুব্ধ হয়েছ যে, যখন আমাদের কাছে আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী এসে গেল তখন আমরা তাতে ঈমান এনেছি? হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর সবরের পাত্র ঢেলে দাও এবং তোমার তাবেদাররূপে আমাদের মৃত্যু দান কর।

[১৫]

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ؕ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ﴿۱۲۷﴾

১২৭. ফিরাউনের কওমের নেতৃবর্গ (ফিরাউনকে) বলল, আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে মুক্ত ছেড়ে দিবেন, যাতে তারা (অবাধে) পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করতে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে বর্জন করতে পারে?[৫৬] সে বলল, আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব, আর তাদের উপর আমাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা আছে।

---

৫৬. অনুমান করা যায়, যে সকল যাদুকর ঈমান এনেছিল ফিরাউন তাদেরকে শাস্তির হুমকি দিলেও হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মুজিযা এবং যাদুকরদের ঈমান ও অবিচলতা দেখে মানসিকভাবে দমে গিয়েছিল। বিশেষত বনী ইসরাঈলের বিপুল সংখ্যক লোক ঈমান আনায় তাৎক্ষণিকভাবে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও তার অনুসারীদের উপর হাত তোলার সাহস তার হয়নি। সমাবেশ ভেঙ্গে যাওয়ার পর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর অনুসারীগণ নিজ-নিজ বাড়ি চলে গেল। এ সময়েই ফিরাউনের অমাত্যবর্গ ওই কথা বলেছিল, যা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তাদের কথার সারমর্ম এই যে, আপনি তো ওদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দিলেন। এখন দিন-দিন শক্তি সঞ্চয় করে ওরা আপনার জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠবে। ফিরাউন নিজ অপমান লুকানোর জন্য তাদেরকে উত্তর দিল, আপাতত আমি তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করলেও আগামীতে আমি তাদের দেখে নেব। আমি বনী ইসরাঈলকে এক-একজন করে খতম করব। তবে তাদের নারীদেরকে হত্যা করব না। তাদেরকে আমাদের সেবিকা বানাব। সে তার লোকদেরকে এ ব্যাপারেও আশ্বস্ত করল যে, পরিবেশ-পরিস্থিতি তার করায়ত্ত রয়েছে এবং তার কর্ম-কৌশল এমন নিখুঁত যে, কোনও রকম বিপদ সৃষ্টিরও আশঙ্কা নেই। এভাবে বনী ইসরাঈলের পুরুষদেরকে হত্যা করার এক নতুন যুগ শুরু হয়ে গেল। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এ পরিস্থিতিতে মুমিনদেরকে সবর করতে বললেন এবং আশা দিলেন যে, ইনশাআল্লাহ শুভ পরিণাম তোমাদেরই অনুকূলে থাকবে।

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলল, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও ও ধৈর্য ধারণ কর। বিশ্বাস রাখ, যমীন আল্লাহর। তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন আর শেষ পরিণাম মুত্তাকীদেরই অনুকূলে থাকে।

قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ؕ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٩﴾

১২৯. তারা বলল, আমাদেরকে তো আপনার আগমনের আগেও উৎপীড়ন করা হয়েছে এবং আপনার আগমনের পরেও (উৎপীড়ন করা হচ্ছে)। মূসা বলল, তোমরা এই আশা রাখ, আল্লাহ তোমাদের দুশমনকে ধ্বংস করবেন এবং যমীনে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কীরূপ কাজ কর।

[১৬]

وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩০. আমি ফিরাউনের সম্প্রদায়কে দুর্ভিক্ষ ও ফসলাদির ক্ষতিতে আক্রান্ত করলাম, যাতে তারা সতর্ক হয়।[৫৭]

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣١﴾

১৩১. (কিন্তু) ফল হল এই যে, যখন তাদের সুখের দিন আসত তখন বলত, এটা তো আমাদের প্রাপ্য ছিল। আর যখন কোন বিপদ দেখা দিত, তখন তাকে মূসা ও তার সঙ্গীদের অশুভতা সাব্যস্ত করত। শোন, (এটা তো) স্বয়ং তাদের অশুভতা (ছিল এবং যা) আল্লাহর জ্ঞানে ছিল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানত না।

وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ

১৩২. এবং তারা (মূসাকে) বলত, আমাদেরকে যাদু করার জন্য তুমি

---

৫৭. পূর্বে ৯৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা যে মূলনীতি বলেছিলেন, সে অনুযায়ী ফিরাউন ও তার কওমকে প্রথম দিকে বিভিন্ন বিপদাপদ দিলেন, যাতে তারা কিছুটা নরম হয়। এর মধ্যে প্রথমে চাপানো হল খরার মুসিবত। ফলে তাদের ফল-ফসল খুব কম জন্মাল।

فَمَا نَحۡنُ لَكَ بِمُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۱۳۲﴾

আমাদের সামনে যে-কোনও নিদর্শনই উপস্থিত কর না কেন আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনার নই।

فَاَرۡسَلۡنَا عَلَیۡهِمُ الطُّوۡفَانَ وَالۡجَرَادَ وَالۡقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰیٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ ۟ فَاسۡتَکۡبَرُوۡا وَکَانُوۡا قَوۡمًا مُّجۡرِمِیۡنَ ﴿۱۳۳﴾

১৩৩. সুতরাং আমি তাদের উপর প্লাবন, পঙ্গপাল, ঘুণপোকা, ব্যাঙ ও রক্তের মুসিবত ছেড়ে দেই, যেগুলো ছিল পৃথক-পৃথক নিদর্শন।[৫৮] তথাপি তারা অহংকার প্রদর্শন করে। বস্তুত তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَیۡهِمُ الرِّجۡزُ قَالُوۡا یٰمُوۡسَی ادۡعُ لَنَا رَبَّکَ بِمَا عَهِدَ عِنۡدَکَ ۚ لَئِنۡ کَشَفۡتَ عَنَّا الرِّجۡزَ لَنُؤۡمِنَنَّ لَکَ وَلَنُرۡسِلَنَّ مَعَکَ بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ ﴿۱۳۴﴾ۚ

১৩৪. যখন তাদের উপর শাস্তি আসত তারা বলত, হে মূসা! তোমার সাথে তোমার প্রতিপালকের যে ওয়াদা রয়েছে, তার অছিলা দিয়ে আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের কাছে দোয়া কর (যাতে তিনি এ আযাব দূর করে দেন)। সত্যিই যদি তুমি আমাদের থেকে এই আযাব অপসারণ কর, তবে আমরা তোমার কথা মেনে নেব এবং বনী ইসরাঈলকে অবশ্যই তোমার সঙ্গে যেতে দেব।

فَلَمَّا کَشَفۡنَا عَنۡهُمُ الرِّجۡزَ اِلٰۤی اَجَلٍ هُمۡ بٰلِغُوۡهُ اِذَا هُمۡ یَنۡکُثُوۡنَ ﴿۱۳۵﴾

১৩৫. অতঃপর যখন আমি তাদের উপর থেকে সেই মেয়াদকাল পর্যন্ত আযাব দূর করতাম, যে পর্যন্ত তাদের পৌঁছা

---

৫৮. এগুলো ছিল বিভিন্ন রকমের আযাব। ফিরাউনী সম্প্রদায়ের উপর এগুলো একের পর এক আসতে থাকে। প্রথমে আসল বন্যা, যাতে তাদের ফসল নষ্ট হয়ে গেল। অতঃপর তারা যখন ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দিয়ে দোয়া করাল, তখন পুনরায় ফসল জন্মাল। কিন্তু তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল। তারা ঈমান আনল না। তারপর পঙ্গপাল এসে সেই ফসল বরবাদ করে দিল। আবারও সেই প্রতিশ্রুতি দিল, ফলে বিপদ দূর হল এবং সাচ্ছন্দ্য ফিরে আসল। কিন্তু এবারও তারা ঈমান না এনে নিশ্চিন্তে বসে থাকল। ফলে তাদের শস্যে ঘুণ দেখা দিল। এবারও একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করল। অতঃপর তাদের উপর বিপুল পরিমাণ ব্যাঙ ছেড়ে দেওয়া হল, যা খাবার পাত্রে লাফিয়ে পড়ে সব খাবার নষ্ট করে দিত। অন্যদিকে খাবার পানিতে রক্ত দেখা যেতে লাগল। ফলে তাদের পানি পান করা দুঃসাধ্য হয়ে গেল।

অবধারিত ছিল,[৫৯] তখন তারা নিমিষে তাদের প্রতিশ্রুতি থেকে ফিরে যেত।

১৩৬. সুতরাং আমি তাদের থেকে বদলা নিলাম এবং তাদেরকে সাগরে নিমজ্জিত করলাম।[৬০] কেননা তারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তা থেকে বিলকুল গাফেল হয়ে গিয়েছিল।

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৭. আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত আমি তাদেরকে সেই দেশের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানালাম, যেথায় আমি বরকত নাযিল করেছিলাম[৬১] এবং বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী পূর্ণ হল, যেহেতু তারা সবর করেছিল আর ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় যা-কিছু বানাত ও চড়াত[৬২] তা সব আমি ধ্বংস করে দিলাম।

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ۙ۬ بِمَا صَبَرُوْا ؕ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ﴿١٣٧﴾

১৩৮. আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করিয়ে দিলাম। অতঃপর এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করল

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰۤى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ

---

৫৯. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার জ্ঞানে ও তাদের নিয়তিতে একটা সময় তো স্থিরীকৃত ছিলই, যে সময় আসলে তাদেরকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করা হবে। কিন্তু তার আগে যে ছোট-ছোট আযাব আসছিল তা কিছু কালের জন্য সরিয়ে নেওয়া হল।

৬০. ফিরাউনকে সাগরে ডুবিয়ে ধ্বংস করার ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা ইউনুস (১০ : ৮৯–৯২), সূরা তোয়াহা (২০ : ৭৭) ও সূরা শুআরায় (২৬ : ৬০–৬৬) আসছে।

৬১. কুরআন মাজীদে যে বরকতপূর্ণ ভূমির কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা শাম ও ফিলিস্তিন অঞ্চল বোঝানো উদ্দেশ্য। সুতরাং এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, ফিরাউন যাদেরকে দাস বানিয়ে রেখেছিল তাদেরকে শাম ও ফিলিস্তিনির মালিক বানিয়ে দেওয়া হল। প্রকাশ থাকে যে, এ অঞ্চলে বনী ইসরাঈলের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ফিরাউনের নিমজ্জিত হওয়ার দীর্ঘকাল পর, যা বিস্তারিতভাবে সূরা বাকারায় ২৪৬ থেকে ২৫১ নং আয়াতে গত হয়েছে।

৬২. 'বানানো' দ্বারা তাদের সেই সব অট্টালিকা ও শৈল্পিক সৃষ্টিসমূহের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যা নিয়ে তাদের গর্ব ছিল। আর 'চড়ানো' দ্বারা ইশারা তাদের উঁচু বৃক্ষাদি ও মাচানে তোলা আঙ্গুর প্রভৃতির লতা-সম্বলিত বাগানের প্রতি। কুরআন মাজীদ সংক্ষিপ্ত শব্দ দু'টোর এ জোড়াকে (Pair) যেই ব্যাপকতা ও অলংকারের সাথে ব্যবহার করেছে, তরজমা দ্বারা অন্য কোন ভাষায় তাকে তুলে আনা সম্ভব নয়।

لَنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿۱۳۸﴾

যারা তাদের মূর্তিপূজায় রত ছিল। বনী ইসরাঈল বলল, হে মূসা! এদের যেমন দেবতা আছে, তেমনি আমাদের জন্যও কোন দেবতা বানিয়ে দাও।[৬৩] মূসা বলল, তোমরা এমন (আজব) লোক যে, মূর্খতাসুলভ কথা বলছ।

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۹﴾

১৩৯. নিশ্চয়ই এসব লোক যে ধান্ধায় লেগে আছে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তারা যা-কিছু করছে সব ভ্রান্ত।

قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۴۰﴾

১৪০. (এবং) সে বলল, তোমাদের জন্য কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য খুঁজে আনব? অথচ তিনিই তোমাদেরকে বিশ্বজগতের সমস্ত মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿۱۴۱﴾

১৪১. এবং (আল্লাহ বলছেন) স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে ফিরাউনের লোকদের থেকে মুক্তি দিয়েছি, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্টতম শাস্তি দিত– তোমাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত। এ বিষয়ের মধ্যে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ছিল এক মহাপরীক্ষা।

[১৭]

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسٰى

১৪২. আমি মূসার জন্য ত্রিশ রাতের মেয়াদ স্থির করেছিলাম (যে, এ রাতসমূহে তূর পাহাড়ে এসে ইতিকাফ করবে)। তারপর আরও দশ রাত বৃদ্ধি করে তা পূর্ণ করি।[৬৪] এভাবে তার প্রতিপালকের

---

৬৩. বনী ইসরাঈল মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান এনেছিল বটে এবং ফিরাউনের জুলুম-নির্যাতনে বেশ সবরও করেছিল, যার প্রশংসা কুরআন মাজীদে করা হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীতে তারা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে নানাভাবে বিরক্তও করেছে। এখান থেকে আল্লাহ তাআলা এ রকম কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

৬৪. ফিরাউনের থেকে মুক্তি লাভ ও সাগর পার হওয়ার পর যা-কিছু ঘটেছিল তার কিছু ঘটনা এস্থলে উল্লেখ করা হয়নি। সূরা মায়েদায় (৫ : ২০–২৬) তার কিছু ঘটনা গত হয়েছে।

لِاَخِیۡهِ هٰرُوۡنَ اخۡلُفۡنِیۡ فِیۡ قَوۡمِیۡ وَاَصۡلِحۡ وَلَا تَتَّبِعۡ سَبِیۡلَ الۡمُفۡسِدِیۡنَ ﴿۱۴۲﴾

নির্ধারিত মেয়াদ চল্লিশ দিন হয়ে গেল এবং মূসা তার ভাই হারূনকে বলল, আমার অনুপস্থিতিতে তুমি সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, সবকিছু ঠিকঠাক রাখবে এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবে না।

وَلَمَّا جَآءَ مُوۡسٰی لِمِیۡقَاتِنَا وَکَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِیۡۤ اَنۡظُرۡ اِلَیۡکَ ؕ قَالَ لَنۡ تَرٰىنِیۡ وَلٰکِنِ انۡظُرۡ اِلَی الۡجَبَلِ فَاِنِ اسۡتَقَرَّ مَکَانَهٗ فَسَوۡفَ تَرٰىنِیۡ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰی رَبُّهٗ لِلۡجَبَلِ جَعَلَهٗ دَکًّا وَّخَرَّ مُوۡسٰی صَعِقًا ۚ فَلَمَّاۤ اَفَاقَ قَالَ سُبۡحٰنَکَ تُبۡتُ اِلَیۡکَ وَاَنَا اَوَّلُ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۱۴۳﴾

১৪৩. মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে এসে পৌঁছল এবং তার প্রতিপালক তাঁর সাথে কথা বললেন, তখন সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দিন আমি আপনাকে দেখব। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কিছুতেই দেখতে পাবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তা যদি আপন স্থানে স্থির থাকে, তবে তুমি আমাকে দেখতে পারবে।[৬৫] অতঃপর যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে তাজাল্লী ফেললেন (জ্যোতি প্রকাশ করলেন) তখন তা পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে

সেসব আয়াতের টীকায় আমরা তার প্রয়োজনীয় বিবরণও উল্লেখ করেছি। এখানে তীহ উপত্যকা (সীনাই মরুভূমি)-এর কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে। বনী ইসরাঈলকে তাদের নাফরমানীর কারণে এ মরুভূমিতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আটকে রাখা হয়েছিল। (সূরা মায়েদায় সে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে)। এ সময় তারা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে দাবী করেছিল, আপনি নিজ ওয়াদা অনুযায়ী আমাদেরকে কোন আসমানী কিতাব এনে দিন, যে কিতাবে আমাদের জীবন যাপনের নীতিমালা লিপিবদ্ধ থাকবে। এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে তূর পাহাড়ে এসে ত্রিশ দিন ইতিকাফ করতে বললেন। পরে বিশেষ কোনও কারণে এ মেয়াদ বৃদ্ধি করে চল্লিশ দিন করে দেওয়া হল। এই ইতিকাফ চলাকালেই আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সৌভাগ্য দান করেন এবং মেয়াদ শেষে তাঁর উপর তাওরাত গ্রন্থ নাযিল করেন। এ কিতাব অনেকগুলো ফলকে লেখা ছিল।

৬৫. এ দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলাকে দেখা সম্ভব নয়। মানুষ তো দূরের কথা পাহাড়-পর্বতেরও এ ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ তাআলার তাজাল্লী বরদাশত করবে অর্থাৎ তিনি নিজ জ্যোতি প্রকাশ করলে তা সহ্য করবে। এ বিষয়টা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে চাক্ষুষ দেখানোর জন্যই আল্লাহ তাআলা তূর পাহাড়ে তাজাল্লী ফেলেছিলেন, যা সে পাহাড়ের পক্ষে বরদাশত করা সম্ভব হয়নি।

পড়ে গেল। পরে যখন তার সংজ্ঞা ফিরে আসল, তখন সে বলল, আপনার সত্তা পবিত্র। আমি আপনার দরবারে তাওবা করছি এবং (দুনিয়ায় কেউ আপনাকে দেখতে সক্ষম নয়- এ বিষয়ের প্রতি) আমি সবার আগে ঈমান আনছি।

قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَبِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. বললেন, হে মূসা! আমি আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা সমস্ত মানুষের উপর তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। সুতরাং আমি তোমাকে যা-কিছু দিলাম তা গ্রহণ কর এবং একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তি বনে যাও।

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ؕ سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٤٥﴾

১৪৫. এবং আমি ফলকসমূহে তার জন্য সর্ববিষয়ে উপদেশ এবং সবকিছুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি। (এবং আদেশ করেছি) এবার এগুলো শক্তভাবে ধর এবং নিজ সম্প্রদায়কে হুকুম দাও, এর উত্তম বিধানাবলী যেন মেনে চলে।[৬৬] আমি শীঘ্রই তোমাদেরকে অবাধ্যদের বাসস্থান দেখাব।[৬৭]

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ

১৪৬. পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রকাশ করে তাদেরকে আমি আমার নিদর্শনাবলী হতে বিমুখ করে রাখব। তারা সব রকমের নিদর্শন দেখলেও

৬৬. এর এক অর্থ হতে পারে এই যে, তাওরাতের সমস্ত বিধানই উত্তম। কাজেই সবগুলোই মেনে চলা উচিত। আবার এরূপ অর্থও করা যায় যে, তাওরাতে কোথাও একটি কাজকে জায়েয বলা হলে অন্যত্র অন্য কাজকে উত্তম বা মুস্তাহাব বলা হয়েছে। তো আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দাবী হচ্ছে, যে কাজকে উত্তম বলা হয়েছে তারই অনুসরণ করা।

৬৭. বাহ্যত এর দ্বারা ফিলিস্তিন অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। তখন এ দেশ আমালিকা বংশের দখলে ছিল। 'দেখানো' দ্বারা বোঝান হয়েছে যে, সে অঞ্চলটি বনী ইসরাঈলের অধিকারে আসবে, যেমনটা হযরত ইউশা ও হযরত সামুয়েল আলাইহিমাস সালামের আমলে হয়েছিল। কতিপয় মুফাসসিরের মতে 'অবাধ্যদের বাসস্থান' দ্বারা জাহান্নাম বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আখিরাতে তোমাদেরকে অবাধ্যদের এই পরিণতি দেখানো হবে যে, যারা তোমাদের উপর জুলুম করেছিল তাদেরকে কী দূরাবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ۝

তাতে ঈমান আনবে না। তারা যদি হিদায়াতের সরল পথ দেখতে পায়, তবে তাকে নিজের পথ হিসেবে গ্রহণ করবে না আর যদি গোমরাহীর পথ দেখতে পায়, তবে তাকে নিজের পথ বানাবে। এসব এ কারণে যে, তারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তা থেকে বিলকুল গাফেল হয়ে গেছে।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاۗءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۭ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৪৭. যারা আমার নিদর্শনসমূহ ও আখিরাতের সম্মুখীন হওয়াকে অস্বীকার করেছে, তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল হয়ে গেছে। তাদেরকে অন্য কিছুর নয়, বরং তারা যে সমস্ত কাজ করত, তারই বদলা দেওয়া হবে।[৬৮]

[১৮]

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ۭ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ

১৪৮. আর মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে তাদের অলংকার দ্বারা একটি বাছুর বানাল (বাছুরটি কেমন ছিল?), একটি প্রাণহীন দেহ, যা থেকে গরুর মত ডাক বের হচ্ছিল।[৬৯] তারা কি এতটুকুও দেখল না যে, তা না

---

৬৮. উপরে যে বলা হয়েছে, 'পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রকাশ করে, তাদেরকে আমি আমার নিদর্শনাবলী হতে বিমুখ করে রাখব', এর দ্বারা কারও মনে এই খটকা জাগতে পারত যে, আল্লাহ তাআলা নিজেই যখন তাদেরকে নিজের নিদর্শনসমূহ হতে ফিরিয়ে রেখেছেন, তখন তাদের কী অপরাধ? এই খটকার নিরসন করা হয়েছে এই বাক্য দ্বারা। বলা হচ্ছে যে, কেউ যখন নিজ ইচ্ছাক্রমে কুফরকেই ধরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, তখন আমি সেই পথই তার জন্য স্থির করে দেই, যা সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নিয়েছে। সে যেহেতু আমার নিদর্শনসমূহ থেকে ফিরে থাকতেই চাচ্ছিল, তাই আমি তাকে তার ইচ্ছার বিপরীতে অন্য কিছু করতে বাধ্য করি না। বরং তাকে তার ইচ্ছানুসারে বিমুখ করেই রাখি। সুতরাং সে যে শাস্তি ভোগ করে, তা তার নিজ কর্মেরই কারণে ভোগ করে, যা সে স্বেচ্ছায় ক্রমাগত করে যাচ্ছিল।

৬৯. এ বাছুরটির বৃত্তান্ত সংক্ষেপে সূরা বাকারায় (২ : ৫১) গত হয়েছে। আর বিস্তারিতভাবে সূরা তোয়াহায় (২০ : ৮৮) আসবে। সেখানে বলা হবে যাদুকর সামেরী বাছুরটি তৈরি করেছিল এবং বনী ইসরাঈলকে বিশ্বাস করিয়েছিল যে, এটিই তোমাদের খোদা (নাউযুবিল্লাহ)।

لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا م اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤٨﴾

তাদের সাথে কথা বলতে পারে আর না তাদেরকে কোনও পথ দেখাতে পারে? (কিন্তু) তারা সেটিকে উপাস্য বানিয়ে নিল এবং স্বয়ং নিজেদের প্রতিই জুলুমকারী হয়ে গেল।

وَلَمَّا سُقِطَ فِيْۤ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا لا قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯. তারা যখন নিজ কৃতকর্মের কারণে অনুতপ্ত হল এবং উপলব্ধি করল যে, তারা বিপথগামী হয়ে গেছে, তখন বলতে লাগল, আল্লাহ যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, তবে নিশ্চয়ই আমরা বরবাদ হয়ে যাব।

وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰۤى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا لا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْۢ بَعْدِيْ ج اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ج وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗۤ اِلَيْهِ ط قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ ز فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫০. এবং মূসা যখন ক্রোধ ও দুঃখভরে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসল, তখন সে বলল, তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে আমার কতইনা নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ! তোমরা এতটা তাড়াহুড়া করলে যে, তোমাদের প্রতিপালকের আদেশেরও অপেক্ষা করলে না? এবং (এই বলে) সে ফলকগুলি ফেলে দিল[৭০] এবং নিজ ভাই (হারুন আলাইহিস সালাম)-এর মাথা ধরে তাকে নিজের দিকে টেনে নিল। সে বলল, হে আমার মায়ের পুত্র! বিশ্বাস কর, তারা আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করেই ফেলেছিল। তুমি শত্রুদেরকে আমার প্রতি হাসার সুযোগ দিও না এবং আমাকে জালেমদের মধ্যে গণ্য করো না।

---

৭০. এগুলো ছিল তাওরাতের ফলক, যা তিনি তূর পাহাড় থেকে এনেছিলেন। ফেলে দেওয়ার অর্থ তিনি সেটি ক্ষিপ্রতার সাথে এক পাশে এভাবে রাখলেন যে, দর্শকের পক্ষে তাকে 'ফেলে দেওয়া' শব্দে ব্যক্ত করা সম্ভব ছিল। সেগুলোর অসম্মান করা তার উদ্দেশ্য ছিল না।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۖ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١٥١﴾

১৫১. মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে তোমার দয়ার ভেতর দাখিল কর। তুমি শ্রেষ্ঠতম দয়ালু।

[১৯]

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫২. আল্লাহ বললেন, যারা বাছুরকে উপাস্য বানিয়েছে, তাদের উপর শীঘ্রই তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ এবং পার্থিব জীবনেই লাঞ্ছনা আপতিত হবে। যারা মিথ্যা রচনা করে আমি এভাবেই তাদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْۤا ۫ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٥٣﴾

১৫৩. আর যারা মন্দ কাজ করে ফেলে তারপর তাওবা করে নেয় ও ঈমান আনে, তোমার প্রতিপালক সেই তাওবার পর (তাদের পক্ষে) অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۖۚ وَفِيْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪. আর যখন মূসার রাগ থেমে গেল, তখন সে ফলকগুলো তুলে নিল এবং তাতে যেসব কথা লেখা ছিল তাতে সেই সকল লোকের পক্ষে হিদায়াত ও রহমতের ব্যবস্থা ছিল, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে।

وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّاۤ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ

১৫৫. মূসা তার সম্প্রদায় হতে সত্তর জন লোককে আমার স্থিরীকৃত সময়ে (তূর পাহাড়ে) আনার জন্য মনোনীত করল।[৭১] অতঃপর যখন তাদেরকে ভূমিকম্প

---

৭১. সত্তরজন লোককে কী কারণে তূর পাহাড়ে আনা হয়েছিল, সে সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেন, বনী ইসরাঈলের দ্বারা বাছুর পূজার যে গুরুতর পাপ ঘটেছিল, সেজন্য তাওবা করানোর লক্ষ্যে তাদেরকে তূর পাহাড়ে আনা হয়েছিল। কিন্তু সেটাই যদি হয়, তবে তাদেরকে ভূমিকম্পের কবলে ফেলার কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করা মুশকিল। যেসব ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার কোনওটাই জোর-জবরদস্তি থেকে মুক্ত নয়। সুতরাং সর্বাপেক্ষা সঠিক কথা সম্ভবত এই, যেমন কোনও কোনও বর্ণনায় আছে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন তাওরাত নিয়ে আসলেন এবং বনী ইসরাঈলকে তার অনুসরণ করতে হুকুম দিলেন, তখন তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলল, আমরা এটা কি

اَهۡلَكۡتَهُمۡ مِّنۡ قَبۡلُ وَاِيَّايَ ؕ اَتُهۡلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ اِنۡ هِيَ اِلَّا فِتۡنَتُكَ ؕ تُضِلُّ بِهَا

আক্রান্ত করল তখন মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি চাইলে পূর্বেই তো তাদেরকে এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতেন। আমাদের মধ্যকার কিছু নির্বোধ লোকের কর্মকাণ্ডের কারণে কি আমাদের সকলকে ধ্বংস করবেন?[৭২] (বলাবাহুল্য আপনি তা করবেন না। সুতরাং বোঝা গেল) এ ঘটনা আপনার পক্ষ হতে কেবল এক

করে বিশ্বাস করব যে, এ কিতাব আল্লাহ তাআলাই নাযিল করেছেন? তখন আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বললেন, তিনি যেন কওমের সত্তর জন প্রতিনিধি বাছাই করে তাদেরকে তূর পাহাড়ে নিয়ে আসেন। কোনও কোনও বর্ণনায় আছে, সেখানে তাদেরকে আল্লাহর কথা শুনিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু এতে তাদের দাবী আরও বেড়ে গেল। বলল, আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলাকে চাক্ষুষ না দেখব, ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করব না। এই হঠকারিতাপূর্ণ দাবির কারণে তাদের উপর এমন বজ্র ধ্বনি হল যে, তাতে ভূমিকম্পের মত অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেল এবং তারা সকলে বেহুঁশ হয়ে গেল। ঘটনার এ বিবরণ কুরআন মাজীদের বর্ণনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সূরা বাকারা (২ : ৫৫-৫৬) ও সূরা নিসায় (৪ : ১৫৩) বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈল দাবী করেছিল, আমাদেরকে খোলা চোখে আল্লাহ দর্শন করাও এবং আমরা নিজেরা যতক্ষণ আল্লাহকে না দেখব ততক্ষণ পর্যন্ত তাওরাত মানব না। উল্লিখিত সূরা দু'টিতে একথাও আছে যে, এ দাবীর কারণে তাদের উপর বজ্রপাত করা হয়েছিল। সম্ভবত সেই বজ্রপাতের কারণেই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়েছিল, যার উল্লেখ এ আয়াতে করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, সূরা নিসায় (৪ : ১৫৩) বজ্রপাতের উল্লেখ করার পর ثم اتخذوا العجل (অতঃপর তারা বাছুর পূজায় লিপ্ত হল) বলার দ্বারা এটা অনিবার্য হয়ে যায় না যে, বজ্রপাত হয়েছিল বাছুর পূজায় লিপ্ত হওয়ার আগে। কেননা সেখানে বনী ইসরাঈলের অনেকগুলো কুকর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর সেগুলো যে কালগত ক্রম অনুসারে সাজানো হয়েছে এটা জরুরী নয়। তাছাড়া ثم শব্দটি 'তদুপরি' অর্থেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৭২. সূরা বাকারায় (২ : ৫৬) বলা হয়েছিল ভূমিকম্পের কারণে সেই সত্তর ব্যক্তির মৃত্যু-মত অবস্থা ঘটেছিল। অন্ততপক্ষে দর্শকের এটাই মনে হচ্ছিল যে, তাদের মৃত্যু ঘটেছে। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন, এক্ষণই তাদেরকে ধ্বংস করা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা নয়। সুতরাং তিনি আল্লাহ তাআলার সমীপে আরয করলেন, এর পূর্বে যখন তারা উপর্যুপরি নাফরমানী করছিল চাইলে তখনই আপনি তাদেরকে এবং খোদ আমাকেও ধ্বংস করতে পারতেন; যে ক্ষমতা আপনার ছিল। অপর দিকে আপনার রহমত ও হিকমত দৃষ্টে এটাও ভাবা যায় না যে, কয়েকজন নির্বোধের দুষ্কর্মের কারণে আমাদের সকলকে ধ্বংস করে ফেলবেন। এই মুহূর্তে যদি এই সত্তর ব্যক্তি বাস্তবিকই মরে গিয়ে থাকে, তবে আমার ও আমার নিষ্ঠাবান সঙ্গীদের ধ্বংসও বলতে গেলে

مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِىْ مَنْ تَشَآءُ ؕ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ﴿۱۵۵﴾

পরীক্ষা, যার মাধ্যমে আপনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করবেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করবেন। আপনিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন ও আমাদের প্রতি রহম করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ক্ষমাশীল।

وَاكْتُبْ لَنَا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَاۤ اِلَيْكَ ؕ قَالَ عَذَابِىْۤ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۵۶﴾ۚ

১৫৬. আমাদের জন্য এ দুনিয়াতেও কল্যাণ লিখে দিন এবং আখিরাতেও। (এতদুদ্দেশ্যে) আমরা আপনারই দিকে রুজু করছি। আল্লাহ বললেন, আমি আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছাকরি দিয়ে থাকি আর আমার দয়া- সে তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত।[৭৩] সুতরাং আমি এ রহমত (পরিপূর্ণভাবে) সেই সব লোকের জন্য লিখব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার আয়াত সমূহে ঈমান রাখে।[৭৪]

অনিবার্য হয়ে যাবে। কেননা আমার কওমের লোকে ওই সত্তরজন লোকের ঘাতক হিসেবে আমাকেও হত্যা করার চেষ্টা করবে। এসব কিছুর প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় এই মুহূর্তে তাদেরকে ধ্বংস করার ইচ্ছা আপনার নেই; বরং এটা এক পরীক্ষা, যা দ্বারা আপনি মানুষকে যাচাই করতে চান যে, পুনরায় জীবন লাভ করার পর তারা কৃতজ্ঞতা আদায় করে, না আগের মতই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে শুরু করে দেয়।

৭৩. অর্থাৎ আমার রহমত আমার ক্রোধ অপেক্ষা উপরে। দুনিয়ার শাস্তি আমি সকল অপরাধীকে দেই না; বরং আমি নিজ জ্ঞান ও হিকমত অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা করি তাকেই দিয়ে থাকি। আখিরাতেও প্রতিটি অপরাধের কারণে শাস্তি দান অবধারিত নয়। বরং যারা ঈমান আনে তাদের বহু অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিয়ে থাকি। হাঁ, যাদের অবাধ্যতা কুফর ও শিরকরূপে সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাদেরকে আমি নিজ ইচ্ছা ও হিকমত অনুযায়ী শাস্তি দান করি। অপর দিকে দুনিয়ায় আমার রহমত সর্বব্যাপী। মুমিন ও কাফের এবং পাপিষ্ঠ ও পুণ্যবান সকলেই তা ভোগ করে। সুতরাং তিনি সকলকেই রিযিক দেন এবং সকলেই সুস্থতা ও নিরাপত্তা লাভ করে। আখিরাতেও কুফর ও শিরক ছাড়া অপরাপর গুনাহ তার সেই নিজ দয়ায় ক্ষমা করা হবে।

৭৪. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নিজ উম্মতের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে কল্যাণ দানের যে দোয়া করেছিলেন, এটা তারই উত্তর। এতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ায় তো

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ

১৫৭. যারা এই রাসূলের অর্থাৎ উম্মী নবীর অনুসরণ করে, যার কথা তারা তাওরাত ও ইনজীলে, যা তাদের নিকট আছে, লিপিবদ্ধ পাবে,[৭৫] যে তাদেরকে সৎকাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজে নিষেধ করবে এবং তাদের জন্য উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করবে ও নিকৃষ্ট বস্তু হারাম

আমার রহমতে সকলেই রিযিক ইত্যাদি লাভ করেছে, কিন্তু যারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে আমার রহমতের অধিকারী হবে, তারা কেবল সেই সকল লোক, যারা ঈমান ও তাকওয়ার গুণ অর্জন করবে এবং অর্থ-সম্পদের আসক্তি যাদেরকে যাকাতের মত ফরয আদায় হতে বিরত রাখতে পারবে না। সুতরাং হে মূসা (আলাইহিস সালাম)! আপনার উম্মতের মধ্যে যারা এসব গুণের অধিকারী হবে, তারা অবশ্যই আমার রহমত লাভ করবে। ফলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে তারা কল্যাণ পেয়ে যাবে।

৭৫. হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ওফাতের পরও বনী ইসরাঈলের সামনে শত-শত বছরের পথ-পরিক্রমা ছিল। তিনি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চেয়ে যে দোয়া করেছিলেন, তার ভেতর বনী ইসরাঈলের আগামী প্রজন্মও শামিল ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করার সময় এটাও স্পষ্ট করে দিলেন যে, শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে বনী ইসরাঈলের যে সকল লোক জীবিত থাকবে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ কেবল সেই অবস্থায়ই হতে পারে, যখন তারা শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনবে ও তার অনুসরণ করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিছু বৈশিষ্ট্যও উল্লেখ করে দিয়েছেন। প্রথম বৈশিষ্ট্য হল তিনি নবী হওয়ার সাথে সাথে রাসূলও হবেন। সাধারণত রাসূল শব্দটি এমন নবীর জন্য প্রযোজ্য হয়, যিনি নতুন শরীয়ত (বিধি-বিধান) নিয়ে আসেন। সুতরাং এ শব্দ দ্বারা ইশারা করে দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নতুন শরীয়ত নিয়ে আসবেন। সে শরীয়তের কিছু-কিছু বিধান তাওরাতে প্রদত্ত বিধান থেকে ভিন্ন রকমও হতে পারে। তখন একথা বলা যাবে না যে, ইনি যেহেতু আমাদের শরীয়ত থেকে ভিন্ন রকমের বিধান শেখাচ্ছেন, তাই আমরা তার প্রতি ঈমান আনতে পারি না। সুতরাং আগেই বলে দেওয়া হচ্ছে যে, প্রতি যুগের প্রয়োজন ও চাহিদা আলাদা হয়ে থাকে, যে কারণে যে রাসূল নতুন শরীয়ত নিয়ে আসেন তাঁর প্রদত্ত শাখাগত বিধান পূর্বের শরীয়ত থেকে পৃথক হতেই পারে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে, তিনি উম্মী হবেন অর্থাৎ তার লেখাপড়া জানা থাকবে না। সাধারণত বনী ইসরাঈল উম্মী বা নিরক্ষর ছিল না। আরবদেরকেই উম্মী বলা হত (দেখুন কুরআন মাজীদ ২ : ৭৮; ৩০ : ২০; ৬২ : ২)। খোদ ইয়াহুদীরাও আরবদের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করত (দেখুন সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৭৫)। সুতরাং এ শব্দটি দ্বারা ইশারা করে দেওয়া হয়েছে যে, শেষ নবীর আবির্ভাব বনী ইসরাঈলের নয়; বরং আরবদের মধ্যেই হবে।

তাঁর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে এই যে, তাওরাত ও ইনজীল উভয় গ্রন্থে তাঁর উল্লেখ থাকবে। এর দ্বারা সেই সব সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইশারা করা হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তাওরাত ও ইনজীলে তার আগমনের বহু আগেই

عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٥٧﴾

করবে এবং তাদের থেকে ভার ও গলার বেড়ি নামাবে, যা তাদের উপর চাপানো ছিল।[৭৬] সুতরাং যারা তার (অর্থাৎ নবীর) প্রতি ঈমান আনবে, তাকে সম্মান করবে, তার সাহায্য করবে এবং তার সঙ্গে যে নূর অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করবে, তারাই হবে সফলকাম।

[২০]

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ

১৫৮. (হে রাসূল! তাদেরকে) বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল,[৭৭] যার আয়ত্তে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর সেই রাসূলের

দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপক রদবদল সত্ত্বেও আজও বাইবেলে এ রকমের বহু ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মাওলানা রহমাতুল্লাহ কীরানবী (রহ.) রচিত 'ইজহারুল হক' গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদ, যা 'বাইবেল ছে কুরআন তাক' নামে প্রকাশিত হয়েছে (অনুবাদক– মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী)।

৭৬. এর দ্বারা সেই সকল কঠিন বিধানের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যা ইয়াহুদীদের প্রতি আরোপ করা হয়েছিল। তার কিছু বিধান তো খোদ তাওরাতেই দেওয়া হয়েছিল এবং আল্লাহ তাআলা নিজ হিকমত ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী তখন ইয়াহুদীদের প্রতি তা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিলেন। আর কিছু বিধান এমনও ছিল, যা ইয়াহুদীদের নাফরমানীর কারণে শাস্তিমূলকভাবে তাদের প্রতি আরোপ করা হয়েছিল। সূরা নিসায় (৪ : ১৬০) তা বর্ণিত হয়েছে। আবার ইয়াহুদীদের ধর্মগুরুগণ নিজেদের পক্ষ হতেও বহু নিয়ম-কানুন তৈরি করে নিয়েছিল। সম্ভবত اصر (ভার) দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের বিধানসমূহ এবং اغلال (গলার বেড়ি) দ্বারা তৃতীয় প্রকারের নিয়ম-কানুনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সকল বিধান রহিত করবেন এবং মানুষের সামনে এক সহজ ও ভারসাম্যপূর্ণ শরীয়ত পেশ করবেন।

৭৭. পূর্বে বলা হয়েছিল যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দোয়া কবুল করার সময় তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বনী ইসরাঈলের ভবিষ্যত প্রজন্মকে মুক্তি লাভ করতে হলে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অবশ্যই ঈমান আনতে হবে। সেই প্রসঙ্গে এস্থলে একটি অন্তর্বর্তী বাক্যস্বরূপ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, তিনি যেন বনী ইসরাঈলসহ বিশ্বের সমস্ত মানুষকে তাঁর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর অনুসরণ করার দাওয়াত দেন।

الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

প্রতি ঈমান আন, যিনি উম্মী নবী এবং যিনি আল্লাহ ও তার বাণীসমূহে বিশ্বাস রাখেন এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ কর।

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি দলও আছে, যারা মানুষকে সত্যের পথ দেখায় এবং সেই (সত্য) অনুসারে ইনসাফ করে।[৭৮]

وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ

১৬০. আমি তাদেরকে (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে) বারটি খান্দানে এভাবে বিভক্ত করে দিয়েছিলাম যে, তারা পৃথক-পৃথক (শৃঙ্খলা-ব্যবস্থার অধীন) দলের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। যখন মূসার কওম তার কাছে পানি চাইল, তখন আমি ওহী মারফত তাকে হুকুম দিলাম, তোমার লাঠি দ্বারা অমুক পাথরে আঘাত কর।[৭৯] সুতরাং সে পাথর থেকে বারটি প্রস্রবণ উৎসারিত হল। প্রত্যেক খান্দান নিজ-নিজ পানি পানের স্থান জানতে পারল। আর আমি তাদেরকে

---

৭৮. ইয়াহুদীদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনার যে দাওয়াত দেওয়া হয় এবং এর আগে তাদের যে বিভিন্ন দুষ্কর্মের বর্ণনা দেওয়া হয়, তা দৃষ্টে কারও মনে এই ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, বনী ইসরাঈলের সমস্ত মানুষই সেসব দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা এস্থলে পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, বনী ইসরাঈলের সব লোক এ রকম নয়। বরং তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা সত্যকে স্বীকার করে, সত্যের অনুসরণ করে এবং মানুষকে সত্যের পথ দেখায়। বনী ইসরাঈলের যে সমস্ত লোক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগে সত্য দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তারাও যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি সেই সকল বনী ইসরাঈলও, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছে, যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.) ও তার সঙ্গীগণ। এ বিষয়টা স্পষ্ট করে দেওয়ার পর হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সমকালীন বনী ইসরাঈলের যে ঘটনাবলী বর্ণিত হয়ে আসছিল পুনরায় তা শুরু করা হচ্ছে।

৭৯. ১৬০ থেকে ১৬২ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে যে সমস্ত ঘটনার দিকে ইশারা করা হয়েছে তা সূরা বাকারায় (২ : ৫৭-৬১) গত হয়েছে। এর ব্যাখ্যার জন্য সেসব আয়াতের টীকা দেখুন।

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۭ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٠﴾

মেঘের ছায়া দিলাম এবং তাদের উপর মান্ন ও সালওয়া অবতীর্ণ করলাম (ও বললাম,) আমি তোমাদেরকে যে উত্তম রিযিক দান করেছি তা খাও। (এতদসত্ত্বেও তারা আমার যে অকৃতজ্ঞতা করল, তাতে) তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি; বরং তারা তাদের নিজেদের প্রতিই জুলুম করছে।

وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ ۭ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٦١﴾

১৬১. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, এই জনপদে বাস কর এবং সেখানে যেখান থেকে ইচ্ছা খাও। আর বলতে থাক (হে আল্লাহ!) আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর (জনপদটির) প্রবেশদ্বার দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর। আমি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করব (এবং) সৎকর্মশীলদেরকে আরও বেশি (সওয়াব) দেব।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاۗءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٢﴾

১৬২. অতঃপর এই হল যে, তাদেরকে যে কথা বলা হয়েছিল, তাদের মধ্যকার জালেমগণ তা পরিবর্তন করে অন্য কথা তৈরি করে নিল। সুতরাং তাদের ক্রমাগত সীমালংঘনের কারণে আমি তাদের উপর আসমান থেকে শাস্তি পাঠালাম।

[২১]

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ

১৬৩. এবং তাদের কাছে সাগর-তীরের জনপদবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর– যখন তারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালংঘন করত,[৮০] যখন তার (অর্থাৎ সাগরের) মাছ শনিবার দিন তো

---

৮০. এ ঘটনাও সংক্ষেপে সূরা বাকারায় (২ : ৬৫–৬৬) গত হয়েছে। ঘটনার সার-সংক্ষেপ এই যে, আরবী ও হিব্রু ভাষায় শনিবারকে 'সাব্‌ত' বলে। ইয়াহুদীদের জন্য এ দিনটিকে একটি পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ দিন সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এ দিন তাদের জন্য জীবিকা উপার্জনমূলক

لَا تَاْتِيْهِمْ ۛ كَذٰلِكَ ۛ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٣﴾

পানিতে ভেসে ভেসে সামনে আসত আর যখন তারা শনিবার উদযাপন করত না, তখন তা আসত না। এভাবে আমি তাদেরকে তাদের উপর্যুপরি অবাধ্যতার কারণে পরীক্ষা করেছিলাম।[৮১]

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمَا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. এবং (তাদেরকে সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দাও) যখন তাদেরই একটি দল (অন্য দলকে) বলেছিল, তোমরা এমন সব লোককে কেন উপদেশ দিচ্ছ, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে ফেলবেন কিংবা কঠোর শাস্তি

যে-কোনও কাজ-কর্ম নিষিদ্ধ ছিল। এস্থলে যে ইয়াহুদীদের কথা বলা হচ্ছে (খুব সম্ভব তারা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের আমলে) কোন এক সাগর উপকূলে বাস করত এবং মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত। তাদের জন্য শনিবার মাছ ধরা জায়েয ছিল না। প্রথম দিকে তারা ছল-চাতুরী করে এ বিধান অমান্য করছিল। পরবর্তীকালে প্রকাশ্যেই এ দিন মাছ ধরা শুরু করে দিল। কিছু সংখ্যক ভালো লোক তাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করল ও তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করল, কিন্তু তারা তাতে কর্ণপাত করল না। পরিশেষে তাদের উপর শাস্তি আপতিত হল এবং তাদের আকৃতি বিকৃত করে তাদেরকে বানর বানিয়ে দেওয়া হল। সূরা বাকারার বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় এ ঘটনা যদিও বর্তমান বাইবেলে পাওয়া যায় না, কিন্তু আরবের ইয়াহুদীগণ এটা ভালো করেই জানত।

৮১. কোনও কওম যখন পাপাচারে লিপ্ত হয়, তখন অনেক সময় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঢিল দেন, যেমন সামনে ১৮২ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজেই এটা উল্লেখ করেছেন। শনিবার দিন উপার্জনমূলক কাজ-কর্ম হতে বিরত থাকা এমন কিছু দুঃসহ কাজ ছিল না, কিন্তু যাদের স্বভাবই ছল নাফরমানী করা, তারা যখন যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ছাড়াই হুকুম অমান্য করা শুরু করে দিল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এভাবে ঢিল দিলেন যে, অন্যান্য দিন অপেক্ষা শনিবারে খুব বেশি পরিমাণে মাছ তাদের কাছাকাছি চলে আসত। এতে তাদের মনে হুকুম অমান্য করার ইচ্ছা ও আগ্রহ অনেক বেড়ে গেল। তারা অনুধাবন করল না যে, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটা পরীক্ষা এবং তিনি এভাবে তাদের রশি ঢিল দিচ্ছেন। প্রথম দিকে তারা এই কৌশল অবলম্বন করল যে, শনিবার দিন মাছের লেজে রশি আটকিয়ে সেটিকে তীরের কোনও জিনিসের সাথে বেঁধে রাখত এবং রোববার দিন সেটিকে ধরত ও রান্না করে খেত। এভাবে ছল-চাতুরী করতে করতে তাদের সাহস বেড়ে গেল এবং এক সময় তারা খোলাখুলি মাছ শিকার শুরু করে দিল। এর থেকে এই শিক্ষা লাভ হয় যে, কারও সামনে যদি গুনাহ করার প্রচুর ও অবাধ সুযোগ দেখা দেয়, তবে তার ভয় পাওয়া ও সাবধান হয়ে যাওয়া উচিত। কেননা যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে তাকে এভাবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ঢিল দেওয়া হচ্ছে এবং এক সময় তাকে অকস্মাৎ ধরে ফেলা হবে।

দিবেন?[৮২] অন্য দলের লোক বলল, আমরা এটা করছি এজন্য, যাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্বমুক্ত হতে পারি এবং (এ উপদেশ দ্বারা) হতে পারে তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে।[৮৩]

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖۤ اَنْجَیْنَا الَّذِیْنَ یَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۭ بَىِٕیْسٍۭ بِمَا كَانُوْا یَفْسُقُوْنَ ﴿۱۶۵﴾

১৬৫. তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা যখন তারা ভুলে গেল, তখন অসৎ কাজে যারা বাধা দিচ্ছিল তাদেরকে তো আমি রক্ষা করি কিন্তু যারা সীমালংঘন করেছিল তাদের উপর্যুপরি অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এক কঠোর শাস্তি দ্বারা আক্রান্ত করি।

---

৮২. মূলত তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। (ক) একদল তো ক্রমাগত নাফরমানী করে যাচ্ছিল; (খ) দ্বিতীয় দল তাদের, যারা প্রথম দিকে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু তারা যখন মানল না, তখন হতাশ হয়ে বোঝানো ছেড়ে দিল আর (গ) তৃতীয় দলটি তাদের যারা হতাশ না হয়ে তাদেরকে অবিরাম উপদেশ দিতে থাকল। এই তৃতীয় দলকে দ্বিতীয় দলের লোক বলল, এরা যখন ক্রমাগত নাফরমানী করে যাচ্ছে, তখন বোঝা যায় আল্লাহ তাআলার শাস্তি তাদের জন্য অবধারিত। কাজেই তাদেরকে বুঝিয়ে সময় নষ্ট করার কোনও অর্থ হয় না।

৮৩. এটা ছিল তৃতীয় দলের উত্তর এবং বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ ও আল্লাহওয়ালাসুলভ উত্তর। তারা তাদের চেষ্টা বজায় রাখার দুটি কারণ উল্লেখ করেছিল। (এক) আমাদের উপদেশ দানে রত থাকার প্রথম উদ্দেশ্য তো এই যে, যখন আমরা আল্লাহ তাআলার দরববারে হাজির হব তখন আমরা বলতে পারব, হে আল্লাহ! আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলাম। কাজেই তারা যে সকল অন্যায় অপরাধ করছিল আমরা তার দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত। (খ) দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, আমরা এখনও আশাবাদী হয়ত এদের মধ্য হতে কোন আল্লাহর বান্দা আমাদের কথা মানবে এবং গুনাহ থেকে নিবৃত্ত হবে। আল্লাহ তাআলা তাদের এ উত্তর বিশেষভাবে উদ্ধৃত করে মুসলিমদেরকে সতর্ক করছেন যে, সমাজে পাপাচারের ব্যাপক বিস্তার ঘটলে একজন মুসলিমের দায়িত্ব কেবল এতটুকুতেই শেষ হয়ে যায় না যে, সে কেবল নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। বরং অন্যকে সঠিক পথ দেখানোও তার দায়িত্ব। এটা করা ছাড়া সে পরিপূর্ণভাবে দায়িত্বমুক্ত হতে পারে না। সেই সঙ্গে বুঝবার বিষয় যে, সত্যের দাওয়াত দাতার পক্ষে হতাশ হওয়ার কোন সুযোগ নেই। বরং আল্লাহর কোন বান্দার হয়ত কখনও বুঝে আসবে এই আশা নিয়ে দাওয়াতের কাজ জারি রাখা চাই।

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ۝١٦٦

১৬৬. সুতরাং তাদেরকে যে কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তারা যখন তার বিপরীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করল, তখন আমি তাদেরকে বললাম, ঘৃণিত বানর হয়ে যাও।[৮৪]

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۚۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١٦٧

১৬৭. এবং (সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করলেন, তিনি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাদের উপর এমন লোকদেরকে কর্তৃত্ব দান করতে থাকবেন, যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট রকমের শাস্তি দেবে।[৮৫] নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুও বটে।

وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ؗ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝١٦٨

১৬৮. এবং আমি দুনিয়ায় তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেই। সুতরাং তাদের মধ্যে সৎকর্মশীল লোকও ছিল এবং কিছু অন্য রকম লোকও। আমি তাদেরকে ভালো ও মন্দ অবস্থা দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা (সঠিক পথের দিকে) ফিরে আসে।

---

৮৪. এর অর্থ হল, তাদের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে তাদেরকে বাস্তবিকই বানর বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আধুনিক কালের কিছু লোক এ জাতীয় কথা বিশ্বাস করতে চায় না, তারা এরূপ ক্ষেত্রে নিজেদের খেয়াল-খুশী মত কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা করছে এবং এভাবে কুরআন মাজীদের অর্থগত বিকৃতি সাধনের দুয়ার খুলে দিচ্ছে। আশ্চর্য কথা হল, ডারউইন যখন অকাট্য কোনও প্রমাণ ছাড়াই এ মতবাদ প্রকাশ করল যে, বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ধারায় বানর মানুষে পরিণত হয়েছে, তখন এটা মানতে তারা কোনরূপ দ্বিধাবোধ করল না, অথচ আল্লাহ তাআলা তার অকাট্য বাণীতে যখন বললেন, মানুষ অধঃপতিত হয়ে বানরে পতিত হয়েছে, তখন তারা এটা মানতে কুণ্ঠাবোধ করল এবং নিজেদের মনমত এর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করল।

৮৫. ইয়াহুদীদের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কিছুকাল পর-পর তাদের উপর এমন অত্যাচারী শাসক চেপে বসেছে, যে তাদের উপর নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পর তাদেরকে নানাভাবে জুলুম-নির্যাতন করেছে। যদিও তাদের হাজার-হাজার বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসে মাঝে-মধ্যে এমন অবকাশও এসেছে, যখন তারা সুখ-সাচ্ছন্দ্য ভোগ করেছে, যেমন আল্লাহ তাআলা

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯. অতঃপর এমন সব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে কিতাব (অর্থাৎ তাওরাত)-এর উত্তরাধিকারী হতে থাকল, যারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী (ঘুষরূপে) গ্রহণ করত এবং বলত, 'আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে'। কিন্তু তার অনুরূপ সামগ্রী তাদের কাছে পুনরায় আসলে তারা (ঘুষরূপে) তাও নিয়ে নিত।[৮৬] তাদের থেকে কি কিতাবে বর্ণিত এই সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর প্রতি সত্য ছাড়া কোন কথা আরোপ করবে না? এবং তাতে (সেই কিতাবে) যা-কিছু লেখা ছিল তারা তা যথারীতি পড়েওছিল। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য আখিরাতের নিবাস শ্রেষ্ঠতর। (হে ইয়াহুদীগণ!) তারপরও কি তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাবে না?

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٧٠﴾

১৭০. আর যারা কিতাবকে মজবুতভাবে ধরে রাখে ও নামায কায়েম করে, আমরা এরূপ সংশোধনকারীদের কর্মফল নষ্ট করি না।

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا

১৭১. এবং (স্মরণ কর) যখন আমি পাহাড়কে তাদের উপর এভাবে তুলে

সামনে বলেছেন, 'আমি তাদেরকে ভালো ও মন্দ অবস্থা দ্বারা পরীক্ষা করেছি।' এর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় মাঝে-মধ্যে তাদের সুদিনও গেছে, কিন্তু সামষ্টিক ইতিহাসের বিপরীতে তা নিতান্তই কম।

৮৬. এটা তাদের আরেকটি অপকর্ম। তারা মানুষের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে আল্লাহর কিতাবের অপব্যাখ্যা করত এবং সেই সাথে জোর বিশ্বাসের সাথে বলত, আমাদের এ গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, অথচ গুনাহ মাফ হয় তাওবা দ্বারা আর তাওবার অপরিহার্য শর্ত হল আগামীতে সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা। কিন্তু তাদের অবস্থা সে রকম ছিল না। তাদের সামনে পুনরায় ঘুষ আনা হলে তারা নির্দ্বিধায় তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকে। তারা এসব কিছুই করত এই তুচ্ছ দুনিয়ার জন্য, অথচ বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগালে তারা বুঝতে পারত আখিরাতের জীবন কত উত্তম!

أَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧١﴾

ধরেছিলাম, যেন সেটি একখানি শামিয়ানা,[৮৭] এবং তারা মনে করেছিল সেটি তাদের উপর পতিত হবে (তখন আমি হুকুম দিয়েছিলাম) আমি তোমাদেরকে যে কিতাব দিয়েছি, তা আকড়ে ধর, ও তাতে বর্ণিত বিষয়সমূহ স্মরণ রাখ, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।

[২২]

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۚۛ شَهِدْنَا ۚۛ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٧٢﴾

১৭২. এবং (হে রাসূল! মানুষকে সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দাও) যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদেরকে বের করেছিলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষী বানিয়েছিলেন (আর জিজ্ঞেস করেছিলেন যে,) আমি কি তোমাদের রব নই? সকলে উত্তর দিয়েছিল, কেন নয়? আমরা সকলে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি[৮৮] (এবং এ স্বীকারোক্তি আমি এজন্য নিয়েছিলাম) যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পার যে, 'আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম'।

---

৮৭. এ ঘটনাটি সূরা বাকারা (২ : ৬৩) ও সূরা নিসায় (৪ : ১৫৪) গত হয়েছে। সূরা বাকারায় যে আয়াতে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তার টীকায় আমরা এর সারসংক্ষেপ উল্লেখ করেছি। সেখানে আমরা একথাও বলেছি যে, আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতের তরজমা এ রকমও করা সম্ভব যে, আমি তাদের উপর পাহাড়কে এমন তীব্রভাবে দোলাতে থাকলাম, যদ্দরুণ তাদের মনে হচ্ছিল সেটি উৎপাটিত হয়ে তাদের উপর পতিত হবে।

৮৮. এ আয়াতে যে সাক্ষ্য ও প্রতিশ্রুতি নেওয়ার কথা বলা হয়েছে হাদীসে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এরূপ যে, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার পর, তার ঔরসে যত সন্তান-সন্ততি জন্ম নেওয়ার ছিল তাদের সকলকে এক জায়গায় একত্র করেন। তখন তারা সকলে পিঁপড়ের মত ক্ষুদ্রাকৃতির ছিল। তিনি তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নেন যে, তারা আল্লাহ তাআলাকে নিজেদের প্রতিপালক স্বীকার করে কিনা? সকলেই স্বীকার করল যে, নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ তাআলাকে নিজেদের প্রতিপালক স্বীকার করে (রূহুল মাআনীতে নাসাঈ, হাকিম ও বায়হাকীর বরাতে)। এই স্বীকারোক্তি দ্বারা তারা যেন স্বীকার করে নিল যে, তারা আল্লাহ তাআলার সমস্ত আদেশ-নিষেধ বিনা বাক্যে পালন করবে আর এভাবে

اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿۱۷۳﴾

১৭৩. কিংবা এরূপ না বল যে, শিরক (-এর সূচনা) তো বহু পূর্বে আমাদের বাপ-দাদাগণই করেছিল। তাদের পরে আমরা তাদেরই আওলাদ হয়ে জন্মেছি। তবে কি বিভ্রান্ত লোকদের কৃতকর্মের কারণে আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۱۷۴﴾

১৭৪. এভাবেই আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করে থাকি, যাতে মানুষ (সত্যের দিকে) ফিরে আসে।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿۱۷۵﴾

১৭৫. এবং (হে রাসূল!) তাদেরকে সেই ব্যক্তির ঘটনা পড়ে শোনাও, যাকে আমি আমার নিদর্শন দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা সম্পূর্ণ বর্জন করে। ফলে শয়তান তার পিছু নেয়। পরিণামে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।[৮৯]

আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর আগেই তাদের দ্বারা আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। দুনিয়ায় এমন মহাপুরুষও জন্ম নিয়েছেন, যাদের এ ঘটনা দুনিয়ায় আসার পরও স্মরণ ছিল, যেমন হযরত যুননুন মিসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে তাঁর এই উক্তি বর্ণিত আছে যে, সে প্রতিশ্রুতির কথা আমার এমনভাবে স্মরণ আছে, যেন এখনও তা শুনতে পাচ্ছি (মাআরিফুল কুরআন, ৪র্থ খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা)। তবে একথা সত্য যে, কিছু ব্যতিক্রম বাদে কারওই একটা প্রতিশ্রুতিরূপে সে কথা স্মরণ নেই। কিন্তু সে কথা স্মরণ না থাকলেও সমস্যা নেই। কেননা এমন কিছু ঘটনা থাকে যা স্মরণ না থাকলেও তার প্রাকৃতিক ক্রিয়া ঠিকই দেখা দেয়। সুতরাং সেই প্রতিশ্রুতির ক্রিয়াও আজও দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই তো তারা মহা বিশ্বের এক স্রষ্টায় বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর মহিমা ও বড়ত্বের গুণকীর্তন করে। যারা বস্তুগত চাহিদা ও জড়বাদী মানসিকতার ঘুর্ণিপাকে ফেঁসে গিয়ে নিজেদের স্বভাব-প্রকৃতি নষ্ট করে ফেলেছে, তাদের কথা আলাদা, নয়ত প্রতিটি মানুষের স্বভাবের ভেতরই আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের বোধ এবং তাঁর ভালোবাসা সংস্থাপিত রয়েছে। আর এ কারণেই যে সমস্ত পারিপার্শ্বিক কারণ স্বভাব ধর্ম হতে দূরে সরিয়ে দেয়, সেগুলো যখন মানুষের সম্মুখ থেকে অপসৃত হয়, তখন মানুষ সত্যের দিকে এভাবে ছুটে যায়, যেন সে সহসা তার হারিয়ে যাওয়া সম্পদের সন্ধান পেয়ে গেছে।

৮৯. সাধারণভাবে মুফাসসিরগণ বলেন, এ আয়াতে বালআম ইবনে বাউরার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। বালআম ছিল ফিলিস্তিনের মাওআব অঞ্চলের এক প্রসিদ্ধ আবেদ ও সংসারবিমুখ (যাহেদ) ব্যক্তি। কথিত আছে, তার দোয়া খুব বেশি কবুল হত। তার সময়ে সে অঞ্চলটি মূর্তিপূজারীদের দখলে ছিল। ফিরাউন ডুবে মরার পর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বনী

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۷۶﴾

১৭৬. আমি ইচ্ছা করলে সেই আয়াত সমূহের বদৌলতে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম। কিন্তু সে তো দুনিয়ার দিকেই ঝুঁকে পড়ল এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত ওই কুকুরের মত হয়ে গেল, যার উপর তুমি হামলা করলেও সে জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকবে আর তাকে (তার অবস্থায়) ছেড়ে দিলেও জিহ্বা বের করে হাঁপাবে।[৯০] এই হল যে সব লোক আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে

ইসরাঈলের বাহিনী নিয়ে সে এলাকায় আক্রমণ করতে চাইলেন এবং সে উদ্দেশ্যে তিনি নিজ বাহিনী নিয়ে মাওআবের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলেন। এ সময় সেখানকার বাদশাহ বালআমকে বলল, সে যেন মূসা আলাইহিস সালাম যাতে ধ্বংস হয়ে যান সে লক্ষ্যে বদদোয়া করে। প্রথম দিকে সে তা করতে রাজি ছিল না, কিন্তু বাদশাহ তাকে মোটা অংকের উৎকোচ দিল। ফলে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু সে যখন বদদোয়া করতে শুরু করল, তখন তার মুখে বদদোয়ার বিপরীতে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের যাতে কল্যাণ হয়, সেই অর্থের শব্দাবলী উচ্চারিত হল। এ অবস্থা দেখে বালআম বাদশাহকে পরামর্শ দিল তার সৈন্যরা যেন তাদের নারীদেরকে বনী ইসরাঈলের তাঁবুতে পাঠিয়ে দেয়। তাহলে তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়বে আর ব্যভিচারের বৈশিষ্ট্যই হল, তা আল্লাহ তাআলার ক্রোধের কারণ হয়ে যায়। ফলে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণে বনী ইসরাঈল তাঁর রহমত থেকে মাহরূম হয়ে যাবে। তার এ পরামর্শ মত কাজ করা হল এবং বনী ইসরাঈল ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ল। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি নারাজ হয়ে গেলেন। শাস্তি স্বরূপ তাদের মধ্যে প্লেগের মহামারী দেখা দিল। বাইবেলেও এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে (দেখুন, গণমা, পরিচ্ছেদ ২২-২৫ এবং ৩১ : ১৬)।

কুরআন মাজীদ এস্থলে যে ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করেছে তার নামও উল্লেখ করেনি এবং সে আল্লাহ তাআলার হুকুম অমান্য করে কিভাবে নিজ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করেছিল তাও ব্যাখ্যা করেনি। উপরে যে ঘটনা উদ্ধৃত করা হল, তাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত নয়। কাজেই আয়াতে যে সেই ব্যক্তিকেই বোঝানো উদ্দেশ্য এটা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। কিন্তু তা বলতে না পারলেও কুরআন মাজীদের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু সেই ব্যক্তিকে সনাক্তকরণের উপর নির্ভরশীল নয়, তাই এতে কোন সমস্যা নেই। বস্তুত এস্থলে উদ্দেশ্য এই সবক দেওয়া যে, আল্লাহ তাআলা যাকে ইলম ও ইবাদতের মহা সৌভাগ্য দান করেন, তার উচিত অন্যদের তুলনায় বেশি সাবধানতা ও তাকওয়া অবলম্বন করা। এরূপ ব্যক্তি যদি আল্লাহ তাআলার আয়াতের বিপরীতে নিজের অবৈধ কামনা-বাসনা পূরণের পেছনে পড়ে, তবে দুনিয়া ও আখিরাতে তার পরিণতি হয় ভয়াবহ।

৯০. অন্যান্য পশু হাঁপায় কেবল তখনই যখন তাদের পিঠে বোঝা চাপানো হয় অথবা তাদের উপর হামলা চালানো হয়। কিন্তু কুকুর ব্যতিক্রম। তার শ্বাস গ্রহণের জন্য সর্বাবস্থায়ই

তাদের দৃষ্টান্ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে এসব ঘটনা শোনাতে থাক, যাতে তারা কিছুটা চিন্তা করে।

سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا۟ يَظْلِمُونَ ﴿١٧٧﴾

১৭৭. যারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে ও নিজেদের প্রতি জুলুম করে, তাদের দৃষ্টান্ত কত মন্দ!

مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿١٧٨﴾

১৭৮. আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, কেবল সে-ই হিদায়াতপ্রাপ্ত হয় আর আল্লাহ যাদেরকে বিপথগামী করেন, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ ﴿١٧٩﴾

১৭৯. আমি জিন ও মানুষের মধ্য হতে বহুজনকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি।[৯১] তাদের অন্তর আছে, কিন্তু তা দ্বারা তার অনুধাবন করে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দ্বারা দেখে না এবং তাদের কান আছে, কিন্তু তা দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তার চেয়েও বেশি বিভ্রান্ত। এরাই গাফেল।

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟

১৮০. উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তাকে সেই সব নামেই ডাকবে।[৯২] যারা

হাঁপানোর দরকার হয়। যারা এ ঘটনাকে বালআম ইবনে বাউরার সাথে সম্পৃক্ত করেন, তারা বলেন, অপকর্মের কারণে তার জিহ্বা কুকুরের মত বের হয়ে গিয়েছিল। তাই আয়াতে তাকে কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রকৃতপক্ষে এটা তার জৈবিক লালসার উপমা। কুকুরের দিকে কোনও জিনিস ছুঁড়ে মারা হলে, তা যদি তাকে আঘাত করার উদ্দেশ্যেও হয়, তবুও সে জিহ্বা বের করে এই লোভে ছুটে যায় যে, সেটা কোন খাদ্যবস্তুও হতে পারে। এভাবেই যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি লালায়িত, সে সব কিছু দিয়েই পার্থিব স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে এবং তার জন্য সর্বাবস্থায় হাঁপাতে থাকে।

৯১. অর্থাৎ তাদের তাকদীরে লেখা আছে যে, তারা নিজ ইচ্ছায় এমন কাজ করবে, যা তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। প্রকাশ থাকে যে, তাকদীরে লেখার অর্থ জাহান্নামের কাজ করতে তাদের বাধ্য হয়ে যাওয়া নয়। এর দৃষ্টান্ত এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, কোনও শিক্ষক তার কোনও ছাত্রের অবস্থা সামনে রেখে লিখে দিল যে, সে ফেল করবে। এর অর্থ এমন নয় যে, শিক্ষক তাকে ফেল করতে বাধ্য করল; বরং সে যা-কিছু লিখেছিল তার অর্থ ছাত্রটি পরিশ্রম না করে সময় নষ্ট করবে পরিণামে সে ফেল করবে।

৯২. আগের আয়াতে অবাধ্যদের মূল রোগ বলা হয়েছিল এই যে, তারা বড় গাফেল। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার স্মরণ ও তার সামনে জবাবদিহিতার অনুভূতি সম্পর্কে তারা উদাসীন।

الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٠﴾

তার নামে বক্র পথ অবলম্বন করে তাদেরকে বর্জন কর।[৯৩] তারা যা-কিছু করছে তাদেরকে তার বদলা দেওয়া হবে।

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٨١﴾

১৮১. আমার মাখলুকসমূহের মধ্যে এমন একটি দল আছে, যারা মানুষকে সত্যের পথ দেখায় এবং সেই (সত্য) অনুযায়ী ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।

[২৩]

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٢﴾

১৮২. আর যারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে আমি তাদের এমনভাবে পর্যায়ক্রমে পাকড়াও করব যে, তারা জানতেই পারবে না।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে দুনিয়ায় সব রকম অনিষ্টতার আসল কারণ এটাই হয়ে থাকে। তাই এবার এ রোগের চিকিৎসা বাতলানো হচ্ছে। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা ও নিজের সব প্রয়োজন তাঁরই কাছে চাওয়া। প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তাআলাকে ডাকার যে নির্দেশ এ আয়াতে দেওয়া হয়েছে, তা দ্বারা তাসবীহ, তাহলীলের মাধ্যমে তাঁর যিকির করা এবং তাঁর কাছে দোয়া করা উভয়টাই বোঝানো হয়েছে। গাফলতি দূর করার উপায় কেবল এটাই যে, বান্দা নিজ প্রতিপালককে উভয় পন্থায় ডাকবে। অবশ্য তাঁকে ডাকার জন্য তাঁর উত্তম নামসমূহের ব্যবহারকে জরুরী করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর উত্তম নামসমূহ বা আসমাউল হুসনা-এর কতক তো তিনি নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন এবং কতক তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসের মাধ্যমে জানিয়েছেন। কুরআন মাজীদের কয়েক স্থানে আসমাউল হুসনার প্রতি ইশারা করা হয়েছে (দেখুন, সূরা বনী ইসরাঈল ১৭ : ১১০; সূরা তোয়াহা ২০ : ৮ ও সূরা হাশর ৫৯ : ২৪)। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম আছে। তিরমিযী ও হাকিম সে নামসমূহও বর্ণনা করেছেন। সারকথা সেই আসমাউল হুসনার অন্তর্ভুক্ত কোন নাম দ্বারাই আল্লাহ তাআলার যিকির ও তাঁর কাছে দোয়া করা চাই। নিজের পক্ষ থেকে তাঁর জন্য কোনও নাম তৈরি করে নেওয়া ঠিক নয়।

৯৩. কাফেরদের মনে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে যে ধারণা ছিল, তা ছিল ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ কিংবা ভ্রান্ত এবং তারা তাদের ভাবনা অনুসারে আল্লাহ তাআলার জন্য কোনও নাম বা বিশেষণ স্থির করে নিয়েছিল। এ আয়াত সতর্ক করছে যে, তাদের অনুসরণে সেই সমস্ত নাম বা বিশেষণ আল্লাহ তাআলার প্রতি আরোপ করা জায়েয নয়। সুতরাং মুসলিমগণকে এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

وَأُمۡلِي لَهُمۡۚ إِنَّ كَيۡدِي مَتِينٌ ۝١٨٣

১৮৩. এবং আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকি। নিশ্চিত জেন, আমার গুপ্ত কৌশল বড় মজবুত।[৯৪]

أَوَلَمۡ يَتَفَكَّرُواْۗ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍۚ إِنۡ هُوَ إِلَّا نَذِيرٞ مُّبِينٌ ۝١٨٤

১৮৪. তবে কি তারা চিন্তা করেনি যে, তাদের এই সহচর (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মধ্যে উন্মাদগ্রস্ততার আভাস মাত্র নেই। সে তো আর কিছু নয়; বরং সুস্পষ্টভাবে মানুষকে সতর্ককারী।[৯৫]

أَوَلَمۡ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيۡءٖ وَأَنۡ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقۡتَرَبَ أَجَلُهُمۡۖ فَبِأَيِّ حَدِيثِۭ بَعۡدَهُۥ يُؤۡمِنُونَ ۝١٨٥

১৮৫. তারা কি লক্ষ্য করেনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব এবং আল্লাহ যে সকল জিনিস সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি এবং এর প্রতিও যে, সম্ভবত তাদের নির্ধারিত সময় কাছেই এসে পড়েছে? সুতরাং এর পর আর কোন কথায় তারা ঈমান আনবে?

مَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُۥۚ وَيَذَرُهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ ۝١٨٦

১৮৬. আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন, তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না আর আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে (কোনও সহযোগী ছাড়া) ছেড়ে দেন, যাতে নিজ অবাধ্যতার ভেতর উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকে।

---

৯৪. এটা সেই সব লোকের জন্য বিপদ সংকেত, যারা ক্রমাগত নাফরমানী করে যাচ্ছে এবং তা সত্ত্বেও তাদেরকে দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধি ভোগ করতে দেওয়া হচ্ছে এবং তারা কখনও চিন্তাও করে না যে, তাদেরকে একদিন আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হতে হবে। এরূপ অবাধ্যতা ও গাফলতি সত্ত্বেও সুখ-সমৃদ্ধি লাভ হলে বুঝতে হবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ঢিল ও অবকাশ দেওয়া হচ্ছে। কুরআন মাজীদে একে ইসতিদরাজ বলা হয়েছে। এরূপ ব্যক্তিকে এক সময় হঠাৎ করেই ধরা হয় এবং সেটা কখনও দুনিয়াতেই হয়ে থাকে। আর এখানে ধরা না হলেও আখিরাতে যে হবে তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই।

৯৫. মক্কার মুশরিকগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী বলে তো স্বীকার করতই না, উপরন্তু অনেক সময় তাকে উন্মাদ আবার কখনও কবি বা যাদুকর সাব্যস্ত করত (নাউযুবিল্লাহ)। এ আয়াত জানাচ্ছে, যারা আলটপ্‌কা কথা বলতে অভ্যস্ত কেবল তারাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এ জাতীয় কথা বলতে পারে। সামান্য একটু চিন্তা করলেই তাদের কাছে এসব অভিযোগের অসারতা স্পষ্ট হয়ে যেত।

يَسۡـَٔلُوۡنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرۡسٰىهَا ؕ قُلۡ اِنَّمَا عِلۡمُهَا عِنۡدَ رَبِّیۡ ۚ لَا يُجَلِّيۡهَا لِوَقۡتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕ ثَقُلَتۡ فِی السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ لَا تَاۡتِيۡكُمۡ اِلَّا بَغۡتَةً ؕ يَسۡـَٔلُوۡنَكَ كَاَنَّكَ حَفِیٌّ عَنۡهَا ؕ قُلۡ اِنَّمَا عِلۡمُهَا عِنۡدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۸۷﴾

১৮৭. (হে রাসূল!) লোকে তোমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, তা কখন ঘটবে? বলে দাও, এ বিষয়ের জ্ঞান কেবল আমার প্রতিপালকেরই আছে। তিনিই তা যথাসময়ে প্রকাশ করে দেখাবেন, অন্য কেউ নয়। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর জন্য তা অতি ভারী বিষয়। তোমাদের কাছে যখন তা আসবে হঠাৎ করেই আসবে। তারা তোমাকে এমনভাবে জিজ্ঞেস করে, যেন তুমি তা সম্পূর্ণরূপে জেনে রেখেছ। বলে দাও, তার জ্ঞান কেবল আল্লাহরই কাছে রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (এ বিষয়ে) জানে না।

قُلۡ لَّاۤ اَمۡلِكُ لِنَفۡسِیۡ نَفۡعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَلَوۡ كُنۡتُ اَعۡلَمُ الۡغَيۡبَ لَاسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ الۡخَيۡرِ ۚۛ وَمَا مَسَّنِیَ السُّوۡٓءُ ۚۛ اِنۡ اَنَا اِلَّا نَذِيۡرٌ وَّبَشِيۡرٌ لِّقَوۡمٍ يُّؤۡمِنُوۡنَ ﴿۱۸۸﴾

১৮৮. বল, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ইচ্ছা না করেন, আমি আমার নিজেরও কোন উপকার ও অপকার করার ক্ষমতা রাখি না। আমার যদি গায়েব সম্পর্কে জানা থাকত, তবে ভালো-ভালো জিনিস প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করে নিতাম এবং কোনও রকম কষ্ট আমাকে স্পর্শ করত না।[৯৬] আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা– সেই সকল লোকের জন্য, যারা আমার কথা মানে।

---

৯৬. অর্থাৎ গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ক সবকিছু যদি আমার জানা থাকত, তবে দুনিয়ায় যা-কিছু উপকারী ও ভালো জিনিস আছে, সবই আমি সংগ্রহ করে নিতাম এবং কোনও রকমের দুঃখ-কষ্ট আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। কেননা তখনতো সকল কাজের পরিণতি আগে থেকেই আমার জানা থাকত। অথচ বাস্তব ব্যাপার এ রকম নয়। এর দ্বারা বোঝা গেল গায়েব ও অদৃশ্য বিষয়ক সবকিছুর জ্ঞান আমাকে দেওয়া হয়নি। হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে আমাকে যে সকল বিষয়ে অবহিত করেন, সে সম্পর্কে আমার জানা হয়ে যায়। এর দ্বারা সেই সকল কাফের ও অবিশ্বাসীর ধারণাও খণ্ডন করা হয়েছে, যারা মনে করত আল্লাহ তাআলার বিশেষ এখতিয়ার ও ক্ষমতাসমূহের কিছুটা নবীদেরও থাকা জরুরী। সেই সঙ্গে যারা নবীদেরকে মর্যাদা দানের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে এবং তাদেরকে আল্লাহ তাআলার স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়; বরং যেই শিরকের মূলোৎপাটনের জন্য নবী-রাসূলকে পাঠানো হয়, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের নামে যারা সেই শিরকী তৎপরতায় লিপ্ত হয়, এ আয়াত তাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছে।

[২৪]

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٨٩﴾

১৮৯. আল্লাহ তিনি, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি[৯৭] হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকেই তার স্ত্রীকে বানিয়েছেন, যাতে সে তার কাছে এসে শান্তি লাভ করতে পারে। তারপর পুরুষ যখন স্ত্রীকে আচ্ছন্ন করল, তখন স্ত্রী গর্ভের হালকা এক বোঝা বহন করল, যা নিয়ে সে চলাফেরা করতে থাকল।[৯৮] অতঃপর সে যখন ভারী হয়ে গেল, তখন (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করল, তুমি যদি আমাদেরকে সুস্থ সন্তান দান কর তবে আমরা অবশ্যই তোমার কৃতজ্ঞতা আদায় করব।

فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٩٠﴾

১৯০. কিন্তু আল্লাহ যখন তাদেরকে একটি সুস্থ সন্তান দান করলেন, তখন তারা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতে আল্লাহর সঙ্গে অন্যদেরকে শরীক সাব্যস্ত করল, অথচ আল্লাহ তাদের অংশীবাদীসুলভ বিষয়াদি হতে বহু উর্ধ্বে।

اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿١٩١﴾

১৯১. তারা কি এমন সব জিনিসকে (আল্লাহর সাথে) শরীক মানে, যারা কোনও বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না; বরং খোদ তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়?

وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٢﴾

১৯২. এবং যারা তাদের কোনও সাহায্য করতে পারে না এবং খোদ নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে না।

---

৯৭. এক ব্যক্তি দ্বারা হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর স্ত্রী দ্বারা হযরত হাওয়া আলাইহাস সালামকে বোঝানো হয়েছে।

৯৮. এখান থেকে হযরত আদম আলাইহিস সালামের যে বংশধরগণ পরবর্তীকালে শিরকে লিপ্ত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে।

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾

১৯৩. তোমরা যদি তাদেরকে সঠিক পথের দিকে ডাক, তবে তারা তোমাদের কথা মানবে না; (বরং) তোমরা তাদেরকে ডাক বা চুপ থাক, উভয় তাদের জন্য সমান।

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾

১৯৪. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে ডাক, তারা তোমাদেরই মত (আল্লাহর) বান্দা। সুতরাং তোমরা তাদের কাছে প্রার্থনা কর অতঃপর তোমরা সত্যবাদী হলে তাদের উচিত তোমাদের দোয়া কবুল করা।

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ﴿١٩٥﴾

১৯৫. তাদের কি পা' আছে, যা দিয়ে তারা চলবে? অথবা তাদের কি হাত আছে, যা দিয়ে ধরবে? অথবা তাদের চোখ আছে, যা দ্বারা দেখবে? নাকি তাদের কান আছে, যা দ্বারা শুনবে? (তাদেরকে বলে দাও,) তোমরা যে সকল দেবতাদেরকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছ, তাদেরকে ডাক, তারপর আমার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত কর এবং আমাকে একটুও অবকাশ দিও না।[৯৯]

إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾

১৯৬. আমার অভিভাবক তো আল্লাহ, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন আর তিনি পুণ্যবানদের অভিভাবকত্ব করেন।

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٧﴾

১৯৭. তোমরা তাকে ছেড়ে যাদেরকে ডাক, তারা তোমাদের কোনও সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং খোদ নিজেদেরও কোনও সাহায্য করতে পারে না।

---

৯৯. মক্কার কাফেরগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভয় দেখিয়েছিল, আপনি যে আমাদের দেবতাদের সম্পর্কে এমন সব কথা বলেন যা দ্বারা বোঝা যায় তাদের কোন ক্ষমতা নেই। এ কারণে তারা আপনাকে শাস্তি দেবে (নাউযুবিল্লাহ)। এ আয়াতে তারই উত্তর দেওয়া হচ্ছে।

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا ؕ وَتَرٰىهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿۱۹۸﴾

১৯৮. তুমি যদি তাদেরকে সঠিক পথের দিকে ডাক তবে তারা তা শুনবেও না। তুমি তাদেরকে দেখবে যেন তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে তারা কিছুই দেখে না।

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۱۹۹﴾

১৯৯. (হে নবী!) তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর এবং (মানুষকে) সৎকাজের আদেশ দাও আর অজ্ঞদের দিকে ভ্রুক্ষেপ করো না।

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۰۰﴾

২০০. যদি শয়তানের পক্ষ হতে তোমাকে কোনও কুমন্ত্রণা দেওয়া হয়, তবে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর।[১০০] নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ۚ ﴿۲۰۱﴾

২০১. যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদেরকে যখন শয়তানের পক্ষ হতে কোনও কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে, তখন তারা (আল্লাহকে) স্মরণ করে।[১০১] ফলে তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।

وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ﴿۲۰۲﴾

২০২. আর যারা এ সকল শয়তানের ভাই, শয়তানগণ তাদেরকে বিভ্রান্তির দিকে টেনে নিয়ে যায়। ফলে তারা (বিভ্রান্তি হতে) ফিরে আসে না।

---

১০০. এ আয়াতে সকল মুসলিমকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, শয়তান মনে কখনও মন্দ ভাবনার প্রতি প্ররোচণা দিলে সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। ক্ষমাপরায়ণ হওয়ার নির্দেশ দান প্রসঙ্গে এ বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করে বোঝানো হচ্ছে যে, যে ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রদর্শনের ফযীলত আছে, সেখানেও যদি শয়তানের প্ররোচণায় কারও রাগ এসে যায় তবে তার ওষুধ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাওয়া।

১০১. প্রবৃত্তি (নফস) ও শয়তানের প্ররোচনায় বড় বড় মুত্তাকীদেরও গুনাহের ইচ্ছা জাগে, কিন্তু তারা তা প্রশমিত করে এভাবে যে, তারা অবিলম্বে আল্লাহর যিকির করে, তাঁর কাছে সাহায্য চায় ও দোয়া করে এবং তাঁর সামনে উপস্থিতির কথা চিন্তা করে। ফলে তাদের চোখ খুলে যায় অর্থাৎ গুনাহের হাকীকত দৃষ্টিগোচর হয়। এভাবে তারা গুনাহ থেকে বেঁচে যায় এবং কখনও গুনাহ হয়ে গেলেও তাওবা করার তাওফীক হয়।

وَاِذَا لَمْ تَاْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ؕ قُلْ اِنَّمَاۤ اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰۤى اِلَیَّ مِنْ رَّبِّیْ ۚ هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۲۰۳﴾

২০৩. এবং (হে নবী!) তুমি যদি তাদের সামনে তাদের (ফরমায়েশী) মুজিযা উপস্থিত না কর, তবে তারা বলে, তুমি নিজে বাছাই করে এ মুজিযা পেশ করলে না কেন? বলে দাও, আমার প্রতিপালক ওহীর মাধ্যমে আমাকে যে বিষয়ে আদেশ করেন আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি।[১০২] এ কুরআন তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে জ্ঞান-তত্ত্বের সমষ্টি এবং যারা ঈমান আনে তাদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।[১০৩]

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۲۰۴﴾

২০৪. যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত হয়।[১০৪]

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِیْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ﴿۲۰۵﴾

২০৫. এবং সকালে ও সন্ধ্যায় নিজ প্রতিপালককে স্মরণ কর বিনয় ও ভীতির সাথে মনে মনেও এবং অনুচ্চস্বরে মুখেও। যারা গাফলতিতে নিমজ্জিত, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

---

১০২. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু মুজিযা তাদের নজরে এসেছিল, তথাপি তারা জেদের বশবর্তীতে নতুন-নতুন মুজিযা দাবি করত। তার উত্তরে এ আয়াতে বলা হয়েছে, আমি নিজের পক্ষ হতে কোন কাজ করতে পারি না। আমি সকল বিষয়ে আল্লাহ তাআলার ওহীর অনুসরণ করে থাকি।

১০৩. অর্থাৎ কুরআন মাজীদ নিজেই একটি মুজিযা। এতে রয়েছে অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্বের সমাহার এবং তা লেখাপড়া না জানা এক উম্মীর মুখ থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। এরপরও আর কোন মুজিযার দরকার?

১০৪. এ আয়াতে বলা হয়েছে, কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত হলে তা পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শোনা চাই। অবশ্য তিলাওয়াতকারীর উচিত যেখানে মানুষ নিজ কাজে ব্যস্ত, সেখানে উচ্চস্বরে না পড়া। এরূপ ক্ষেত্রে লোকে তিলাওয়াতে মনোযোগ না দিলে তার গুনাহ তিলাওয়াতকারীর নিজের উপরই বর্তাবে।

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۩

২০৬. স্মরণ রেখ, যারা (অর্থাৎ ফিরিশতাগণ) তোমার রবের সান্নিধ্যে আছে, তারা তাঁর ইবাদত থেকে অহংকারে মুখ ফেরায় না এবং তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং তাঁরই সম্মুখে সিজদাবনত হয়।[১০৫]

---

১০৫. এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে, মানুষকে আল্লাহ তাআলার যিকির করার যে হুকুম দেওয়া হয়েছে, তাতে আল্লাহ তাআলার নিজের কোন লাভ নেই। কেননা প্রথম কথা হল, কোনও মাখলুকের ইবাদত বা যিকির থেকে আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণ বেনিয়ায। দ্বিতীয়ত তাঁর এক বড় মাখলুক তথা ফিরিশতাগণ সর্বদা তাঁর যিকিরে মশগুল রয়েছে। আসলে মানুষকে যিকিরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার নিজেরই লাভের জন্য। কেননা অন্তরে যিকির থাকলে সে অন্তর শয়তানের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ হয়ে যায় আর এভাবে মানুষ নিজেকে গুনাহ ও অন্যায়-অনাচার থেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়।

প্রকাশ থাকে যে, এটি সিজদার আয়াত। যে ব্যক্তি আরবীতে এ আয়াত পড়বে তার জন্য সিজদা ওয়াজিব হয়ে যায়। কুরআন মাজীদে এরূপ চৌদ্দটি আয়াত রয়েছে। এটি তার মধ্যে প্রথম।

سبحان ربك رب العزة عما يصفون -

وسلام على المرسلين - والحمد لله رب العالمين

আলহামদুলিল্লাহ আজ ১৮ রবিউল আউয়াল ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ১৮ এপ্রিল ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ মঙ্গলবার দুবাই থেকে লন্ডন যাওয়ার পথে আসরের সময় সূরা আরাফের তরজমা ও টীকার কাজ সমাপ্ত হল (অনুবাদ সমাপ্ত হল আজ রোববার ২৩ মহররম ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ১০ জানুয়ারি ২০১০ খ্রিস্টাব্দ)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং একে আমার গুনাহের মাগফিরাত ও আখিরাতের সফলতার অছিলা বানিয়ে দিন এবং মুসলিমদেরকে এর দ্বারা উপকৃত করুন। অবশিষ্ট সূরাসমূহের তরজমা ও ব্যাখ্যার কাজও নিজ মর্জি অনুসারে সমাপ্ত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সূরা আনফাল

পরিচিতি

এ সূরাটি হিজরী দ্বিতীয় সনে মদীনা মুনাওয়ারায় নাযিল হয়েছে। এর বেশির ভাগ আলোচনা বদরের যুদ্ধ ও তদ-সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী এবং তার মাসাইলের সাথে সম্পৃক্ত। এ যুদ্ধই ইসলাম ও কুফরের মধ্যকার সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধের মর্যাদা রাখে। আল্লাহ তাআলা এ যুদ্ধে মুসলিমদেরকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেন এবং মক্কার কুরাইশদেরকে গ্লানিকর পরাজয়ে বিপর্যস্ত করেন। তাই আল্লাহ্ তাআলা এ সূরায় নিজ নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং মুসলিমগণ এতে যে প্রাণপণ লড়াই করেছেন তাতে উৎসাহ দানের সাথে সাথে তাদের দ্বারা যে ভুল-ত্রুটি ঘটেছে তার প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। ভবিষ্যতে যে সকল বিষয় মুসলিমদের বিজয় ও সাফল্য-লাভে সর্বদা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে তার প্রতিও নির্দেশ করা হয়েছে। জিহাদ এবং গনীমতের মাল বণ্টন সংক্রান্ত বহু মাসআলা এ সূরায় স্থান পেয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, এ যুদ্ধ ঘটেছিলই মক্কার কাফেরদের জুলুম ও নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে। তাই যে পরিস্থিতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাও এ সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া যে সকল মুসলিম মক্কা মুকাররমায় রয়ে গিয়েছিল তাদের কী করণীয় তাও বলে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাদের জন্য মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করাকে অত্যাবশ্যকীয় করে দেওয়া হয়েছে। হিজরতের প্রেক্ষাপটে মীরাছ বণ্টন সম্পর্কে সাময়িকভাবে কিছু বিধান জারি করা হয়েছিল। এ কারণেই সূরার শেষে স্বতন্ত্রভাবে মীরাছের কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে।

বদর যুদ্ধ ঃ এ সূরায় যেসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তার অনেক কিছুই যেহেতু বদর যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত তাই সেগুলো সঠিকভাবে বুঝতে হলে এ যুদ্ধ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা থাকা দরকার। সে কারণে এ স্থলে বদর যুদ্ধের কিছু মৌলিক বিষয় উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ হচ্ছে, যাতে তার সাথে সম্পৃক্ত আয়াতসমূহকে তার আসল প্রেক্ষাপটসহ উপলব্ধি করা যায়।

নবুওয়াত লাভের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুকাররমায় থেকেছিলেন তের বছর। সুদীর্ঘ এ সময়কালে মক্কার কাফেরগণ তাঁকে ও তাঁর নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীদেরকে অসহনীয়, অবর্ণনীয় কষ্ট দিয়েছে। এমনকি হিজরতের সামান্য পূর্বে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনাও করেছিল, যা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনায় চলে আসার পর মক্কার কাফেরগণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকল, যাতে মদীনায়ও তিনি স্বস্তিতে থাকতে না পারেন। তারা আবদুল্লাহ ইবনে উবাঈকে চিঠি লিখল, 'তোমরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সঙ্গীদেরকে আশ্রয় দিয়েছ। আমাদের সাফ কথা, তোমরা আশ্রয় প্রত্যাহার করে নাও। নয়ত আমরা তোমাদের উপরই আক্রমণ চালাব (আবু দাউদ, অধ্যায়– আল-খারাজ, পরিচ্ছেদ ২৩ হাদীস নং ৩০০৪)।

আনসার সম্প্রদায়ের আউস গোত্রীয় নেতা হযরত সাদ ইবনে মুয়াজ (রাযি.) একবার মক্কা মুকাররমায় গেলে ঠিক তাওয়াফের সময় আবু জাহল তাকে বলল, তোমরা আমাদের শত্রুদেরকে আশ্রয় দিয়েছ! এখন যদি তুমি আমাদের এক সর্দারের আশ্রয়ে না থাকতে, তবে তোমাকে জীবিত ফিরে যেতে দেওয়া হত না। বোঝাতে চাচ্ছিল যে, আগামীতে মদীনা মুনাওয়ারার কোন লোক মক্কা মুকাররমা আসলে তাকে হত্যা করা হবে। হযরত সাদ ইবনে মুয়াজ (রাযি.)-এর উত্তরে আবু জাহলকে বললেন, তোমরা যদি আমাদেরকে মক্কা মুকাররমায় আসতে বাধা দাও, তবে আমরা তোমাদের পক্ষে এর চেয়ে আরও কঠিন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করব। তোমাদের বাণিজ্য কাফেলা যখন শামের দিকে যায়, তখন মদীনার উপর দিয়েই তো যায়। এখন থেকে তোমাদের যে-কোনও বাণিজ্য কাফেলাকে মদীনার উপর দিয়ে যাতায়াতে বাধা দিতে এবং কোনও কাফেলাকে দেখামাত্র তাদের উপর হামলা চালাতে আমাদের কোন বাধা থাকবে না। (দেখুন, সহীহ বুখারী, আল-মাগাযী অধ্যায়, পরিচ্ছেদ- ২, হাদীস নং ৩৯৫০)। এর পরপরই মক্কার কাফেরদের একটি বাহিনী মদীনা মুনাওয়ারার নিকটবর্তী এলাকায় পৌঁছে মুসলিমদের গবাদি পশু লুট করে নিয়ে গেল। এহেন পরিস্থিতিতে কাফেরদের তৎকালীন নেতা আবু সুফিয়ান একটি বিশাল বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে শামে গেল। মক্কার সকল নারী-পুরুষ নিজেদের সোনা-রূপা দিয়ে এ ব্যবসায় পুঁজি সরবরাহ করেছিল। কাফেলাটি শামে পৌঁছে বেচাকেনা করল এবং তাতে তাদের দ্বিগুণ মুনাফা হল। অতঃপর তারা পঁচিশ হাজার দীনার (গিণি)-এর মালামাল নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। কাফেলায় ছিল এক হাজার মালবাহী উট। চল্লিশজন সশস্ত্র লোক তার পাহারায় নিযুক্ত ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাফেলার প্রত্যাবর্তনের খবর পেলেন, তখন হযরত সাদ ইবনে মুয়াজ (রাযি.)-এর চ্যালেঞ্জ মোতাবেক তাদের উপর হামলা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আকস্মিক সিদ্ধান্তের কারণে যথারীতি সৈন্য সংগ্রহের সুযোগ ছিল না। উপস্থিত মত যত জন সাহাবী তৈরি হতে পেরেছিলেন ব্যস তাদেরকে নিয়েই তিনি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের হয়ে পড়লেন। সর্বসাকুল্যে লোকসংখ্যা ছিল তিনশ' তেরজন। তাদের সাথে ছিল সত্তরটি উট, দু'টি ঘোড়া ও ষাটটি বর্ম।

উল্লেখ্য কোনও কোনও অমুসলিম লেখক এ ঘটনা সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন যে, একটি শান্তিপূর্ণ বাণিজ্য দলের উপর আক্রমণ করার কী বৈধতা থাকতে পারে? সমকালীন কিছু মুসলিম গ্রন্থকারও তাদের এ আপত্তিতে প্রভাবিত হয়ে দাবী করার চেষ্টা করছেন যে, সে কাফেলার উপর কোনও রকম আক্রমণ চালানো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং আবু সুফিয়ান নিজের থেকেই বিপদের আশঙ্কায় আবু জাহলের বাহিনীকে আসতে বলেছিল। কিন্তু সহীহ হাদীস ও কুরআনী ইশারা-ইঙ্গিতের প্রতি লক্ষ্য করলে ঘটনার এরূপ ব্যাখ্যা ধোপে টেকে না। বস্তুত সেই সময়কার পরিবেশ-পরিস্থিতি, সে কালের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত রীতি-রেওয়াজ সম্পর্কে জানা না থাকার কারণে এ আপত্তির সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম কথা

হচ্ছে, আমরা উপরে যে সব ঘটনা উল্লেখ করেছি, তা দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় তখন উভয় পক্ষের মধ্যে এক নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল। উভয় পক্ষ যে একে অপরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছিল কেবল তাই নয়; বরং কাফেরদের পক্ষ থেকে উস্কানিমূলক তৎপরতাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত হযরত সাদ ইবনে মুয়াজ (রাযি.) আগেই তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে এসেছিলেন যে, এখন থেকে আর তাদের বাণিজ্য কাফেলার উপর হামলা চালাতে মুসলিমদের কোন বাধা থাকবে না। তৃতীয়ত সে যুগে সামরিক ও বে-সামরিকের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকত না। সমাজের সমস্ত সাবালক পুরুষকেই 'মুকাতিলা' (যোদ্ধা) বলা হত। এতদসঙ্গে লক্ষ্য করুন কাফেলার অবস্থা। নেতৃত্ব ছিল আবু সুফিয়ানের হাতে। তখন সে ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোর শত্রু। তার সাথে ছিল চল্লিশ জন সশস্ত্র লোক, যারা কুরাইশের সেই সব লোকের অন্যতম, যারা মুসলিমদের প্রতি জুলুম-নির্যাতনে অগ্রণী ভূমিকা রাখত। কুরাইশের লোকজন তখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আশঙ্কা ছিল, এই কাফেলা নিরাপদে মক্কায় পৌঁছতে সক্ষম হলে তাদের সমরশক্তি আরও অনেক বেড়ে যাবে। এসবের পরও যদি এ যুদ্ধকে একটি শান্তিপূর্ণ বাণিজ্য দলের উপর আক্রমণ নামে অভিহিত করা হয়, তবে সেটা পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা একদেশদর্শী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এ কারণে সহীহ হাদীসে বর্ণিত ঘটনাসমূহকে অস্বীকার করা কিছুতেই বৈধ হতে পারে না।

যাই হোক, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য অনুমান করতে পেরে আবু সুফিয়ান দু'টি কাজ করল, একদিকে তো সে একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীকে আবু জাহলের কাছে এই সংবাদ দিয়ে পাঠালো যে, তার কাফেলা বিপদের সম্মুখীন। সে যেন পূর্ণাঙ্গ এক বাহিনী নিয়ে শীঘ্র চলে আসে। অপর দিকে সে রাস্তা বদল করে নিজ কাফেলাকে লোহিত সাগরের দিকে নিয়ে গেল, যাতে সে দিকের ঘুর পথে নিরাপদে মক্কায় পৌঁছানো যায়।

আবু জাহল এটাকে এক সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করল। পত্রপাঠ সে একটি বড়-সড় বাহিনী প্রস্তুত করে ফেলল এবং অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে অগ্রসর হল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানতে পারলেন আবু সুফিয়ানের কাফেলা সটকে পড়েছে এবং অন্য দিক থেকে আবু জাহেলের বাহিনী এগিয়ে আসছে, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। সকলে যুদ্ধের পক্ষেই রায় দিলেন, যাতে এর দ্বারা আবু জাহেলের সাথে চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যায়। সুতরাং বদর নামক স্থানে উভয় দল মুখোমুখি হল। মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা ও অস্ত্র-সস্ত্র আবু জাহেলের বাহিনীর সাথে কোনও তুলনায় আসে না। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে মুসলিমদেরকে গৌরবময় বিজয় দান করলেন। আবু জাহেলসহ কুরাইশের সত্তরজন সর্দার নিহত হল। মুসলিমদের সাথে শত্রুতায় এ সকল সর্দারই সব সময় নেতৃত্ব দিত। এছাড়া তাদের আরও সত্তরজন বন্দী হল। অবশিষ্টরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল।

সূরা আনফাল

سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٧٥ رُكُوْعَاتُهَا ١٠

এটি একটি মাদানী সূরা। এতে ৭৫টি আয়াত ও ১০টি রুকু আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۪ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ①

১. (হে নবী!) লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দান)-এর এখতিয়ার আল্লাহ ও রাসূলের। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক শুধরে নাও।[১] এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ②

২. মুমিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয়, যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পড়া হয়, তখন তা তাদের ঈমানের উন্নতি সাধন করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে।

---

১. বদর যুদ্ধে যখন শত্রুদের পরাজয় ঘটল, তখন সাহাবায়ে কিরাম তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকলেন। একদল শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং একদল শত্রুর ফেলে যাওয়া মালামাল কুড়াতে শুরু করলেন। যেহেতু এটাই ছিল প্রথম যুদ্ধ এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান তখনও পর্যন্ত নাযিল হয়নি, তাই তৃতীয় দল মনে করেছিল, তারা যে মালামাল কুড়িয়েছে, তা তাদেরই। (সম্ভবত জাহিলী যুগে এমনই রেওয়াজ ছিল)। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রথমোক্ত দুই দলের খেয়াল হল, তারাও তো যুদ্ধে পুরোপুরি শরীক ছিল বরং গনীমত কুড়ানোর সময় তারাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিয়েছে। সুতরাং গনীমতের ভেতর তাদেরও অংশ থাকা চাই। বস্তুত এটা ছিল এক স্বভাবগত চাহিদা, যে কারণে এ নিয়ে তাদের মধ্যে কিছুটা বাদানুবাদও শুরু হয়ে গিয়েছিল। যখন বিষয়টা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছল, তখন এই আয়াত নাযিল হল। এতে জানানো হয়েছে, গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে ফায়সালা নেওয়ার এখতিয়ার কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। সুতরাং সামনে এ সূরারই ৪১ নং আয়াতে গনীমত বণ্টনের

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ⓷

৩. যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ⓸

৪. এরাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।

كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۪ وَ اِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ⓹

৫. (গনীমত বণ্টনের) এ বিষয়টা অনেকটা সেই রকম, যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে সত্যের জন্য নিজ ঘর থেকে বের করেছিলেন, অথচ মুমিনদের একটি দলের কাছে এ বিষয়টা অপসন্দ ছিল।[২]

يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُوْنَ ⓺

৬. সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তারা তোমার সাথে সে বিষয়ে এমনভাবে বিতর্ক করছে, যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং তারা তা নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছে।

বিস্তারিত নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে আদেশ করা হয়েছে যে, মুসলিমদের মধ্যে যদি কোনও বিষয়ে মনোমালিন্য দেখা দেয়, তবে তা দূর করে পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক করে নেওয়া চাই।

২. যারা গনীমত কুড়িয়েছিল, তাদের আশা ছিল সে সম্পদ কেবল তাদেরই থাকবে। কিন্তু ফায়সালা যেহেতু সে রকম হয়নি তাই তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, মানুষের সব আশাই পরিণামে মঙ্গলজনক হয় না। পরে তার বুঝে আসে, যে সিদ্ধান্ত তার ইচ্ছার বিপরীত হয়েছে কল্যাণ তাতেই নিহিত। এটাকে আবু জাহেলের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারটার সাথে তুলনা করতে পার। মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় তো লক্ষ্য ছিল আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে আটকানো, যে কারণে রীতিমত কোনও বাহিনীও তৈরি করা হয়নি। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে যখন আবু জাহেলের নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী এগিয়ে আসছে বলে খবর পাওয়া গেল, তখন কতিপয় সাহাবী চাচ্ছিলেন যুদ্ধ না করে ওয়াপস চলে যাওয়া হোক। কেননা এভাবে অপ্রস্তুত ও নিরস্ত্র অবস্থায় একটি সশস্ত্র বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করলে সেটা মৃত্যুমুখে ঝাঁপ দেওয়ার নামান্তর হবে। কিন্তু অন্যান্য সাহাবীগণ অত্যন্ত উদ্দীপনাময় বক্তৃতা দিলেন এবং তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব খুশী হলেন। অবশেষে যখন তাঁর ইচ্ছা অনুধাবন করা গেল তখন সকলেই যুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। পরে প্রমাণ হল যুদ্ধ করার মধ্যেই মুসলিমদের মহা কল্যাণ ছিল। কেননা এর ফলে কুফরের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়।

وَ اِذۡ یَعِدُکُمُ اللّٰهُ اِحۡدَی الطَّآئِفَتَیۡنِ اَنَّهَا لَکُمۡ وَ تَوَدُّوۡنَ اَنَّ غَیۡرَ ذَاتِ الشَّوۡکَۃِ تَکُوۡنُ لَکُمۡ وَ یُرِیۡدُ اللّٰهُ اَنۡ یُّحِقَّ الۡحَقَّ بِکَلِمٰتِهٖ وَ یَقۡطَعَ دَابِرَ الۡکٰفِرِیۡنَ ۙ﴿۷﴾

৭. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, দু'টি দলের মধ্যে কোন একদল তোমাদের আয়ত্তে আসবে। আর তোমাদের কামনা ছিল, নিষ্কণ্টক দলটি তোমাদের সম্মুখীন হোক।[৩] আল্লাহ চাচ্ছিলেন নিজ বিধানাবলী দ্বারা সত্যকে সত্যে পরিণত করে দেখাবেন এবং কাফেরদের মূলোচ্ছেদ করবেন।

لِیُحِقَّ الۡحَقَّ وَ یُبۡطِلَ الۡبَاطِلَ وَ لَوۡ کَرِهَ الۡمُجۡرِمُوۡنَ ۚ﴿۸﴾

৮. এভাবে তিনি সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্যরূপে প্রমাণ করতে চান, তাতে অপরাধীদের এটা যতই অপসন্দ হোক।

اِذۡ تَسۡتَغِیۡثُوۡنَ رَبَّکُمۡ فَاسۡتَجَابَ لَکُمۡ اَنِّیۡ مُمِدُّکُمۡ بِاَلۡفٍ مِّنَ الۡمَلٰٓئِکَۃِ مُرۡدِفِیۡنَ ﴿۹﴾

৯. স্মরণ কর, যখন তোমরা নিজ প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করেছিলে, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদে সাড়া দিয়ে বললেন, আমি তোমাদের সাহায্যার্থে এক হাজার ফিরিশতার একটি বাহিনী পাঠাচ্ছি, যারা একের পর এক আসবে।

وَ مَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشۡرٰی وَ لِتَطۡمَئِنَّ بِهٖ قُلُوۡبُکُمۡ ۚ وَ مَا النَّصۡرُ اِلَّا مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِیۡزٌ حَکِیۡمٌ ﴿۱۰﴾

১০. এ প্রতিশ্রুতি আল্লাহ কেবল এজন্যই দিয়েছেন, যাতে এটা তোমাদের জন্য সুসংবাদ হয় এবং যাতে তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে, অন্য কারও পক্ষ থেকে নয়,[৪] কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই সাহায্য আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতারও মালিক, হিকমতেরও মালিক।

---

৩. এর দ্বারা আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে বোঝানো উদ্দেশ্য। আর 'কাঁটা' দ্বারা বিপদ বোঝানো হয়েছে। কাফেলায় সশস্ত্র লোক ছিল মোট চল্লিশজন। কাজেই কাফেলার উপর আক্রমণ করাটা বেশি বিপজ্জনক ছিল না বিধায় অন্তরের ঝোঁক এ দিকেই বেশি থাকা স্বাভাবিক ছিল।

৪. অর্থাৎ সাহায্য করার জন্য ফিরিশতা পাঠানোর কোনও প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার ছিল না। তাছাড়া ফিরিশতাদেরও নিজস্ব কোনও শক্তি নেই যে, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে সাহায্য করবে। সাহায্য তো আল্লাহ তাআলা সরাসরিও করতে পারেন। কিন্তু মানুষের স্বভাব হল কোনও জিনিসের আসবাব-উপকরণ সামনে দেখতে পেলে তাতে তার আস্থা বেশি হয় এবং

[২]

১১. স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের ভীতি-বিহ্বলতা দূর করার জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করছিলেন[৫] এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করছিলেন,[৬] তা দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য, তোমাদের থেকে শয়তানের ময়লা দূর করার জন্য,[৭] তোমাদের অন্তরে দৃঢ়তা বাঁধার জন্য এবং তার মাধ্যমে (তোমাদের) পা স্থির রাখার জন্য।

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ⑪

১২. স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে ওহীর মাধমে হুকুম দিলেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। কাজেই তোমরা মুমিনদের পা স্থির রাখ, আমি কাফেরদের মনে ভীতি

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ

মনও খুশি হয়। সে কারণেই এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এ আয়াতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যে-কোনও কাজের জন্য যখন সে কাজের উপকরণাদি অবলম্বন করা হয়, তখন প্রতি মুহূর্তে চিন্তা করতে হবে এ উপকরণসমূহও আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি এবং এর যে প্রভাব ও কার্যকারিতা তাও আল্লাহ তাআলার হুকুমেই দেখা দেয়। সুতরাং ভরসা উপকরণের উপর নয়, বরং আল্লাহ তাআলার ফযল ও তাঁর করুণার উপরই করতে হবে।

৫. এত বড় বাহিনীর সঙ্গে যদি নিরস্ত্র-প্রায় একটি ক্ষুদ্র দলকে যুদ্ধ করতে হয়, তবে ঘাবড়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। আল্লাহ তাআলা তাদের সে ঘাবড়ানি প্রশমিত করার লক্ষ্যে তাদেরকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দিলেন। এটা তন্দ্রাচ্ছন্নতার এক সুফল যে, এর দ্বারা ভয়-ভীতি কেটে যায়। সুতরাং যুদ্ধের পূর্বের রাতে তারা প্রাণ ভরে ঘুমালেন। ফলে তারা একদম চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। তাছাড়া যুদ্ধ চলাকালেও মাঝে-মধ্যে তাদের তন্দ্রাভাব দেখা দিত এবং তাতে তাদের স্বস্তি লাভ হত।

৬. বদরে দ্রুত পৌঁছে এমন একটা স্থান আগেই দখল করে নেওয়া মুসলিমদের জন্য অতীব জরুরী ছিল, যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে পানিও থাকবে এবং মাটিও শক্ত হবে। কিন্তু তারা সেখানে পৌঁছে যে স্থানে জায়গা পেয়েছিলো বাহ্যত তাদের পক্ষে সেটি সুবিধাজনক ছিল না। কেননা সে জায়গাটি ছিল বালুময়। তাতে এক তো পা' আটকাত না, যে কারণে চলাফেরা ও নড়াচড়া করা কঠিন হত, দ্বিতীয়ত সেখানে পানিও ছিল না। একটি হাউজ বানিয়ে সেখানে সামান্য পানি জমা করা হয়েছিল বটে, কিন্তু দ্রুত তা নিঃশেষ হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা উভয় সমস্যার সমাধানকল্পে বৃষ্টি দান করলেন। তাতে বালুও জমে গেল, ফলে চলাফেরায় সুবিধা হয়ে গেল এবং যথেষ্ট পরিমাণে পানিও সঞ্চিত হল।

৭. 'ময়লা' দ্বারা শয়তানের কুমন্ত্রণা বোঝানো হয়েছে, যা এত বড় শত্রুর সাথে যুদ্ধকালে সাধারণত দেখা দিয়েই থাকে।

وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾

সঞ্চার করব। সুতরাং তোমরা তাদের ঘাড়ের উপর আঘাত কর এবং তাদের আঙ্গুলের জোড়াসমূহেও আঘাত কর।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾

১৩. এটা এই কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই কেউ আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতায় লিপ্ত হলে আল্লাহর আযাব তো সুকঠিন।

ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾

১৪. সুতরাং এসবের মজা ভোগ কর। তাছাড়া কাফেরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের (আসল) শাস্তি।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ﴿١٥﴾

১৫. হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কাফিরদের মুখোমুখি হয়, যখন তারা চড়াও হয়ে আসে, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না।

وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗۤ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦﴾

১৬. তবে কেউ যদি যুদ্ধ কৌশল হিসেবে এ রকম করে অথবা সে নিজ দলের সাথে গিয়ে মিলতে চায়, তার কথা আলাদা। এছাড়া যে ব্যক্তি সে দিন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম আর তা অতি মন্দ ঠিকানা।[৮]

---

৮. যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়নকে সর্বাবস্থায় অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে, তাতে শত্রু-সৈন্য যত বেশিই হোক। বদর যুদ্ধে সুরতহাল এ রকমই ছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে হুকুম ঠিক এ রকম থাকেনি। অবস্থাভেদে বিধানে প্রভেদ করা হয়েছে, যা এ সূরারই ৬৫–৬৬ নং আয়াতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। সে আলোকে এখন বিধান এই যে, শত্রু-সৈন্যের সংখ্যা যদি দ্বিগুণ হয় বা তার কম, তখন যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা বিলকুল হারাম। কিন্তু তাদের সংখ্যা যদি দ্বিগুণেরও বেশি হয়, তখন যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি আছে। আবার যে ক্ষেত্রে শত্রুদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা জায়েয নয়, তা থেকেও দুটো অবস্থাকে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। (ক) অনেক সময় যুদ্ধ-কৌশল হিসেবে যুদ্ধ চলা অবস্থায়ই পেছনে সরে আসার প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন ময়দান থেকে পলায়ন করা উদ্দেশ্য থাকে না। উদ্দেশ্য থাকে অন্য কিছু। এরূপ অবস্থায় পশ্চাদপসরণ করা জায়েয। (খ) অনেক সময় ক্ষুদ্র দল পেছনে সরে এসে নিজ বাহিনীর সাথে মিলিত হয় এবং উদ্দেশ্য থাকে তাদের সাহায্য নিয়ে একযোগে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। এ জাতীয় পৃষ্ঠপ্রদর্শনও জায়েয।

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ۭ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ⑰

১৭. সুতরাং (হে মুসলিমগণ! প্রকৃতপক্ষে) তোমরা তাদেরকে (অর্থাৎ কাফেরদেরকে) হত্যা করনি; বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছিলেন এবং (হে নবী!) তুমি যখন তাদের উপর (মাটি) নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তা তুমি নিক্ষেপ করনি; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন[৯] আর (তা তোমাদের হাত দ্বারা করিয়েছিলেন) তার মাধ্যমে মুমিনদেরকে উত্তম প্রতিদান দেওয়ার জন্য। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর শ্রোতা ও সবকিছুর জ্ঞাতা।

ذٰلِكُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِينَ ⑱

১৮. এসব কিছু তো রয়েছেই, সেই সঙ্গে এ বিষয়টাও যে, আল্লাহ কাফেরদের সব চক্রান্ত দুর্বল করার ছিলেন।[১০]

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ ۚ

১৯. (হে কাফেরগণ!) তোমরা যদি মীমাংসাই চেয়ে থাক, তবে মীমাংসা তো তোমাদের সামনে এসেই গেছে। এখন যদি তোমরা নিবৃত্ত হও, তবে তা তোমাদেরই পক্ষে কল্যাণকর হবে। আর

---

৯. বদর যুদ্ধের সময় শত্রু বাহিনী যখন সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছিল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার হুকুমে এক মুঠো মাটি ও কাঁকর তুলে কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহ তাআলা তা প্রতিটি কাফের পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলেন, যা তাদের চোখে-মুখে গিয়ে লাগল। ফলে শত্রুবাহিনীতে হই-চই পড়ে গেল। এখানে সেই ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১০. প্রকৃতপক্ষে এটি একটি প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা তো নিজ কুদরতে সরাসরিই শত্রু নিপাত করতে পারতেন। তা সত্ত্বেও তিনি মুসলিমদেরকে কেন ব্যবহার করলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত দিয়ে কাঁকর-মাটি কেন নিক্ষেপ করলেন? উত্তর দেওয়া হয়েছে এই যে, প্রথমত আল্লাহ তাআলার নীতি হল, তিনি তাকবীনী (রহস্যজগতীয়) বিষয়াবলীও বাহ্যিক কোন কারণ-উপকরণের মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকেন। এস্থলে মুসলিমদেরকে মাধ্যম বানানো হয়েছে এ কারণে, যাতে এই ছলে তাদের সওয়াব ও প্রতিদান অর্জিত হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত তিনি কাফেরদেরকে দেখাতে চাচ্ছিলেন যে, তোমরা তোমাদের যে কৌশল ও চক্রান্ত এবং আসবাব-উপকরণ নিয়ে গর্ববোধ করে থাক, আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে মুসলিমদের হাতে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারেন, যেই মুসলিমদেরকে তোমরা অতি দুর্বল মনে করছ।

وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٩﴾

যদি পুনরায় সেই কাজই কর (যা এ যাবৎ করছিল), তবে আমরাও পুনরায় তাই করব (যেমনটা সদ্য করলাম) এবং তখন তোমাদের দল তোমাদের কোনও কাজে আসবে না, তার সংখ্যা যত বেশিই হোক। স্মরণ রেখ, আল্লাহ মুমিনদের সঙ্গে আছেন।

[৩]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০. হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং এর থেকে (অর্থাৎ আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিও না, যখন তোমরা (আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশাবলী) শুনছ।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. এবং তাদের মত হয়ো না, যারা বলে, আমরা শুনলাম কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা শোনে না।

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. বিশ্বাস রেখ, আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও বোবা লোক, যারা বুদ্ধি কাজে লাগায় না।[১১]

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ؕ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. আল্লাহর যদি জানা থাকত তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ আছে, তবে তিনি তাদেরকে অবশ্যই শোনার তাওফীক দিতেন, কিন্তু (তাদের মধ্যে যেহেতু কোন কল্যাণ নেই, তাই) তাদের শোনার তাওফীক দিলেও তারা মুখ ফিরিয়ে পালাবে।[১২]

---

১১. পূর্বের আয়াতে 'শোনা' দ্বারা 'উপলব্ধি করা' বোঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কাফেরগণ শোনার দাবী করলেও বোঝার চেষ্টা করে না। এ হিসেবে তারা পশুরও অধম। কেননা বাকশক্তিহীন পশু কোন কথা না বুঝলে সেটা নিন্দাযোগ্য নয়, যেহেতু তাদের সে যোগ্যতাই নেই এবং তাদের কাছে এটা দাবীও থাকে না। কিন্তু মানুষের তো বোঝার যোগ্যতা আছে এবং তার কাছে দাবীও রয়েছে যে, সে বুঝে-শুনে ভালো পথ গ্রহণ করুক। তথাপি সে বোঝার চেষ্টা না করলে পশু অপেক্ষাও অধম সাব্যস্ত হবে বৈকি!

১২. 'কল্যাণ' দ্বারা সত্যের অনুসন্ধিৎসা বোঝানো হয়েছে। আর পূর্বে বলা হয়েছে যে, 'শোনা' দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য 'উপলব্ধি করা'। এ আয়াত দ্বারা একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব জানা গেল।

২৪. হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও রাসূলের দাওয়াত কবুল কর, যখন তোমাদেরকে এমন বিষয়ের দিকে ডাকেন, যা তোমাদেরকে জীবন দান করে।[১৩] জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে যান।[১৪] আর তোমাদের সকলকে একত্র করে তারই কাছে নিয়ে যাওয়া হবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾

তা এই যে, সত্য বোঝার ও মানার তাওফীক আল্লাহ তাআলা কেবল তাকেই দান করেন, যার অন্তরে সত্যের অনুসন্ধিৎসা আছে। যদি কোনও ব্যক্তি সত্য জানার আগ্রহই না রাখে এবং সে এই ভেবে গাফলতির জীবন যাপন করে যে, আমি যা করছি সঠিক করছি, কারও কাছে আমার কিছু শেখার প্রয়োজন নেই, তবে প্রথমত সে সত্য-সঠিক কথা বুঝতেই পারে না আর কখনও বুঝে আসলেও সে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না; বরং তা থেকে যথারীতি মুখ ফিরিয়ে রাখে।

১৩. এ সংক্ষিপ্ত বাক্য এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা বিবৃত হয়েছে। প্রথমত ইসলামের দাওয়াত ও তার বিধানাবলী এমন যে, সমস্ত মানুষ যদি পূর্ণাঙ্গরূপে তা গ্রহণ ও অনুসরণ করে তবে ইহলোকেই তারা শান্তিপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা লাভ করতে পারে। ইবাদত-বন্দেগী তো আত্মিক প্রশান্তির সর্বোত্তম মাধ্যম। তাছাড়া ইসলামের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিধানসমূহ বিশ্বকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন সরবরাহ করতে পারে। অন্য দিকে প্রকৃত জীবন তো আখিরাতের জীবন। সে জীবনের সুখ-শান্তি ইসলামী বিধান মেনে চলার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কারও কাছে যদি ইসলামের কোনও বিধান কঠিনও মনে হয়, তবে তার চিন্তা করা উচিত যে, এর উপর তো তার পরকালীন জীবনের শান্তি নির্ভর করে। এই পার্থিব জীবনের জন্যও তো মানুষ বড়-বড় অপারেশনে রাজি হয়ে যায় এবং অনেক কষ্টসাধ্য কাজ মাথা পেতে নেয়। তাহলে শরীয়তের যে সকল বিধান শ্রম ও কষ্টসাধ্য বলে মনে হয় কিংবা যাতে মনের অনেক চাহিদা ত্যাগ করতে হয়, সেগুলোকে কেন হাসিমুখে মেনে নেওয়া হবে না, যখন আখিরাতের প্রকৃত ও অনন্ত-স্থায়ী জীবনের সুখ-শান্তি তার উপর নির্ভরশীল?

১৪. এর অর্থ, যে ব্যক্তির অন্তরে সত্য-লাভের আগ্রহ আছে, তার অন্তরে যদি কখনও গুনাহের ইচ্ছা জাগে এবং সে সত্য সন্ধানীর মত আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু করে ও তাঁর কাছে সাহায্য চায়, তবে আল্লাহ তাআলা তার ও গুনাহের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে যান। ফলে সে গুনাহ থেকে রক্ষা পায়। আর যদি কখনও গুনাহ হয়েও যায়, তবে তার তাওবা করার তাওফীক লাভ হয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তির অন্তরে সত্য জানার ইচ্ছা নেই এবং সে আল্লাহ তাআলার দিকে রুজুও করে না, তার অন্তরে যদি কখনও কোন ভালো কাজের ইচ্ছা জাগে কিন্তু সে তাতে গড়িমসি করতে থাকে, তবে তার সে ভালো কাজ করার তাওফীক হয় না। কিছু না কিছু এমন কারণ সৃষ্টি হয়ে যায় যদ্দরুণ তার সেই ইচ্ছা কমজোর হয়ে যায় অথবা তা করার সুযোগ তার হয়ে ওঠে না। এ কারণেই বুযুর্গগণ বলেন, কখনও কোনও ভালো কাজের ইচ্ছা জাগলে তখনই তা করে ফেলা চাই। গড়িমসি করা উচিত নয়। কেননা সেটা বিপজ্জনক।

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

২৫. এবং সেই বিপর্যয়কে ভয় কর, যা বিশেষভাবে তোমাদের মধ্যে যারা জুলুম করে কেবল তাদেরকেই আক্রান্ত করবে না।[১৫] জেনে রেখ, আল্লাহর আযাব সুকঠিন।

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে, লোকে তোমাদেরকে তোমাদের দেশে দাবিয়ে রেখেছিল। তোমরা ভয় করতে লোকে তোমাদেরকে অকস্মাৎ তুলে নিয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে আশ্রয় দিলেন, তোমাদেরকে নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করলেন এবং তোমাদেরকে উৎকৃষ্ট জিনিসের রিযিক দান করলেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় কর।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং জেনে-শুনে নিজেদের আমানতের খেয়ানত করো না।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾

২৮. জেনে রেখ, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা।[১৬] আর মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহরই কাছে।

---

১৫. এ আয়াতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা এই যে, একজন মুসলিমের দায়িত্ব কেবল নিজেকে শরীয়তের অনুসারী বানানোর দ্বারাই শেষ হয়ে যায় না। সমাজে যদি কোন মন্দ কাজের বিস্তার ঘটতে দেখে, তবে সাধ্যমত তা রোধ করাও তার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে যদি অবহেলা করে এবং সেই মন্দ কাজের দরুণ কোনও বিপর্যয় দেখা দেয়, তবে মন্দ কাজে যারা সরাসরি জড়িত ছিল কেবল তারাই সেই বিপর্যয়ের শিকার হবে না; বরং যারা নিজেরা সরাসরি মন্দ কাজ করেনি, কিন্তু অন্যদেরকে তা করতে বাধাও দেয়নি, তাদেরকে তার শিকার হতে হবে।

১৬. মাল ও আওলাদের মহব্বত মানুষের মজ্জাগত বিষয়। যৌক্তিক সীমার মধ্যে থাকলে দূষণীয়ও নয়। কিন্তু পরীক্ষা এভাবে যে, এ ভালোবাসা আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করতে উৎসাহ যোগায় কি না সেটা লক্ষ্য করা হবে। অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির

[৪]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

২৯. হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহর সঙ্গে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন কর, তবে তিনি তোমাদেরকে (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) পার্থক্য করার শক্তি দেবেন,[১৭] তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে মাগফিরাত দ্বারা ভূষিত করবেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহের মালিক।

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ؕ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. (হে নবী!) সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন কাফেরগণ ষড়যন্ত্র করছিল তোমাকে বন্দী করবে অথবা তোমাকে হত্যা করবে কিংবা তোমাকে (দেশ থেকে) বহিষ্কার করবে। তারা তো নিজেদের ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিল আর আল্লাহও নিজ কৌশল প্রয়োগ করছিলেন। বস্তুত আল্লাহ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৌশলকারী।[১৮]

ভালোবাসা যদি আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের সাথে হয়, তবে এটা কেবল জায়েযই নয়; বরং এ কারণে সওয়াবও পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে এ ভালোবাসা যদি গুনাহ ও নাফরমানীর দিকে নিয়ে যায়, তবে এটা মহা মুসিবতের কারণ। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলিমকে এর থেকে হেফাজত করুন।

১৭. এটা তাকওয়ার এক বৈশিষ্ট্য যে, তা মানুষকে পরিষ্কার বুঝ-সমঝ দান করে। ফলে সে সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়। অপর দিকে গুনাহ ও পাপাচারের বৈশিষ্ট্য হল, তা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট করে দেয়। ফলে সে ভালোকে মন্দ ও মন্দকে ভালো মনে করতে শুরু করে।

১৮. এ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মক্কার কাফেরগণ যখন দেখল, ইসলাম অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করছে এবং মদীনা মুনাওয়ারায় প্রচুর সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন তারা এক পরামর্শ সভা ডাকল। তাতে বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করা হল। এ আয়াতে সেসব প্রস্তাব উল্লেখ করা হয়েছে আর তা হচ্ছে গ্রেফতার করা, হত্যা করা ও নির্বাসন দেওয়া। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, তাকে হত্যাই করা হবে এবং তা এভাবে যে, বিভিন্ন গোত্র থেকে একজন করে যুবক বেছে নেওয়া হবে এবং তারা সকলে একযোগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আক্রমণ চালাবে। আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তাদের এ সমস্ত কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিলেন এবং তাঁকে হিজরত করার হুকুম দিলেন। শত্রুরা তাঁর ঘর অবরোধ করে রেখেছিল আর এ অবস্থায় তিনি আল্লাহ তাআলার

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. তাদের সামনে যখন আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে, (আচ্ছা) শুনলাম তো! ইচ্ছা করলে আমরাও এরূপ কথা বলতে পারি। এটা (কুরআন) পূর্ববর্তী লোকদের কল্পকাহিনী ছাড়া কিছু নয়।

وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٢﴾

৩২. (একটা সময় ছিল) যখন তারা বলেছিল, হে আল্লাহ! এই কুরআনই যদি আপনার পক্ষ হতে আগত সত্য হয়ে থাকে, তবে আমাদের প্রতি আকাশ থেকে পাথর-বৃষ্টি বর্ষণ করুন অথবা আমাদের প্রতি কোন মর্মন্তুদ শাস্তি নিক্ষেপ করুন।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۭ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. এবং (হে নবী!) আল্লাহ এমন নন যে, তুমি তাদের মধ্যে বর্তমান থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং তিনি এমনও নন যে, তারা ইস্তিগফারে রত থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেবেন।[১৯]

কুদরতে তাদের সম্মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলেন, কিন্তু তারা তাঁকে দেখতে পেল না। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সীরাত গ্রন্থসমূহে দেখা যেতে পারে। মাআরিফুল কুরআনেও এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তা বর্ণিত হয়েছে।

১৯. অর্থাৎ শিরক ও কুফরের কারণে তারা তো এরই উপযুক্ত ছিল যে, শাস্তি অবতীর্ণ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। কিন্তু দু'টি কারণে তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করা হয়নি। একটি কারণ এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুকাররমায় তাদের মধ্যেই রয়েছেন। আর তাঁর বর্তমানে শাস্তি নাযিল হতে পারে না। কেননা আল্লাহ তাআলা কোনও জাতির উপর তাদের নবীর বর্তমানে শাস্তি নাযিল করেন না। নবী যখন তাদের মধ্য হতে বের হয়ে যান তখনই শাস্তি নাযিল করা হয়ে থাকে। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রহমাতুল লিল আলামীন বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। তাই তাঁর বরকতে ব্যাপক আযাব আসবে না। দ্বিতীয় কারণ হল, মক্কা মুকাররমায় বহু মুসলিম ইস্তিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনায় রত আছে, তাদের ইস্তিগফারের বরকতে আযাব থেমে রয়েছে। কোনও কোনও মুফাসসির আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন যে, খোদ মুশরিকগণও তাওয়াফকালে 'গুফরানাকা-গুফরানাকা' 'তোমার ক্ষমা চাই, তোমার ক্ষমা চাই' বলত, যা ইস্তিগফারেরই এক পদ্ধতি। যদিও কুফর ও শিরকের কারণে তার এ ইস্তিগফার দ্বারা আখিরাতের আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা কাফেরদের পুণ্যের বদলা ইহজগতেই দিয়ে দেন। তাই তাদের ইস্তিগফারের ফায়দাও তারা দুনিয়ায় পেয়ে গেছে আর তা এভাবে যে, ছামুদ, আদ প্রভৃতি জাতির উপর যেমন ব্যাপক শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল মক্কার কাফেরদের উপর সে রকম ব্যাপক শাস্তি অবতীর্ণ করা হয়নি।

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর তাদের কী-বা গুণ আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না, অথচ তারা মানুষকে মসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেয়,[২০] যদিও তারা তার মুতাওয়াল্লী নয়। মুত্তাকীগণ ছাড়া অন্য কোনও লোক তার মুতাওয়াল্লী হতেও পারে না। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক (একথা) জানে না।

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. বাইতুল্লাহর নিকট তাদের নামায শিস দেওয়া ও তালি বাজানো ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং (হে কাফেরগণ!) তোমরা যে কুফরী কাজকর্ম করতে, তজ্জন্য এখন শাস্তি ভোগ কর।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা আল্লাহর পথে মানুষকে বাঁধা দেওয়ার জন্য নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।[২১] এর পরিণাম হবে এই যে, তারা অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে থাকবে অতঃপর সেসব তাদের মনস্তাপের কারণ হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা পরাভূত হবে। আর (আখিরাতে) এ সকল কাফেরকে একত্র করে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে।

---

২০. অর্থাৎ যদিও উপরে বর্ণিত দুই কারণে দুনিয়ায় তাদের উপর কোন শাস্তি অবতীর্ণ হচ্ছে না, তাই বলে এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, তারা শাস্তির উপযুক্তই নয়। বস্তুত কুফর ও শিরক ছাড়াও তারা এমন বহু অপরাধ করে থাকে, যা তাদের জন্য শাস্তিকে অবধারিত করে রেখেছে, যেমন তাদের একটা অপরাধ হল, তারা মুসলিমদেরকে মসজিদুল হারামে ইবাদত করতে দেয় না। পূর্বে এ সম্পর্কে হযরত সা'দ ইবনে মুয়াজ (রাযি.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। (দেখুন এ সূরার পরিচিতি)। সুতরাং যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ মক্কা মুকাররমা থেকে বের হয়ে যাবেন, তখন তাদের উপর আংশিক শাস্তি এসে যাবে, যেমনটা পরবর্তীকালে মক্কা বিজয়রূপে দেখা দিয়েছিল। অতঃপর তারা আখিরাতে পূর্ণাঙ্গ শাস্তির সম্মুখীন হবে।

২১. বদর যুদ্ধের পর কুরাইশের যে সকল মোড়ল জীবিত ছিল, তারা আরও বড় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল এবং সে লক্ষ্যে তারা চাঁদা সংগ্রহ করতে শুরু করেছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۳۷﴾

৩৭. আর তা এই জন্য যে, আল্লাহ অপবিত্র (লোকদের)কে পবিত্র (লোকদের) থেকে পৃথক করে দেবেন এবং এক অপবিত্রকে অপর অপবিত্রের উপর রেখে তাদের সকলকে স্তুপীকৃত করবেন অতঃপর সেই স্তুপকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এরাই সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত।

[৫]

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۳۸﴾

৩৮. (হে নবী!) যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদেরকে বলে দাও, তারা যদি নিবৃত্ত হয়, তবে অতীতে যা-কিছু হয়েছে তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[২২] কিন্তু তারা যদি পুনরায় সে কাজই করে, তবে পূর্ববর্তী লোকদের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে তা তো (তাদের সামনে) রয়েছেই।[২৩]

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ

৩৯. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাক, যাবৎ না ফিতনা দূরীভুত হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হয়ে যায়।[২৪]

---

২২. এ আয়াতে মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যখন ঈমান আনে, তখন তার কুফরী অবস্থায় কৃত যাবতীয় গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এমনকি আগের নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের কাযা করাও জরুরী হয় না।

২৩. এর দ্বারা বদরের যুদ্ধে নিহত কাফেরদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী সেই সকল জাতির প্রতিও, যাদেরকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের পরিণতি তোমরা দেখেছ। সুতরাং তোমরা যদি তোমাদের জেদ ও হঠকারিতা থেকে বিরত না হও, তবে সে রকম পরিণতি তোমাদেরও হতে পারে।

২৪. সামনে সূরা তাওবায় বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা জাযিরাতুল আরবকে ইসলামের কেন্দ্রভূমি বানিয়েছেন। তাই এখানকার জন্য বিধান হল যে, এখানে কোন কাফের ও মুশরিক স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে না। হয়ত ইসলাম গ্রহণ করবে, নয়ত অন্য কোথাও চলে যাবে। সে কারণেই এ আয়াতে হুকুম দেওয়া হয়েছে, জাযিরাতুল আরবের কাফের ও মুশরিকগণ যতক্ষণ পর্যন্ত উল্লিখিত দু'টি বিষয়ের কোনও একটি গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। জাযিরাতুল আরবের বাইরে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। সেখানে অমুসলিমদের সাথে বিভিন্ন রকমের চুক্তি হতে পারে। প্রায় এই একই রকমের আয়াত সূরা বাকারায় (২ : ১৯৩) গত হয়েছে। সেখানে আমরা যে টীকা লিখেছি তা দেখে নেওয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

بَصِيْرٌ ۝٣٩

অতঃপর তারা যদি নিবৃত্ত হয়, তবে আল্লাহ তো তাদের কার্যাবলী সম্যক দেখছেন।[২৫]

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ؕ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝٤٠

৪০. তারা যদি মুখ ফিরিয়ে রাখে, তবে জেনে রেখ, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক– কত উত্তম অভিভাবক তিনি এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

[দশম পারা]

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰكِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ

৪১. (হে মুসলিমগণ!) জেনে রাখ, তোমরা যা-কিছু গনীমত অর্জন কর, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ, রাসূল, তাঁর আত্মীয়বর্গ, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের প্রাপ্য[২৬] (যা আদায় করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য)– যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও সেই বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখ, যা আমি নিজ বান্দার উপর

---

২৫. অর্থাৎ কোনও অমুসলিম প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে মুসলিমই গণ্য করতে হবে। তাঁর অন্তরে কি আছে তা অনুসন্ধান করার দরকার নেই। কেননা দিলের খবর আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না। তিনিই তাদের কার্যাবলী ভালোভাবে দেখছেন এবং সে অনুযায়ী আখিরাতে ফায়সালা করবেন।

২৬. গনীমত বলে সেই সম্পদকে, যা জিহাদ কালে শত্রুপক্ষের থেকে মুজাহিদদের হস্তগত হয়। এ আয়াতে তা বণ্টনের মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মূলনীতির সারমর্ম এই যে, জিহাদে যে সম্পদ অর্জিত হয়, তাকে পাঁচ ভাগ করা হবে। তার চার ভাগ মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করা হবে এবং পঞ্চম ভাগ বায়তুল মালে জমা করা হবে। এই পঞ্চম ভাগকে 'খুমুস' বলা হয়। খুমুস বণ্টনের নিয়ম সম্পর্কে আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে যে, এ মালের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা। সুতরাং তার নির্দেশ মতই এটা বণ্টন করতে হবে। অতঃপর এটা বণ্টনের পাঁচটি খাত উল্লেখ করা হয়েছে। এক ভাগ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। এক ভাগ তাঁর আত্মীয়-স্বজনের। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়বর্গ তাঁর ও ইসলামের সাহায্যার্থে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, আবার তাদের জন্য যাকাতের অর্থও হারাম করা হয়েছিল। অবশিষ্ট তিন ভাগ ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অংশ তাঁর ওফাতের পর আর কার্যকর নেই। তাঁর আত্মীয়দের অংশ সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে কিছুটা মতভেদ আছে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে এ অংশের কার্যকারিতা এখনও বহাল আছে। কাজেই তা বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের মধ্যে তাদের অধিকার হিসেবে বণ্টন করা জরুরী, তাতে তারা ধনী হোক বা গরীব। কিন্তু আহলুস সুন্নাহর অন্যান্য ফকীহগণ বলেন, তারা গরীব হলে

يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤١﴾

মীমাংসার দিন অবতীর্ণ করেছি[২৭]– যে দিন দু' দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ۭ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ أَمْرًا كَانَ

৪২. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন তোমরা উপত্যকার নিকটবর্তী প্রান্তে ছিলে এবং তারা ছিল দূরবর্তী প্রান্তে আর কাফেলা ছিল তোমাদের অপেক্ষা নিচের দিকে।[২৮] তোমরা যদি আগে থেকেই পারস্পরিক আলোচনাক্রমে (যুদ্ধের) সময় নির্ধারণ করতে চাইতে, তবে সময় নির্ধারণের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে অবশ্যই

তো অন্যান্য গরীবদের উপর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদেরকে খুমুসের অর্থ দেওয়া হবে। আর তারা যদি অভাবগ্রস্ত না হয়, তবে খুমুসে আলাদাভাবে তাদের কোন অধিকার থাকবে না। হযরত উমর (রাযি.) একবার হযরত আলী (রাযি.)কে খুমুস থেকে অংশ দিলে হযরত আলী (রাযি.) এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করলেন যে, এ বছর আমাদের খান্দাদের কোন প্রয়োজন নেই (আবু দাউদ, হাদীস নং ২৯৮৪)। সুতরাং হযরত আলী (রাযি.) সহ চারও খুলাফায়ে রাশেদীনের নীতি এটাই ছিল যে, বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের লোকজন অভাবগ্রস্ত হলে খুমুস থেকে অংশ দানের ক্ষেত্রে তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন আর তারা যদি অভাবগ্রস্ত না হতেন, তবে তাদেরকে দিতেন না। তার একটি কারণ এই-ও যে, অধিকাংশ ফুকাহা ও মুফাসসিরগণের মতে এ আয়াতে যে পাঁচটি খাত বর্ণিত হয়েছে, খুমুসের অর্থ তাদের সকল শ্রেণীকে দেওয়া এবং সমহারে দেওয়া অপরিহার্য নয় এবং আয়াতের উদ্দেশ্যও সেটা নয়; বরং খুমুস ব্যয়ের এ পঞ্চ খাত যাকাতের খাতসমূহেরই মত (যাদের উল্লেখ সূরা তাওবায় [৯ : ৬০] আসছে)। অর্থাৎ ইমাম তথা রাষ্ট্রপ্রধানের এখতিয়ার রয়েছে যে, এ খাতসমূহের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী যে খাতে যে পরিমাণ দেওয়া সমীচীন মনে করেন তাই দেবেন। এ মাসআলা সম্পর্কে বান্দা সহীহ মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থ তাকমিলা ফাতহুল মুলহিমে (৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৪–২৫৮) বিস্তারিত আলোচনা করেছে।

২৭. এর দ্বারা বদর যুদ্ধের দিনকে বোঝানো হয়েছে। আয়াতে এ দিনকে 'ইয়াওমুল ফুরকান' বলা হয়েছে, অর্থাৎ যে দিন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মীমাংসা হয়ে গেছে। সুতরাং তিনশ' তেরজনের নিরস্ত্র একটি দল এক হাজার সশস্ত্র যোদ্ধার বিপরীতে অলৌকিকভাবে জয়লাভ করেছে। এ দিন 'যা নাযিল হয়েছিল' বলে ফিরিশতাদের বাহিনী ও কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ বোঝানো হয়েছে, যা সে দিন যথাক্রমে মুসলিমদের সাহায্যার্থে ও তাদের সান্ত্বনা দানের জন্য নাযিল করা হয়েছিল।

২৮. এর দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রের মানচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বদর একটি উপত্যকার নাম। তার যে প্রান্ত মদীনা মুনাওয়ারার নিকটবর্তী, সেখানে মুসলিম বাহিনী অবস্থান নিয়েছিল আর যে প্রান্ত মদীনা মুনাওয়ারা থেকে অপেক্ষাকৃত দূরে, সেখানে ছিল কাফেরদের বাহিনী। আর 'কাফেলা' দ্বারা আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে বোঝানো হয়েছে, যা উপত্যকার নিম্নদিক

مَفْعُوْلًا ۙ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۙ﴿۴۲﴾

মতভেদ দেখা দিত। কিন্তু (পূর্ব সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে দু'পক্ষের মধ্যকার যুদ্ধের) এ ঘটনা এজন্য ঘটেছে, যাতে যে বিষয়টা ঘটবার ছিল আল্লাহ তা সম্পন্ন করে দেখান। ফলে যার ধ্বংস হওয়ার, সে সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখেই ধ্বংস হয় আর যার জীবিত থাকার, সেও সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখেই জীবিত থাকে।[২৯] আল্লাহ সবকিছুর শ্রোতা ও সব কিছুর জ্ঞাতা।

اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِيْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا ۭ وَلَوْ اَرٰىكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ

৪৩. (হে নবী!) সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে তাদের (অর্থাৎ শত্রুদের) সংখ্যা কম দেখাচ্ছিলেন।[৩০] তোমাকে যদি তাদের

থেকে বের হয়ে উপকূলবর্তী পথ ধরেছিল এবং এভাবে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। সূরার শুরুতে এ ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

২৯. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেন, যদ্দরুণ মক্কার কাফেরদের সাথে পুরো দস্তুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যায়। নতুবা উভয় পক্ষ যদি পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা করে যুদ্ধের কোন সময় স্থির করতে চাইত, তবে মতভেদ দেখা দিত। মুসলিমগণ যেহেতু নিরস্ত্র ও অপ্রস্তুত ছিল তাই তারা যুদ্ধ এড়াতে চাইত। অপর দিকে মুশরিকদের অন্তরেও যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভীতি সক্রিয় ছিল তাই একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও তারা যুদ্ধ না হওয়ার পক্ষেই মত দিত। কিন্তু তারা যখন দেখল তাদের বাণিজ্য কাফেলা বিপদের সম্মুখীন তখন যুদ্ধ ছাড়া তাদের উপায় থাকল না। অন্য দিকে মুসলিমদের সামনে যখন শত্রু সৈন্য এসেই পড়ল তখন তারাও যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি যুদ্ধের এ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছি এজন্য, যাতে একবার মীমাংসাকর যুদ্ধ হয়েই যায় এবং আল্লাহ প্রদত্ত সাহায্য বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা সকলের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরপরও যদি কেউ কুফরে লিপ্ত থেকে ধ্বংসের পথ অবলম্বন করে, তবে সে তা করবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সত্যের প্রমাণ সুস্পষ্ট করে দেওয়ার পর। আর যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করে সম্মানজনক জীবন বেছে নেয়, তবে সেও তা নেবে সমুজ্জ্বল প্রমাণের আলোকে।

৩০. যুদ্ধ শুরুর আগে হানাদার কাফেরদের সংখ্যা কত তা যখন মুসলিমদের জানা ছিল না, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখানো হয় যে, তাদের সংখ্যা অল্প। তিনি সে স্বপ্ন সাহাবায়ে কিরামের সামনে বর্ণনা করলেন। এতে তাদের সাহস বৃদ্ধি পায়। ইমাম রাযী (রহ.) বলেন, নবীর স্বপ্ন যেহেতু বাস্তব বিরোধী হতে পারে না, তাই দৃশ্যত বোঝা যাচ্ছে তাকে সৈন্যদের একটা অংশ দেখানো হয়েছিল, তিনি সেই অংশ সম্পর্কেই জানিয়েছিলেন যে, তারা অল্পসংখ্যক। কেউ বলেন, স্বপ্নে যে জিনিস দেখানো হয়, তার সম্পর্ক থাকে উপমা জগত (আলম-ই মিছাল)-এর সাথে। যা দেখা যায়, উদ্দেশ্য হুবহু

سَلَّمَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

সংখ্যা বেশি দেখাতেন, তবে (হে মুসলিমগণ!) তোমরা সাহস হারাতে এবং এ বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হত, কিন্তু আল্লাহ (তোমাদেরকে তা থেকে) রক্ষা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের গুপ্ত কথাসমূহও ভালোভাবে জানেন।

وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيْۤ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّيُقَلِّلُكُمْ فِيْۤ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

৪৪. এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন তোমরা একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিলে, তখন আল্লাহ তোমাদের চোখে তাদের সংখ্যা অল্পসংখ্যক দেখাচ্ছিলেন এবং তাদের চোখে তোমাদেরকে অল্প দেখাচ্ছিলেন,[৩১] যাতে যে কাজ সংঘটিত হওয়ার ছিল, আল্লাহ তা সম্পন্ন করে দেখান। যাবতীয় বিষয় আল্লাহরই দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

[৬]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

৪৫. হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন দলের সম্মুখীন হবে, তখন অবিচলিত থাকবে এবং আল্লাহকে বেশি পরিমাণে স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন কর।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ

৪৬. এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং পরস্পরে কলহ করবে না, অন্যথায় তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং

সেটাই হয় না। এ কারণে স্বপ্নের তাবীর করার প্রয়োজন থাকে। সুতরাং স্বপ্নে যদিও গোটা বাহিনীর সংখ্যা অল্প দেখানো হয়েছিল, কিন্তু সে অল্পতার আসল ব্যাখ্যা ছিল এই যে, সৈন্য সংখ্যা বেশি হলেও তার গুরুত্ব বড় কম। এ ব্যাখ্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানা ছিল। সুতরাং সে দৃষ্টিতেই তিনি সাহাবায়ে কিরামের সামনে এ স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যাতে তাদের সাহস ও উদ্যম বৃদ্ধি পায়।

৩১. এটা সেই স্বপ্ন নয়; বরং জাগ্রত অবস্থার কথা। উভয় পক্ষ যখন একে অন্যের সম্মুখীন ঠিক তখনই এটা ঘটেছিল। তখন আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের অন্তরে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে দেন, যদ্দরুণ কাফেরদের সেই বিশাল ও শক্তিশালী বাহিনীকেও তাদের কাছে অত্যন্ত মামুলি মনে হচ্ছিল।

الصّٰبِرِيْنَ ۝٤٦

তোমাদের হাওয়া (প্রভাব) বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য ধারণ করবে। বিশ্বাস রাখ, আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۝٤٧

৪৭. তোমরা তাদের মত হবে না, যারা নিজ গৃহ থেকে দম্ভভরে এবং মানুষকে নিজেদের ঠাটবাট দেখাতে দেখাতে বের হয়েছিল এবং তারা অন্যদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দিত।[৩২] আল্লাহ মানুষের সমস্ত কর্ম (নিজ জ্ঞান দ্বারা) পরিবেষ্টন করে আছেন।[৩৩]

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّيْ

৪৮. এবং (সেই সময়ও উল্লেখযোগ্য) যখন শয়তান তাদেরকে (অর্থাৎ কাফেরদেরকে) বুঝিয়েছিল যে, তাদের কাজ-কর্ম খুবই শোভন এবং বলেছিল, আজ এমন কেউ নেই, যে তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারে। আর আমিই তোমাদের রক্ষক।[৩৪] অতঃপর যখন

---

৩২. এর দ্বারা কুরায়শের সেই বাহিনীকে বোঝানো হয়েছে, যারা বদরের যুদ্ধে অহমিকা ভরে ও নিজেদের শান-শওকত প্রদর্শন করতে করতে বের হয়েছিল। শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, নিজেদের সামরিক শক্তি যত বেশিই হোক তার উপর ভরসা করে অহমিকায় লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। বরং ভরসা কেবল আল্লাহ তাআলারই উপর রাখা চাই।

৩৩. খুব সম্ভব বোঝানো হচ্ছে, অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে কারও সম্পর্কে মনে হয় সে ইখলাসের সাথে কাজ করছে। কিন্তু বাস্তবে তার উদ্দেশ্য থাকে লোক দেখানো অথবা এর বিপরীতে কারও ধরণ-ধারণ লোক দেখানো সুলভ হয়ে থাকে (যেমন শত্রুকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে অনেক সময় শক্তির মহড়া দিতে হয়), কিন্তু ইখলাসের সাথে তার ভরসা থাকে আল্লাহ তাআলারই উপর। যেহেতু সকলের সকল কাজের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তাআলা জানেন, তাই তিনি তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞানের ভিত্তিতেই তাদের শাস্তি বা পুরস্কার দানের ফায়সালা নেবেন। কেবল বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে ফায়সালা হবে না (তাফসীরে কাবীর)।

৩৪. শয়তানের পক্ষ থেকে এ আশ্বাস দানের কাজটি এভাবেও হতে পারে যে, মুশরিকদের অন্তরে এরূপ ভাবনা জাগ্রত করেছিল। কিন্তু পরের বাক্যে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, সে মানুষের বেশে মুশরিকদের সামনে এসেছিল এবং এসব কথা বলে তাদেরকে উস্কানি দিয়েছিল। সুতরাং ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) প্রমুখ এই ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, মক্কার মুশরিকগণ যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছিল, তখন তাদের পুরানো শত্রু বনু বকরের দিক থেকে তাদের আশঙ্কা বোধ হল, পাছে তারা তাদের ঘর-বাড়িতে হামলা চালায়। এ সময় শয়তান বনু বকরের নেতা সুরাকার বেশে তাদের সামনে উপস্থিত

بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

উভয় দল পরস্পর মুখোমুখি হল, তখন সে পিছন দিকে সরে পড়ল এবং বলল, আমি তোমাদের কোনও দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি যা-কিছু দেখছি, তোমরা তা দেখতে পাচ্ছ না। আমি আল্লাহকে ভয় করছি এবং আল্লাহর শাস্তি অতি কঠোর।

[৭]

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٤٩﴾

৪৯. স্মরণ কর, মুনাফিক ও যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল, তারা যখন বলছিল, তাদের (অর্থাৎ মুসলিমদের) দ্বীন তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে।[৩৫] অথচ কেউ আল্লাহর উপর ভরসা করলে আল্লাহ তো পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٥٠﴾

৫০. তুমি যদি দেখতে, ফিরিশতাগণ কাফেরদের চেহারা ও পিঠে আঘাত করে করে তাদের প্রাণ হরণ করছিল (আর বলছিল) এবার তোমরা জ্বলার মজা (-ও) ভোগ কর (তাহলে চমৎকার দৃশ্য দেখতে পেতে)।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٥١﴾

৫১. এসব তোমরা নিজ হাতে যা সামনে পাঠিয়েছিলে তার প্রতিফল। আর এটা তো স্থিরীকৃত বিষয় যে, আল্লাহ বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন।

হল এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করল যে, তোমাদের সৈন্য সংখ্যা বিপুল। তোমাদের উপর কেউ জয়ী হতে পারবে না। আর আমাদের গোত্র সম্পর্কে তোমরা নিশ্চিন্তে থাক। আমি নিজেই তোমাদের রক্ষা করব এবং তোমাদের সাথেই যাব। মক্কার মুশরিকগণ এ কথায় আশ্বস্ত হয়ে গেল। কিন্তু বদরের ময়দানে যখন ফিরিশতাদের বাহিনী সামনে এসে গেল তখন সুরাকারূপী শয়তান এই বলে তাদের থেকে পালালো যে, আমি তোমাদের কোন দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি এমন এক বাহিনী দেখছি, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। পরে মুশরিক বাহিনী যখন পরাস্ত হয়ে মক্কায় ফিরল তখন তারা সুরাকাকে ধরে অভিযোগ করল যে, তুমি আমাদেরকে এত বড় ধোঁকা দিলে? সুরাকা বলল, আমি তো এ ঘটনার কিছুই জানি না এবং আমি এমন কোনও কথা বলিওনি।

৩৫. মুসলিমগণ যখন সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় কাফেরদের অত বড় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, তখন মুনাফিকগণ বলতে লাগল, নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে এরা বড় ধোঁকার মধ্যে রয়েছে। মক্কার লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি এদের কোথায়?

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۵۲﴾

৫২. (তাদের অবস্থা ঠিক সেই রকমই হয়েছে) যেমন ফিরাউনের সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা হয়েছিল। তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে আল্লাহ তাদের পাপাচারের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি শক্তিমান এবং তার শাস্তি অতি কঠোর।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۙ﴿۵۳﴾

৫৩. এসব এজন্য হয়েছে যে, আল্লাহর নীতি হল, তিনি কোনও সম্প্রদায়কে যে নিয়ামত দান করেন, তা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলে।[৩৬] আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿۵۴﴾

৫৪. (এ বিষয়েও তাদের অবস্থা) ফিরাউনের সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থার মত। তারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে তাদের পাপাচারের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেই এবং ফিরাউনের সম্প্রদায়কে করি নিমজ্জিত। তারা সকলে ছিল জালেম।

---

৩৬. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নিজ নিয়ামতসমূহকে শাস্তি দ্বারা পরিবর্তন করেন কেবল তখনই, যখন মানুষ নিজেই নিজের অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলে। মক্কার কাফেরদেরকে আল্লাহ তাআলা সব রকমের নিয়ামত দান করেছিলেন। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হল তাদেরই মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব হওয়া। তখন যদি তারা জেদ না দেখিয়ে সত্য তালাশ করত ও ন্যায়নিষ্ঠতার পরিচয় দিত, তবে ইসলাম গ্রহণ করা তাদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন ছিল না। কিন্তু তারা এ নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা করল এবং জেদ দেখিয়ে নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলল। এমনকি হঠকারিতাবশত ইসলাম গ্রহণকে তারা নিজেদের জন্য অমর্যাদাকর মনে করল। ফলে সত্য গ্রহণ তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে গেল। এভাবে যখন তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলল, তখন আল্লাহ তাআলাও নিয়ামতকে আযাবে পরিবর্তিত করে দিলেন।

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. নিশ্চিত জেন, ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রাণীদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব হল তারা যারা কুফর অবলম্বন করেছে, যে কারণে তারা ঈমান আনয়ন করছে না।[৩৭]

الَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. তারা সেই সকল লোক, যাদের থেকে তুমি প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলে। তা সত্ত্বেও তারা প্রতিবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তারা বিন্দুমাত্র ভয় করে না।[৩৮]

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. সুতরাং যুদ্ধকালে যদি তোমরা তাদেরকে নাগালের ভেতর পাও তবে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে তাদের পিছনে যারা আছে তাদেরকেও ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবে, যাতে তারা স্মরণ রাখে।[৩৯]

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. তোমরা যদি কোনও সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা কর, তবে তুমিও সে চুক্তি সোজা তাদের দিকে ছুঁড়ে মার।[৪০] স্মরণ রেখ, আল্লাহ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদেরকে পসন্দ করেন না।

---

৩৭. এর জন্য পিছনে ২২ নং আয়াতের টীকা দেখুন।

৩৮. এর দ্বারা মদীনার আশেপাশে বসবাসকারী ইয়াহুদীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুক্তি হয়েছিল যে, তারা ও মুসলিমগণ পরস্পর শান্তিতে সহাবস্থান করবে। একে অন্যের শত্রুর সহযোগিতা করবে না। কিন্তু ইয়াহুদীরা এ চুক্তি বার বার ভঙ্গ করেছে এবং তারা গোপনে মক্কার কাফেরদের সাথে যোগসাজশে রত থেকেছে।

৩৯. অর্থাৎ তারা যদি কোন যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ময়দানে আসে, তবে তাদেরকে এমন শিক্ষা দিতে হবে, যাতে বিশ্বাস ভঙ্গের পরিণাম কেবল তাদেরকেই নয়; বরং তাদের পিছনে থেকে যারা তাদেরকে উস্কানি দেয় তাদেরকেও ভোগ করতে হয় এবং তাদের সব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যায়।

৪০. যদি তাদের পক্ষ থকে প্রকাশ্যে বিশ্বাস ভঙ্গের মত কোনও কাজ পাওয়া না যায়, কিন্তু সুযোগ মত বিশ্বাস ভঙ্গ করে মুসলিমদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে বলে আশঙ্কা হয়, তবে সেক্ষেত্রে কী করণীয় এ আয়াতে তার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে মুসলিমদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন পরিষ্কারভাবে চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিয়ে

[৮]

৫৯. কাফেরগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে, তারা পরিত্রাণ পেয়ে গেছে।[৪১] এটা তো নিশ্চিত কথা যে, তারা (আল্লাহকে) ব্যর্থ করতে পারবে না।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۝

৬০. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-ছাউনি প্রস্তুত কর,[৪২] যা দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু ও নিজেদের (বর্তমান) শত্রুদেরকে সন্ত্রস্ত করে রাখবে এবং তাদের ছাড়া সেই সব লোককেও যাদেরকে তোমরা এখনও জান না (কিন্তু) আল্লাহ জানেন।[৪৩]

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ۚ اللَّهُ

দেয় এবং তাদেরকে জানিয়ে দেয় যে, এখন থেকে আমাদের মধ্যে কোনও পক্ষই চুক্তি মানতে বাধ্য নয়। যে-কোনও পক্ষ চাইলে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে যে-কোনও রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে– এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। 'তুমিও সে চুক্তি সোজা তাদের দিকে ছুঁড়ে মার' বলে এ কথাই বোঝানো হয়েছে। আরবদের পরিভাষায় বাক্যটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এতদসঙ্গে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, শত্রু পক্ষের দিক থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা দেখা দিলে আগেই তাদের বিরুদ্ধে চুক্তি-বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। আগে চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিয়ে নিতে হবে। অন্যথায় সেটা চুক্তি ভঙ্গের শামিল হবে, যা আল্লাহ তাআলার পসন্দ নয়।

৪১. এর দ্বারা সেই সকল কাফেরের দিকে ইশারা করা হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধ থেকে পলায়ন করেছিল।

৪২. গোটা মুসলিম উম্মাহর প্রতি এটা এক স্থায়ী নির্দেশ যে, তারা যেন ইসলাম ও মুসলিমদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত রাখার লক্ষ্যে সব রকম প্রতিরক্ষা শক্তি গড়ে তোলে। কুরআন মাজীদ সাধারণভাবে 'শক্তি' শব্দ ব্যবহার করে বোঝাচ্ছে যে, রণপ্রস্তুতি বিশেষ কোনও অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং যখন যে ধরনের প্রতিরক্ষা-শক্তি কাজে আসে, তখন সেই রকম শক্তি অর্জন করা মুসলিমদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং সর্বপ্রকার আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রও এর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া মুসলিমদের জাতীয়, সামাজিক ও সামরিক উন্নতির জন্য যত রকমের আসবাব-উপকরণ দরকার হয় সে সবও এর মধ্যে পড়ে। আফসোস আজকের মুসলিম বিশ্ব এ ফরয আদায়ে চরম অবহেলা প্রদর্শন করেছে। ফলে আজ তারা অন্যান্য জাতির আশ্রিত ও বশীভূত জাতিতে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ সূরতহাল থেকে পরিত্রাণ দিন।

৪৩. এর দ্বারা মুসলিমদের সেই সকল শত্রুকে বোঝানো হয়েছে, যারা তখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে আসেনি, যেমন রোমান ও পারস্য জাতি। তারা প্রকাশ্য শত্রুতা করেছিল আরও পরে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ দিকে, খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে এবং তারপরেও তাদের সঙ্গে মুসলিমদের যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে।

يَعْلَمُهُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٦٠﴾

তোমরা আল্লাহর পথে যা-কিছু ব্যয় করবে তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে দেওয়া হবে এবং তোমাদেরকে কিছু কম দেওয়া হবে না।

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦١﴾

৬১. আর তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তোমরাও সে দিকে ঝুঁকে পড়বে[৪৪] এবং আল্লাহর উপর নির্ভর করবে। নিশ্চয়ই তিনি সকল কথা শোনেন, সকল কিছু জানেন।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْۤا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ الَّذِيْۤ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. তারা যদি তোমাকে ধোঁকা দিতে চায়, তবে আল্লাহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই নিজ সাহায্যে মুমিনদের দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন।

وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّاۤ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٣﴾

৬৩. এবং তিনি তাদের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। তুমি যদি পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদও ব্যয় করতে তবে তাদের হৃদয়ে এ সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে পারতে না। কিন্তু তিনি তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমতারও মালিক, হিকমতেরও মালিক।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. হে নবী! তোমার জন্য আল্লাহ এবং যে সকল মুমিন তোমার অনুসরণ করেছে তারাই যথেষ্ট।

[৯]

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْۤا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ

৬৫. হে নবী! মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন ধৈর্যশীল লোক থাকে, তবে তারা দু'শ জনের উপর জয়ী হবে। তোমাদের যদি একশ' জন থাকে, তবে তারা এক হাজার কাফেরের উপর জয়ী

---

৪৪. এ আয়াত মুসলিমদেরকে শত্রুর সাথে সন্ধি স্থাপনেরও অনুমতি দিয়েছে। তবে শর্তাবলী এমন হতে হবে যাতে মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষা পায়।

لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾

হবে। কেননা তারা এমন এক সম্প্রদায়, যারা বুঝ-সমঝ রাখে না।[৪৫]

اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ؕ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْۤا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. এখন আল্লাহ তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা আছে। সুতরাং (এখন বিধান এই যে,) তোমাদের মধ্যে যদি ধৈর্যশীল একশ লোক থাকে, তবে তারা দু'শ জনের উপর জয়ী হবে আর যদি তোমাদের এক হাজার জন থাকে, তবে তারা আল্লাহর হুকুমে দু' হাজার জনের উপর জয়ী হবে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।[৪৬]

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗۤ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖۗ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٧﴾

৬৭. কোনও নবীর পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, যমীনে যতক্ষণ পর্যন্ত (শত্রুদের) রক্ত ব্যাপকভাবে প্রবাহিত না করা হবে (যাতে তাদের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়) ততক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে কয়েদী থাকবে।[৪৭] তোমরা দুনিয়ার

---

৪৫. যেহেতু সঠিক বুঝ রাখে না তাই ইসলামও গ্রহণ করে না। আর ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে আল্লাহ তাআলার গায়েবী সাহায্য থেকেও বঞ্চিত থাকে এবং নিজেদের দশগুণ বেশি শক্তি থাকা সত্ত্বেও মুসলিমদের কাছে পরাস্ত হয়। প্রসঙ্গত এ আয়াতে আদেশ করা হয়েছে যে, কাফেরদের সংখ্যা মুসলিমদের অপেক্ষা দশগুণ বেশি হলেও মুসলিমদের জন্য পিছু হটা জায়েয নয়। অবশ্য এরপরে পরবর্তী আয়াতটি দ্বারা এ হুকুম আরও সহজ করে দেওয়া হয়েছে।

৪৬. এ হুকুম পরবর্তীতে নাযিল হয়েছে। এর দ্বারা আগের হুকুম সহজ করা হয়েছে। এখন বিধান এই যে, শত্রুদের সংখ্যা মুসলিমদের দ্বিগুণ পর্যন্ত থাকলে মুসলিমদের জন্য পিছু হটা জায়েয নয়। শত্রু সংখ্যা যদি আরও বেশি হয়, তবে পশ্চাদপসরণ করার অবকাশ আছে। এভাবে পূর্বে ১৫ ও ১৬ নং আয়াতে যে বিধান বর্ণিত হয়েছিল, এ আয়াতে তার ব্যাখ্যা করে দেওয়া হল।

৪৭. বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের সত্তর জন লোক বন্দী হয়েছিল। তাদেরকে যুদ্ধ বন্দী হিসেবে মদীনায় নিয়ে আসা হয়। তাদের সঙ্গে কি আচরণ করা হবে এ নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। হযরত উমর (রাযি.) সহ কতিপয় সাহাবীর রায় ছিল তাদেরকে হত্যা করে ফেলা। কেননা মুসলিমদের প্রতি তারা যে উৎপীড়ন চালিয়েছিল সে কারণে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া

সম্পদ কামনা কর আর আল্লাহ (তোমাদের জন্য) আখিরাত (-এর কল্যাণ) চান। আল্লাহ ক্ষমতারও মালিক, হিকমতেরও মালিক।

৬৮. যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে লিখিত এক বিধান পূর্বে না আসত, তবে তোমরা যে পথ অবলম্বন করেছ সে কারণে তোমাদের উপর বড় কোন শাস্তি আপতিত হত।[৪৮]

لَوۡلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمۡ فِيۡمَاۤ اَخَذۡتُمۡ عَذَابٌ عَظِيۡمٌ ﴿۶۸﴾

উচিত। অন্যান্য সাহাবীগণ মত দিলেন, তাদেরকে ফিদয়ার বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হোক (ফিদয়া বলে সেই অর্থকে, যার বিনিময়ে যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়)। যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীগণ এই দ্বিতীয় মতেরই পক্ষে ছিলেন, তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অনুসারেই ফায়সালা দান করলেন। সুতরাং কয়েদীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। সে পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আয়াতে এ ফায়সালার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে এবং তার কারণ বলা হয়েছে এই যে, বদর যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল কাফেরদের দর্প চূর্ণ করা ও তাদের মেরুদণ্ড সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে দেওয়া। আর এভাবে যারা বছরের পর বছর কেবল সত্য দ্বীনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং মুসলিমদের প্রতি বর্বরোচিত জুলুম-নির্যাতনও চালিয়ে গেছে, তাদের মধ্যে মুসলিমদের প্রতাপ বসিয়ে দেওয়া। এর জন্য দরকার ছিল তাদের প্রতি কোনরূপ দয়া না দেখিয়ে বরং সকলকে হত্যা করে ফেলা, যাতে কেউ ওয়াপস গিয়ে মুসলিমদের জন্য নতুন করে বিপদের কারণ হতে না পারে এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি দেখে অন্যরাও শিক্ষালাভ করতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দানের কারণে যে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে, এটা বদর যুদ্ধের উপরিউক্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যর সাথে সম্পৃক্ত। পরবর্তীকালে সূরা মুহাম্মাদের ৪নং আয়াতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এখন যেহেতু কাফেরদের সামরিক শক্তি ভেঙ্গে গেছে, তাই এখন আর তাদের যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা জরুরী নয়; বরং এখন ফিদয়ার বিনিময়েও তাদেরকে মুক্তি দেওয়া জায়েয। এমনকি প্রয়োজনবোধে ফিদয়াবিহীন মুক্তি দানের ঔদার্যও তাদের প্রতি প্রদর্শন করা যেতে পারে।

৪৮. 'পূর্বে লিখিত বিধান' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? কতক মুফাসসির বলেন, পূর্বে ৩৩ নং আয়াতে বর্ণিত বিধান, অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্তমানে আল্লাহ তাআলার কোনও আযাব না আসা। অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন, কয়েদীদের মধ্য হতে কারও কারও তাকদীরে লেখা ছিল যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, এ আয়াত তাকদীরের সেই লিখনকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সে ফায়সালার কারণে মুসলিমদেরকে শাস্তি দেননি এ কারণে যে, কয়েদীদের মধ্যে এমন কেউ কেউ এ ফায়সালার কারণে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে, যাদের ভাগ্যে ইসলাম লেখা ছিল। নয়ত নীতিগতভাবে এ ফায়সালা পসন্দীয় ছিল না।

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٩﴾

৬৯. সুতরাং তোমরা যে গনীমত অর্জন করেছ, তা উত্তম বৈধ সম্পদ হিসেবে ভোগ কর এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৪৯]

[১০]

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْۤ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰۤى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّاۤ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧٠﴾

৭০. হে নবী! তোমাদের হাতে যে সকল বন্দী আছে, (এবং যারা ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রমকাশ করেছে) তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালো কিছু দেখলে তোমাদের থেকে যে সম্পদ (ফিদয়া রূপে) নেওয়া হয়েছে, তোমাদেরকে তা অপেক্ষা উত্তম কিছু দান করবেন[৫০] এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

৪৯. যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে এ ফায়সালা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের মত ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমর্থনক্রমে নেওয়া হয়েছিল, তাই অসন্তোষ প্রকাশ সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে ক্ষমা করারও ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে অনুমতি দিয়েছেন যে, তারা ফিদয়া হিসেবে যে সম্পদ গ্রহণ করেছে তা তারা ভোগ করতে পারে। কেননা তাদের পক্ষে তা হালাল।

৫০. ভালো কিছু দেখার অর্থ যারা ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, তাদের অন্তরে ইখলাস ও নিষ্ঠা থাকা, দূরভিসন্ধিমূলকভাবে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা না দেওয়া। এ অবস্থায় তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, তারা নিজেদের মুক্তির জন্য যে অর্থ ব্যয় করেছে, দুনিয়া বা আখিরাতে তাদেরকে তার চেয়ে উত্তম বদলা দেওয়া হবে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস (রা), যিনি তখনও পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন, তিনি আরয করেছিলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে যুদ্ধে আসতে বাধ্য করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে যাই হোক ফিদয়া দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেছে, আপনাকেও তা দিতে হবে। সেই সঙ্গে আপনার ভাতিজা আকীল ও নাওফালের ফিদয়াও আপনিই দেবেন। তিনি বললেন, এতটা অর্থ আমি কোথায় পাব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনি আপনার স্ত্রী উম্মুল ফযলের কাছে গোপনে যে অর্থ রেখে এসেছেন তার কী হল? একথা শুনে হযরত আব্বাস (রাযি.) স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কেননা তিনি ও তাঁর স্ত্রী ছাড়া আর কারও একথা জানা ছিল না। তৎক্ষণাৎ তিনি বলে উঠলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল। পরবর্তীকালে হযরত আব্বাস (রাযি.) বলতেন, ফিদয়া হিসেবে আমি যা দিয়েছিলাম, আল্লাহ তাআলা আমাকে তার চেয়ে ঢের বেশি দিয়েছেন।

৭১. (হে নবী!) তারা যদি তোমার সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গের ইচ্ছা করে থাকে, তবে তারা তো ইতঃপূর্বে আল্লাহর সঙ্গেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, যার পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের আয়ত্তাধীন করেছেন। বস্তুত আল্লাহর জ্ঞানও পরিপূর্ণ, হিকমতও পরিপূর্ণ।

وَاِنْ یُّرِیْدُوْا خِیَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ حَكِیْمٌ ﴿۷۱﴾

৭২. যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে (মদীনায়) আশ্রয় দিয়েছে ও তাদের সাহায্য করেছে, তারা পরস্পরে একে অন্যের অলি-ওয়ারিছ। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের সাথে তোমাদের উত্তরাধিকারের কোনও সম্পর্ক নেই।[৫১] হ্যাঁ দ্বীনের কারণে তারা

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْۤا اُولٰٓىِٕكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِیَآءُ بَعْضٍ ؕ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ یُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَایَتِهِمْ مِّنْ شَیْءٍ حَتّٰی یُهَاجِرُوْا ۚ

---

৫১. সূরা আনফালের শেষ দিকের এ আয়াতসমূহে মীরাছ সংক্রান্ত কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে। এসব বিধান **মক্কা** মুকাররমা থেকে মুসলিমদের হিজরতের ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত হয়েছিল। এ মূলনীতি তো আল্লাহ তাআলা শুরুতেই স্থির করে দিয়েছিলেন যে, মুসলিম ও কাফের একে অন্যের ওয়ারিশ হতে পারে না। হিজরতের পর অবস্থা এই হয়েছিল যে, যে সকল সাহাবী মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেছিলেন, তাদের অনেকের আত্মীয়-স্বজন **মক্কা** মুকাররমায় রয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকে এমনও ছিল যারা ওয়ারিশ হতে পারত। কিন্তু তাদের অধিকাংশ যেহেতু ছিল কাফের, তখনও পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাই ঈমান ও কুফরের প্রতিবন্ধকতার কারণে তারা মুসলিমদের ওয়ারিশ হতে পারেনি। এ আয়াত দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, না তারা মুসলিমদের ওয়ারিশ হতে পারে, আর না মুসলিমগণ তাদের। মুহাজিরদের এমন কিছু আত্মীয়ও ছিল, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু তারা মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেনি। তাদের সম্পর্কেও এ আয়াত বিধান দিয়েছে যে, মুহাজির মুসলিমদের সঙ্গে তাদেরও উত্তরাধিকার প্রাপ্তির কোনও সূত্র নেই। তার এক কারণ তো এই যে, তখন মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করা সকল মুসলিমের উপর ফরয ছিল। তারা হিজরত করে তখনও পর্যন্ত এ ফরয আদায় করেনি। আর দ্বিতীয় কারণ হল, মুহাজিরগণ ছিলেন মদীনা মুনাওয়ারায়, যা ছিল দারুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্র আর তাদের ওই মুসলিম আত্মীয়গণ ছিলেন মক্কা মুকাররমায়, যা তখন দারুল হারব বা অমুসলিম রাষ্ট্র ছিল এবং উভয়ের মধ্যে বিশাল প্রতিবন্ধক বিদ্যমান ছিল।

যা হোক মুহাজিরগণের যেসব আত্মীয় মক্কা মুকাররমায় ছিল, তারা মুসলিম হোক বা অমুসলিম, তাদের সাথে মুহাজিরদের উত্তরাধিকার সূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের কোনও আত্মীয় যদি মক্কা মুকাররমায় মারা যেত, তবে তার রেখে যাওয়া সম্পদে

وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٧٢﴾

তোমাদের সাহায্য চাইলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য, অবশ্য সে সাহায্য যদি এমন কোনও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হয়, যাদের সঙ্গে তোমাদের কোন চুক্তি আছে, তবে নয়।[৫২] তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ্ তা ভালোভাবে দেখেন।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ﴿٧٣﴾

৭৩. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা পরস্পরে একে অন্যের অলি-ওয়ারিশ। তোমরা যদি এরূপ না কর, তবে পৃথিবীতে ফিতনা ও মহা বিপর্যয় দেখা দেবে।[৫৩]

মুহাজিরদের কোনও অংশ থাকত না। অপর দিকে যদি কোন মুহাজির মদীনায় মারা যেতেন, তবে তার রেখে যাওয়া সম্পদেও তার মক্কাস্থ কোনও আত্মীয় অংশ লাভ করত না। যে সকল মুহাজির মদীনায় চলে এসেছিলেন, মদীনার আনসারগণ তাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি একজন আনসারী সাহাবীর সাথে একেকজন মুহাজির সাহাবীর ভ্রাতৃ-বন্ধন গড়ে দিয়েছিলেন। পরিভাষায় একে 'মুআখাত' বলে। এ আয়াতে বিধান দেওয়া হয়েছে যে, এখন প্রত্যেক মুহাজিরের ওয়ারিশ হবে তার মুআখাত ভিত্তিক আনসারী ভাই, মক্কাস্থ আত্মীয়গণ নয়।

৫২. অর্থাৎ যে সকল মুসলিম এখনও পর্যন্ত হিজরত করেনি, তারা যদিও মুহাজিরদের ওয়ারিশ নয়, কিন্তু তারা মুসলিম তো বটে। কাজেই তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলে তাদের সাহায্য করা মুহাজিরদের অবশ্য কর্তব্য। তবে একটা অবস্থা ব্যতিক্রম। সে অবস্থায় এরূপ সাহায্য করা মুহাজিরদের পক্ষে বৈধ নয়। আর তা হল, যে কাফেরদের বিরুদ্ধে তারা সাহায্য চাচ্ছে তাদের সঙ্গে মুসলিমদের যুদ্ধবিরোধী কোনও চুক্তি থাকা। যদি তাদের সঙ্গে মুসলিমদের এ রকম চুক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকে, তবে তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের মুসলিম ভাইদের সাহায্য করা ও তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয হবে না। কেননা এটা বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে গণ্য হবে, যা কিছুতেই জায়েয নয়। এর দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে ইসলামে বিশ্বাস রক্ষার গুরুত্ব কতটুকু। অমুসলিমদের সাথে কোনও চুক্তি হয়ে গেলে নিজ মুসলিম ভাইদের সাহায্য করার জন্যও সে চুক্তির বিপরীত কাজ করাকে ইসলাম বৈধ করেনি। হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে এরূপ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল, যাতে চরম ধৈর্যের সাথে এ বিধান পালন করা হয়েছে। এ সময় কাফেরদের হাতে নির্যাতিত মুসলিমগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। তাদের সাহায্য করার জন্য মুসলিমদের অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু কুরাইশদের সাথে যেহেতু চুক্তি হয়ে গিয়েছিল তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সবর করতে বলেন। এটা ছিল তাদের পক্ষে এক কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু এ পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হন। তাঁরা অবিচলভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালন করে যান।

৫৩. মীরাছ সংক্রান্ত উপরিউক্ত বিধান এবং যে সকল মুসলিম হিজরত করেনি তাদের সাহায্য করা সংক্রান্ত যে বিধান শেষ দিকে এ আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, তারই সাথে এ বাক্যের

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٤﴾

৭৪. যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে আর যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও তাদের সাহায্য করেছে তারাই সকলে প্রকৃত মুমিন।[৫৪] তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও সম্মানজনক রিযিক।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٥﴾

৭৫. যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও তোমাদের সাথে জিহাদ করেছে, তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত। আর (তাদের মধ্যে) যারা (পুরানো মুহাজিরদের) আত্মীয়, আল্লাহর কিতাবে তারা একে-অন্যের (মীরাছের ব্যাপারে অন্যদের অপেক্ষা) বেশি হকদার।[৫৫] নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

সম্পর্ক। এতে সতর্ক করা হয়েছে যে, এসব বিধান অমান্য করলে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে। উদাহরণত কাফেরদের হাতে যে সকল মুসলিম নিপীড়িত হচ্ছে, তাদের সাহায্য না করলে যে বিপর্যয় দেখা দেবে এটা তো স্পষ্ট কথা। এমনিভাবে তাদের সাহায্য করতে গিয়ে যদি অমুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়, তবে এর দ্বারাও সেই সকল কল্যাণ ও স্বার্থ পদদলিত হবে যার প্রতি লক্ষ্য করে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছিল।

৫৪. অর্থাৎ যে সকল মুসলিম এখনও পর্যন্ত হিজরত করেনি, যদিও তারা মুমিন, কিন্তু হিজরতের নির্দেশ পালন না করার অপূর্ণতা তাদের মধ্যে এখনও রয়ে গেছে। অপর দিকে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে এই অপূর্ণতা নেই। তাই প্রকৃত অর্থে মুমিন নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত তারাই।

৫৫. এটা যে সকল মুসলিম ইতঃপূর্বে হিজরত করেনি, তারাও পরিশেষে হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছে, সেই সময়কার কথা। তাদের সম্পর্কে এ আয়াতে দু'টি বিধান বর্ণিত হয়েছে। (ক) হিজরতের মাধ্যমে তারা যেহেতু নিজেদের সেই ত্রুটি দূর করে ফেলেছে, যদ্দরুণ তাদের মর্যাদা মুহাজির ও আনসারদের চেয়ে নিচে ছিল, সেহেতু এখন তারাও তাদের সম-মর্যাদার হয়ে গেছে। (খ) এত দিন তারা তাদের মুহাজির আত্মীয়দের ওয়ারিশ হতে পারত না। এখন তারাও যেহেতু হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছে এবং ওয়ারিশ হওয়ার মূল প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গেছে, তাই এখন তারা তাদের মুহাজির ভাইদের ওয়ারিশ হবে। এর অনিবার্য ফল এই যে, ইতঃপূর্বে আনসারী ভাইদেরকে যে মুহাজিরদের ওয়ারিশ বানানো হয়েছিল, তা রহিত হয়ে গেছে। কেননা সেটা ছিল এক সাময়িক বিধান। মদীনায় মুহাজিরদের কোন আত্মীয় না থাকার কারণেই সে বিধান দেওয়া হয়েছিল। এখন যেহেতু তারা মদীনায় এসে গেছে তাই এখন মীরাছের মূল বিধান ফিরে আসবে অর্থাৎ নিকটাত্মীয়দের মধ্যেই উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন হবে।

আল-হামদুলিল্লাহ আজ ২৭ রবিউল আউয়াল ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২৭ এপ্রিল ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ মক্কা মুকাররমায় সূরা আনফালের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৭ মহররম ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ১৪ জানুয়ারি ২০১০ খ্রিস্টাব্দ)। এ সূরার তরজমা শুরু হয়েছিল লন্ডনে, কিছু অংশ করাচিতে করা হয়েছে আর আজ পবিত্র মক্কায় আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে সমাপ্ত হল। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতকে কবুল করে নিন, একে উম্মতের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অন্যান্য সূরাসমূহের তরজমা ও টীকার কাজও নিজ ফযল ও করমে নিজ মর্জি মোতাবেক ইখলাসের সাথে শেষ করার তাওফীক দিন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

সূরা তাওবা

পরিচিতি

এটিও একটি মাদানী সূরা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক জীবনের শেষ দিকে নাযিল হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি সূরা আনফালের পরিশিষ্ট স্বরূপ। খুব সম্ভব এ কারণেই অন্যান্য সূরার মত এ সূরার শুরুতে بسم الله الرحمن الرحيم নাযিল হয়নি এবং লেখাও হয়নি। এ কারণে সূরাটি তিলাওয়াত করার নিয়মও এ রকম যে, যে ব্যক্তি পূর্বের সূরা আনফাল থেকে তিলাওয়াত করে আসবে সে এখানে বিসমিল্লাহ... পড়বে না। হাঁ, কেউ যদি এ সূরা থেকেই পড়া শুরু করে তবে তাকে বিসমিল্লাহ পড়তে হবে। কেউ কেউ এ সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ'-এর পরিবর্তে অন্য কিছু বাক্য তৈরি করে দিয়েছে এবং তা পড়ার নিয়ম চালু করেছে। মূলত তার কোনও ভিত্তি নেই। উপরে যে নিয়ম লেখা হল, সেটাই সালাফে সালেহীন থেকে বর্ণিত হয়ে এসেছে।

এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল মক্কা বিজয়ের পর। আরবের বহু গোত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কুরাইশ কাফেরদের যুদ্ধ কোন পরিণতিতে পৌঁছায় তার অপেক্ষায় ছিল। কুরাইশ গোত্র যখন হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল ঘোষণা করল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুকাররমায় হামলা চালালেন এবং বিশেষ রক্তপাত ছাড়াই জয়লাভ করলেন। এর ফলে কাফেরদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছিল। তথাপি শেষ চেষ্টা হিসেবে হাওয়াযিন গোত্র মুসলিমদের মুকাবিলা করার জন্য বিশাল সেনাদল সংগ্রহ করল। ফলে হুনায়ন প্রান্তরে সর্বশেষ বড় ধরনের যুদ্ধ হল। প্রথম দিকে মুসলিমদের কিছুটা পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হলেও চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই অর্জিত হয়। এ যুদ্ধের কিছু ঘটনাও এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। সর্বশেষ এ যুদ্ধের পর আরবের যে সকল গোত্র কুরাইশের কারণে ইসলাম গ্রহণ করতে ভয় পাচ্ছিল কিংবা যারা যুদ্ধের শেষ পরিণতি দেখার অপেক্ষায় ছিল তাদের অন্তর থেকে ইসলাম গ্রহণের প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গেল। ফলে তারা দলে দলে মদীনা মুনাওয়ারায় এসে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। এভাবে জাযিরাতুল আরবের অধিকাংশ এলাকায় ইসলামী পতাকা উড়তে শুরু করল। এ সময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জাযিরাতুল আরবকে ইসলামের কেন্দ্রভূমি ঘোষণা করা হল। মূল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আরব উপদ্বীপে কোন অমুসলিম সাধারণ নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে পারবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে এ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেই ইরশাদ করেন, আরব উপদ্বীপে দু'টি দ্বীন অবস্থান করতে পারে না (ইমাম মালিক, মুআত্তা; মুসনাদে আহমদ, ৬ খণ্ড, ৫৭২ পৃষ্ঠা)। কিন্তু এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা হয় পর্যায়ক্রমে। সর্বপ্রথম লক্ষ্য স্থির করা হয় মূর্তিপূজার মূলোচ্ছেদ, যাতে জাযিরাতুল আরবের কোথাও মূর্তিপূজার চিহ্নমাত্র না থাকে। সুতরাং আরবে যে সকল মূর্তিপূজক অবশিষ্ট ছিল এবং যারা বিশ বছরেরও বেশি কাল যাবৎ মুসলিমদের প্রতি বর্বরোচিত জুলুম-নির্যাতন

চালিয়েছিল, তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে অবকাশ দেওয়া হল। এ সূরার শুরুতে সে সব মেয়াদের উল্লেখ পূর্বক জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা যদি এ সময়ের ভেতর ইসলাম গ্রহণ না করে তবে তাদেরকে জাযিরাতুল আরব ছাড়তে হবে নয়ত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে। এতদসঙ্গে মসজিদুল হারামকে মূর্তিপূজার সকল চিহ্ন থেকে পবিত্র করারও ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হল।

উপরিউক্ত লক্ষ্য পূরণ হওয়ার পর জাযিরাতুল আরবের পূর্ণাঙ্গ পবিত্রীকরণের জন্য দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। আর তা ছিল জাযিরাতুল আরব থেকে ইয়াহুদী ও নাসারাদের উচ্ছেদ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনে এ লক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তিনি এ সম্পর্কে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন। সামনে ২৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এর বিবরণ আসবে।

এর আগে রোম সম্রাট মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে কিছুটা উদ্বেগ বোধ করে থাকবেন। যে কারণে তিনি মুসলিমদের উপর হামলা করার উদ্দেশ্যে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামের বাহিনী নিয়ে তাবুক পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। এ সূরার একটা বড় অংশ এ যুদ্ধাভিযানেরই বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত করে। মুনাফিকদের দুরভিসন্ধিমূলক কার্যক্রম তো অবিরত চলছিলই। এ সূরায় তাদের সে সব অপ-তৎপরতারও মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে।

এ সূরার এক নাম সূরা তাওবা, অন্য নাম বারাআঃ। বারাআঃ অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ। এ সূরার শুরুতে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তাই এর নাম সূরা বারাআঃ। আর সূরাটির নাম তাওবা বাখা হয়েছে এ কারণে যে, এতে কয়েকজন সাহাবীর তাওবা কবুলের কথা বর্ণিত হয়েছে। সে সাহাবীগণ তাবুক যুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত ছিলেন। পরে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তারা যারপরনাই অনুতাপ দগ্ধ হন ও কৃতকর্মের জন্য তাওবা করেন। আল্লাহ তাআলা তাদের তাওবা কবুল করে নেন।

৯–সূরা তাওবা, মাদানী–১১৩

سُوۡرَۃُ التَّوۡبَۃِ مَدَنِیَّۃٌ

এ সূরায় ১২৯ আয়াত ও ১৬টি রুকু আছে।

اٰيَاتُهَا ١٢٩ رُكُوۡعَاتُهَا ١٦

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖۤ اِلَى الَّذِيۡنَ عٰهَدۡتُّمۡ مِّنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ ؕ ①

১. (হে মুসলিমগণ!) এটা আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা, সেই সকল মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে।[১]

فَسِيۡحُوۡا فِى الۡاَرۡضِ اَرۡبَعَةَ اَشۡهُرٍ وَّاعۡلَمُوۡۤا اَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخۡزِى الۡكٰفِرِيۡنَ ②

২. সুতরাং (হে মুশরিকগণ! আরবের) ভূমিতে চার মাস পর্যন্ত তোমাদের স্বাধীনভাবে বিচরণ করার অনুমতি আছে। জেনে রেখ, তোমরা আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না এবং এটাও (জেনে রেখ) যে, আল্লাহ কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন।

---

১. পূর্বে এ সূরার পরিচিতিতে যে প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে, এ আয়াতগুলি ভালোভাবে বুঝতে হলে সেটা জানা থাকা আবশ্যক। জাযিরাতুল আরবকে ইসলামের কেন্দ্রভূমি বানানোর লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা আদেশ নাযিল করেন যে, কিছু কালের অবকাশ দেওয়া হল। এরপর আর কোন মূর্তিপূজক আরব উপদ্বীপে নাগরিকের মর্যাদা নিয়ে অবস্থান করতে পারবে না। সুতরাং যে সামান্য সংখ্যক মুশরিক অদ্যাবধি ইসলাম গ্রহণ করেনি, এ আয়াতে তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এরা ছিল সেই সব লোক, যারা মুসলিমদেরকে কষ্ট দানের কোন পন্থা বাকি রাখেনি, সর্বদা তাদের উপর বর্বরোচিত জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদেরকে জাযিরাতুল আরব ত্যাগ করার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে, সামনের আয়াতসমূহে বিস্তারিতভাবে তা আসছে। এ সকল মুশরিক ছিল চার রকমের।

এক. এক তো হল সেই সকল মুশরিক যাদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ বন্ধের কোন চুক্তি হয়নি। এরূপ মুশরিকদেরকে চার মাসের সময় দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে তারা ইসলাম গ্রহণ করলে তো ভালো কথা। যদি তা না করে জাযিরাতুল আরবের বাইরে কোনও দেশে যেতে চায়, তবে তারও ব্যবস্থা করতে পারে। যদি এ দু'টো বিকল্পের কোনওটি গ্রহণ না করে, তবে এখনই তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া যাচ্ছে যে, তাদেরকে যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে (তিরমিযী, হজ্জ অধ্যায়, হাদীস নং ৮৭১)।

দুই. দ্বিতীয় প্রকার হল সেই সকল মুশরিকের, যাদের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হয়েছিল, কিন্তু তার জন্য নির্দিষ্ট কোনও মেয়াদ ধার্য করা হয়নি। তাদের সম্পর্কেও ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে যে, এখন থেকে সে চুক্তি চার মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর ভেতর তাদেরকেও

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِیْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ

৩. বড় হজ্জের দিন[২] আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে সমস্ত মানুষের জন্য ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, আল্লাহও মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন এবং রাসূলও। সুতরাং (হে

প্রথমোক্ত দলের মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সূরা তাওবার প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াত এ দুই শ্রেণীর মুশরিক সম্পর্কেই।

তিন. তৃতীয় প্রকারের মুশরিক হল তারা, যাদের সঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধবিরোধী চুক্তি সম্পন্ন করেছিলেন বটে, কিন্তু তারা সে চুক্তির মর্যাদা রক্ষা না করে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছিল, যেমন হুদায়বিয়ায় কুরাইশ কাফেরদের সাথে এ রকম চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু তারা সে চুক্তি লংঘন করেছিল। তারই ফলশ্রুতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুকাররমায় অভিযান চালিয়েছিলেন এবং বিজয় অর্জন করেছিলেন। তাদেরকে বাড়তি কোন সময় দেওয়া হয়নি, তবে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা যেহেতু হজ্জের সময় দেওয়া হয়েছিল, যা এমনিতেই সম্মানিত মাস, যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ জায়েয নয় এবং এর পরের মহররমও এ রকমই একটি মাস, তাই স্বাভাবিকভাবেই মহররম মাসের শেষ পর্যন্ত তারা সময় পেয়ে গিয়েছিল। তাদেরই সম্পর্কে ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, সম্মানিত মাসসমূহ গত হওয়ার পরও যদি তারা ঈমান না আনে এবং জাযিরাতুল আরব ত্যাগও না করে, তবে তাদেরকে কতল করা হবে।

চার. চতুর্থ প্রকারের মুশরিক তারা, যাদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হয়েছিল নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এবং এর ভেতর তারা বিশ্বাস ভঙ্গও করেনি। ৪নং আয়াতে এদের সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের চুক্তির মেয়াদ যত দিনই অবশিষ্ট আছে, তা পূরণ করতে দেওয়া হবে। এর মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে কোনও রকম ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। বনু কিনানার শাখা গোত্র বনু যাম্‌রা ও বনু মুদলিজের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ রকমই চুক্তি ছিল। তাদের দিক থেকে চুক্তিবিরোধী কোনও রকম তৎপরতাও পাওয়া যায়নি। তাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে আরও নয় মাস বাকি ছিল। সুতরাং তাদেরকে নয় মাস সময় দেওয়া হল।

এ চারও প্রকারের ঘোষণাসমূহকে বারাআঃ বা সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা বলা হয়।

২. কুরআন মাজীদে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের হুকুম এসে গেলেও ইনসাফের খাতিরে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রত্যেক শ্রেণীকে যে মেয়াদে অবকাশ দিয়েছিলেন তার শুরু ধরা হয় সেই সময় থেকে যখন তারা এ সকল বিধান সম্পর্কে অবগতি লাভ করেছিল। সমগ্র আরবে এ ঘোষণা পৌঁছানোর সর্বোত্তম মাধ্যম ছিল হজ্জের সময়ে ঘোষণা দান। কেননা তখন হিজাযে সারা আরব থেকে লোকজন একত্র হত এবং তখনও পর্যন্ত মুশরিকরাও হজ্জ করতে আসত। সুতরাং মক্কা বিজয়ের পর হিজরী ৯ সনে যে হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়, তাকেই এ ঘোষণার জন্য বেছে নেওয়া হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ হজ্জে শরীক হননি। তিনি হযরত আবু বকর (রাযি.)কে হজ্জের আমীর বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি সম্পর্কচ্ছেদের উপরিউক্ত বিধানসমূহ ঘোষণা করার জন্য হযরত আলী (রাযি.)কে প্রেরণ করেন। এর কারণ ছিল এই যে, সেকালে আরবে রেওয়াজ ছিল– কেউ কোনও চুক্তি করার

تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ۭ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝۳

মুশরিকগণ!) তোমরা যদি তাওবা কর, তবে তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর হবে। আর যদি (এখনও) তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে স্মরণ রেখ, তোমরা আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না এবং কাফেরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শোনাও।

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝۴

৪. তবে (হে মুসলিমগণ!) যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পন্ন করেছ ও পরে তারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোনও ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সহযোগিতাও করেনি, তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সাবধানতা অবলম্বনকারীদের পসন্দ করেন।[৩]

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا

৫. অতঃপর সম্মানিত মাসসমূহ অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে (যারা তোমাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল) যেখানেই পাবে হত্যা করবে। তাদেরকে গ্রেফতার করবে, অবরোধ করবে এবং তাদেরকে ধরার জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে

পর তা বাতিল করতে চাইলে সরাসরি তার নিজেকেই তা ঘোষণা করতে হত অথবা তার কোন নিকটাত্মীয়ের দ্বারা ঘোষণা দেওয়াতে হত। তখনকার সেই রেওয়াজ হিসেবেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাযি.)কে প্রেরণ করেছিলেন (আদ-দুররুল মানছুর, ৪ খণ্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা, বৈরুত ১৪২১ হিজরী)।

প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক হজ্জকেই আল-হাজ্জুল আকবার বা বড় হজ্জ বলে। এটা বলা হয় এ কারণে যে, উমরাও এক রকমের হজ্জ, তবে সেটা ছোট হজ্জ আর তার বিপরীতে হজ্জ হল বড় হজ্জ। মানুষের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, কোনও বছর হজ্জ যদি জুমুআর দিন হয়, তবে তা আকবারী হজ্জ (বড় হজ্জ) হয়। বস্তুত এর কোনও ভিত্তি নেই। একথা অনস্বীকার্য যে, জুমুআর দিন হজ্জ হলে দু'টি ফযীলত একত্র হয়, কিন্তু তাই বলে সেটাকেই আকবারী হজ্জ সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। বরং যে-কোনও হজ্জই আকবারী হজ্জ, তা যে দিনেই অনুষ্ঠিত হোক।

৩. অর্থাৎ পূর্ণ সাবধানতার সাথে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করা বাঞ্ছনীয়, যাতে পূর্ণ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে কোনওরূপ সন্দেহ বাকি না থাকে।

الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

বসে থাকবে।[৪] অবশ্য তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝

৬. মুশরিকদের মধ্যে কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে সেই সময় পর্যন্ত আশ্রয় দেবে, যে পর্যন্ত সে আল্লাহর বাণী শুনবে।[৫] তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দেবে।[৬] এটা এ কারণে যে, তারা এমন লোক, যাদের জ্ঞান নেই।

[২]

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

৭. মুশরিকদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে কোন চুক্তি কি করে বলবৎ থাকতে পারে?[৭] তবে মসজিদুল

---

৪. এতে তৃতীয় প্রকার মুশরিকদের কথা বলা হয়েছে, যারা চুক্তিবিরোধী তৎপরতা দেখিয়েছিল।

৫. এ আয়াত মুশরিকদের চারও শ্রেণীকে তাদের নিজ-নিজ মেয়াদের বাইরে এই সুবিধা দিয়েছে যে, তাদের কেউ যদি অতিরিক্ত সময় চায় এবং ইসলামী দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তা করতে ইচ্ছুক হয়, তবে তাকে আশ্রয় দিয়ে আল্লাহর কালাম শোনানো হবে অর্থাৎ ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে দলীল-প্রমাণ বোঝানো হবে।

৬. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কালাম শুনানোকেই যথেষ্ট মনে করা ঠিক হবে না; বরং তাদেরকে এমন নিরাপদ স্থানে পৌঁছানো চাই, যেখানে তার উপর কোনও চাপ থাকবে না। ফলে নিশ্চিন্ত মনে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে পারবে।

৭. এতটুকু কথা স্পষ্ট যে, ৭ থেকে ১৬ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে কুরাইশ কাফেরদের সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এবং তাদের কর্তৃক চুক্তি ভঙ্গের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর মুসলিমদেরকে হুকুম করা হয়েছে, তারা যেন তাদের কথায় আস্থা না রাখে। যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ করে তবে তাদের সাথে যেন যুদ্ধ করে। তবে এ আয়াতসমূহ কখন নাযিল হয়েছিল সে সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। একদল মুফাসসির বলেন, এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছিল মক্কা বিজয়ের আগে হুদায়বিয়ায়, যখন কুরাইশের সাথে মুসলিমগণ চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন সেই সময়। এ চুক্তি বলবৎ ছিল। কিন্তু এ আয়াতসমূহে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের চুক্তিতে অবিচল থাকবে না। কাজেই তারা যদি চুক্তি রক্ষা না করে, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। অতঃপর তারা পুনরায় চুক্তি সম্পাদন করতে চাইলে তাদের কথায় আস্থা রাখবে না। কেননা তারা মুখে বলে এক কথা, কিন্তু অন্তরে থাকে অন্য কিছু। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তাদেরকে করবেন লাঞ্ছিত। এভাবে যে সকল মুসলিম তাদের জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছে, তাদের

الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

হারামের নিকটে তোমরা যাদের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করেছ, তারা যতক্ষণ তোমাদের সাথে সোজা থাকবে, তোমরাও তাদের সাথে সোজা থাকবে।[৮] নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে পসন্দ করেন।

অন্তর জুড়াবে। এ তাফসীর অনুসারে এ আয়াতসমূহ সম্পর্কচ্ছেদের সেই ঘোষণার আগে নাযিল হয়েছে, যা ১ থেকে ৬ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। সে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল মক্কা বিজয়ের এক বছর দু' মাস পর হিজরী ৯ সনের হজ্জের সময়।

অপর একদল মুফাসসির বলেন, এ সকল আয়াত সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়ার আগের নয়; বরং সেই সম্পর্কিত আয়াতসমূহে যে বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়ে আসছে এ আয়াতসমূহও তারই অংশ। এতে সেই ঘোষণা দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর তা এই যে, এসব লোক আগেই যেহেতু চুক্তি ভঙ্গ করেছে, তাই এখন আর আশা করা যায় না যে, তাদের সঙ্গে নতুন কোন চুক্তি করা হলে তারা তা রক্ষা করবে। কেননা মুসলিমদের প্রতি তাদের মনে যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা বিরাজ করে, সে কারণে তাদের কাছে না কোনও আত্মীয়তার মূল্য আছে আর না কোনও চুক্তির। যেহেতু মক্কা বিজয় কালে ও তার পরে কুরাইশের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং কুরাইশ কাফেরদের সাথে তাদের আত্মীয়তা ছিল, তাই কুরাইশ সম্পর্কে তাদের অন্তরে কিছুটা কোমলতা থাকা অস্বাভাবিক ছিল না। তাই এ আয়াতসমূহে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে তারা যেন কুরাইশ কাফেরদের কথায় প্রতারিত না হয়। বরং অন্তরে যেন দৃঢ় সংকল্প রাখে যদি কখনও তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হয় তবে পূর্ণ শক্তি দিয়ে তাদের সাথে লড়বে। এ লেখকের কাছে একাধিক প্রমাণের ভিত্তিতে এই তাফসীরই বেশি শক্তিশালী মনে হয়। প্রথম কারণ তো এই যে, ৭ থেকে ১৬ পর্যন্ত আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সবগুলো একই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত। আলোচনার ধারাবাহিকতা পর্যবেক্ষণ করলে ৭নং আয়াত সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা কঠিন যে, এ আয়াত প্রথম ছয় আয়াতের বহু আগে নাযিল হয়েছিল। দ্বিতীয়ত ঘোষণা দানকালে হযরত আলী (রাযি.) কুরআন মাজীদের যে আয়াতসমূহ পাঠ করেছিলেন, রিওয়ায়াতসমূহে তার সংখ্যা সর্বনিম্ন দশ এবং সর্বোচ্চ চল্লিশ বলা হয়েছে। (দেখুন আদ-দুররুল মানছুর, ৪র্থ খণ্ড, ১১২ পৃষ্ঠা; আল-বিকাঈ, নাজমুদ দুরার, ৮ খণ্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা)। আর নাসায়ী শরীফের এক রিওয়ায়াতে যে আছে 'তিনি তা শেষ পর্যন্ত পড়লেন' (অধ্যায়- হজ্জ, পরিচ্ছেদ- তারবিয়ার দিন খুতবা প্রসঙ্গ, হাদীস নং ২৯৯৩), এর অর্থ যে সমস্ত আয়াত দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল, তার শেষ পর্যন্ত পড়লেন। তৃতীয় হাফেজ ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) আল্লামা সুয়ূতী (রহ.), আল্লামা বিকাঈ (রহ.) ও কাযী আবুস সাউদ (রহ.) সহ বড়-বড় মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ এ আয়াতসমূহকে বারাআঃ বা সম্পর্কচ্ছেদেরই অংশ সাব্যস্ত করেছেন। তাদের মতে এতে সম্পর্কচ্ছেদের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৮. পূর্বে এক নং টীকায় মুশরিকদের যে চতুর্থ প্রকারের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এ আয়াতে তাদের কথাই বলা হচ্ছে। তাদেরকে তাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, মেয়াদ পূর্ণ হতে তখনও নয় মাস বাকি ছিল।

كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝۸

৮. (কিন্তু অন্য মুশরিকদের সাথে) কেমন করে চুক্তি বলবৎ থাকবে, যখন তাদের অবস্থা হল, তারা কখনও তোমাদের উপর বিজয়ী হলে তোমাদের ব্যাপারে কোনওরূপ আত্মীয়তার মর্যাদা দেয় না এবং অঙ্গীকারেরও না। তারা মুখে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে চায়, অথচ তাদের অন্তর তা অস্বীকার করে। তাদের অধিকাংশই অবাধ্য।

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝۹

৯. তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের বিনিময়ে (দুনিয়ার) তুচ্ছ মূল্য গ্রহণকেই পসন্দ করেছে[৯] এবং তার ফলে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। বস্তুত তাদের কাজকর্ম অতি নিকৃষ্ট।

لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ۝۱۰

১০. তারা কোনও মুমিনের ক্ষেত্রেই কোনও আত্মীয়তার মর্যাদা দেয় না এবং অঙ্গীকারেরও নয় এবং তারাই সীমালংঘনকারী।

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ؕ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝۱۱

১১. সুতরাং যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই হয়ে যাবে।[১০] যারা জানতে আগ্রহী তাদের জন্য বিধানাবলী এভাবে বিশদ বর্ণনা করি।

وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ

১২. তারা যদি চুক্তি সম্পন্ন করার পর নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং

এখানে বলা হয়েছে যে, এই মেয়াদের ভেতর তারা যদি সোজা হয়ে চলে তোমরাও তাদের সাথে সোজা চলবে। আর যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ করে, তবে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় থাকার প্রয়োজন নেই (ইবনে জারীর, তাফসীর, ১০ খণ্ড, ৮২ পৃষ্ঠা)।

৯. অর্থাৎ তারা আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহ অনুসরণ করার পরিবর্তে পার্থিব জীবনের তুচ্ছ স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছে।

১০. এখানে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কোনও ব্যক্তি খাঁটি মনে তাওবা করলে মুসলিমদের উচিত তার সাথে ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করা এবং ইসলাম গ্রহণের আগে যেসব কষ্ট দিয়েছে, তা ভুলে যাওয়া। কেননা ইসলাম পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ও অন্যায়-অপরাধ মিটিয়ে দেয়।

وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ﴿١٢﴾

তোমাদের দ্বীনের নিন্দা করে, তবে কুফরের এ সকল নেতৃবর্গের সঙ্গে এই আশায় যুদ্ধ কর যে, তারা হয়ত নিরস্ত হবে।[১১] বস্তুত এরা এমন লোক যাদের প্রতিশ্রুতির কোনও মুল্য নেই।

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩. তোমরা কি সেই সকল লোকের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে (দেশ থেকে) বহিষ্কারের ইচ্ছা করেছে এবং তারাই তোমাদের বিরুদ্ধে (উস্কানী দান ও উত্যক্তকরণের কাজ) প্রথম করেছে।[১২] তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? (যদি তাই হয়) তবে তো আল্লাহই এ বিষয়ের বেশি হকদার যে, তোমরা তাকে ভয় করবে- যদি তোমরা মুমিন হও।

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ۙ﴿١٤﴾

১৪. তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যাতে আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দান করেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করেন এবং মুমিনদের অন্তর জুড়িয়ে দেন।

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى

১৫. এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করেন। আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা তার তাওবা

---

১১. পূর্বের আয়াতসমূহের দৃষ্টিতে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের এক অর্থ হতে পারে ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যাওয়া, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর অনেকে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) তাদের সঙ্গে জিহাদ করেছিলেন। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, যাদের সঙ্গে তোমাদের চুক্তি ছিল এবং তারা সে চুক্তি আগেই ভঙ্গ করেছে কিংবা যাদের চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হতে আরও নয় মাস বাকি আছে, তারা যদি এই সময়ের মধ্যে চুক্তি ভঙ্গ করে, তবে তাদের সঙ্গে জিহাদ করবে। 'এই আশায় যুদ্ধ কর যে, তারা হয়ত নিরস্ত হবে'- এর অর্থ, তোমাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের উদ্দেশ্য রাজ্য বিস্তার নয়; বরং এই হওয়া চাই যে, তোমাদের শত্রু যাতে কুফর ও জুলুম পরিত্যাগ করে।

১২. অর্থাৎ তারাই মক্কা মুকাররমায় প্রথমে জুলুম করেছে অথবা এর অর্থ হুদায়বিয়ার সন্ধি তারাই প্রথম ভঙ্গ করেছে।

مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ⑮

কবুল করেন।[১৩] আল্লাহর জ্ঞানও পরিপূর্ণ, তাঁর হিকমত পরিপূর্ণ।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ⑯

১৬. তোমরা কি মনে করেছ তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে, অথচ আল্লাহ এখনও দেখে নেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করে এবং আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানায় না?[১৪] তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ তা পরিপূর্ণরূপে জানেন।

[৩]

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ

১৭. মুশরিকগণ এ কাজের উপযুক্ত নয় যে, তারা আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে,[১৫] যখন তারা নিজেরাই নিজেদের

---

১৩. অর্থাৎ এটা অসম্ভব নয় যে, কাফেরগণ তাওবা করে ইসলামে প্রবেশ করবে। সুতরাং এর পরে বহু লোক সত্যিকারের মুসলিম হয়ে যায়।

১৪. দৃশ্যত এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে সেই সকল ব্যক্তির প্রতি, যারা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তখনও পর্যন্ত কোনও জিহাদে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়নি। অন্যান্য সাহাবীগণ তো মক্কা বিজয়ের আগেও বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই নও মুসলিমদেরকে বলা হচ্ছে, তোমাদেরও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। বারাআঃ বা সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দানের পর যদিও বড় কোনও যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, তথাপি তাদেরকে সর্বান্তকরণে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে এ কারণে যে, পাছে আত্মীয়তার পিছু টানের ফলে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটানোর যাবতীয় দাবী ও চাহিদা পূরণে তারা ইতস্ততঃ করে। এজন্যই জিহাদের নির্দেশ দানের সাথে সাথে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ছাড়া অন্য কাউকে এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু না বানায়, যার কাছে নিজেদের গোপন কথা প্রকাশ করা যায়।

১৫. মক্কার মুশরিকগণ এই বলে গর্ব করত যে, তারা মসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক। তারা এ পবিত্র মসজিদের খেদমত ও দেখাশোনা করে এবং এর নির্মাণ কার্যের মত গৌরবময় দায়িত্ব পালন করে। এ হিসেবে তাদের মর্যাদা মুসলিমদের উপরে। এ আয়াত তাদের সে ভ্রান্ত ধারণা রদ করছে। বলা হচ্ছে যে, মসজিদুল হারাম বা অন্য যে-কোনও মসজিদের খেদমত করা নিঃসন্দেহে এক বড় ইবাদত, কিন্তু এর জন্য ঈমান থাকা শর্ত। কেননা মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যই হল আল্লাহ তাআলার এমন ইবাদত প্রতিষ্ঠা করা, যাতে আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কাউকে শরীক করা হবে না। এই বুনিয়াদী উদ্দেশ্য যদি অনুপস্থিত থাকে, তবে মসজিদ নির্মাণের সার্থকতা কী? সুতরাং কুফর ও শিরকে লিপ্ত কোনও ব্যক্তি মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার উপযুক্ত নয়। সামনে ২৮ নং আয়াতে মুশরিকদেরকে এই বিধান জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এখন থেকে তারা এসব কাজের জন্য মসজিদুল হারামের কাছেও আসতে পারবে না।

أَعْمَالُهُمْ ۚ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

কুফরের সাক্ষী। তাদের সমস্ত কর্মই নিষ্ফল হয়ে গেছে এবং তাদেরকে সর্বদা জাহান্নামেই থাকতে হবে।

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

১৮. আল্লাহর মসজিদ তো আবাদ করে তারাই, যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছে এবং নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। এরূপ লোকদের সম্পর্কেই আশা আছে যে, তারা সঠিক পথ অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

১৯. তোমরা কি হাজীদেরকে পানি পান করানো ও মসজিদুল হারামকে আবাদ করার কাজকে সেই ব্যক্তির (কার্যাবলীর) সমান মনে কর, যে আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে?[১৬] আল্লাহর কাছে এরা সমতুল্য হতে পারে না। আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে লক্ষ্যস্থলে পৌছান না।

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

২০. যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর পথে হিজরত করেছে এবং নিজেদের জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারা আল্লাহর কাছে মর্যাদায় অনেক শ্রেষ্ঠ এবং তারাই সফলকাম।

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ

২১. তাদের প্রতিপালক তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে রহমত, সন্তুষ্টি ও এমন

---

১৬. এ আয়াতে মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত নেক কাজ সম-মর্যাদার হয় না। কোনও ব্যক্তি যদি ফরয কাজসমূহ আদায় না করে নফল ইবাদতে লিপ্ত থাকে, তবে এটা কোন নেক কাজ হিসেবেই গণ্য হবে না। নিশ্চয়ই হাজীদেরকে পানি পান করানো একটি মহৎ কাজ, কিন্তু মর্যাদা হিসেবে তা নফল বৈ নয়। অনুরূপ মসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধানও অবস্থাভেদে ফরযে কিফায়া কিংবা একটি নফল ইবাদত। পক্ষান্তরে ঈমান তো মানুষের মুক্তির জন্য বুনিয়াদী শর্ত। আর জিহাদ কখনও ফরযে আইন এবং কখনও ফরযে কিফায়া। প্রথমোক্ত কাজ দু'টির তুলনায় এ দু'টোর মর্যাদা অনেক উপরে। সুতরাং ঈমান ব্যতিরেকে কেবল এ জাতীয় সেবার কারণে কেউ কোনও মুমিনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না।

لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾

উদ্যানসমূহের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার ভেতর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী নেয়ামত।

خٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ إِنَّ اللّٰهَ عِندَهٗٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

২২. তারা তাতে সর্বদা থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহরই কাছে আছে মহা-প্রতিদান।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوٓا اٰبَآءَكُمْ وَإِخْوٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمٰنِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. হে মুমিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভাই যদি ঈমানের বিপরীতে কুফরকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তবে তাদেরকে নিজেদের অভিভাবক বানিও না।[১৭] যারা তাদেরকে অভিভাবক বানাবে তারা জালেম সাব্যস্ত হবে।

قُلْ إِن كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوٰنُكُمْ وَأَزْوٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوٰلٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهٖ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهٖ فَتَرَبَّصُوا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهٖ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

২৪. (হে নবী! মুসলিমদেরকে) বল, তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা বেশি প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের খান্দান, তোমাদের সেই সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, তোমাদের সেই ব্যবসায়, যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা কর এবং বসবাসের সেই ঘর, যা তোমরা ভালোবাস, তবে অপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ ফায়সালা প্রকাশ[১৮]

---

১৭. অর্থাৎ তাদের সাথে এমন সম্পর্ক রেখ না, যা তোমাদের দ্বীনী দায়িত্ব-কর্তব্য আদায়ে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। নিজেদের ঈমান রক্ষা করা ও দ্বীনী কর্তব্যসমূহ আদায় করার পাশাপাশি তাদের সাথে সদাচরণ করার যে ব্যাপারটা, ইসলামে সেটা উপেক্ষণীয় নয়; বরং কুরআন মাজীদ তাকে উত্তম কাজ সাব্যস্ত করেছে ও তাতে উৎসাহ যুগিয়েছে (দেখুন সূরা লুকমান, ৩১ : ৩৫; সূরা মুমতাহানা, ৬০ : ৮)।

১৮. ফায়সালা দ্বারা শাস্তির ফায়সালা বোঝানো হয়েছে। এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, অর্থ-সম্পদ, ঘর-বাড়ি, জমি-জায়েদাদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবই আল্লাহ তাআলার নিয়ামত। তবে ততক্ষণ, যতক্ষণ না এগুলো আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনে বাধা হবে। যদি বাধা হয়ে যায় তবে এসব জিনিসই মানুষের জন্য আযাবে পরিণত হয় (আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন)।

করেন। আল্লাহ অবাধ্যদেরকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছান না।

[৪]

২৫. বস্তুত আল্লাহ বহু ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন এবং (বিশেষ করে) হুনায়নের দিন, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে বিভোর করে দিয়েছিল।[১৯] কিন্তু সে সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনও কাজে আসেনি এবং যমীন তার প্রশস্ততা সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করেছিলে।

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ۚ﴿۲۵﴾

১৯. সংক্ষেপে হুনায়ন যুদ্ধের ঘটনা নিম্নরূপ, মক্কা মুকাররমায় জয়লাভ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ পেলেন মালিক ইবনে আউফের নেতৃত্বে বনু হাওয়াযিন তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করছে। বনু হাওয়াযিন এক বিশাল জনগোষ্ঠীর নাম। এর অনেকগুলো শাখা-প্রশাখা ছিল। তায়েফের প্রসিদ্ধ ছাকীফ গোত্রও এ গোষ্ঠীরই শাখা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুপ্তচর পাঠিয়ে সংবাদটির সত্যতা যাচাই করলেন। জানা গেল সংবাদ সত্য এবং তারা জোরে-শোরে বিপুল উত্তেজনায় যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনা অনুযায়ী বনু হাওয়াযিনের লোকসংখ্যা ছিল চব্বিশ হাজার থেকে আটাশ হাজারের মাঝামাঝি। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দ হাজার সাহাবায়ে কিরামের এক বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলেন। এ যুদ্ধ হয়েছিল হুনায়ন নামক স্থানে, যা মক্কা মুকাররমা থেকে আনুমানিক দশ মাইল দূরে অবস্থিত মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকার নাম। এ যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ছিল চৌদ্দ হাজার। এর আগে অন্য কোন যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের সংখ্যা এত বিপুল ছিল না। মুসলিমগণ সর্বদা নিজেদের সৈন্যসংখ্যা অল্প হওয়া সত্ত্বেও বেশি সৈন্যের মুকাবিলায় জয়লাভ করেছে। এবার যেহেতু তাদের সৈন্য সংখ্যাও বিপুল তাই তাদের কারও কারও মুখ থেকে বের হয়ে গেল যে, আজ আমাদের সংখ্যা অনেক বেশি। সুতরাং আজ আমরা কারও কাছে পরাস্ত হতেই পারি না। মুসলিমগণ আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে নিজেদের সংখ্যার উপর নির্ভর করবে- এটা আল্লাহ তাআলার পসন্দ হল না। সুতরাং তিনি এর ফল দেখালেন। মুসলিম বাহিনী এক সংকীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করছিল। এ সময় বনু হাওযাযিনের তীরন্দাজ বাহিনী অকস্মাৎ তাদের উপর বৃষ্টির মত তীর ছুঁড়তে শুরু করল। তা এতটাই প্রচণ্ড ছিল যে, মুসলিম বাহিনী তার সামনে তিষ্ঠাতে পারছিল না। তাদের বহু সদস্য পালাতে শুরু করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্য কতিপয় নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীসহ অবিচলিত থাকলেন। তিনি হযরত আব্বাস (রাযি.)কে হুকুম দিলেন যেন পলায়নরতদেরকে উচ্চস্বরে ডাক দেন। হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর আওয়াজ খুব বড় ছিল। তিনি ডাক দিলেন এবং মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে তা বিজলীর মত ছড়িয়ে পড়ল। যারা

ثُمَّ اَنۡزَلَ اللّٰهُ سَكِيۡنَتَهٗ عَلٰى رَسُوۡلِهٖ وَعَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَاَنۡزَلَ جُنُوۡدًا لَّمۡ تَرَوۡهَا ۚ وَعَذَّبَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الۡكٰفِرِيۡنَ ﴿۲۶﴾

২৬. অতঃপর আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল ও মুমিনদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন[২০] এবং এমন এক বাহিনী অবতীর্ণ করলেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছিল আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিলেন। আর এটাই কাফিরদের কর্মফল।

ثُمَّ يَتُوۡبُ اللّٰهُ مِنۡۢ بَعۡدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۲۷﴾

২৭. অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাওবার সৌভাগ্য দান করেন।[২১] আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّمَا الۡمُشۡرِكُوۡنَ نَجَسٌ فَلَا يَقۡرَبُوا الۡمَسۡجِدَ الۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هٰذَا ۚ

২৮. হে মুমিনগণ! মুশরিকরা আপদমস্তক অপবিত্র।[২২] সুতরাং এ বছরের পর যেন তারা মসজিদুল হারামের নিকটেও না আসে[২৩] এবং (হে মুসলিমগণ!)

ময়দান ত্যাগ করেছিল তারা নতুন উদ্যমে ফিরে আসল। দেখতে না দেখতে দৃশ্যপট পাল্টে গেল এবং মুসলিমদের বিজয় অর্জিত হল। বনু হাওয়াযিনের সত্তর জন নেতা নিহত হল। দলপতি মালিক ইবনে আউফ তার পরিবার-পরিজন ও অর্থ-সম্পদ ছেড়ে পালিয়ে গেল এবং তায়েফের দূর্গে গিয়ে আশ্রয় নিল। তাদের ছয় হাজার সদস্য বন্দী হল। বিপুল সংখ্যক গবাদি পশু ও চার হাজার উকিয়া রূপা গনীমত হিসেবে মুসলিমদের হস্তগত হল।

২০. এটা সেই সময়ের কথা, যখন রণক্ষেত্র ত্যাগকারী মুসলিমগণ হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর ডাক শুনে ফিরে আসেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে এমন স্বস্তি সৃষ্টি করে দেন যে, ক্ষণিকের জন্য তাদের অন্তরে শত্রুর পক্ষ থেকে যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল তা উবে গেল।

২১. এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, হাওয়াযিনের যে সব লোক অমিত বিক্রমের সাথে লড়তে এসেছিল, তাদের অনেকেরই তাওবা করে ঈমান আনার তাওফীক লাভ হবে। হয়েছিলও তাই, বনু হাওয়াযিন ও বনু ছাকীফের বিপুল সংখ্যক লোক পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। স্বয়ং তাদের নেতা মালিক ইবনে আউফও ঈমান এনেছিলেন এবং তিনি ইসলামের একজন বীর সিপাহসালার রূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আজ তাকে হযরত মালিক ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু নামে স্মরণ করা হয়ে থাকে।

২২. এর অর্থ এই নয় যে, তাদের শরীরটাই নাপাক; বরং এর দ্বারা তাদের বিশ্বাসগত অপবিত্রতা বোঝানো হয়েছে, যা তাদের সত্তায় বিস্তার লাভ করেছে।

২৩. এ ঘোষণাটি সম্পর্কচ্ছেদের উপসংহার স্বরূপ। এর মাধ্যমে মুশরিকদেরকে মসজিদুল হারামের কাছেও আসতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ব্যাখ্যা করেন যে, পরবর্তী বছর থেকে তাদের জন্য হজ্জ করার অনুমতি থাকবে না। কেননা

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

তোমরা যদি দারিদ্র্যের ভয় কর, তবে জেনে রেখ, আল্লাহ চাইলে নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে (মুশরিকদের থেকে) বেনিয়ায করে দেবেন।[২৪] নিশ্চয়ই আল্লাহর জ্ঞানও পরিপূর্ণ, হিকমতও পরিপূর্ণ।

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ

২৯. কিতাবীদের মধ্যে যারা[২৫] আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং পরকালেও

এ আয়াতের নির্দেশ অনুসারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাযি.)-এর দ্বারা যে ঘোষণা করেছিলেন, তার ভাষা ছিল এই যে, لا يحجن بعد هذا العام مشرك 'এ বছরের পর কোনও মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না' (সহীহ বুখারী, অধ্যায় : তাফসীর, পরিচ্ছেদ : সূরা বারাআঃ)। এর দ্বারা বোঝা যায় 'মসজিদুল হারামের কাছে না আসা'-এর অর্থ হজ্জ করার অনুমতি না থাকা। এটা ঠিক এ রকম, যেমন পুরুষদেরকে বলা হয়েছে, 'স্ত্রীদের হায়েয অবস্থায় তারা তাদের কাছেও যাবে না'। আর এর দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য এ সময় সহবাস করবে না। না হয় এমনিতে তাদের কাছে যাওয়া নিষেধ নয়। এমনিভাবে কাফেরগণ হজ্জ তো করতে পারবে না, কিন্তু প্রয়োজনে তারা মসজিদুল হারাম বা অন্য যে কোনও মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে। এটা সম্পূর্ণ নিষেধ নয়। কেননা একাধিক বর্ণনায় প্রমাণ আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময় মুশরিকদেরকে 'মসজিদে নববী'তে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন, এ আয়াতের দৃষ্টিতে মসজিদুল হারাম ও হরমের সীমানার ভেতর কাফেরদের প্রবেশ নিষেধ। আর ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে কেবল মসজিদুল হারামই নয়; বরং কোনও মসজিদেই কাফেরদের প্রবেশ জায়েয নয়।

২৪. অমুসলিমদের জন্য হজ্জ নিষিদ্ধ করার ফলে মক্কা মুকাররমার ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির উপর মন্দ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা হওয়ার কথা ছিল। কেননা মক্কা মুকাররমার নিজস্ব কোনও উৎপাদন ছিল না। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বহিরাগতদের উপর নির্ভরশীল ছিল। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে সেই আশঙ্কা দূর করে দেন এবং আশ্বস্ত করেন যে, তিনি নিজ অনুগ্রহে মুসলিমদের অভাব-অনটন দূর করে দেবেন।

২৫. এর পূর্বের আটাশটি আয়াত ছিল আরবের মূর্তিপূজকদের সম্পর্কে। এখান থেকে তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ শুরু হচ্ছে (আদ-দুররুল মানছুর, ৪ খণ্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা মুজাহিদের বরাতে)। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, এসব আয়াত নাযিল হয়েছিল উপরের আটাশ আয়াতের আগে। কেননা তাবুকের যুদ্ধ হয়েছিল বারাআঃ বা সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়ার আগে। এ যুদ্ধের ঘটনা ইনশাআল্লাহ সামনে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আসবে। এ যুদ্ধ হয়েছিল রোমানদের বিরুদ্ধে, যাদের অধিকাংশই ছিল খ্রিস্টান। ইয়াহুদীদেরও একটা বড় অংশ রোম সাম্রাজ্যের অধীনে জীবন যাপন করছিল। কুরআন মাজীদে এ উভয় সম্প্রদায়কে 'আহলে কিতাব' নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাই তাদের সাথে যুদ্ধ করার

الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾

নয়[২৬] এবং আল্লাহ ও তার রাসূল যা-কিছু হারাম করেছেন তাকে হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীনকে নিজের দ্বীন বলে স্বীকার করে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, যাবৎ না তারা হেয় হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া আদায় করে।[২৭]

নির্দেশ দান প্রসঙ্গে তাদের কিছু নিন্দনীয় আকীদা-বিশ্বাস ও কাজ-কর্ম তুলে ধরা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, যদিও এ সকল আয়াত নাযিল হয়েছিল পূর্বের আয়াতসমূহের আগে, কিন্তু কুরআন মাজীদের বিন্যাসে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে পরে। সম্ভবত এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, জাযিরাতুল আরবকে পৌত্তলিকতা হতে পবিত্র করার পর মুসলিমদেরকে বাইরের কিতাবীদের মুকাবিলা করতে হবে। তাছাড়া মূর্তিপূজকদের জন্য জাযিরাতুল আরবে নাগরিক হিসেবে বসবাস নিষিদ্ধ করা হলেও কিতাবীদের জন্য এই সুযোগ রাখা হয়েছিল যে, তারা জিযিয়া আদায় করে ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে পারবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তাদের জন্য এ সুযোগ বলবৎ রাখা হয়েছিল, কিন্তু ওফাতের পূর্বে তিনি অসিয়ত করে যান যে, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে জাযিরাতুল আরব থেকে বের করে দিও (সহীহ বুখারী, অধ্যায় : জিহাদ, হাদীস নং ৩০৫৩)। পরবর্তীকালে হযরত উমর (রাযি.) এ অসিয়ত বাস্তবায়ন করেন। তবে এ হুকুম জাযিরাতুল আরবের জন্যই নির্দিষ্ট। জাযিরাতুল আরবের বাইরে যেখানেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক, সেখানে এখনও কিতাবীগণসহ যে-কোনও অমুসলিম সম্প্রদায় ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বাস করতে পারবে এবং সেখানে তারা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে। শর্ত একটাই আর তা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ।

এখানে যদিও কেবল 'আহলে কিতাব'-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু যে কারণ বলা হয়েছে, অর্থাৎ 'সত্য দ্বীনের অনুসরণ না করা', এটা যেহেতু যে-কোনও প্রকার অমুসলিমের মধ্যেই পাওয়া যায়, তাই জাযিরাতুল আরবের বাইরে সব রকম অমুসলিমের জন্যই এ হুকুম প্রযোজ্য। এ সম্পর্কে উম্মতের ইজমা রয়েছে।

২৬. কিতাবীগণ বাহ্যত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দাবী করে থাকে, কিন্তু এ বিশ্বাসের সাথে তারা যেহেতু বহু ভ্রান্ত বিশ্বাস নিজেদের পক্ষ থেকে তৈরি করে নিয়েছে, যার কিছু সামনে বর্ণিত হচ্ছে, তাই তাদের এ বিশ্বাসকে বিশ্বাসহীনতা সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না।

২৭. 'জিযিয়া' এক প্রকার কর। এটা মুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধক্ষম অমুসলিম নাগরিক থেকে নেওয়া হয়। সুতরাং এটা নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও সংসারবিরাগী ধর্মগুরুদের উপর আরোপিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে এটা ইসলামী রাষ্ট্রে নিরাপত্তার সাথে তাদের বসবাস এবং প্রতিরক্ষা কার্যে তাদের অংশগ্রহণ না করার বিনিময়ে প্রদেয় কর। এ করের বদলে ইসলামী রাষ্ট্র তাদের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে (রূহুল মাআনী)। এর একটা কারণ এইও যে, মুসলিমদের মত অমুসলিমদের থেকে যাকাত আদায় করা হয় না, অথচ রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিক অধিকার তারা ভোগ করে। এ কারণেও তাদের উপর এই বিশেষ ধরনের কর

[৫]

৩০. ইয়াহুদীরা বলে, উযায়র আল্লাহর পুত্র[২৮] আর নাসারাগণ বলে, মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এসবই তাদের মুখের তৈরি কথা। এরা তাদের পূর্বে যারা কাফের হয়ে গিয়েছিল,[২৯] তাদেরই মত কথা বলে। তাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করুন! তারা বিভ্রান্ত হয়ে কোন দিকে উল্টে যাচ্ছে?

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿۳۰﴾

৩১. তারা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের আহবার (অর্থাৎ ইয়াহুদী ধর্মগুরু) এবং রাহিব (খ্রিস্টান বৈরাগী)কে খোদা বানিয়ে নিয়েছে[৩০] এবং মাসীহ ইবনে

اِتَّخَذُوْۤا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا

আরোপিত হয়ে থাকে। হাদীসে মুসলিম শাসকদের জোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় সতর্ক থাকে এবং তাদের প্রতি সাধ্যাতীত কর আরোপ না করে। সুতরাং ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসের প্রায় সব যুগেই জিযিয়ার বিষয়টাকে অত্যন্ত মামুলী হিসেবে দেখা হয়েছে। আয়াতে যে বলা হয়েছে, 'তারা জিযিয়া আদায় করবে নত হয়ে,' ইমাম শাফেয়ী (রহ.) থেকে এর তাফসীর বর্ণিত হয়েছে যে, তারা ইসলামী রাষ্ট্রের আইন-কানুনের অধীন হয়ে থাকাকে মেনে নেবে (রূহুল মাআনী, ১০ খণ্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা)।

২৮. হযরত উযায়ের আলাইহিস সালাম ছিলেন একজন মহান নবী। বাইবেলে তাকে 'আযরা' নামে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বাইবেলের একটি পূর্ণ অধ্যায় তাঁর নামের সাথেই যুক্ত। 'বুখত নাসসার'-এর আক্রমণে তাওরাতের কপি বিলুপ্ত হয়ে গেলে তিনি নিজ স্মৃতিপট থেকে তা পুনরায় লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। সম্ভবত এ কারণেই একদল ইয়াহুদী তাকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেছিল। প্রকাশ থাকে যে, হযরত উযায়ের আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলার পুত্র সাব্যস্ত করার আকীদা সমগ্র ইয়াহুদী জাতির নয়; বরং এটা তাদের একটি উপদলের বিশ্বাস, যাদের একটা অংশ আরবেও বাস করত।

২৯. খুব সম্ভব এর দ্বারা আরব মুশরিকদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা ফিরিশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলত।

৩০. তাদেরকে খোদা বানানোর যে ব্যাখ্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন, তার সারমর্ম এই যে, তারা তাদের ধর্মগুরুদেরকে বিপুল ক্ষমতা দিয়ে রেখেছিল। ফলে তারা তাদের ইচ্ছা মত কোনও জিনিসকে হালাল এবং কোনও জিনিসকে হারাম ঘোষণা করতে পারত। প্রকাশ থাকে যে, যারা সরাসরি আসমানী কিতাবের জ্ঞান রাখে না, শরীয়তের বিধান জানার জন্য সেই আম সাধারণকে আলেম-উলামার শরণাপন্ন হতেই হয় এবং আল্লাহ তাআলার বিধানের ব্যাখ্যাতা হিসেবে তাদের কথা মানতেও হয়। খোদ কুরআন মাজীদই এ নির্দেশ দান করেছে (দেখুন, সূরা নাহল ১৬ : ৪৩ ও সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৭)। এতটুকুর মধ্যে তো আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ এতটুকুতেই ক্ষান্ত ছিল

لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۳۱﴾

মারইয়ামকেও। অথচ তাদেরকে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করার হুকুম দেওয়া হয়নি। তিনি ব্যতীত কোন খোদা নেই। তাদের অংশীবাদীসুলভ কথাবার্তা হতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۳۲﴾

৩২. তারা আল্লাহর নূরকে তাদের মুখের ফুঁ দ্বারা নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ তার নূরের পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া আর কিছুতেই সম্মত নয়, তাতে কাফেরগণ এটাকে যতই অপ্রীতিকর মনে করুক।

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿۳۳﴾

৩৩. আল্লাহই তো হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ নিজ রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি অন্য সব দ্বীনের উপর তাকে জয়যুক্ত করেন, তাতে মুশরিকগণ এটাকে যতই অপ্রীতিকর মনে করুক।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۳۴﴾

৩৪. হে মুমিনগণ! (ইয়াহুদী) আহবার ও (খ্রিস্টান) রাহিবদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে, যারা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভোগ করে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে।[৩১] যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তির 'সুসংবাদ' দাও।[৩২]

না। তারা আরও অগ্রসর হয়ে তাদের ধর্মগুরুদেরকে বিধান তৈরি করারও একতিয়ার প্রদান করেছিল। ফলে তারা কেবল আসমানী কিতাবের ব্যাখ্যা হিসেবেই নয়; বরং নিজেদের ইচ্ছা মত কোনও জিনিসকে হালাল এবং কোনও জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করতে পারত, তাতে তাদের সে বিধান আল্লাহর কিতাবের পরিপন্থীই হোক না কেন!

৩১. মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার বিভিন্ন পন্থা হতে পারে, কিন্তু ওই সকল ধর্মগুরুরা বিশেষভাবে যা করত বলে বর্ণিত আছে তা এই যে, তারা মানুষের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে শরীয়তকে ভেঙ্গে-চুরে তাদের মর্জিমত বিধান বর্ণনা করত আর এভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যে সরল-সঠিক পথ নির্ধারণ করেছেন তা থেকে মানুষকে দূরে রাখত।

৩২. কিতাবীগণ লোভ-লালসার বশে অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করত এবং শরীয়ত প্রদত্ত হক আদায়ে কার্পণ্য করত। তাই এ আয়াত দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। আর আয়াত যদিও

৩৫. যে দিন সে ধন-সম্পদ জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর তা দ্বারা তাদের কপাল, তাদের পাঁজর ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে (এবং বলা হবে) এই হচ্ছে সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে, তার মজা ভোগ কর।

يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬. প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা বারটি,[৩৩] যা আল্লাহর কিতাব

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ, কিন্তু এর শব্দাবলী ব্যাপক। ফলে এটা ওই সকল মুসলিমের জন্যও প্রযোজ্য, যারা অর্থ-সম্পদ সঞ্চয়ে লিপ্ত থাকে, কিন্তু তার হকসমূহ যথাযথভাবে আদায় করে না। আল্লাহ তাআলা সম্পদের উপর বিভিন্ন রকমের হক ধার্য করেছেন। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যাকাত, যা আদায় করা প্রত্যেক মালদার মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য।

৩৩. সূরার শুরুতে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তাতে এক শ্রেণীর মূর্তিপূজককে সম্মানিত মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে আরব মুশরিকদের একটি অযৌক্তিক প্রথার মূলোচ্ছেদ জরুরী ছিল। সেটাই ৩৬ ও ৩৭ নং আয়াতে করা হয়েছে। তাদের সে প্রথাটির সারমর্ম এই যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময় থেকেই চারটি চান্দ্র মাসকে সম্মানিত মাস মনে করা হত। আর তা হচ্ছে যু-কা'দা, যুলহিজ্জা, মহররম ও রজব। এ মাসসমূহে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। আরব মুশরিকরা যদিও মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ধর্মকে সাংঘাতিকভাবে বদলে ফেলেছিল, কিন্তু তারা এ চার মাসের মর্যাদা ঠিকই স্বীকার করত এবং এ সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ নাজায়েয মনে করত। কালক্রমে এ বিধানটি তাদের পক্ষে কঠিন মনে হতে লাগল। কেননা যু-কা'দা থেকে মহররম পর্যন্ত একাধারে তিন মাস যুদ্ধ বন্ধ রাখা তাদের জন্য অসুবিধাজনক ছিল। এ সমস্যার সমাধান তারা এভাবে করল যে, কোনও বছর তারা ঘোষণা করত, এ বছরের সফর মাস মহররম মাসের আগে আসবে অথবা বলত এ বছর মহররমের পরিবর্তে সফর মাসকে মর্যাদাপূর্ণ মাস গণ্য করা হবে। এভাবে তারা মহররম মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহকে জায়েয করে নিত। কোনও কোনও বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, চান্দ্র-পরিক্রমার কারণে হজ্জ যেহেতু বিভিন্ন ঋতুতে আসত এবং অনেক সময় এমন ঋতুতে আসত, যা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল ছিল না, সে কারণে তারা সেই বছরের হজ্জকে যুলহিজ্জার বদলে অন্য কোনও মাসে নিয়ে যেত। এজন্য তারা কাবীসার এক হিসাব পদ্ধতিও আবিষ্কার করে নিয়েছিল, যা বিশদভাবে ইমাম রাযী (রহ.) 'তাফসীরে কাবীর'-এ উল্লেখ করেছেন। ইবনে জারীর (রহ.)-এর কোনও কোনও রিওয়ায়াত দ্বারাও তার সমর্থন হয়। মাসসমূহকে আগপিছু করার এই প্রথাকে 'নাসী' বলা হত। ৩৭ নং আয়াতে তার বর্ণনা আসছে।

فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۬ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۶﴾

(অর্থাৎ লাওহে মাহফুজ) অনুযায়ী সেই দিন থেকে চালু আছে, যে দিন আল্লাহ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। এর মধ্যে চারটি মাস মর্যাদাপূর্ণ। এটাই দ্বীন (-এর) সহজ-সরল (দাবী)। সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহের ব্যাপারে নিজেদের প্রতি জুলুম করো না[৩৪] এবং তোমরা সকলে মিলে মুশরিকদের সাথে লড়াই কর, যেমন তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।

اِنَّمَا النَّسِیْٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ؕ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ اَعْمَالِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۷﴾

৩৭. এই নাসী (মাসকে পিছিয়ে নেওয়া) তো কুফরকে আরও বৃদ্ধি করা, যা দ্বারা কাফেরদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়। তারা এ কাজকে এক বছর হালাল করে নেয় ও এক বছর হারাম সাব্যস্ত করে, যাতে আল্লাহ যে মাসকে নিষিদ্ধ করেছেন তার গণনা পূরণ করতে পারে এবং (এভাবে) আল্লাহ যা হারাম সাব্যস্ত করেছিলেন, তাকে হালাল করতে পারে।[৩৫] তাদের কুকর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুদৃশ্য করে দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ এরূপ কাফেরদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্ত করেন না।

[৬]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا

৩৮. হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হল যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে

---

৩৪. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মাসসমূহকে যেভাবে বিন্যস্ত করেছেন তাতে রদবদল ও আগুপিছু করার পরিণাম এই হল যে, যে মাসে যুদ্ধ হারাম ছিল, সে মাসে তা হালাল করে নেওয়া হল, যা একটি মহাপাপ। যে ব্যক্তি পাপ কর্ম করে সে নিজের উপরই জুলুম করে। কেননা তার অশুভ ফল তার নিজেকে ভুগতে হবে। সেই সঙ্গে এ বাক্যে ইশারা করা হয়েছে যে, এই মর্যাদাপূর্ণ মাসসমূহে আল্লাহর ইবাদত তুলনামূলক বেশি করা উচিত এবং অন্যান্য দিন অপেক্ষা এ সময় গুনাহ থেকেও বেশি দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

৩৫. অর্থাৎ মাসসমূহকে আগে-পিছে করে তারা চার মাসের গণনা তো পূরণ করে নিল কিন্তু বিন্যাস বদলের কুফল দাঁড়াল এই যে, আল্লাহ তাআলা যে মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহকে বাস্তবিকই হারাম করেছিলেন, সে মাসে তারা তা হালাল করে নিল।

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿۳۸﴾

অভিযানে বের হতে বলা হল, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটির সাথে মিশে গেলে?[৩৬] তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছ? (তাই যদি হয়) তবে (স্মরণ রেখ) আখিরাতের বিপরীতে পার্থিব জীবনের আনন্দ অতি সামান্য।

---

৩৬. এখান থেকে তাবুক যুদ্ধের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে, যা সূরার প্রায় শেষ পর্যন্ত চলতে থাকবে। সংক্ষেপে এ যুদ্ধের ঘটনা এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয় ও হুনায়নের যুদ্ধ শেষে যখন মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসলেন, তার কিছুদিন পর শাম থেকে আগত কতিপয় ব্যবসায়ী মুসলিমদেরকে জানাল, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস মদীনা মুনাওয়ারায় এক জোরালো হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এতদুদ্দেশ্যে সে শাম ও আরবের সীমান্তে এক বিশাল বাহিনীও মোতায়েন করেছে। এমনকি সৈন্যদেরকে এক বছরের অগ্রিম বেতনও আদায় করে দিয়েছে। যদিও সাহাবায়ে কেরাম এ যাবৎকাল বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, কিন্তু তা সবই জাযিরাতুল আরবের ভিতরে। কোনও বর্হিশক্তির সাথে এ পর্যন্ত মুকাবিলা হয়নি। এবার তাঁরা সেই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে যাচ্ছেন। তাও দুনিয়ার এক বৃহৎ শক্তির সাথে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফায়সালা করলেন যে, হিরাক্লিয়াসের আক্রমণের অপেক্ষায় না থেকে আমরা নিজেরাই অগ্রসর হয়ে তাদের উপর হামলা চালাব। সুতরাং তিনি মদীনা মুনাওয়ারার সমস্ত মুসলিমকে এ যুদ্ধে শরীক হওয়ার হুকুম দিলেন। মুসলিমদের পক্ষে এটা ছিল এক কঠিন পরীক্ষা। কেননা এটা ছিল দীর্ঘ দশ বছরের উপর্যুপরি যুদ্ধ, অবশেষে পবিত্র মক্কায় জয়লাভের পর প্রথমবারের মত এক সুযোগ, যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার কিছুটা সময় পাওয়া গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার সময়টা ছিল এমন, যখন মদীনা মুনাওয়ারার খেজুর বাগানগুলোতে খেজুর পাকছিল। এই খেজুরের উপরই মদীনাবাসীদের সারা বছরের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। সন্দেহ নেই এমন অবস্থায় বাগান ছেড়ে যাওয়াটা অত সহজ ব্যাপার ছিল না। তৃতীয়ত এটা ছিল আরব অঞ্চলে তীব্র গরমের সময়। মনে হত আকাশ থেকে আগুন ঝরছে ও ভূমি থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। চতুর্থত তাবুকের সফর ছিল অনেক দীর্ঘ। প্রায় আটশ' মাইলের সবটা পথই ছিল দুর্গম মরুভূমির উপর দিয়ে। আবার বাহন পশুর সংখ্যাও ছিল খুব কম। তদুপরি সফরের উদ্দেশ্য ছিল রোমানদের সাথে যুদ্ধ করা, যারা ছিল তখনকার বিশ্বের সর্ববৃহৎ শক্তি এবং তাদের যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কেও মুসলিমদের কোনও জানাশোনা ছিল না। মোদ্দাকথা সব দিক থেকেই এটি ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং জান-মাল ও আবেগ-অনুভূতি বিসর্জন দেওয়ার জিহাদ। যা হোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ত্রিশ হাজার সাহাবায়ে কিরামের এক বাহিনী নিয়ে তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। আল্লাহ তাআলা হিরাক্লিয়াস ও তার বাহিনীর উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই দুঃসাহসিক অগ্রাভিযানের এমন প্রভাব ফেললেন যে, তারা কালবিলম্ব না করে সেখান থেকে ওয়াপস চলে গেল। ফলে যুদ্ধ করার অবকাশ হল না। উপরে বর্ণিত সমস্যাদি সত্ত্বেও সাহাবায়ে কিরামের অধিকাংশই

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

৩৯. তোমরা যদি অভিযানে বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থানে অন্য কোনও জাতিকে আনয়ন করবেন এবং তোমরা তার কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ

৪০. তোমরা যদি তার (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সাহায্য না কর, তবে (তাতে তার কোনও ক্ষতি নেই। কেননা) আল্লাহ তো সেই সময়ও তার সাহায্য করেছিলেন, যখন কাফেরগণ তাকে (মক্কা) থেকে বের করে দিয়েছিল এবং তখন সে ছিল দুইজনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, তখন সে তার সঙ্গীকে বলেছিল, দুঃখ করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।[৩৭] সুতরাং

শাহাদাতের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে অত্যন্ত খুশী মনে এ অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য এমন কিছু সাহাবীও ছিলেন, যাদের কাছে এ অভিযান অত্যন্ত কঠিন মনে হয়েছিল, ফলে শুরুর দিকে তারা কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাও সৈন্যদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছিলেন। তারপরও কয়েকজন সাহাবী এমন রয়ে গিয়েছিলেন, যারা শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হননি। ফলে তারা অভিযানে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত থাকেন। আর মুনাফিকদের দল তো ছিলই, যারা প্রকাশ্যে নিজেদেরকে মুমিন বলে দাবী করলেও আন্তরিকভাবে ঈমানদার ছিল না। এমন সমস্যা সংকুল অভিযানে তাদের পক্ষে মুসলিমদের সহযাত্রী হওয়া সম্ভবই ছিল না। তাই তারা বিভিন্ন রকমের ছল ও বাহানা দেখিয়ে মদীনায় থেকে গিয়েছিল। এ সূরার সামনের আয়াতসমূহে এই সকল শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। তাতে তাদের কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ৩৮ নং আয়াতে যে সকল লোকের নিন্দা করা হয়েছে তারা কারা, এ সম্পর্কে দু'টো সম্ভাবনা আছে। (ক) তারা হয়ত মুনাফিক শ্রেণী। আর এ অবস্থায় 'হে মুমিনগণ' বলে যে সম্বোধন করা হয়েছে, এটা তাদের বাহ্যিক দাবীর ভিত্তিতে করা হয়েছে। (খ) এমনও হতে পারে যে, যে সকল সাহাবীর অন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। তবে এটা নিশ্চিত যে, ৪২ নং আয়াত থেকে মুনাফিকদের সম্পর্কেই আলোচনা হয়েছে।

৩৭. এর দ্বারা হিজরতের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একমাত্র সফর সঙ্গী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)কে সঙ্গে নিয়ে মক্কা মুকাররমা

كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ؕ وَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٤٠﴾

আল্লাহ তার প্রতি নিজের পক্ষ থেকে প্রশান্তি বর্ষণ করলেন এবং এমন বাহিনী দ্বারা তার সাহায্য করলেন, যা তোমরা দেখনি এবং কাফেরদের কথাকে হেয় করে দেখালেন। বস্তুত আল্লাহর কথাই সমুচ্চ। আল্লাহর ক্ষমতারও মালিক, হিকমতেরও মালিক।

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১. (জিহাদের জন্য) বের হয়ে পড়, তোমরা হালকা অবস্থায় থাক বা ভারী অবস্থায় এবং নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। তোমরা যদি বুঝ-সমঝ রাখ তবে এটাই তোমাদের পক্ষে উত্তম।

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ؕ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. যদি পার্থিব সামগ্রী আশু লাভের সম্ভাবনা থাকত এবং সফরও মাঝামাঝি রকমের হত, তবে তারা (অর্থাৎ মুনাফিকগণ) অবশ্যই তোমাদের অনুগামী হত। কিন্তু তাদের পক্ষে এই কঠিন পথ অনেক দূরবর্তী মনে হল। এখন তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, আমাদের সামর্থ্য থাকলে অবশ্যই আপনার সাথে বের হতাম।

থেকে বের হয়ে পড়েছিলেন এবং তিন দিন পর্যন্ত ছাওর পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করে থেকেছিলেন। মক্কা মুকাররমার কাফেরদের সর্দারগণ তাঁর সন্ধানে চারদিকে লোকজন নামিয়ে দিয়েছিল। এমনকি ঘোষণা করে দিয়েছিল, যে ব্যক্তি তাকে গ্রেফতার করতে পারবে তাকে একশ' উট পুরস্কার দেওয়া হবে। একবার অনুসন্ধানকারী দল ছাওরের গুহা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) তাদের পা দেখতে পাচ্ছিলেন। ফলে তাঁর চেহারায় উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। এ সময়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন, দুঃখ করো না। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা গুহার মুখে মাকড়সা লাগিয়ে দিলেন। তারা সেখানে জাল বুনে ফেলল। তারা সে জাল দেখে ওয়াপস চলে গেল। এ ঘটনার বরাত দিয়েই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কারও কোনও সাহায্য করার প্রয়োজন নেই। তার জন্য এক আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট। তবে যারা তাঁর সাহায্য করার সুযোগ পায় তারা বড় ভাগ্যবান।

তারা নিজেরা নিজেদেরকেই ধ্বংস করছে এবং আল্লাহ ভালো করে জানেন তারা মিথ্যাবাদী।

[৭]

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. (হে নবী!) আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।[৩৮] কারা সত্যবাদী তোমার কাছে তা স্পষ্ট হওয়া এবং কারা মিথ্যাবাদী তা ভালোভাবে জানার আগে তুমি তাদেরকে (জিহাদে শরীক না হওয়ার) অনুমতি কেন দিলে?

لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে, তারা নিজেদের জান-মাল দ্বারা জিহাদ না করার জন্য তোমার কাছে অনুমতি চায় না। আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন।

اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. তোমার কাছে অনুমতি চায় তো তারা, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহে নিপতিত এবং তারা নিজেদের সন্দেহের ভেতর দোদুল্যমান।

وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ

৪৬. যদি বের হওয়ার ইচ্ছাই তাদের থাকত, তবে তার জন্য কিছু না কিছু

---

৩৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণ না করার অনুমতি কেন দিলেন এজন্য তাকে তিরস্কার করা উদ্দেশ্য, কিন্তু মহব্বতপূর্ণ ভঙ্গি লক্ষ্য করুন। তিরস্কার করার আগেই ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন। কেননা প্রথমেই যদি তিরস্কার করা হত এবং ক্ষমার ঘোষণা পরে দেওয়া হত, তবে এই মধ্যবর্তী সময়টা না জানি তাঁর কী অবস্থার ভেতর দিয়ে কাটত। যা হোক আয়াতের মর্ম এই যে, ওই মুনাফিকদের তো যুদ্ধে যাওয়ার কোন ইচ্ছাই ছিল না, যেমন সামনে ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলাও চাচ্ছিলেন না তারা সৈন্যদের সাথে মিশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ পাক। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তাদেরকে যুদ্ধে শরীক না হওয়ার অনুমতি না দিতেন, তবে তারা যে নাফরমান এ বিষয়টা সুস্পষ্ট হয়ে যেত। পক্ষান্তরে বর্তমান অবস্থায় তারা যেহেতু অনুমতি নিয়ে ফেলেছে, তাই একদিকে মুসলিমদেরকে বলে বেড়াবে আমরা তো অনুমতি নিয়েই মদীনা মুনাওয়ারায় থেকেছি অপর দিকে নিজেদের লোকদের কাছে এই বলে কৃতিত্ব জাহির করবে যে, দেখলে তো, আমরা মুসলিমদেরকে কেমন ধোঁকা দিয়েছি।

كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ۝

প্রস্তুতি গ্রহণ করত।[৩৯] কিন্তু তাদের ওঠাই আল্লাহর পসন্দ ছিল না। তাই তাদেরকে আলস্যে পড়ে থাকতে দিলেন এবং বলে দেওয়া হল, যারা (পঙ্গুত্বের কারণে) বসে আছে তাদের সাথে তোমরাও বসে থাক।

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاۡاَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝

৪৭. তারা তোমাদের সাথে বের হলে তোমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি করত না এবং তোমাদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির চেষ্টায় তোমাদের সারিসমূহের মধ্যে ছোটাছুটি করত। আর তোমাদের নিজেদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যারা তাদের মতলবের কথা বেশ শুনে থাকে।[৪০] আল্লাহ জালেমদের সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ

৪৮. তারা এর আগেও ফিতনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। তোমার ক্ষতি করার লক্ষ্যে

---

৩৯. এ আয়াত জানাচ্ছে যে, মানুষের ওজর-অজুহাত কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যখন নিজের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালনের পুরোপুরি চেষ্টা ও সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারপর তার সামনে তার ইচ্ছা-বহির্ভূত এমন কোনও কারণ এসে পড়ে, যদ্দরুণ সে নিজ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয় না। পক্ষান্তরে কোনও লোক যদি চেষ্টাই না করে এবং সাধ্য অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ থেকে বিরত থাকে আর এ অবস্থায় বলে, আমি অক্ষম, আমার ওজর আছে, তবে তার এ কথা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। উদাহরণত এক ব্যক্তি ফজরের সময় জাগ্রত হওয়ার সব রকম চেষ্টা করল, অ্যালার্ম লাগাল, কিংবা কাউকে জাগানোর জন্য বলে রাখল, কিন্তু তারপরও সে জাগতে পারল না, তবে সে নিশ্চয়ই মাজুর। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনও প্রস্তুতিই গ্রহণ করল না, তারপর জাগতে না পারার ওজর দেখাল, তার এ ওজর গ্রহণযোগ্য নয়।

৪০. এর দুই অর্থ হতে পারে। (এক) কতক সরলপ্রাণ মুসলিম ওই সব লোকের স্বরূপ জানে না। তাই তাদের কথা শুনে মনে করে তারা তা খাঁটি মনেই বলছে। কাজেই ওই সকল মুনাফিক তোমাদের সাথে যুদ্ধে আসলে সরলমনা মুসলিমদেরকে প্ররোচনা দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করত। (দুই) দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে যে, ওই সকল মুনাফিক নিজেরা যদিও সেনাদলে যোগদান করেনি, কিন্তু তোমাদের ভেতর তাদের গুপ্তচর আছে। তারা তোমাদের কথা কান পেতে শোনে এবং যেসব কথা দ্বারা মুনাফিকদের কোন সুবিধা হতে পারে, তা তাদের কাছে পৌঁছে দেয়।

الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٤٨﴾

তারা বিষয়াবলীকে ওলট-পালট করে যাচ্ছিল। অবশেষে সত্য আসল এবং আল্লাহর হুকুম বিজয়ী হল আর তারা তা অপসন্দ করছিল।[৪১]

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আর তাদের মধ্যেই সেই ব্যক্তিও আছে, যে বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না।[৪২] ওহে! ফিতনায় তো তারা পড়েই রয়েছে। বিশ্বাস রাখ, জাহান্নাম কাফেরদেরকে বেষ্টন করে রাখবেই।

إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَّهُمْ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾

৫০. তোমাদের কোন কল্যাণ লাভ হলে তাদের দুঃখ হয় আর যদি তোমাদের কোন মুসিবত দেখা দেয়, তবে বলে, আমরা তো আগেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম আর (একথা বলে) তারা বড় খুশী মনে সটকে পড়ে।

قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

৫১. বলে দাও, আল্লাহ আমাদের তাকদীরে যে কষ্ট লিখে রেখেছেন, তা ছাড়া অন্য কোন কষ্ট আমাদেরকে কিছুতেই স্পর্শ করবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহরই উপর মুমিনদের ভরসা করা উচিত।

---

৪১. এর দ্বারা মুসলিমদের বিজয়সমূহের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। মক্কা বিজয় ও হুনায়নের বিজয় তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুনাফিকদের সর্বাত্মক চেষ্টা ছিল মুসলিমগণ যাতে সফল না হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার হুকুম জয়ী হল আর তারা হা করে তাকিয়ে থাকল।

৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, মুনাফিকদের মধ্যে জাদ্দ ইবনে কায়স নামক একজন লোক ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বললে সে জবাব দিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বড় নারী-কাতর লোক। রোমান সুন্দরীদের দেখলে আমার পক্ষে ইন্দ্রিয় সংযম সম্ভব হবে না। ফলে আমি ফিতনায় পড়ে যাব। সুতরাং আমাকে এই যুদ্ধে শরীক না হওয়ার অনুমতি দিন এবং এভাবে আমাকে ফিতনার শিকার হওয়া থেকে বাঁচান। এ আয়াতে তার দিকেই ইশারা করা হয়েছে (রূহুল মাআনী, ইবনুল মুনযির, তাববারানী ও ইবনে মারদাওয়ায়হের বরাতে)।

৫২. বলে দাও, তোমরা আমাদের জন্য যে জিনিসের অপেক্ষায় আছ, তা তো এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, দু'টি মঙ্গলের একটি না একটি আমরা লাভ করব।[৪৩] আর আমরা তোমাদের ব্যাপারে এই অপেক্ষায় আছি যে, আল্লাহ নিজের পক্ষ হতে অথবা আমাদের হাতে তোমাদেরকে শাস্তি দান করবেন। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় আছি।

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّاۤ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ؕ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖۤ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖؗ فَتَرَبَّصُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩. বলে দাও, তোমরা নিজেদের সম্পদ থেকে খুশী মনে চাঁদা দাও অথবা অসন্তোষের সাথে, তোমাদের পক্ষ হতে তা কিছুতেই কবুল করা হবে না।[৪৪] তোমরা এমন লোক যে ক্রমাগত নাফরমানী করে যাচ্ছ।

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ؕ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪. তাদের চাঁদা কবুল হওয়ার পক্ষে বাধা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কুফরী করেছে এবং তারা সালাতে আসলে গড়িমসি করে আসে এবং (কোনও সৎকাজে) অর্থ ব্যয় করলে তা করে অসন্তোষের সাথে।

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّاۤ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫. তাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (-এর আধিক্য) দেখে তোমার বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ তো দুনিয়ার

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ

---

৪৩. অর্থাৎ হয়ত আমরা জয়লাভ করব অথবা আল্লাহ তাআলার পথে শহীদ হয়ে যাব। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, আমাদের পক্ষে এ দুটোই কল্যাণকর। তোমরা মনে করছ শহীদ হয়ে গেলে আমাদের ক্ষতি হবে, অথচ শহীদ হওয়াটা আদৌ ক্ষতির বিষয় নয়; বরং অতি বড় লাভজনক ব্যাপার।

৪৪. এ আয়াত নাযিল হয়েছে জাদ্দ ইবনে কায়েস প্রসঙ্গে, যার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এক রিওয়ায়াতে আছে, যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে এক তো সে পূর্বোক্ত বেহুদা ওজর পেশ করেছিল, সেই সঙ্গে সে প্রস্তাব করেছিল, তার বদলে (অর্থাৎ, যুদ্ধে যাওয়ার বদলে) আমি যুদ্ধের চাঁদা দেব (ইবনে জারীর, ১ম খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা)। তারই জবাবে এ আয়াত ঘোষণা করছে যে, মুনাফিকদের চাঁদা গ্রহণযোগ্য নয়।

اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٥٥﴾

জীবনে এসব জিনিস দ্বারাই তাদেরকে শাস্তি দিতে চান।[৪৫] আর যাতে কুফর অবস্থায়ই তাদের প্রাণ বের হয়।

وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ؕ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. তারা আল্লাহর কসম করে বলে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে তারা এক ভীরু সম্প্রদায়।

لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. তারা যদি কোনও আশ্রয়স্থল, কোনও গিরি-গুহা কিংবা কোনও প্রবেশস্থল পেয়ে যায়, তবে লাগামহীনভাবে সে দিকেই ধাবিত হয়।[৪৬]

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَاۤ

৫৮. তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা সদকা (বণ্টন) সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ

---

৪৫. এ আয়াত দুনিয়ার ধন-দৌলত সম্পর্কিত এক মহা সত্যের প্রতি ইশারা করছে। ইসলামের শিক্ষা হল, ধন-দৌলত এমনিতে এমন কোন বিষয় নয়, যাকে মানুষ তার জীবনের লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারে। মানুষের আসল লক্ষ্য তো হবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন ও আখিরাতের সর্বোত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ। তবে দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে হলে যেহেতু অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন, তাই বৈধ উপায়ে তা অর্জন করা চাই। এক্ষেত্রেও ভুলে গেলে চলবে না যে, দুনিয়ার প্রয়োজন সমাধায়ও অর্থ-সম্পদ স্বয়ং সরাসরি কোনও উপকার দিতে পারে না। বরং তা আরাম-আয়েশের উপকরণ সংগ্রহের মাধ্যমই হতে পারে। মানুষ যখন তাকে জীবনের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নেয় এবং সর্বদা এই ধান্ধায় পড়ে থাকে যে, দিন-দিন তা কিভাবে বাড়ানো যায়, তবে সে বেচারার জন্য অর্থ-সম্পদ একটা মুসিবত হয়ে দাঁড়ায়। সে যে এই ধান্ধার ভেতর নিজের সুখ-শান্তি সব বিসর্জন দিয়েছে সে খবরও তার থাকে না। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, তার ব্যাংক-ব্যালান্স উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু তার তো দিনেও স্বস্তি নেই, রাতেও আরাম নেই। না স্ত্রী-সন্তানদের সাথে কথা বলার ফুরসত আছে আর না আরাম-আয়েশের উপকরণসমূহ ভোগ করার অবকাশ আছে। যদি কখনও তার অর্থ-বিত্তে লোকসান দেখা দেয়, তবে তো মাথার উপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। কেননা তার তো সে লোকসানের বিনিময়ে আখিরাতে কিছু পাওয়ার ধারণা নেই। এভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে দুনিয়াদারের পক্ষে অর্থ-বিত্ত তার দুনিয়ার জীবনেই আযাব হয়ে দাঁড়ায়।

৪৬. অর্থাৎ তারা যে নিজেকে মুসলিম বলে ঘোষণা করেছে তা কেবল মুসলিমদের ভয়ে। নয়ত তাদের অন্তরে এক ফোঁটা ঈমান নেই। সুতরাং এমন কোনও স্থান যদি তারা পেত যেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারত, তবে তারা ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা না দিয়ে বরং সেখানে গিয়ে আত্মগোপন করত।

إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

করে।[৪৭] সদকা থেকে তাদেরকে তাদের (মন মত) দেওয়া হলে তারা খুশী হয়ে যায় আর তাদেরকে যদি তা থেকে না দেওয়া হয়, অমনি তারা ক্ষুব্ধ হয়,

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. কত ভালো হত– আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে যা-ই দিয়েছেন তাতে যদি তারা খুশী থাকত এবং বলত, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, ভবিষ্যতে আল্লাহ আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও। আমরা তো আল্লাহরই কাছে আশাবাদী।

[৮]

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

৬০. প্রকৃতপক্ষে সদকা ফকীর ও মিসকীনদের হক[৪৮] এবং সেই সকল কর্মচারীদের, যারা সদকা উসূলের কাজে নিয়োজিত[৪৯] এবং যাদের মনোরঞ্জন করা উদ্দেশ্য তাদের।[৫০] তাছাড়া

৪৭. ইবনে জারীর (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে কয়েকটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন, যাতে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদকা বণ্টন করলে কিছু মুনাফিক তাতে প্রশ্ন তুলল। তারা বলল, এ বণ্টন ইনসাফ মোতাবেক হয়নি (নাউযুবিল্লাহ)। এর কারণ ছিল এই যে, মুনাফিকদেরকে তা থেকে তাদের খাহেশ মত দেওয়া হয়নি।

৪৮. ফকীর ও মিসকীন কাছাকাছি অর্থের শব্দ। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ কেউ এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন যে, মিসকীন সেই ব্যক্তি যার কিছুই নেই; সম্পূর্ণ নিঃস্ব। আর ফকীর বলে সেই ব্যক্তিকে, যার কাছে কিছু থাকে, কিন্তু তা প্রয়োজন অপেক্ষা কম। আবার কেউ কেউ পার্থক্যটা এর বিপরীতভাবে করেছেন। তবে যাকাতের বিধানে উভয়ই সমান। অর্থাৎ যার কাছে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা তার সমমূল্যের মাল-সামগ্রী, যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত না থাকে, তার জন্য যাকাত গ্রহণ জায়েয। বিস্তারিত জানার জন্য ফিকহী গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য।

৪৯. ইসলামী রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল মুসলিমদের থেকে তাদের প্রকাশ্য সম্পদের যাকাত উসূল করে প্রকৃত হকদারদের মধ্যে বণ্টন করা। এ কাজের জন্য যে সকল কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়, তাদের বেতনও যাকাত থেকে দেওয়া যেতে পারে।

৫০. এর দ্বারা সেই অভাবগ্রস্ত নও-মুসলিমকে বোঝানো হয়েছে, ইসলামের উপর স্থিতিশীল রাখার জন্য যার মনোরঞ্জন করার প্রয়োজন বোধ হয়। পরিভাষায় এরূপ লোককে 'মাআল্লাফাতুল কুলুব' বলা হয়।

وَالْغٰرِمِیْنَ وَفِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِیْلِ ؕ فَرِیْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ حَكِیْمٌ ﴿۶۰﴾

দাসমুক্তিতে,[৫১] ঋণগ্রস্তের ঋণ পরিশোধে[৫২] এবং আল্লাহর পথে[৫৩] ও মুসাফিরদের সাহায্যেও[৫৪] তা ব্যয় করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ জ্ঞানেরও মালিক, হিকমতেরও মালিক।

وَمِنْهُمُ الَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ النَّبِیَّ وَیَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ؕ قُلْ اُذُنُ خَیْرٍ لَّكُمْ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَیُؤْمِنُ

৬১. তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং (তাঁর সম্পর্কে) বলে, 'সে তো আপাদমস্তক কান'।[৫৫] বলে দাও,

---

৫১. যে যুগে দাস প্রথা চালু ছিল, তখন অনেক সময় মনিব তার দাসকে বলত, তুমি আমাকে এই পরিমাণ অর্থ আদায় করলে তুমি আযাদ হয়ে যাবে। এরূপ দাসদের মুক্তি লাভে সহযোগিতা করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করার সুযোগ ছিল।

৫২. এর দ্বারা সেই ঋণগ্রস্তকে বোঝানো হয়েছে, যার মালামাল ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট নয় কিংবা তার সব মালপত্র দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হলে তার কাছে নিসাব তথা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সম-পরিমাণ মাল অবশিষ্ট থাকবে না।

৫৩. 'আল্লাহর পথে' কথাটি কুরআন মাজীদে বেশির ভাগই জিহাদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা এমন লোককে বোঝানো উদ্দেশ্য, যে জিহাদে যেতে চায়, কিন্তু তার কাছে বাহন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা নেই। ফুকাহায়ে কিরাম আরও কতক অভাবগ্রস্তকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেমন কোন ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, কিন্তু এই মুহূর্তে তার কাছে হজ্জ আদায়ের মত অর্থ-কড়ি নেই। এরূপ ব্যক্তিকেও 'আল্লাহর পথে'-এর খাতভুক্ত করে যাকাত দেওয়া যাবে।

৫৪. 'মুসাফির' দ্বারা এমন সফর রত ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যার কাছে সফরের প্রয়োজনাদি পূরণ করে বাড়ি ফেরার মত টাকা-পয়সা নেই, যদিও বাড়িতে তার নিসাব পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, কুরআন মাজীদে বর্ণিত যাকাতের অর্থ ব্যয়ের উপরিউক্ত আটটি খাতের যে ব্যাখ্যা আমরা এখানে প্রদান করলাম, এটা খুবই সংক্ষিপ্ত। সুতরাং এসব খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয়ের সময় কোন আলেমের কাছ থেকে ভালোভাবে মাসআলা বুঝে নেওয়া চাই। কেননা এসব খাতের প্রত্যেকটি সম্পর্কে শরীয়তের বিস্তারিত বিধি-বিধান রয়েছে, যার বিশদ বিবরণ দেওয়ার জায়গা এটা নয়।

৫৫. এটা আরবী ভাষার একটা প্রবচনের আক্ষরিক অনুবাদ। আরবী পরিভাষায় যে ব্যক্তি সকলের কথাই শোনামাত্র বিশ্বাস করে, তার সম্পর্কে বলা হয়, 'এ ব্যক্তির তো সবটাই কান' কিংবা 'সে আগাগোড়া কান'। যেমন উর্দূ ভাষায় বলে (وہ کچے کانوں کے ہے) [বাংলায় বলে 'কান পাতলা']। মুনাফিকরা আপসের মধ্য আলাপচারিতার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এরূপ ন্যাক্কারজনক শব্দ ব্যবহার করেছিল।

لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦١﴾

তোমাদের পক্ষে যা মঙ্গলজনক সে তারই জন্য কান।[৫৬] সে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং মুমিনদের কথা বিশ্বাস করে। তোমাদের মধ্যে যারা (বাহ্যিকভাবে) ঈমান এনেছে, তাদের জন্য সে রহমত (সুলভ আচরণকারী)। যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে।

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾

৬২, (হে মুসলিমগণ!) তারা তোমাদেরকে খুশী করার জন্য তোমাদের কাছে আল্লাহর নামে শপথ করে, অথচ তারা সত্যিকারের মুমিন হলে তো আল্লাহ ও তার রাসূলই এ বিষয়ের বেশি হকদার যে, তারা তাদেরকেই খুশী করবে।

اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٣﴾

৬৩. তারা কি জানে না কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করলে সিদ্ধান্ত স্থির রয়েছে যে, তার জন্য জাহান্নামের আগুন, যাতে সে সর্বদা থাকবে? এটা তো চরম লাঞ্ছনা!

বোঝাতে চাচ্ছিল, আমাদের চক্রান্তের বিষয়টা কখনও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফাঁস হয়ে গেলেও আমরা কথা দ্বারা তাঁকে খুশী করে ফেলব। কেননা তিনি সকলের কথাই বিশ্বাস করে নেন।

৫৬. মুনাফিকদের উপরিউক্ত বাক্যের উত্তরে আল্লাহ তাআলা তিনটি বিষয় ইরশাদ করেছেন। (এক) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কান পেতে সর্বপ্রথম যে কথা শোনেন, তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ওহী। আর ওহী তো তোমাদের সকলের কল্যাণার্থেই নাযিল করা হয়। (দুই) তিনি খাঁটি মুমিনদের কথা শুনে সত্যিই তা বিশ্বাস করে নেন। কেননা তাদের সম্পর্কে তাঁর জানা আছে, তারা মিথ্যা বলে না। (তিন) যারা কেবল বাহ্যিকভাবে ঈমান এনেছে সেই মুনাফিকদের কথাও তিনি শোনেন। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, তিনি তাদের কথায় ধোঁকায় পড়ে যান। বরং আল্লাহ তাআলা যেহেতু তাকে সাক্ষাৎ রহমত ও করুণাস্বরূপ পাঠিয়েছেন, তাই যতদূর সম্ভব তিনি প্রত্যেকের সাথে দয়ার আচরণ করেন। আর সে কারণেই তিনি মুনাফিকদের কথা সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে বরং নীরবতা অবলম্বন করেন। সুতরাং এটা ধোঁকায় পড়া নয়; বরং তাঁর দয়ালু চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ।

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. মুনাফিকগণ ভয় পায় যে, পাছে মুসলিমদের প্রতি এমন কোনও সূরা নাযিল হয়, যা তাদেরকে তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) মনের কথা জানিয়ে দিবে।[৫৭] বলে দাও, তোমরা ঠাট্টা করতে থাক। তোমরা যা ভয় কর আল্লাহ তা প্রকাশ করেই দিবেন।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ؕ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা তো হাসি-তামাশা ও ফূর্তি করছিলাম। বল, তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে ফূর্তি করছিলে?

لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. অজুহাত দেখিও না। তোমরা ঈমান জাহির করার পর কুফরীতে লিপ্ত হয়েছ। আমি তোমাদের মধ্যে এক দলকে ক্ষমা করলেও, অন্য দলকে অবশ্যই শাস্তি দিব।[৫৮] কেননা তারা অপরাধী।

[৯]

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী সকলেই এক রকম। তারা মন্দ কাজের আদেশ করে ও ভালো কাজে বাধা দেয় এবং তারা নিজেদের হাত বন্ধ করে রাখে।[৫৯] তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিকগণ ঘোর অবাধ্য।

---

৫৭. মুনাফিকগণ তাদের নিজেদের মধ্যকার আলাপ-আলোচনায় মুসলিমদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। কেউ এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলত, আমরা এসব কথা কেবল ফূর্তি করেই বলেছিলাম, মনের থেকে বলিনি। ৬৪ থেকে ৬৬ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে তাদের এসব কার্যকলাপের পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

৫৮. অর্থাৎ মুনাফিকদের মধ্যে যারা তাওবা করবে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে। আর যারা তাওবা করবে না তারা অবশ্যই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

৫৯. 'হাত বন্ধ রাখা'-এর অর্থ তারা কৃপণ। যে সকল ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করা উচিত, তাতে তা করে না।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٦٨﴾

৬৮. আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী এবং সমস্ত কাফেরকে জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। তাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন আর তাদের জন্য আছে স্থায়ী শাস্তি।

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. (হে মুনাফিকগণ!) তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, তোমরা তাদেরই মত। তারা শক্তিতে তোমাদের অপেক্ষা প্রবল এবং ধনে-জনে তোমাদের অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। তারা তাদের ভাগের মজা লুটে নিয়েছিল, তারপর তোমরাও তোমাদের ভাগের মজা লুটছ, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ নিজেদের ভাগের মজা লুটেছিল এবং তোমরাও বেহুদা কথাবার্তায় লিপ্ত হয়েছ, যেমন তারা লিপ্ত হয়েছিল। তারাই এমন লোক, যাদের কর্ম দুনিয়া ও আখিরাতে নিষ্ফল হয়েছে এবং তারাই এমন লোক, যারা ব্যবসায় লোকসান দিয়েছে।

اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۙ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) কাছে কি তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের সংবাদ পৌঁছেনি? নূহের কওম, আদ, ছামুদ, ইবরাহীমের কওম, মাদয়ানবাসী এবং সেই সকল জনপদ, যা উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে![৬০] তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। অতঃপর আল্লাহ এমন নন যে, তাদের উপর জুলুম করবেন; বস্তুত তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।

---

৬০. এদের ঘটনাবলীর জন্য দেখুন সূরা আ'রাফের ৫৯ থেকে ৯২ আয়াত ও সংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۷۱﴾

৭১. মুমিন নর ও মুমিন নারী পরস্পরে একে অন্যের সহযোগী। তারা সৎকাজের আদেশ করে অসৎ কাজে বাধা দেয়, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তারা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ নিজ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতারও মালিক, হিকমতেরও মালিক।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۷۲﴾

৭২. আল্লাহ মুমিন নর ও মুমিন নারীদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমন উদ্যানরাজির, যার তলদেশে নহর বহমান থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে এবং এমন উৎকৃষ্ট বাসস্থানের, যা সতত সজীব জান্নাতে থাকবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস (যা জান্নাতবাসীগণ লাভ করবে)। এটাই মহা সাফল্য।

[৬১]

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۷۳﴾

৭৩. হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের সাথে জিহাদ কর[৬১] এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম আর তা অতি মন্দ ঠিকানা।

---

৬১. 'জিহাদ'-এর মূল অর্থ, চেষ্টা, মেহনত ও পরিশ্রম করা। দ্বীনের হেফাজত ও প্রতিরক্ষার জন্য এ মেহনত সশস্ত্র সংগ্রাম রূপেও হতে পারে এবং মৌখিক দাওয়াত ও তাবলীগ আলোচনা-পর্যালোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পন্থায়ও হতে পারে। যারা প্রকাশ্য কাফের তাদের সাথে জিহাদ দ্বারা এখানে প্রথমোক্ত অর্থই বোঝানো হয়েছে। আর মুনাফিকদের সাথে জিহাদ দ্বারা দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য। মুনাফিকরা যেহেতু মুখে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করত তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অপতৎপরতা সত্ত্বেও হুকুম দেন যে, দুনিয়ায় তাদের সাথে মুসলিমদের মতই ব্যবহার করতে হবে। সুতরাং তাদের সাথে জিহাদের অর্থ হবে মৌখিক জিহাদ। আর তাদের প্রতি কঠোর হওয়ার অর্থ কথাবার্তায় তাদের কোনও খাতির না করা এবং তাদের দ্বারা শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ ঘটলে তাদেরকে ক্ষমা না করা।

يَحۡلِفُوۡنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوۡا ؕ وَلَقَدۡ قَالُوۡا كَلِمَةَ الۡكُفۡرِ وَكَفَرُوۡا بَعۡدَ اِسۡلَامِهِمۡ وَهَمُّوۡا بِمَا لَمۡ يَنَالُوۡا ۚ وَمَا نَقَمُوۡۤا اِلَّاۤ اَنۡ اَغۡنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوۡلُهٗ مِنۡ فَضۡلِهٖ ۚ فَاِنۡ يَّتُوۡبُوۡا يَكُ خَيۡرًا لَّهُمۡ ۚ وَاِنۡ يَّتَوَلَّوۡا يُعَذِّبۡهُمُ اللّٰهُ

৭৪. তারা আল্লাহর কসম করে যে, তারা অমুক কথা বলেনি। অথচ তারা কুফরী কথা বলেছে[৬২] এবং তারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণের পর কুফর অবলম্বন করেছে।[৬৩] তারা এমন কাজ করার ইচ্ছা করেছিল, যাতে তারা সফলতা লাভ করতে পারেনি।[৬৪] আল্লাহ ও তার রাসূল যে তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে বিত্তবান করেছিলেন,[৬৫] তারা তারই

---

৬২. মুনাফিকদের একটা খাসলত ছিল যে, তারা তাদের নিজেদের বৈঠক ও মজলিসে কাফের সুলভ কথাবার্তা বলত। এ সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে সাফ অস্বীকার করত এবং কসম করত যে, আমরা এমন কথা বলিনি। একবার মুনাফিক কুল শিরোমণি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমদের সম্পর্কে চরম ধৃষ্ঠতামূলক উক্তি করেছিল। এমনই কথা, যা উচ্চারণ করাও কঠিন। সেই সঙ্গে এটাও বলেছিল যে, আমরা যখন মদীনায় পৌছব, তখন আমাদের মধ্যকার সম্মানী লোকেরা নিম্ন শ্রেণীর লোকদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেবে। খোদ কুরআন মাজীদেও তার এ কথা উদ্ধৃত হয়েছে (দেখুন, সূরা মুনাফিকুন ৬৩ : ৮)। কিন্তু যখন তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল সে তা অস্বীকার করল এবং কসম করল যে, আমি এটা বলিনি (রূহুল মাআনী, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির প্রমূখের বরাতে)।

৬৩. অর্থাৎ আন্তরিকভাবে যদিও তারা কখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি, কিন্তু অন্ততপক্ষে মুখে তো ইসলামের কথা স্বীকার করত। পরবর্তীকালে তারা মুখেও কুফরকে গ্রহণ করে নিল।

৬৪. এর দ্বারা কোনও এক ঘটনার দিকে ইশারা করা হয়েছে, যাতে মুনাফিকরা কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্র এঁটেছিল, কিন্তু তাতে তারা সফল হতে পারেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এ রকম কয়েকটি ঘটনাই ঘটেছিল, যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার এই ন্যাক্কারজনক দূরভিসন্ধির কথা প্রকাশ করেছিল যে, তারা মুসলিমগণকে মদীনা থেকে বের করে দেবে। বলাবাহুল্য তারা তাদের সে কু-মতলব বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়নি। দ্বিতীয় একটি ঘটনা ঘটেছিল তাবুক থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যাবর্তন কালে। মুনাফিকরা বারজন লোককে মুখোশ পরিয়ে এক গিরিপথে নিযুক্ত করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল- তারা সেখানে লুকিয়ে থাকবে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সেখান দিয়ে অতিক্রম করবেন তখন তার উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাবে। কিন্তু হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাযি.) তাদেরকে দেখে ফেলেছিলেন। তিনি তা অবহিত করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে এত জোরে আওয়াজ করলেন যে, তারা তাতে আতঙ্কিত হয়ে ওঠল। ফলে সকলে প্রাণ নিয়ে পালাল। পরে তিনি হযরত হুযায়ফা (রাযি.)কে জানালেন যে, তারা ছিল একদল মুনাফিক (রূহুল মাআনী, দালাইলুল নবুওয়াহ এর বরাতে)।

৬৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমনের বরকতে মদীনা মুনাওয়ারার বাসিন্দাদের আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হয়ে গিয়েছিল এবং তার সুফল

عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾

বদলা দিয়েছে। এখন তারা তাওবা করলে তা তাদের পক্ষে মঙ্গল হবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাময় শাস্তি দিবেন এবং ভূপৃষ্ঠে তাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না।

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾

৭৫. তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল যে, তিনি যদি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে দান করেন, তবে আমরা অবশ্যই সদকা করব এবং নিঃসন্দেহে আমরা সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হব।

فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾

৭৬. কিন্তু আল্লাহ যখন তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে দান করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করল এবং মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।[৬৬]

মুনাফিকরাও ভোগ করছিল। এর আগে তাদের খুবই দৈন্য দশা ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমনের পর তাদের অধিকাংশই মালদার হয়ে গেল। এ আয়াত বলছে, সৌজন্যবোধের তো দাবী ছিল তারা এ সমৃদ্ধির কারণে আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুকর আদায় করবে, কিন্তু তারা সে ইহসানের বদলা দিল তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক চক্রান্ত দ্বারা।

৬৬. হযরত আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর এক বর্ণনায় আছে, সালাবা ইবনে হাতিব নামক এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আরজ করল, আপনি দোয়া করুন, আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে ধনী বানিয়ে দেন। তিনি প্রথমে তাকে বুঝালেন যে, বেশী ধনবান হওয়াকে তো আমি নিজের জন্যও পসন্দ করি না। কিন্তু সে পীড়াপীড়ি করতে থাকল এবং এই ওয়াদাও করল যে, আমি ধনবান হলে সকল হকদারকে তাদের হক আদায় করে দেব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে এই প্রাজ্ঞজনোচিত কথা বললেন, দেখ, যেই অল্প সম্পদের শুকর আদায় করতে পারবে, সেটা ওই বেশি সম্পদ অপেক্ষা শ্রেয়, যার শুকর আদায় করতে পারবে না। কিন্তু তথাপি সে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। অগত্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করলেন। ফলে বাস্তবিকই সে ধনবান হয়ে গেল। তার মূল সম্পদ ছিল গবাদি পশু। তা অল্প দিনের ভেতর এত বেড়ে গেল যে, তার দেখাশোনায় ব্যস্ত থাকার ফলে নামায ছুটে যেতে লাগল। সে এক পর্যায়ে তার পশুগুলো নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারার বাইরে গিয়ে থাকতে শুরু করল। কেননা ভিতরে তার স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। প্রথম দিকে তো জুমুআর দিন মসজিদে আসত। কিন্তু এক পর্যায়ে

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. সুতরাং আল্লাহ শাস্তি হিসেবে তাদের অন্তরে কপটতা স্থিত করে দিলেন সেই দিন পর্যন্ত, যে দিন তারা আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবে। কেননা তারা আল্লাহর সঙ্গে যে ওয়াদা করেছিল তা রক্ষা করল না এবং তারা মিথ্যা বলত।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٧٨﴾

৭৮. তাদের কি জানা ছিল না যে, আল্লাহ তাদের সমস্ত গুপ্ত বিষয় এবং তাদের কানাকানি সম্পর্কে অবগত এবং অদৃশ্যের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তার পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে?

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ؕ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۫ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾

৭৯. (এসব মুনাফিক তো এমন) যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকাকারীদেরকে দোষারোপ করে এবং তাদেরকেও যারা নিজ শ্রম (লব্ধ অর্থ) ছাড়া কিছুই পায় না।[৬৭] এ কারণে তারা তাদেরকে উপহাস করে। আল্লাহও তাদের উপহাস করেন।[৬৮] তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে।

জুমুআয় আসাও ছেড়ে দিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধি যখন তার কাছে যাকাত আদায়ের জন্য গেল, তখন সে যাকাত নিয়েও পরিহাস করল এবং টালবাহানা করে তাকে ফেরত পাঠাল। এ আয়াতে সেই ঘটনার দিকে ইশারা করা হয়েছে (রূহুল মাআনী, তাবারানী ও বায়হাকীর বরাতে)।

৬৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদেরকে দান-খয়রাত করতে উৎসাহ দিলে নিষ্ঠাবান মুসলিমদের যার পক্ষে যা সম্ভব ছিল তাঁর সমীপে এনে পেশ করলেন। অপর দিকে মুনাফিকগণ এ পুণ্যের কাজে অংশগ্রহণ করবে তো দূরের কথা উল্টো তারা মুসলিমদেরকে বিভিন্নভাবে দোষারোপ করতে লাগল। কেউ বেশি দিলে বলত, সে তো মানুষকে দেখানোর জন্য দান করছে। আবার কোন গরীব শ্রমিক নিজের ঘাম ঝরানো কামাই থেকে কিছু নিয়ে আসলে তারা উপহাস করে বলত, তুমি এই কী নিয়ে এসেছ? এর কোনও প্রয়োজন আল্লাহর আছে কি? বুখারী শরীফ এবং হাদীস ও তাফসীরের অন্যান্য কিতাবে এ রকম বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। এস্থলে খুব সম্ভব তাবুক যুদ্ধকালীন সময়ের কথা বোঝানো হয়েছে, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাঁদা দিতে উৎসাহিত করেছিলেন। আদ-দুররুল মানছুর (৪র্থ খণ্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা)-এর একটি রিওয়ায়াত দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়।

৬৮. আল্লাহ তাআলা উপহাস করা থেকে বেনিয়ায। সুতরাং এস্থলে উপহাস করা দ্বারা উপহাস করার শাস্তি বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা যে উপহাস করছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সেজন্য শাস্তি দান করবেন। আল্লাহ তাআলার জন্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে অলংকার

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۸۰﴾

৮০. (হে নবী!) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর একই কথা। তুমি যদি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবু আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী পন্থা অবলম্বন করেছে। আল্লাহ অবাধ্যদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্ত করেন না।

[১১]

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ ؕ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿۸۱﴾

৮১. যাদেরকে (তাবুক যুদ্ধ হতে) পিছনে থাকতে দেওয়া হয়েছিল, তারা রাসূলুল্লাহর যাওয়ার পর (নিজ গৃহে) বসে থাকাতে আনন্দ লাভ করল। আর আল্লাহর পথে নিজেদের জান-মাল দ্বারা জিহাদ করা তাদের কাছে নাপসন্দ ছিল। তারা বলেছিল, এই গরমে বের হয়ো না। বল, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন তীব্রতর। যদি তারা বুঝত!

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۸۲﴾

৮২. সুতরাং তারা (দুনিয়ায়) কিঞ্চিৎ হেসে নিক। অতঃপর তারা (আখিরাতে) অনেক কাঁদবে। কেননা তারা যা-কিছু অর্জন করেছে, তার প্রতিফল এটাই।

فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِىَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِىَ عَدُوًّا ؕ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ﴿۸۳﴾

৮৩. (হে নবী!) এরপর আল্লাহ তোমাকে তাদের কোনও দলের কাছে ফিরিয়ে আনলে এবং তারা তোমার কাছে (অন্য কোনও জিহাদে) বের হওয়ার অনুমতি চাইলে তাদেরকে বলে দেবে, 'তোমরা আর কখনও আমার সঙ্গে বের হতে পারবে না' এবং আমার সাথে মিলে কখনও কোনও শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না। তোমরা তো প্রথম বার বসে থাকতে পসন্দ করেছিলে। সুতরাং

শাস্ত্রের মুশাকালা [পাশাপাশি অবস্থানের কারণে একটি বিষয়কে অপরটির শব্দে ব্যক্তকরণমূলক অলংকার]-এর ভিত্তিতে।

এখনও তাদের সঙ্গে বসে থাক, যাদেরকে (কোন ওজরের কারণে) বসে থাকতে হয়।

৮৪. (হে নবী!) তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) মধ্য হতে কেউ মারা গেলে তুমি তার প্রতি (জানাযার) নামায পড়বে না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবেও না।[৬৯] তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী কর্মপন্থা অবলম্বন করেছে এবং তারা পাপিষ্ঠ অবস্থায় মারা গেছে।

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۸۴﴾

৮৫. তাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (-এর প্রাচুর্য) দেখে তোমার বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ তো এসব জিনিস দ্বারা তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান[৭০] এবং (আরও চান) যেন কুফর অবস্থায়ই তাদের প্রাণপাত হয়।

وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۸۵﴾

---

৬৯. এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে সহীহ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) ছিলেন একজন খাঁটি মুসলিম। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মুনাফিকী প্রকাশ পেলেও সে প্রকাশ্যে যেহেতু নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করত, তাই বাহ্যত তার সাথে মুসলিমদের মতই আচরণ করা হত। তার যখন মৃত্যু হল, তখন তার পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁকে জানাযা পড়ানোর জন্য অনুরোধ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো উম্মতের প্রতিটি ব্যক্তির প্রতিই বড় দয়ালু ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর অনুরোধ গ্রহণ করলেন এবং তাঁর পিতার জানাযা পড়ানোর জন্য চলে গেলেন। এদিকে হযরত উমর (রাযি.) তাঁকে এই মুনাফিক কুল শিরোমণির জানাযা না পড়ানোর অনুরোধ জানালেন এবং এর সপক্ষে পূর্ববর্তী আয়াতের বরাত দিলেন, যাতে বলা হয়েছে, 'তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর উভয়ই সমান। তুমি যদি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবু আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না (আয়াত নং ৮০)। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাকে তো এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে যে, আমি চাইলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি। সুতরাং আমি তার জন্য সত্তর বারেরও বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করব। কাজেই তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জানাযা পড়ালেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় এবং তাঁকে মুনাফিকদের জানাযার নামায পড়াতে নিষেধ করে দেওয়া হয়। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর কখনও কোনও মুনাফিকের জানাযার নামায পড়াননি।

৭০. এর জন্য পেছনে ৫৫নং আয়াতের টীকা দেখুন।

وَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. 'আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তাঁর রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর'- এ মর্মে যখন কোন সূরা নাযিল হয়, তখন তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে, তারা তোমার কাছে অব্যাহতি চায় এবং বলে, যারা (ঘরে) বসে আছে, আমাকেও তাদের সঙ্গে থাকতে দিন।

رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. তারা পেছনে থেকে যাওয়া নারীদের সঙ্গে থাকাতেই আনন্দ বোধ করে। তাদের অন্তরে মোহর করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা অনুধাবন করে না (যে, তারা আসলে কী করছে!)।

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ؗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. কিন্তু রাসূল এবং যে সকল লোক তার সঙ্গে ঈমান এনেছে তারা নিজেদের জান-মাল দ্বারা জিহাদ করেছে। তাদেরই জন্য সর্বপ্রকার কল্যাণ এবং তারাই কৃতকার্য।

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٨٩﴾

৮৯. আল্লাহ তাদের জন্য এমন সব উদ্যান তৈরি করে রেখেছেন, যার তলদেশে নহর বহমান, যাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।

[১২]

وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٠﴾

৯০. আর দেহাতীদের মধ্য থেকেও অজুহাত প্রদর্শনকারীরা আসল, যেন তাদেরকে (জিহাদ থেকে) অব্যাহতি দেওয়া হয়।[৭১] আর (এভাবে) যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে মিথ্যা বলেছিল, তারা সকলে বসে থাকল। তাদের মধ্যে যারা (সম্পূর্ণরূপে) কুফর অবলম্বন করেছে তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

---

৭১. মদীনা মুনাওয়ারায় যেমন বহু মুনাফিক ছিল, তেমনি যারা মদীনার বাইরে পল্লী এলাকায় বাস করত, তাদের মধ্যেও অনেকে মুনাফিক ছিল। তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণের হুকুম যেহেতু কেবল মদীনাবাসীদের জন্যই নয়; বরং আশেপাশে যারা বাস করত, তাদের জন্যও ব্যাপক ছিল, তাই এ সকল দেহাতী মুনাফিকরাও নানা অজুহাত নিয়ে হাজির হল।

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩١﴾

৯১. দুর্বল লোকদের (জিহাদে না যাওয়াতে) কোনও গুনাহ নেই এবং পীড়িত ও সেই সকল লোকেরও নয়, যাদের কাছে খরচ করার মত কিছু নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি অকৃত্রিম থাকে। সৎ লোকদের সম্পর্কে কোনও অভিযোগ নেই। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴿٩٢﴾

৯২. সেই সকল লোকেরও (কোনও গুনাহ) নেই, যাদের অবস্থা এই যে, যখন তুমি তাদের জন্য কোন বাহনের ব্যবস্থা করবে– এই আশায় তারা তোমার কাছে আসল আর তুমি বললে, আমার কাছে তো তোমাদেরকে দেওয়ার মত কোন বাহন নেই, তখন তাদের কাছে খরচ করার মত কিছু না থাকার দুঃখে তারা এভাবে ফিরে গেল যে, তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল।[৭২]

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۚ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾

৯৩. অভিযোগ তো আছে তাদের সম্পর্কে, যারা ধনবান হওয়া সত্ত্বেও তোমার কাছে অব্যাহতি চায়। পেছনে অবস্থানকারী নারীদের সঙ্গে থাকাতে তারা খুশী। আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন। ফলে তারা প্রকৃত সত্য জানে না।

---

৭২. বিভিন্ন রিওয়ায়াতে আছে, এঁরা সকলে ছিলেন আনসারী সাহাবী, যেমন হযরত সালিম ইবনে উমায়ের, হযরত উলবা ইবনে যায়েদ, হযরত আবদুর রহমান ইবনে কাব, হযরত আমর ইবনুল হাম্মাম, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল, হযরত হারমী ইবনে আবদুল্লাহ ও হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাঈন। তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তারা নিখাদ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এবং সেজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সওয়ারীর আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন বললেন, আমার কাছে তো কোনও সওয়ারী নেই, তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন (রূহুল মাআনী)।

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ؕ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ؕ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۴﴾

৯৪. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা যখন (তাবুক থেকে) তাদের কাছে ফিরে যাবে, তখন তারা তোমাদের কাছে (নানা রকম) অজুহাত পেশ করবে। (হে নবী!) তাদেরকে বলে দিও, তোমরা অজুহাত পেশ করো না আমরা কিছুতেই তোমাদের কথা বিশ্বাস করব না। আল্লাহ তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদেরকে ভালোভাবে অবগত করেছেন। আর ভবিষ্যতে আল্লাহও তোমাদের কর্মপন্থা দেখবেন এবং তাঁর রাসূলও। অতঃপর তোমাদেরকে সেই সত্তার সামনে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, যিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত। অতঃপর তোমরা যা-কিছু করছিলে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ اِنَّهُمْ رِجْسٌ ؗ وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۹۵﴾

৯৫. তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে, তখন তারা তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম করবে, যাতে তোমরা তাদেরকে ক্ষমা কর। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ক্ষমা করো।[৭৩] নিশ্চয়ই তারা আপদমস্তক অপবিত্র। আর তারা যা অর্জন করছে তজ্জন্য তাদের ঠিকানা জাহান্নাম।

يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۹۶﴾

৯৬. তোমরা যাতে তাদের প্রতি খুশী হয়ে যাও সেজন্য তারা তোমাদের সামনে কসম করবে, অথচ তোমরা তাদের প্রতি খুশী হলেও আল্লাহ এরূপ অবাধ্য লোকদের প্রতি খুশী হবেন না।

---

৭৩. এখানে উপেক্ষা করার অর্থ তাদের কথা শোনার পর তা অগ্রাহ্য করা এবং তৎক্ষণাৎ তাদেরকে কোন শাস্তিও না দেওয়া আর তাদের ওজর গ্রহণের ওয়াদাও না করা কিংবা ক্ষমার ঘোষণা না দেওয়া। এ নীতি অবলম্বনের কারণ পরবর্তী আয়াতে এই বলা হয়েছে যে, মুনাফিকীর কারণে তারা আপদমস্তক অপবিত্র। তাদের অজুহাত মিথ্যা হওয়ার কারণে তা তাদেরকে পবিত্র করার শক্তি রাখে না। শেষে তাদেরকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

ٱلۡأَعۡرَابُ أَشَدُّ كُفۡرًا وَنِفَاقًا وَأَجۡدَرُ أَلَّا يَعۡلَمُوا۟ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾

৯৭. দেহাতী (মুনাফিক)-গণ কুফর ও কপটতায় কঠোরতর এবং অন্যদের অপেক্ষা তারা এ বিষয়ের বেশি উপযুক্ত যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি যে দ্বীন অবতীর্ণ করেছেন তার বিধানাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে।[৭৪] আল্লাহ জ্ঞানেরও মালিক, হিকমতেরও মালিক।

وَمِنَ ٱلۡأَعۡرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغۡرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآئِرَ ۚ عَلَيۡهِمۡ دَآئِرَةُ ٱلسَّوۡءِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾

৯৮. সেই দেহাতীদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা (আল্লাহর নামে) ব্যয়িত অর্থকে এক জরিমানা গণ্য করে এবং তোমাদের উপর মুসিবত আবর্তিত হওয়ার অপেক্ষা করে,[৭৫] (অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে,) নিকৃষ্টতম বিপদের আবর্তন তো তাদেরই উপর ঘটেছে। আল্লাহ সকল কথা শোনেন, সবকিছু জানেন।

وَمِنَ ٱلۡأَعۡرَابِ مَن يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَٰتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَٰتِ ٱلرَّسُولِ ۚ أَلَآ إِنَّهَا قُرۡبَةٌ لَّهُمۡ ۚ سَيُدۡخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحۡمَتِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٩﴾

৯৯. ওই দেহাতীদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে এবং (আল্লাহর নামে) যা-কিছু ব্যয় করে, তাকে আল্লাহর নৈকট্য ও রাসূলের দোয়া লাভের মাধ্যম মনে করে। নিশ্চয়ই, এটা তাদের জন্য নৈকট্য লাভের মাধ্যম। আল্লাহ তাদেরকে নিজ রহমতের ভেতর দাখিল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

৭৪. অর্থাৎ মুনাফিকী ছাড়াও তাদের একটা দোষ হল, তারা মদীনা মুনাওয়ারার মুসলিমদের সাথে মেলামেশাও করে না যে, শরীয়তের বিধানাবলী জানতে পারবে।

৭৫. অর্থাৎ তাদের একান্ত কামনা মুসলিমগণ কোনও মুসিবতের চক্রে পতিত হোক। তাহলে শরীয়তের যে সব বিধান তাদের দৃষ্টিতে কঠিন মনে হয়, সে ব্যাপারে তারা স্বাধীন হয়ে যেতে পারবে। বিশেষত তাবুকের যুদ্ধকালে তারা বড় আশা করছিল, এবার যেহেতু বিশাল রোমান শক্তির সাথে মুসলিমদের মুকাবিলা হতে যাচ্ছে, তাই যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে রোমানদের হাতে এবার তাদের চূড়ান্ত পতন ঘটবে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরা মুনাফিকীর চক্রে নিপতিত আছে, যা তাদেরকে দুনিয়া আখিরাত উভয় স্থানে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।

[১৩]

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٠٠﴾

১০০. মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথমে ঈমান এনেছে এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানরাজি তৈরি করে রেখেছেন, যার তলদেশে নহর বহমান। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সাফল্য।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ؕ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۫ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ۚ ﴿١٠١﴾

১০১. তোমাদের আশেপাশে যে সকল দেহাতী আছে, তাদের মধ্যেও মুনাফিক আছে এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও,[৭৬] তারা মুনাফিকীতে (এতটা) সিদ্ধ (যে,) তুমি তাদেরকে জান না, আমি তাদেরকে জানি। আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দেব।[৭৭] অতঃপর তাদেরকে এক মহা শাস্তির দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হবে।

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ

১০২. অপর কিছু লোক এমন, যারা নিজেদের দোষ স্বীকার করেছে। তারা মেশানো কাজ করেছে– কিছু ভালো কাজ, কিছু মন্দ কাজ। আশা করা যায়

---

৭৬. এতক্ষণ যে সকল দেহাতীদের কথা বলা হয়েছে, তারা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দূরে বাস করত। এবার যেসব দেহাতী মদীনা মুনাওয়ারার আশেপাশে বাস করত তাদের সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। সেই সঙ্গে খোদ মদীনা মুনাওয়ারার বাসিন্দাদের মধ্যে যারা মুনাফিক ছিল এবং যাদের মুনাফিকীর বিষয়টা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানা ছিল না, তাদের অবস্থা তুলে ধরা হচ্ছে।

৭৭. 'দু'বার শাস্তি দান'-এর ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। সঠিক অর্থ তো আল্লাহ তাআলাই জানেন। তবে বাহ্যত যা বুঝে আসে সে হিসেবে এক শাস্তি তো এই যে, তারা মুসলিমদের পরাস্ত ও পর্যুদস্ত হওয়ার যে আশা করছিল, তা পূরণ হয়নি; বরং মুসলিমগণ তাবুকের যুদ্ধ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদেই ফিরে এসেছেন। মুনাফিকদের পক্ষে এটাই এক বড় শাস্তি। দ্বিতীয়ত বহু মুনাফিকের মুখোশ খুলে গিয়েছে। ফলে দুনিয়াতেই তাদেরকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে।

عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١٠٢

আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন।[৭৮] নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۭ

১০৩. (হে নবী!) তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ কর, যার মাধ্যমে তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং যা তাদের পক্ষে বরকতের কারণ হবে।[৭৯] আর তাদের জন্য দোয়া কর। নিশ্চয়ই

---

৭৮. মুনাফিকগণ তো নিজেদের মুনাফিকীর কারণে তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি আর এ পর্যন্ত তাদের সম্পর্কেই আলোচনা চলছিল। কিন্তু অকৃত্রিম মুমিনদের মধ্যেও এমন কিছু লোক ছিল, যারা অলসতার কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তারা ছিলেন মোট দশজন। তাদের মধ্যে সাতজন নিজেদের অলসতার কারণে এতটাই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে ফেরার আগেই তারা নিজেরা নিজেদেরকে শাস্তি দেওয়ার সংকল্প নিয়ে ফেলেন। এতদুদ্দেশ্যে তারা মসজিদে নববীতে গিয়ে নিজেদেরকে খুঁটির সাথে বেঁধে ফেললেন এবং বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ক্ষমা না করবেন এবং নিজ হাতে আমাদেরকে খুলে না দেবেন, ততক্ষণ আমরা এভাবেই বাঁধা থাকব। অবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসলেন। তাদেরকে বাঁধা অবস্থায় দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী? তাঁকে বৃত্তান্ত জানানো হল। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা যতক্ষণ পর্যন্ত খোলার হুকুম না দেন ততক্ষণ আমিও তাদেরকে খুলব না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় এবং তাদের তাওবা কবুল করা হয়। ফলে তাদের বাঁধনও খুলে দেওয়া হয়। সেই সাতজনের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত আবু লুবাবা আনসারী (রাযি.)। তাঁর নামে মসজিদে নববীতে এখনও একটি স্তম্ভ আছে, যাকে 'উসতুওয়ানা আবু লুবাবা' বলা হয়। এক রিওয়ায়াতে আছে, তিনি নিজেকে খুঁটির সাথে বেঁধেছিলেন সেই সময়, যখন বনু কুরাইজার ব্যাপারে তাঁর দ্বারা একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হাফেজ ইবনে জারীর (রহ.) এ বর্ণনাকেই বেশি সঠিক সাব্যস্ত করেছেন যে, ঘটনাটি তাবুক যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত এবং সে সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে (দেখুন, ইবনে জারীর, তাফসীর ১১ খণ্ড, ১২–১৬ পৃ.)। অবশিষ্ট যে তিনজন তাবুকের যুদ্ধে শরীক হননি তাদের আলোচনা সামনে ১০৬ নং আয়াতে আসছে।

এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কারও দ্বারা কোনও গুনাহ হয়ে গেলে তার হতাশ হওয়ার কারণ নেই। বরং সে তাওবার প্রতি মনোযোগী হবে। এমনিভাবে সে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে নিজেকে সঠিক প্রমাণের চেষ্টা করবে না; বরং সর্বতোভাবে লজ্জা ও অনুশোচনা প্রকাশ করবে। এরূপ লোকদেরকে আল্লাহ তাআলা আশান্বিত করেছেন যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন।

৭৯. চরম অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে যারা নিজেদেরকে খুটির সাথে বেঁধে ফেলেছিলেন, যখন আল্লাহ তাআলা তাদের তাওবা কবুল করলেন এবং তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হল, তখন তাঁরা

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

তোমার দোয়া তাদের পক্ষে প্রশান্তিদায়ক। আল্লাহ সব কথা শোনেন, সবকিছু জানেন।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

১০৪. তাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহই তো নিজ বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং সদকাও গ্রহণ করেন এবং আল্লাহই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু?

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

১০৫. এবং (তাদেরকে) বল, তোমরা আমল করতে থাক। আল্লাহ তোমাদের আমলের ধরণ দেখবেন এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও। অতঃপর তোমাদেরকে সেই সত্তার কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, যিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন। তারপর তিনি তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে অবহিত করবেন।[৮০]

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا

১০৬. এবং অপর কিছু লোক রয়েছে, যাদের সম্পর্কে ফায়সালা মুলতবি রাখা হয়েছে আল্লাহর হুকুম না আসা পর্যন্ত।

কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিজেদের সম্পদ সদকা করতে মনস্থ করলেন এবং তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এনে পেশ করলেন। তিনি প্রথমে বললেন, আমাকে তোমাদের থেকে কোনও সম্পদ গ্রহণের হুকুম দেওয়া হয়নি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং তাকে সদকা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আয়াতে সদকার দু'টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। (এক) সদকা মানুষের জন্য মন্দ চরিত্র ও পাপাচার থেকে পবিত্রতা অর্জনের পক্ষে সহায়ক হয়। (দুই) সদকা দ্বারা মানুষের সৎকার্যে বরকত ও উন্নতি লাভ হয়।

প্রকাশ থাকে যে, এ আয়াত যদিও একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছিল, কিন্তু এর ভাষা যেহেতু সাধারণ, তাই এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরামের ইজমা (ঐকমত্য) রয়েছে যে, এ আয়াতেরই আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের অধিনায়ক তার জনগণ থেকে যাকাত উসূল করার এবং যথাযথ খাতে তা ব্যয় করার অধিকার সংরক্ষণ করে। আর এ কারণেই হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) নিজ খেলাফত আমলে যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন।

৮০. এ আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে যে, তাওবার পরও কারও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা ঠিক নয়। বরং আগামীতে নিজের কার্যকলাপ যাতে সংশোধন হয়ে যায় সে ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া উচিত।

يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٦﴾

আল্লাহ হয়ত তাদেরকে শাস্তি দেবেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করবেন।[৮১] আল্লাহর পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী এবং পরিপূর্ণ হিকমতেরও অধিকারী।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. এবং কিছু লোক এমন, যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে এই উদ্দেশ্যে যে, তারা (মুসলিমদের) ক্ষতি সাধন করবে, কুফরী কথাবার্তা বলবে, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে এবং পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তার রাসূলের সঙ্গে যে ব্যক্তির যুদ্ধ রয়েছে,[৮২] তার জন্য একটি ঘাঁটির ব্যবস্থা করবে। তারা অবশ্যই কসম করবে যে, আমরা সদুদ্দেশ্যেই এটা করেছি। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তারা নিশ্চিত মিথ্যুক।

---

৮১. যেই দশজন সাহাবী বিনা ওজরে কেবল অলসতাবশত তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছিলেন, তাদের সাতজনের বৃত্তান্ত তো পেছনে বর্ণিত হয়েছে। এবার বাকি তিনজনের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে। এ তিনজন হলেন হযরত কাব ইবনে মালিক (রাযি.), হযরত হেলাল ইবনে উমায়্যা (রাযি.) ও হযরত মুরারা ইবনে রাবী (রাযি.)। তারা অনুতপ্ত তো হয়েছিলেন, কিন্তু হযরত আবু লুবাবা (রাযি.) ও তার সাথীগণ যে দ্রুততার সাথে তাওবা করেছিলেন, তারা অতটা দ্রুত করেননি এবং তাঁদের অনুরূপ পন্থাও তাঁরা অবলম্বন করেননি। সুতরাং তারা যখন ক্ষমা প্রার্থনার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে পৌঁছলেন, তখন তিনি তাদের ব্যাপারে ফায়সালা মূলতবী রাখলেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনও হুকুম না আসে ততক্ষণের জন্য হুকুম দিলেন মুসলিমগণ যেন সামাজিকভাবে তাদেরকে বয়কট করে চলেন। সুতরাং পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত তাদেরকে বয়কট করে রাখা হল। অতঃপর তাদের তাওবা কবুল হল। সামনে ১১৮ নং আয়াতে তা বিস্তারিত আসছে।

৮২. এবার একদল চরম কুচক্রি মুনাফিক সম্পর্কে আলোচনা। তারা এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের ভিত্তিতে মসজিদের নামে এক ইমারত নির্মাণ করেছিল। ঘটনার বিবরণ এই যে, মদীনা মুনাওয়ারার খাযরাজ গোত্রে আবু আমির নামে এক লোক ছিল। সে খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল এবং সেই শিক্ষা মত সংসার বিমুখতা ও বৈরাগ্যের জীবন যাপন করত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওবা সাল্লামের শুভাগমনের আগে মদীনা মুনাওয়ারার মানুষ তাকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। মদীনা মুনাওয়ারায় আগমনের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও সত্য দ্বীনের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু সে সত্য গ্রহণ তো করলই না, উল্টো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের প্রতিপক্ষ জ্ঞান করল এবং সে হিসেবে তাঁর

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿۱۰۸﴾

১০৮. (হে নবী!) তুমি তাতে (অর্থাৎ তথাকথিত ওই মসজিদে) কখনও (নামাযের জন্য) দাঁড়াবে না। তবে যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে, সেটাই তোমার দাঁড়ানোর বেশি হকদার।[৮৩] তাতে এমন লোক আছে, যারা পাক-পবিত্রতাকে বেশি পসন্দ করে। আল্লাহ পাক-পবিত্র লোকদের পসন্দ করেন।

শত্রুতায় বদ্ধপরিকর হয়ে গেল। বদরের যুদ্ধ থেকে শুরু করে হুনায়নের যুদ্ধ পর্যন্ত মক্কার কাফেরদের সঙ্গে যত যুদ্ধ হয়েছে, তার সব ক'টিতেই সে কাফেরদের সমর্থন ও সহযোগিতা করেছে। পরিশেষে হুনায়নের যুদ্ধেও যখন মুসলিমদের বিজয় অর্জিত হল, তখন সে শাম চলে গেল এবং সেখান থেকে মদীনা মুনাওয়ারার মুনাফিকদেরকে চিঠি লিখল যে, আমি চেষ্টা করছি, যাতে রোমের বাদশাহ মদীনা মুনাওয়ারায় হামলা চালায় এবং মুসলিমদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কিন্তু এর সফলতার জন্য তোমাদেরও কাজ করতে হবে। তোমরা নিজেদেরকে সংঘটিত কর, যাতে আক্রমণ করলে ভিতর থেকে তোমরা তার সহযোগিতা করতে পার। সে এই পরামর্শও দিল যে, তোমরা মসজিদের নামে একটা স্থাপনা তৈরি কর, যা বিদ্রোহের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। গোপনে সেখানে অস্ত্র-শস্ত্রও মজুদ করবে। তোমাদের পারস্পরিক শলা-পরামর্শও সেখানেই করবে। আর আমার পক্ষ থেকে কোন দূত গেলে তাকেও সেখানেই থাকতে দেবে। সুতরাং মুনাফিকগণ কুবা এলাকায় একটি ইমারত তৈরি করল। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে আরজ করল, আমাদের মধ্যে বহু কমজোর লোক আছে। কুবার মসজিদ তাদের পক্ষে দূর হয়ে যায়। তাই তাদের সুবিধার্থে আমরা এই মসজিদটি তৈরি করেছি। আপনি কোনও এক সময় এসে এখানে নামায পড়ুন, যাতে আমরা বরকত লাভ করতে পারি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাবুক অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এখন তো আমি তাবুক যাচ্ছি। ফেরার পথে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হলে আমি সেখানে গিয়ে নামায পড়ব। কিন্তু তাবুক থেকে ফেরার সময় তিনি যখন মদীনা মুনাওয়ারার কাছাকাছি পৌঁছলেন, তখন 'যূ-আওয়ান' নামক স্থানে এ আয়াত নাযিল হয় এবং এর দ্বারা তার সামনে তথাকথিত ওই মসজিদের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়। আর তাকে নিষেধ করে দেওয়া হয়, যেন তাতে নামায না পড়েন। তিনি তখনই মালিক ইবনে দুখশুম ও মান ইবনে আদী রাযিয়াল্লাহু আনহুমা– এ দুই সাহাবীকে মসজিদ নামের সে ঘাঁটিটি ধ্বংস করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। সুতরাং তারা গিয়ে সেটি জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিলেন (ইবনে জারীর, তাফসীর)।

৮৩. এর দ্বারা কুবার মসজিদ ও মসজিদে নববী উভয়ই বোঝানো হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করে আসেন এবং কুবা পল্লীতে চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন, সেই সময় তিনি সেখানে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। কুবার সেই মসজিদটিই ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম মসজিদ। কুবা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছার পর তিনি মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন।

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. আচ্ছা, সেই ব্যক্তি উত্তম, যে আল্লাহ ভীতি ও তাঁর সন্তুষ্টির উপর নিজ গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেছে, না সেই ব্যক্তি, যে তার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাদের পতনোন্মুখ কিনারায়,[৮৪] ফলে সেটি তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হিদায়াতপ্রাপ্ত করেন না।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١٠﴾

১১০. তারা যে ইমারত তৈরি করেছিল, তা তাদের অন্তরে নিরন্তর সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়।[৮৫] আল্লাহ পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী, পরিপূর্ণ হিকমতের অধিকারী।

এ উভয় মসজিদেরই ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল তাকওয়া ও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উপর। এ মসজিদের ফযীলত বলা হয়েছে যে, এর মুসল্লীগণ পাক-সাফের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখে। দেহের বাহ্যিক পবিত্রতা যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি আমল-আখলাকের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতাও।

৮৪. কুরআন মাজীদে এস্থলে جرف শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটা কোন ভূমি, টিলা বা পাহাড়ের সেই অংশকে বলে, যার তলদেশ পানির ঢল ও স্রোতে ক্ষয়ে গিয়ে খোঁড়ল মত হয়ে গেছে। ফলে উপরের মাটি যে-কোন সময় ধ্বসে যেতে পারে।

৮৫. মুনাফিকরা যে ইমারত তৈরি করেছিল, সে সম্পর্কে ১০৭ নং আয়াতে জানানো উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা সেটি তৈরি করেছিল মসজিদের নামে। তাদের দাবী ছিল সেটি মসজিদ। এ কারণেই সেখানে ইমারতটির জন্য মসজিদ শব্দই ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু এ আয়াতে সেটির স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। তাই এখানে সেটিকে ইমারত বলা হয়েছে, মসজিদ বলা হয়নি। কেননা বাস্তবে সেটি মসজিদ ছিলই না। তার প্রতিষ্ঠাতাগণ মূলত কাফের ছিল এবং প্রতিষ্ঠাও করেছিল ইসলামের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে। এ কারণেই সেটিকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও মুসলিম মসজিদ নির্মাণ করলে তা জ্বালানো জায়েয হয় না।

এ আয়াতে বলা হয়েছে, 'ইমারতটি তাদের অন্তরে নিরন্তর সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকবে।' এর অর্থ, সেটি ভস্মিভূত করার ফলে মুনাফিকদের কাছেও এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তাদের ষড়যন্ত্রের বিষয়টা মুসলিমদের কাছে ফাঁস হয়ে গেছে। সুতরাং তারা নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে সর্বদা সন্দেহে নিপতিত থাকবে যে, না জানি মুসলিমগণ আমাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে! তাদের এই সংশয়জনিত অবস্থার অবসান কেবল সেই সময়ই হবে, যখন তাদের অন্তর ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে, অর্থাৎ তাদের মৃত্যু ঘটবে।

[১৪]

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

১১১. বস্তুত আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের সম্পদ এর বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য জান্নাত আছে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। ফলে হত্যা করে ও নিহতও হয়। এটা এক সত্য প্রতিশ্রুতি, যার দায়িত্ব আল্লাহ তাওরাত ও ইনজীলেও নিয়েছেন এবং কুরআনেও। আল্লাহ অপেক্ষা বেশি প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সঙ্গে যে সওদা করেছ, সেই সওদার জন্য তোমরা আনন্দিত হও এবং এটাই মহা সাফল্য।

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

১১২. (যারা এই সফল সওদা করেছে, তারা কারা?) তারা তাওবাকারী, আল্লাহর ইবাদতকারী, তাঁর প্রশংসাকারী, সওম পালনকারী,[৮৬] রুকু ও সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা ও অন্যায় কাজে বাধাদানকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী।[৮৭] (হে নবী!) এরূপ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও।

---

৮৬. কুরআন মাজীদে এ স্থলে السائحون শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূল অর্থ ভ্রমণ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাখ্যা করেছেন রোযাদার। বহু সাহাবী ও তাবেয়ী থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে (তাফসীরে ইবনে জারীর)। রোযাকে 'ভ্রমণ' শব্দে ব্যক্ত করার কারণ এই হয়ে থাকবে যে, ভ্রমণে যেমন মানুষের পানাহার ও শয়ন-জাগরণের নিয়ম ঠিক থাকে না, তেমনি রোযায়ও এসব বিষয়ে পার্থক্য দেখা দেয়।

৮৭. কুরআন মাজীদের বহু স্থানে 'আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা' ও তা সংরক্ষণ করার নির্দেশ বর্ণিত আছে। এ শব্দাবলী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর প্রেক্ষাপট এই যে, আল্লাহ তাআলা যত বিধান দিয়েছেন, তার প্রত্যেকটির কিছু সীমারেখা আছে। সেই সীমারেখার ভেতর থেকেই যদি তা পালন করা হয়, তবে সঠিক হয় ও পুণ্যের কাজ হিসেবে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে যদি কোন কাজে সীমারেখা ডিঙিয়ে যাওয়া হয়, তবে সেই কাজই অপসন্দনীয় এমনকি কখনও তা গুনাহের কাজ হিসেবে গণ্য হয়। উদাহরণ আল্লাহ তাআলার ইবাদত একটি বড় সওয়াবের কাজ, কিন্তু কেউ যদি ইবাদতে এতটা মগ্ন হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ তাআলা

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿۱۱۳﴾

১১৩. এটা নবী ও মুমিনদের পক্ষে শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাতে তারা আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন, যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, তারা জাহান্নামী।[৮৮]

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ

১১৪. আর ইবরাহীম নিজ পিতার জন্য যে মাগফিরাতের দোয়া করেছিলেন তার কারণ এছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, সে তাকে (পিতাকে) এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।[৮৯] পরে যখন তার কাছে স্পষ্ট

বান্দাদের যে সকল হক তার উপর আরোপ করেছেন, তা উপেক্ষিত থাকে, তবে সেই ইবাদতও অবৈধ হয়ে যায়। তাহাজ্জুদের নামায অনেক বড় সওয়াবের কাজ, কিন্তু কেউ যদি এ নামায পড়তে গিয়ে অন্যদের ঘুম নষ্ট করে, তবে তা নাজায়েয হয়ে যাবে। এমনিভাবে পিতা-মাতার সেবার উপরে কোনও নফল ইবাদত নেই, কিন্তু কেউ যদি এ কারণে স্ত্রী ও সন্তানদের হক পদদলিত করতে শুরু করে, তবে সে খেদমত গুনাহে পরিণত হবে। খুব সম্ভব এ কারণেই অনেকগুলো নেক কাজ বর্ণনা করার পর এ আয়াতের শেষে সীমারেখা সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বোঝানো হচ্ছে যে, তারা ওই সমস্ত নেক কাজ তার নির্ধারিত সীমারেখার ভেতর থেকে আঞ্জাম দেয়। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সেসব সীমারেখা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ কথা ও কাজ দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। আর তা শেখার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কোনও আল্লাহওয়ালার সাহচর্যে থাকা এবং তার কর্মপন্থা দেখে সে সকল সীমারেখা উপলব্ধি করা ও নিজ জীবনে তা রূপায়নের চেষ্টা করা।

৮৮. বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ আয়াতের শানে নুযুল বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু তালিব যদিও তার ভরপুর সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন, কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। মৃত্যুকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে কালিমা পাঠ করে মুসলিম হয়ে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু তখন আবু জাহল প্রমূখের বিরোধিতায় তাতে সাড়া দেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেছিলেন, আমাকে যতক্ষণ পর্যন্ত নিষেধ করা না হয় ততক্ষণ আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় এবং এর দ্বারা তাকে আবু তালিবের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়। তাছাড়া তাফসীরে তাবারী প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, কতিপয় মুসলিম তাদের মুশরিক বাপ-দাদাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তারা বলেছিলেন, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তো নিজ পিতার মাগফিরাত কামনা করেছিলেন, সুতরাং আমরাও তা করতে পারি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল।

৮৯. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে তাঁর পিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন তা সূরা মারইয়াম (১৯ : ৪৭) ও সূরা মুমতাহানায় (৬ : ৪) বর্ণিত আছে আর সে অনুযায়ী দোয়া করার কথা বর্ণিত রয়েছে সূরা শুআরায় (২৬ : ৮৬)।

تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِیْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِیْمٌ ﴿۱۱۴﴾

হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর দুশমন, তখন সে তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করল।[৯০] ইবরাহীম তো অত্যধিক উহ্-আহ্কারী[৯১] ও বড় সহনশীল ছিল।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِیُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰی یُبَیِّنَ لَهُمْ مَّا یَتَّقُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿۱۱۵﴾

১১৫. আল্লাহ এমন নন যে, কোনও সম্প্রদায়কে হিদায়াত করার পর গোমরাহ করে দেবেন, যাবৎ না তাদের কাছে স্পষ্ট করে দেন যে, তাদের কোন কোন বিষয় থেকে বেঁচে থাকা উচিত।[৯২] নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।

اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ یُحْیٖ وَیُمِیْتُ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا نَصِیْرٍ ﴿۱۱۶﴾

১১৬. নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই অধিকারে। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনও অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَی النَّبِیِّ وَالْمُهٰجِرِیْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْهُ فِیْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ یَزِیْغُ قُلُوْبُ فَرِیْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَیْهِمْ ؕ

১১৭. বস্তুত আল্লাহ সদয় দৃষ্টি দিয়েছেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে থেকেছিল,[৯৩] যখন তাদের একটি দলের অন্তর টলে যাওয়ার

---

৯০. অর্থাৎ যখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তার মৃত্যু কুফর অবস্থায়ই হবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত সে আল্লাহর শত্রু হয়ে থাকবে, তখন তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ত্যাগ করলেন। এর থেকে উলামায়ে কিরাম এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, কোনও কাফেরের জন্য এই নিয়তে মাগফিরাতের দোয়া করা জায়েয, যেন তার ঈমান আনার তাওফীক লাভ হয় এবং সেই উসিলায় তার মাগফিরাত হয়ে যায়। কিন্তু যেই ব্যক্তি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, তার মৃত্যু কুফর অবস্থায়ই হয়েছে, তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা জায়েয নয়।

৯১. 'উহ্-আহকারী' –এটা কুরআন মাজীদের اواه শব্দের আক্ষরিক অর্থ। বোঝানো হচ্ছে, তিনি অত্যন্ত কোমলপ্রাণ ছিলেন। আল্লাহ তাআলার স্মরণ ও আখিরাতের চিন্তায় তিনি অত্যধিক উহ্-আহ্ ও খুব কান্নাকাটি করতেন।

৯২. অর্থাৎ কোনও মুশরিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা জায়েয নয়– এ মর্মে যেহেতু এ পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনও নির্দেশ ছিল না, তাই এর আগে যারা কোনও মুশরিকের জন্য ইস্তিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে না।

৯৩. এতক্ষণ মুনাফিকদের নিন্দা এবং যে সকল মুসলিম অলসতার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছিল তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। এবার সেই

إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾

উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের অবস্থার প্রতি সদয় দৃষ্টি দিলেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি অতি সদয়, পরম দয়ালু।

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١١٨﴾

১১৮. এবং সেই তিন জনের প্রতিও (আল্লাহ সদয় দৃষ্টি দিয়েছেন) যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত মূলতবি রাখা হয়েছিল।[৯৪] অবশেষে যখন এ পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল, তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল, আল্লাহর (ধরা) থেকে খোদ তাঁর আশ্রয় ছাড়া কোথাও আশ্রয় পাওয়া যাবে না,[৯৫] তখন আল্লাহ তাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেন, যাতে

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের প্রশংসা করা হচ্ছে, যারা চরম কঠিন পরিস্থিতিতেও হাসিমুখে তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যেও অধিকাংশ ছিলেন এমন, যাদের অন্তরে জিহাদের জযবা ও হুকুম পালনের আগ্রহ ছিল অদম্য, যে কারণে তারা সেই কঠিন পরিস্থিতিকে একদম আমলে নেননি। অবশ্য তাদের মধ্যে এমন কতিপয়ও ছিলেন, পরিস্থিতির ভয়াবহতার কারণে প্রথম দিকে তাদের অন্তরে কিছুটা দোটানা ভাব দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারাও মন-প্রাণ দিয়ে অভিযানে শরীক হয়ে যান। এই দ্বিতীয় শ্রেণী সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যখন তাদের একটি দলের অন্তর টলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।'

৯৪. ১০৬ নং আয়াতে যে তিন সাহাবী সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত মূলতবী রাখা হয়েছে, এ আয়াতে তাদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

৯৫. ১০৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছিল যে, এ তিনজন সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম দিয়েছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনও নির্দেশ না আসে, ততক্ষণ মুসলিমগণ তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করে চলবে। ফলে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন তাদেরকে এভাবে কাটাতে হয় যে, কোনও মুসলিম তাদের সঙ্গে কথা বলত না এবং অন্য কোনও রকমের যোগাযোগ ও লেনদেন করত না। তাদের অন্যতম হযরত কাব ইবনে মালিক (রাযি.) সেই সময়কার যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন, সহীহ বুখারীর একটি দীর্ঘ রিওয়ায়াতে তা বিশদভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁর সে বর্ণনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। কী কিয়ামত যে তখন তাদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে তিনি তার চিত্র তুলে ধরেছেন, বস্তুত সে হাদীসটি তাদের ঈমানী চেতনা ও মানসিক অবস্থার অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও সালংকার বিবৃতি। সম্পূর্ণ হাদীসটি এখানে উদ্ধৃত করা কঠিন। অবশ্য মাআরিফুল কুরআনে

তারা তারই দিকে রুজু করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[১৫]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

১১৯. হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।[৯৬]

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২০. মদীনাবাসী ও তাদের আশপাশের দেহাতীদের পক্ষে এটা জায়েয ছিল না যে, তারা আল্লাহর রাসূলের (অনুগামী হওয়া) থেকে পিছিয়ে থাকবে এবং এটাও জায়েয ছিল না যে, তারা নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করে তার (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) জীবন সম্পর্কে চিন্তামুক্ত হয়ে বসে থাকবে। এটা এ কারণে যে, আল্লাহর পথে তাদের (অর্থাৎ মুজাহিদদের) যে পিপাসা, ক্লান্তি ও ক্ষুধার কষ্ট দেখা দেয় অথবা তারা কাফেরদের ক্রোধ সঞ্চার করে– এমন যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে কিংবা শত্রুর বিরুদ্ধে তারা যে সফলতা অর্জন করে, তাতে তাদের আমলনামায় (এরূপ প্রতিটি কাজের সময়) অবশ্যই পুণ্য লেখা হয়। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের কোনও কর্ম বৃথা যেতে দেন না।

তার বিশদ তরজমা উল্লেখ করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন। এ আয়াতে তাদের মানসিক অবস্থার প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

৯৬. সেই তিন মহাত্মার ঘটনা থেকে যে শিক্ষা লাভ হয় এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তারা নিজেদের দোষ গোপন করার লক্ষ্যে মুনাফিকদের মত মিথ্যা ছল-ছুতা খাড়া করেননি; বরং যা সত্য ছিল তাই অকপটে প্রকাশ করেছেন। বলে দিয়েছেন, তাদের কোনও ওজর ছিল না। তাদের এই সত্যবাদিতার বরকতে আল্লাহ তাআলা যে কেবল তাদের তাওবা কবুল করেছেন তাই নয়; বরং কুরআন মাজীদে সত্যবাদী মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করে কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে অমরত্ব দান করেছেন। এ আয়াতে এই শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, মানুষের উচিত এমন সত্যনিষ্ঠ লোকের সাহচর্য অবলম্বন করা, যারা মুখেও সত্য বলে এবং কাজেও সততার পরিচয় দেয়।

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢١﴾

১২১. তাছাড়া তারা (আল্লাহর পথে) যা কিছু ব্যয় করে, সে ব্যয় অল্প হোক বা বেশি এবং তারা যে-কোন উপত্যকাই অতিক্রম করে, তা সবই (তাদের আমলনামায় পুণ্য হিসেবে) লেখা হয়, যাতে আল্লাহ তাদেরকে (এরূপ প্রতিটি আমলের বিনিময়ে) এমন প্রতিদান দিতে পারেন, যা তাদের উৎকৃষ্ট আমলের জন্য নির্ধারিত আছে।[৯৭]

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ

১২২. মুসলিমদের পক্ষে এটাও সমীচীন নয় যে, তারা (সর্বদা) সকলে এক সঙ্গে (জিহাদে) বের হয়ে যাবে।[৯৮] সুতরাং এমন কেন হয় না যে, তাদের প্রতিটি বড় দল থেকে একটি অংশ (জিহাদে) বের হবে, যাতে (যারা জিহাদে যায়নি)

---

৯৭. অর্থাৎ মুজাহিদদের এসব কাজের মধ্যে কোনও কোনওটি তুচ্ছ মনে হলেও সওয়াব দেওয়া হবে তাদের উৎকৃষ্ট কাজের অনুরূপ। (প্রকাশ থাকে যে, কুরআন মাজীদে احسن। শব্দটিকে আমলের বিশেষণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ একে 'জাযা' বা প্রতিদানের বিশেষণও সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু আল্লামা আবু হায়্যান 'আল-বাহরুল মুহীত' গ্রন্থে ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে এর উপর যে আপত্তি তুলেছেন তার কোন সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং আল্লামা আলুসী (রহ.)ও আপত্তিটি উল্লেখ করে তার সমর্থনই করেছেন। সুতরাং এ স্থলে আয়াতটির তরজমা মাদারিকুত তানযীলে বর্ণিত তাফসীর অনুসারেই করা হয়েছে।

৯৮. যারা তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, সূরা তাওবার সুদীর্ঘ অংশে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। বিভিন্ন রিওয়ায়াতে আছে, এসব আয়াত শুনে সাহাবায়ে কিরাম সংকল্প করেছিলেন, আগামীতে যখনই কোন যুদ্ধ আসবে তাতে সকলেই অংশগ্রহণ করবেন। এ আয়াত নির্দেশনা দিচ্ছে, এরূপ চিন্তা সর্বদা সঙ্গত নয়। তাবুকের যুদ্ধে তো বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, যে কারণে সকল মুসলিমকে তাতে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় 'দায়িত্ব ও কর্ম-বণ্টন নীতি' অনুসারে কাজ করা চাই। আমীরের পক্ষ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ ডাক (অর্থাৎ সকলকে যুদ্ধে যোগদানের হুকুম) দেওয়া না হয়, ততক্ষণ জিহাদ ফরযে কিফায়া। প্রত্যেক বড় দল থেকে যদি একটা অংশ জিহাদে চলে যায়, তবে সকলের পক্ষ থেকে ফরযে কিফায়া আদায় হয়ে যাবে। এটা এ কারণেও দরকার যে, উম্মতের জন্য জিহাদ যেমন একটা আবশ্যিক বিষয়, তেমনি ইলমে দ্বীন অর্জন করাও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যদি সকলেই জিহাদে চলে যায়, তবে ইলমে দ্বীনের পঠন-পাঠনের দায়িত্ব কে পালন করবে? সুতরাং সঠিক পন্থা এটাই যে, যারা জিহাদে যাবে না, তারা দ্বীনী ইলম অর্জনে মশগুল থাকবে।

وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

তারা দ্বীনের উপলব্ধি অর্জনের চেষ্টা করে এবং যখন তাদের কওমের (সেই সব) লোক (যারা জিহাদে গিয়েছে, তারা) তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তাদেরকে সতর্ক করে,[৯৯] ফলে তারা (গুনাহ থেকে) সতর্ক থাকবে।

[১৬]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. হে মুমিনগণ! কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।[১০০] তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়।[১০১] নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

১২৪. যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) কেউ কেউ বলে, এ সূরাটি তোমাদের মধ্যে কার কার ঈমান বৃদ্ধি করেছে?[১০২] যারা

---

৯৯. অর্থাৎ তারা যেসব বিধান শিখেছে, মুজাহিদদেরকে তা অবহিত করবে, যেমন এই কাজ ওয়াজিব, ওই কাজ গুনাহ ইত্যাদি।

১০০. যে বিষয়বস্তুর দ্বারা এ সূরার সূচনা হয়েছিল এ আয়াতে তার সারমর্ম বলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। সে হিসেবে প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরয ছিল, যে সব মুশরিক এ ঘোষণা অমান্য করবে তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকবে, শুরুতে বলা হয়েছে, মক্কা বিজয়ের পর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের অন্তরে তাদের মুশরিক আত্মীয়দের প্রতি কিছুটা কোমল ভাব থাকা অসম্ভব ছিল না। তাই সূরার উপসংহারে তাদেরকে ফের সতর্ক করা হচ্ছে যে, ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে যেমন এই ক্রম বিস্তারের নীতি অবলম্বন বাঞ্ছনীয় যে, সর্বপ্রথম দাওয়াত দেওয়া হবে নিকটাত্মীয়দেরকে, তেমনি জিহাদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। অর্থাৎ সর্বপ্রথম যুদ্ধ করবে নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে, তারপর পর্যায়ক্রমে অন্যদের সঙ্গে।

১০১. অর্থাৎ আত্মীয়তার কারণে তোমাদের অন্তরে তাদের প্রতি যেন এমন নমনীয় ভাব সৃষ্টি না হয়, যা জিহাদের দায়িত্ব পালনে অন্তরায় হতে পারে। এমনিভাবে তারা যেন তোমাদের ভেতর কোনওরূপ দুর্বলতা দেখতে না পায়; বরং তোমরা যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সেটাই যেন উপলব্ধি করে।

১০২. একথা বলে মুনাফিকরা সূরা আনফালে বর্ণিত একটা কথাকে ব্যঙ্গ করত। তাতে বলা হয়েছিল মুমিনদের সামনে যখন কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাতে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় (৮ : ২)।

فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿١٢٤﴾

(সত্যিকারের) ঈমান এনেছে, এ সূরা বাস্তবিকই তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারাই (এতে) আনন্দিত হয়।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, এ সূরা তাদের কলুষের সাথে আরও কলুষ যুক্ত করে[১০৩] এবং তাদের মৃত্যুও ঘটে কাফের অবস্থায়।

اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৬. তারা কি লক্ষ্য করে না প্রতি বছর তারা দু'-একবার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়?[১০৪] তথাপি তারা তাওবাও করে না এবং উপদেশও গ্রহণ করে না।

وَاِذَا مَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ؕ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ؕ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. এবং যখনই কোনও সূরা নাযিল হয়, তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকায় (এবং ইশারায় একে অন্যকে বলে) তোমাদেরকে কেউ দেখছে না তো? তারপর তারা সেখান থেকে সটকে পড়ে।[১০৫] আল্লাহ তাদের অন্তর ঘুরিয়ে দিয়েছেন, যেহেতু তারা অনুধাবন করে না।

---

১০৩. অর্থাৎ কুফর ও মুনাফিকীর কলুষ-কালিমা তো আগেই তাদের মধ্যে ছিল। এবার নতুন আয়াতকে অস্বীকার ও বিদ্রূপ করার ফলে সেই কলুষে মাত্রা যোগ হল।

১০৪. মুনাফিকদের উপর প্রতি বছরই কোনও না কোনও বিপদ আসত। কখনও তাদের আকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনার বিপরীতে মুসলিমদের বিজয় অর্জিত হত, কখনও তাদের নিজেদের কোনও গোমর ফাঁস হয়ে যেত, কখনও রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হত এবং কখনও অভাব-অনটনের শিকার হত। আল্লাহ তাআলা বলেন, এসব বিপদই তাদেরকে সতর্ক করার জন্য যথেষ্ট হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোনও কিছু থেকেই তারা শিক্ষা নেয় না।

১০৫. আসল কথা আল্লাহ তাআলার কালামের প্রতি তাদের ছিল চরম বিদ্বেষ। তাই তাদের কামনা ও চেষ্টা থাকত, যাতে কখনও তা শোনার অবকাশ না আসে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মজলিসে যখন নতুন কোন সূরা তিলাওয়াত করতেন, তখন তারা পালানোর চেষ্টা করত। কিন্তু সকলের সম্মুখ দিয়ে উঠে গেলে পাছে তাদের গোমর ফাঁস হয়ে যায়, তাই একে অন্যকে চোখের ইশারায় বলত, এমন কোনও সুযোগ খোঁজ, যখন কোনও মুসলিম তোমাদেরকে দেখছে না আর সেই অবকাশে চুপিসারে উঠে যাও।

لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُوۡلٌ مِّنۡ اَنۡفُسِكُمۡ عَزِیۡزٌ عَلَیۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِیۡصٌ عَلَیۡكُمۡ بِالۡمُؤۡمِنِیۡنَ رَءُوۡفٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۱۲۸﴾

১২৮. (হে মানুষ!) তোমাদের কাছে এমন এক রাসূল এসেছে, যে তোমাদের নিজেদেরই লোক। তোমাদের যে-কোনও কষ্ট তার জন্য অতি পীড়াদায়ক। সে সতত তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত সদয়, পরম দয়ালু।

فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَقُلۡ حَسۡبِیَ اللّٰهُ ۫ۖ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَیۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَ هُوَ رَبُّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡمِ ﴿۱۲۹﴾

১২৯. তারপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে (হে রাসূল! তাদেরকে) বলে দাও, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোনও মাবুদ নেই। তারই উপর আমি ভরসা করেছি এবং তিনি মহা আরশের মালিক।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় আজ ১৮ রবিউছ ছানী ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ১৭ মে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ করাচীতে সূরা তাওবার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। [আর অনুবাদ শেষ হল আজ বুধবার ৩ সফর ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২০ জানুয়ারি ২০১০ খ্রিস্টাব্দ]। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাসমূহের তরজমা ও টীকার কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক সম্পন্ন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫ ৭৮৫
ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net
ওয়েব সাইট: www.maktabatulashraf.net